জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শিশু-গ্রন্থমালা ১

জাতির জনক তাঁর সারা জীবন





জাতির জনক
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
শিশু-গ্রন্থমালা

জাতির জনকের আদর্শে
উজ্জীবিত বাঙালি জাতির
সংগ্রামী ঐতিহ্য আর
প্রতিরোধের মুখে স্বৈরাচার,
ষড়যন্ত্রকারী ঘাতক ও
স্বাধীনতা বিরোধী চক্রের
সকল অপচেষ্টা আজ
পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে। ...

তাঁর আদর্শের আলোক
বাঙালি জাতিকে চিরকাল
এগিয়ে যেতে পথ দেখাবে।
সকলের মিলিত প্রচেষ্টায়
সুখী-সমৃদ্ধ 'সোনার বাংলা'
গড়ে জাতির জনকের
অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন
করাই হোক আমাদের শপথ।

শেখ হাসিনা

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শিশু- গ্রন্থমালা ১

জাতির জনক তাঁর সারা জীবন



জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শিশু- গ্রন্থমালা ১

বইনকশা ও প্রচ্ছদ : হাশেম খান

ছবি এঁকেছেন

রফিকুন নবী
আজিজুর রহমান
রব্বানী শামীম
সামিনা নাফিজ
শেখ আফজাল
আবদুল মোমেন মিল্টন
সোহাগ পারভেজ
হাশেম খান

জাতির জনক তাঁর সারা জীবন

বাশিশুএ ৭০১
প্রকাশক : ফালগুনী হামিদ, পরিচালক, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, দোয়েল চত্বর রোড, ঢাকা-১০০০। মুদ্রণে : রূপা প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং, ২০৫/৪ ফকিরেরপুল, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০। প্রচ্ছদ ও বইনকশা : হাশেম খান। প্রকাশকাল : আষাঢ় ১৪১৮, জুন ২০১১।
শুভেচ্ছা মূল্য : ৪০০.০০

JATIR JANAK : TNAR SARA JIBAN Father of The Nation : his life & achievements (A Collection of essays, poems, stories, photographs & drawings on Bongobondhu). Edited by The Board of Editors. Publisher : Falguni Hamid, Director, Bangladesh Shishu Academy, Doyel Chattor Road, Dhaka-1000. Cover & Book-Design : Hashem Khan, Date of Publication : June 2011.

Price : Tk. 400.00
US S 20.00

ISBN : 984-70076-0701-2



জাতির জনক তাঁর সারা জীবন

সম্পাদনা পরিষদ

সভাপতি : হাশেম খান

সদস্য

মুনতাসীর মামুন সেলিনা হোসেন
সুব্রত বড়ুয়া শাহ্‌জাহান কিবরিয়া

ব্যবস্থাপনা

কর্মসূচি পরিচালক : ফালগুনী হামিদ

সমন্বয়কারী : সুজন বড়ুয়া

বাংলাদেশ শিশু একাডেমী



শুভেচ্ছা

.....

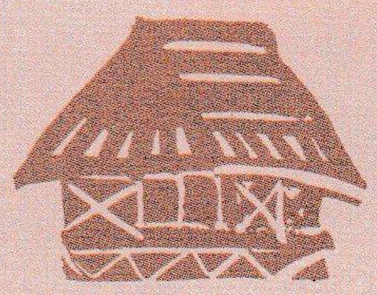
.....

.....

উৎসর্গ

১০ বছরের শিশু
শেখ রাসেল শহীদ হয়েছিল
১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট।
বাংলাদেশের মানুষ
শেখ রাসেলকে
মনে রাখবে চিরদিন





বাংলাদেশ।

অতীতে আমাদের এই বাংলাদেশের নাম ছিল পূর্ববাংলা। একে পূর্ববঙ্গও বলা হত। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ রাজত্বের অবসানের পরে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। তখন পূর্ব বাংলার নাম হয় পূর্ব পাকিস্তান। পুরো দেশের নাম পাকিস্তান। অন্য অংশ পশ্চিম পাকিস্তান। দুই অংশের দূরত্ব প্রায় ১০০০ মাইল। ভাষা, সংস্কৃতি, জীবনযাপন, দেশের জলবায়ু ইত্যাদি অনেক কিছুতেই দুই দেশের মিল নেই। শুধু ইসলাম ধর্মের মানুষের সংখ্যা দু'অংশে বেশি হওয়ার কারণে একদেশ।

পাকিস্তান রাষ্ট্রের শুরু থেকেই দেখা গেল পশ্চিম পাকিস্তানের নেতা, রাজনীতির মানুষ, আমলা ও সেনা কর্মকর্তারা নানা কৌশলে রাষ্ট্রের উচ্চতর স্থান ও ক্ষমতাসম্পন্ন পদগুলো দখল করে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষকে তাদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে চলেছে। সেই সময় (১৯৪৭-৪৮) পুরো পাকিস্তানের জনসাধারণের মধ্যে বাংলাভাষায় কথা বলত ৫৬ ভাগ মানুষ। তারপরেও গভর্নর জেনারেল মুহম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকায় এসে ঘোষণা করলেন— 'উর্দু হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।' ৫৬ ভাগ মানুষের ভাষা, পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের মাতৃভাষা 'বাংলাকে' কোনো গুরুত্ব দেওয়া হল না। ছাত্র-জনতা তীব্রভাবে এই ঘোষণার প্রতিবাদ জানাল।

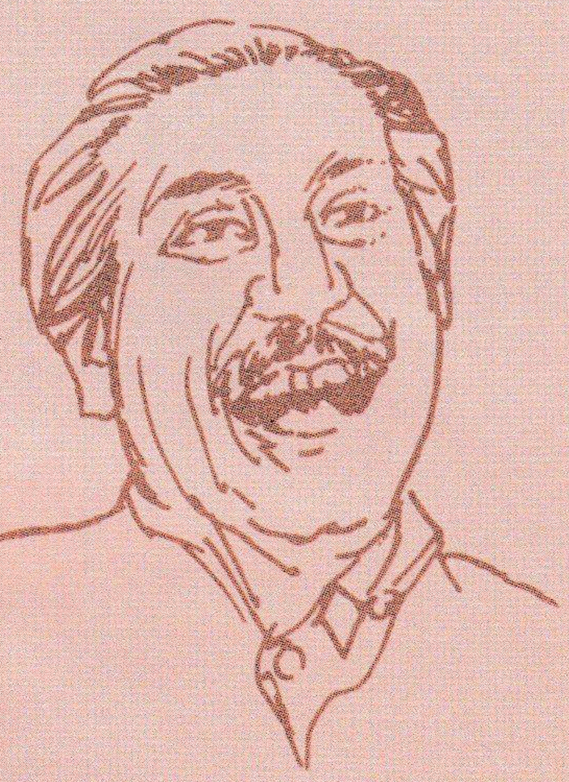
এইভাবে দেখা গেল, দিনের পর দিন, বছরের পর বছর ধরে পূর্ব পাকিস্তানকে চরম অবহেলা করে চলেছে পাকিস্তানের শাসকবর্গ। পূর্ব পাকিস্তান থেকে অর্জিত সম্পদ ও অর্থ নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়ন হচ্ছে। তাদের শহর-বন্দর, রাস্তা-ঘাট সব আধুনিক রূপ দেওয়া হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তানের আয় দিয়ে। পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা দিন দিন জরাজীর্ণ হয়ে পড়ছে। রাষ্ট্রের বড় বড় পদগুলো বেশির ভাগই তারা দখল করে নিচ্ছে। কল-কারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা প্রায় সব কিছুর জন্যই পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষকে সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে। নানা কৌশলে ও অজুহাতে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের তারা ঠকিয়ে চলেছে।

কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান বা পূর্ব বাংলার মানুষ তা মেনে নেবে কেন? বারে বারে তারা তীব্র প্রতিবাদ জানাল ও আন্দোলন গড়ে তুলতে লাগল এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে। ফলে আন্দোলনকারীদের উপর নেমে আসতে লাগল নির্যাতন ও শাস্তির খড়্গ— জেল, জুলুম, হত্যাসহ নানা রকম মানসিক ও দৈহিক নিপীড়ন।

১৯৪৭ থেকে ১৯৭১। এই ২৩ বছর ধরে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী তথা সামরিক শাসকদের বাঙালিদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া অনেক অন্যায় আইন, শোষণ নির্যাতনের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ বারবার প্রতিবাদের ঝড় তুলেছে, সংগ্রাম করেছে। নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য জনতা ক্রমে আন্দোলনের গতি বাড়িয়ে দিয়ে ১৯৭১-এর ২৬ মার্চ চরম আঘাত হেনেছে। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করেছে। দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধ করে ৩০ লক্ষ মানুষ প্রাণ দিয়েছে বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী পরাজিত হয়ে আত্মসমর্পণ করেছে। ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে নতুন স্বাধীন দেশের জন্ম হল, যার নাম বাংলাদেশ।

দুই

সংগ্রামের ২৩ বছরের উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলো হল— ১৯৪৮ সালে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল একমাত্র উর্দুকেই রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দিলে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র-জনতা তীব্র প্রতিবাদ জানায়। বাংলাকেও রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য সারা দেশে আন্দোলন গড়ে ওঠে। সেই ধারাবাহিকতায় ১৯৫২ সালে উর্দু ভাষার সঙ্গে বাংলা



ভাষাকেও রাষ্ট্রভাষা ঘোষণার দাবি জোরালোভাবে তুলে ধরতে গেলে তৎকালীন মুসলিম লীগ সরকার ছাত্র-জনতার ওপর নির্দয়ভাবে গুলিবর্ষণ করে। ভাষার দাবিকে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্যে তৎকালীন মুসলিম লীগ সরকারের নির্দেশে আন্দোলনরত ছাত্র-জনতার উপর পুলিশ গুলি চালায়। গুলিতে নিহত হয় বরকত, সালাম, রফিক, জব্বার, শফিউরসহ অনেকে। তারিখ ছিল ৮ ফাল্গুন বা ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২ সাল।

না, বাঙালিরা নির্যাতন, হত্যা ও রক্তপাতে মোটেই ভীত হল না, বরং আন্দোলনকে আরো তীব্রতর করে তুলল। অবশেষে মুসলীম লীগ সরকার বাধ্য হল বাংলাভাষাকেও রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মেনে নিতে। এদিকে মানুষ দিন দিন অত্যাচারী মুসলিম লীগ সরকারের পক্ষ থেকে সরে আসতে লাগল। ফলে ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে হেরে মুসলীম লীগ সরকারের পতন হল। কেন্দ্রে ও পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক সরকারে আওয়ামী লীগসহ অন্যান্য প্রগতিবাদী রাজনৈতিক দলের জোট 'যুক্তফ্রন্ট' ক্ষমতায় এল। কিন্তু সামরিক বাহিনী ও অন্যান্য উচ্চাভিলাষী নেতাদের কূটকৌশলে অল্পদিনের মধ্যেই যুক্তফ্রন্টকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেওয়া হল। যে কালো আইনে হঠাৎ করেই যুক্তফ্রন্টকে সরানো হল, তার নাম '৯২-ক ধারা'।

১৯৫৮ সালে পাকিস্তানের প্রধান সেনাপতি আইয়ুব খান অকস্মাৎ সমগ্র পাকিস্তানের ক্ষমতা জোর করেই নিজের আয়ত্তে নিয়ে নিলেন। সারাদেশে সামরিক আইন অর্থাৎ মার্শাল ল জারি করলেন। রাজনীতি বন্ধ করে দিয়ে বহু জনদরদি নেতাকে বন্দি করে জেলে পুরলেন। কালো আইন 'এবডো' জারি করে ৫ বছরের জন্য রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বন্ধ করে দিলেন।

পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য আন্দোলন কখনোই বেশিদিন থেমে থাকেনি। পাকিস্তানি শাসকবর্গের অবিচার ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে জনগণকে জাগিয়ে তোলার পেছনে তাই অনেক রাজনৈতিক নেতার অবদান রয়েছে— তাঁরা জেল, মামলাসহ নানা রকম নির্যাতন সহ্য করেছেন। জনগণ সে সব নেতাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে, তাঁদের প্রতি রয়েছে জনগণের ভালোবাসা ও অসীম কৃতজ্ঞতা। এঁদের মধ্যে প্রধান যাঁরা তাঁরা হলেন— শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী প্রমুখ। এঁদের পাশাপাশি থেকে আরেকজন তরুণ নেতা নিজের সাহস, মেধা ও সাংগঠনিক দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে সাধারণ মানুষের প্রিয় নেতা হিসেবে অগ্রগণ্য হয়ে উঠলেন— তিনি শেখ মুজিবুর রহমান। পরবর্তীকালে জনগণ তাঁকে ভালোবেসে উপাধি দিয়েছিল 'বঙ্গবন্ধু'।

১৯৬১ সালে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল আইয়ুব খান হামুদুর রহমান শিক্ষা কমিশন নামে নতুন শিক্ষাপদ্ধতি চালু করার পদক্ষেপ নিলেন। সে শিক্ষাপদ্ধতিতে সাধারণ শিক্ষা থেকে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণে সাধারণ পরিবারের সন্তানদের সুযোগ পাওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়ালো। আইয়ুব খানের সুকঠিন মার্শাল লয়ের তখন প্রায় তিন বছর। ছাত্র-জনতা প্রতিবাদের ঝড় তুলল— হামুদুর রহমান শিক্ষা কমিশন মানি না, মানব না। মার্শাল লয়ের কঠিন আইনকে তাঁরা তোয়াক্কাই করল না। আন্দোলনের জোয়ারে হামুদুর রহমান শিক্ষা কমিশন বাতিল হল। জনগণের জয় সূচিত হল।

১৯৬১ সালে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একশততম জন্মদিন পালন করবে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা। রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষার কবি। তাঁর কবিতা, তাঁর সাহিত্য, তাঁর গান, নাটক ও ছবি বাঙালির প্রাণের কথা। বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচনা করে রবীন্দ্রনাথ আন্তর্জাতিক সর্বোচ্চ পুরস্কার 'নোবেল' প্রাইজ অর্জন করে বিশ্বে বাঙালিকে গৌরবের উঁচু স্থানে বসিয়ে দিয়েছেন। তাঁর শততম জন্মদিন পালনে পাকিস্তান সামরিক সরকার ঘোরতরভাবে বাধা দিল। তারা বলল, রবীন্দ্রনাথ হিন্দু ধর্মের লোক, তাঁর সাহিত্য, তাঁর গান, তাঁর কবিতা হিন্দুদের সাহিত্য। পাকিস্তান মুসলমানদের দেশ। তাই 'রবীন্দ্রনাথের

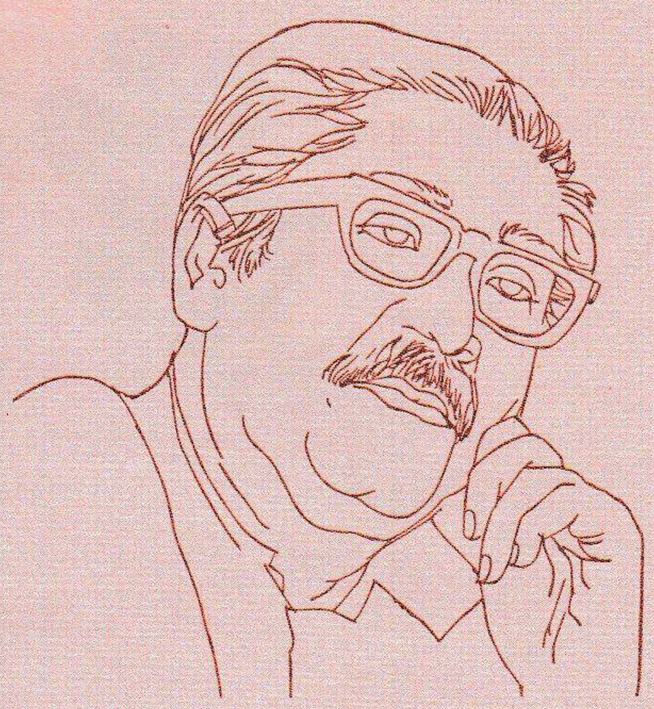
সাহিত্য— হিন্দু সাহিত্য' এমন একটি মিথ্যা অপবাদ ছড়ানো হল। কিন্তু বাংলার দামাল ছেলেরা, পূর্ব পাকিস্তানের রবীন্দ্রভক্তরা তা শুনবে কেন? স্বৈরাচারী পাক সরকারের খোঁড়া যুক্তি ও মিথ্যা অপবাদ তীব্র আন্দোলন করে উড়িয়ে দিল। পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র অত্যন্ত জাঁকজমকের সঙ্গে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী পালন করা হল। রবীন্দ্রনাথের গান সবার মুখে মুখে সারা দেশেই ছড়িয়ে পড়ল।

'এবডো'র পাঁচ বছর শেষে শেখ মুজিবুর রহমান জেল থেকে মুক্তি পেলেন। ১৯৬৬ সালে ঘোষণা করলেন আওয়ামী লীগের ৬-দফা দাবি। এই ৬-দফা ছিল খুবই সুচিন্তিত ও যুক্তিযুক্ত। পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে সাত কোটি মানুষের স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকার ন্যূনতম অধিকারগুলো এই ৬-দফা'য় তুলে ধরা হল। পাকিস্তানি সামরিক সরকার শেখ মুজিবের এই ৬-দফা'র দাবি দেখে বিপাকে পড়ে গেল। তাদের মনে ভয় ঢুকে গেল। ৬-দফা মেনে নিলে এতদিন তারা পূর্ব পাকিস্তানকে যেভাবে ঠকিয়েছে তা বন্ধ হয়ে যাবে। পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত সম্পদ যেভাবে লুট করেছে এবং আত্মসাৎ করেছে তা আর পারা যাবে না। তাই ৬-দফা দাবিকে নস্যাৎ করে দেওয়ার জন্য নানা রকম মামলা সাজিয়ে বাংলার মানুষের প্রিয়নেতা শেখ মুজিবকে অপদস্ত করার জন্য আবার গ্রেফতার করল। শুধু শেখ মুজিবই নয়, আওয়ামী লীগের অনেক নেতা ও বাঙালি অফিসারদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করল। দায়েরকৃত মামলার নাম 'আগরতলা ষড়যন্ত্র' মামলা। সেই সঙ্গে নানারকম মানসিক, আর্থিক ও দৈহিক নির্যাতনও চলতে থাকল।

পাকিস্তান সরকারের কাছে গুরুতর অপরাধ করেছে শেখ মুজিব। তাদের অভিযোগ— পূর্ব পাকিস্তানকে আলাদা দেশ করার জন্যে পার্বত্য ত্রিপুরার আগরতলায় বসে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে। সেখানে ভারতীয় নেতারা ও পূর্ব পাকিস্তানের কিছু পদস্থ সরকারি কর্মকর্তাও ছিল। মামলা এমনভাবে সাজানো হল যাতে শেখ মুজিব, অন্যান্য নেতা ও পদস্থ কর্মকর্তাদের রাষ্ট্রদ্রোহী হিসেবে দোষী সাব্যস্ত করে কঠিন শাস্তি দিয়ে জেলে পুরে রাখতে কিংবা মৃত্যুদণ্ডের মতো শাস্তির ব্যবস্থা করতে পারে। তাদের ভাবনা— শেখ মুজিবই একমাত্র নেতা যাকে ঠিকমত শায়েস্তা করতে পারলে পাকিস্তানের স্বৈর শাসকদের বিরুদ্ধে সব আন্দোলন বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু পাকিস্তানের শাসকবর্গের ধারণা ছিল সম্পূর্ণ ভুল।

শেখ মুজিব এমন একজন নেতা যিনি তাঁর শৈশব থেকেই তিল তিল করে নিজেকে তৈরি করেছেন— দেশের জন্য ও মানুষের সেবক হিসেবে। মানুষের দুঃখকষ্ট তিনি গভীরভাবে বুঝতেন। রাজনীতির নামে শাসকগোষ্ঠী কীভাবে শোষণ করছে, গরিবের জমি-জমা ও ফসল লুটে নিচ্ছে তা তিনি মানুষদের জানিয়ে দিতেন। সাধারণ মানুষদের পাশে থেকে তাদের অধিকার আদায়ে সাহস যোগাতেন। অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে এবং দাবি আদায়ের জন্য তাদের হয়ে লড়াই করেছেন। তাই অতি অল্প সময়েই তিনি সাড়ে সাত কোটি বাঙালির প্রিয় নেতা হয়ে উঠেছেন। একই সংগে বাংলার মানুষও দিন দিন প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে। শেখ মুজিব তখন আর একা নন। সারা দেশের মানুষ তখন তাঁর সঙ্গে। বাঙালির এই প্রিয় নেতাকে রাষ্ট্রদ্রোহী প্রমাণ করে কারাগারে ঢোকাবে? হতেই পারে না। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিরুদ্ধে ছাত্র-জনতা দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলল। জেলের তালা ভেঙে প্রিয় নেতাকে মুক্ত করে আনবেই। ছাত্ররা যোগ করল ১১-দফা দাবি। ফলে ৩টি আন্দোলনের শক্তি এক হয়ে মহাশক্তিশালী এক সংগ্রাম গড়ে উঠল স্বৈরাচারী পাকিস্তান সরকারকে উৎখাত করার জন্য।

শেখ মুজিবের ৬-দফা, ছাত্রজনতার ১১-দফা এবং আগরতলা মামলা থেকে শেখ মুজিবের মুক্তির আন্দোলন গ্রামে-গঞ্জে, শহরে-বন্দরে, হাটে-বাজারে, স্কুল-কলেজে, কলে-কারখানায়— সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। এই আন্দোলনের নাম ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান।



আন্দোলন এমন শক্তিশালী রূপ নিল যে, পাকিস্তান সরকার নিজেদের প্রচুর স্বৈরাচারী শক্তি নিয়োগ করেও গণঅভ্যুত্থানকে, বিন্দুমাত্রও থামাতে পারল না। জনগণের প্রচণ্ড দাবির চাপে তাদের প্রিয় নেতা শেখ মুজিবসহ সব রাজনৈতিক নেতাকে কারাগার থেকে মুক্তি দিতে বাধ্য হল। মুক্তির পর ছাত্র-জনতা তৎকালীন ঘোড়দৌড়ের মাঠে শেখ মুজিবের জন্য বিশাল এক সংবর্ধনা সভার আয়োজন করে তাঁকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করে। দোর্দণ্ড প্রতাপশালী ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের পদ থেকে সরে দাঁড়ালেন। ক্ষমতা দিয়ে গেলেন আরেক সামরিক প্রধান ইয়াহিয়া খানকে।

'৬৯-এর গণআন্দোলনের শক্তি ও জনগণের ঐক্য দেখে ইয়াহিয়া ক্ষমতা আঁকড়ে রাখার সাহস পেল না। অতি দ্রুত দেশে সাধারণ নির্বাচন দিল। নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সমগ্র পাকিস্তানে সবচেয়ে বেশি ভোট পেয়ে ক্ষমতা জয় করে নিল। কিন্তু বাঙালিদের হাতে পাকিস্তানের ক্ষমতা দেবে না পাকিস্তান সামরিক সরকার। ৩ মার্চ ১৯৭১ তারিখ নির্ধারিত ছিল পাকিস্তানের নতুন জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশন বসার এবং তা বসবে ঢাকায়। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া একেবারে হঠাৎ করেই নির্লজ্জের মত ১ মার্চ ঘোষণা দিলেন— ৩ মার্চে অধিবেশন বসবে না। জুলফিকার আলী ভুট্টো পশ্চিম পাকিস্তানে বেশি ভোট পেয়েছে। আগে তার সঙ্গে বসে ক্ষমতা ভাগাভাগির বিষয় ঠিক করে নিতে হবে।

অসম্ভব! গর্জে উঠলেন শেখ মুজিব। জনগণের রায়ে তিনিই এখন পাকিস্তানের সরকার গঠন করবেন এবং তা হবে জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের মাধ্যমে, কারো সঙ্গে গোপন সলা-পরামর্শ করে নয়।

সমগ্র বাংলা জুড়ে জনতা আবার প্রচণ্ড ক্ষোভে গর্জে উঠল— মানি না-মানব না। প্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধুকে জানাল, বাঙালিদের আর পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে থাকার প্রয়োজন নেই। ২ মার্চ বঙ্গবন্ধু বিশাল জনবিক্ষোভের মাঝে দাঁড়িয়ে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিলেন— পাকিস্তান সরকারের নির্দেশে নয়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশ অনুযায়ী দেশ চলবে। অফিস, আদালত, সরকারি কাজকর্ম এবং ব্যাংক বঙ্গবন্ধুর নির্দেশেই চলবে।

৭ মার্চ ১৯৭১ রমনার ঘোড়দৌড় মাঠে (বর্তমান সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যান) লক্ষ লক্ষ বাঙালির বিশাল জনসভায় বঙ্গবন্ধু দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা দিলেন— *ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল, তোমাদের যা কিছু আছে তাই দিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে। ...মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেবো; এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ—*

..... এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। "জয় বাংলা"।

তিন

৭ মার্চে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণের পর পূর্ব পাকিস্তান তথা বর্তমান বাংলাদেশের প্রতিটি ঘরে প্রতিটি মানুষ নতুন এক স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে জাগরণের শিহরনে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল। কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিত হতে লাগল— 'জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।' 'তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা মেঘনা যমুনা'। 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধর বাংলাদেশ স্বাধীন কর'।

সাজ সাজ— যুদ্ধসাজ সর্বত্র। স্কুল-কলেজ, মাদ্রাসা-বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে, শহরে পাড়ায় পাড়ায়, গ্রামেগঞ্জে সর্বত্রই ছেলে, মেয়ে, যুবক, সব বয়সের মানুষ প্রস্তুতি ও প্রশিক্ষণ নিতে লাগল। অস্ত্র নিয়েই যুদ্ধ করে দেশকে স্বাধীন করতে হবে। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ অনুযায়ী 'যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে' যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হল সবাই।

পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ছুটে এল প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া এবং জুলফিকার আলী ভুট্টো। একটা সমঝোতার আলোচনা করে সমাধানে পৌঁছাতে চায় তারা। আসলে এই

আলোচনা ছিল একটা প্রহসন। আলোচনার নামে সময় নিয়ে গোপনে জাহাজ ভর্তি করে গোলা-বারুদ ও সৈন্যদের নিয়ে আসতে থাকল পশ্চিম পাকিস্তান থেকে। উড়োজাহাজেও নিয়ে আসতে লাগল সমরাস্ত্র ও সৈন্য।

পাঁচ দিন ধরে অনেক আলোচনা করেও ফলাফল কিছুই হল না। বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর দল আওয়ামী লীগ ৬-দফা থেকে বিন্দুমাত্র সরে দাঁড়ালেন না। ৬-দফা'র ভিত্তিতেই তিনি বাংলার মানুষের সমর্থন পেয়েছেন— এবং একচেটিয়া সমর্থন। ইয়াহিয়া ও ভুট্টো ২টি বাদে ৪টি দফা মেনে নিল। পূর্ব পাকিস্তানের জন্য আলাদা সামরিক বাহিনী ও আলাদা মুদ্রার ব্যাপারে তারা বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে একমত হল না।

২৫ মার্চ ১৯৭১ বিকেল পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ইয়াহিয়া ও ভুট্টো আলোচনা করল। আলোচনা আরো চলবে। কিন্তু রাতেই তারা 'অপারেশন সার্চলাইট'-এর নির্দেশ দিয়ে অতিদ্রুত ও গোপনে পশ্চিম পাকিস্তানে চলে গেল। রাত এগারোটা থেকেই ট্যাংক, সাঁজোয়া গাড়ি ও ভারী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে নেমে এল পাকিস্তানি সৈন্যরা। নির্বিচারে কামান দাগিয়ে রাস্তার দু'পাশের বাড়িঘর, দোকানপাট ধূলিসাৎ করে দিল। আগুন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিল। মানুষজনের উপর বৃষ্টির মতো গুলি ছুঁড়তে লাগল। হাজার হাজার অসহায় মানুষ সে রাতেই মৃত্যুবরণ করল। সে সময় ৭২ ঘণ্টা ধরে 'অপারেশন সার্চলাইট'-এ ঢাকা শহরে ও পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী হত্যা ও ধ্বংসলীলার ঘৃণ্যতম বীভৎসতার প্রকাশ ঘটিয়েছে। মানুষের প্রতি মানুষরূপী সেনাদের নিষ্ঠুরতা দেখে সারা পৃথিবীর মানুষ বিস্মিত ও স্তম্ভিত। বিশ্বের ইতিহাসে এমন নিষ্ঠুরতা ও হত্যাযজ্ঞ পাকিস্তানি সেনাবাহিনীই ঘটাল।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২৫ মার্চ রাতেই জাতির উদ্দেশে চূড়ান্ত স্বাধীনতার ঘোষণা বাংলা ও ইংরেজিতে জানিয়ে দিলেন। ঠিক তার পরপরই বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তান সেনাবাহিনী গ্রেফতার করে দ্রুত পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে গেল। আর সেই সময় বাহাত্তর ঘণ্টা ধরে ঢাকা শহরকে ধ্বংস্তূপে পরিণত করল পাকিস্তান সেনাবাহিনী। বাঙালির রক্তের স্রোতে সব রাস্তা লালে লাল। মানুষের লাশ আর লাশের স্তূপ সর্বত্র —জ্বলছে বাড়িঘর, কল-কারখানা, ইপিআর সদর দফতর, রাজারবাগ পুলিশের সদর দফতর, স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও ছাত্রাবাস।

পাকিস্তানি হানাদার সৈন্যদের ভারী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে প্রথম আক্রমণ থেকেই বীর বিক্রমে রুখে দাঁড়াল বাঙালি তরুণ ছাত্রজনতা, ইপিআর-এর বাঙালি সেনারা, পুলিশ বাহিনী ও আনসাররা। সেই রাতে চার-পাঁচ ঘণ্টা ধরে তারা পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে অসীম সাহসে যুদ্ধ করে কিছুটা হলেও পাকিস্তানি সেনাদের বাধা দিল। কিন্তু শুধু থ্রি নট থ্রি রাইফেল দিয়ে কতক্ষণ আর ট্যাংক, মেশিনগান ও মর্টারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যায়?

তবুও এই চার পাঁচ-ঘন্টা যুদ্ধ করে বাঙালি যোদ্ধারা প্রমাণ করে দিল তারা বীরের জাতি। তারা ভয় পায় না। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণা এবং পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আকস্মিক আক্রমণের বিরুদ্ধে বাঙালির রুখে দাঁড়ানোর বিষয়টি দেখে ভীতসন্ত্রস্ত সাধারণ মানুষের মনে সাহস ও শক্তি ফিরে এল। আর এভাবেই ২৬ মার্চ থেকেই মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল।

১৭ এপ্রিল ১৯৭১, আওয়ামী লীগের উচ্চ পর্যায়ের নেতা তাজউদ্দীন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, এ. এইচ. এম কামরুজ্জামান প্রমুখ বঙ্গবন্ধুর চিন্তাচেতনা ও আদর্শকে বাস্তবায়নের জন্যে কুষ্টিয়ার বৈদ্যনাথতলায় আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্বে নতুন রাষ্ট্র 'স্বাধীন বাংলাদেশ' সরকার গঠনের ঘোষণা দিলেন। রাষ্ট্রপতি হলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। যেহেতু তখন বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের জেলে বন্দি, তাঁর অবর্তমানে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পেলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম; তাজউদ্দীন আহমদ হলেন প্রধানমন্ত্রী। কর্নেল আতাউল গনি ওসমানী হলেন প্রধান



সেনাপতি। বৈদ্যনাথতলার নতুন নামকরণ হল মুজিবনগর। আর সবার মুখে মুখে স্বাধীন বাংলার বিপ্লবী সরকারের নাম হয়ে গেল মুজিবনগর সরকার। এই মুজিবনগর সরকারই অত্যন্ত ধীশক্তিসম্পন্ন পরিকল্পনা ও রণকৌশল প্রয়োগ করে মুক্তিযুদ্ধকে ছড়িয়ে দিল বাংলাদেশের গ্রামেগঞ্জে সর্বত্র। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে সেই সময়ের ভারত সরকার পূর্ব বাংলার মানুষের এই মানবিক যুদ্ধে সবরকমের সহযোগিতা নিয়ে এগিয়ে এল। ভারতীয় সেনাবাহিনীর কাছে মাত্র দু/এক মাসের ট্রেনিং নিয়ে বাংলার দামাল ছেলেরা অসীম সাহসে ভারী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত শক্তিশালী পাকসেনাদের ক্যাম্পে, আস্তানায় আক্রমণের পর আক্রমণ চালিয়ে তাদের ভীতসন্ত্রস্ত করে তুলতে লাগল। পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের উপর পাকিস্তানিদের আক্রমণের ফলে প্রায় এক কোটি লোক ভারতের বিভিন্ন স্থানে আশ্রয় নিয়েছে। এই এক কোটি লোককে আশ্রয় দেওয়া ও ভরণপোষণ করা ভারতের অর্থনীতির উপর বিরাট চাপের সৃষ্টি করল।

বাংলার মুক্তিসেনা ও ভারতীয় বাহিনীর যৌথ আক্রমণের ফলে ৯ মাসের মধ্যেই পাকিস্তান বাহিনী বেসামাল হয়ে পড়ল। মুক্তি বাহিনীর সাঁড়শি আক্রমণে পাকিস্তানি হানাদার সৈন্যরা দিশেহারা। অবশেষে পরাজয় বরণ করে নিল পাকিস্তান সেনাবাহিনী। ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ রমনার মাঠে যৌথবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করল তারা।

পরাক্রমশালী ও বিপুল অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও সরকারের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ২৬ মার্চ '৭১-এর স্বাধীনতা ঘোষণা এবং তা বাস্তবায়নের জন্য জননেতা তাজউদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে ১৭ এপ্রিল ১৯৭১-এ স্বাধীন বাংলা সরকার গঠন করে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা ছিল ঐতিহাসিক ও সাহসী পদক্ষেপ।

বাঙালির বিজয় সূচিত হল। পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন— নাম হল বাংলাদেশ। দেশকে শত্রুমুক্ত করার জন্য অনেক রক্তক্ষয় হল। জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে পুরো জনপদ ধ্বংসস্তূপে পরিণত করল পাকিস্তানি সেনারা এবং তাদের দোসর আলবদর-রাজাকারেরা। ৩০ লক্ষ মানুষ প্রাণ দিল, ২ লক্ষ মা-বোনকে হতে হল নির্যাতিত। শত দুঃখ-কষ্ট বুকে ধারণ করে বাংলার মানুষ স্বাধীন দেশের পতাকা তুলে নতুন রূপে দেশকে গড়ে তুলতে শপথ নিল।

বিজয়ের ২৫ দিন পর ১০ জানুয়ারি ১৯৭২ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নতুন পাকিস্তান সরকার মুক্ত করে দিতে বাধ্য হল। আনন্দে, উল্লাসে প্রিয় নেতাকে বাংলার মানুষ গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় বরণ করে নিল। আনন্দের অশ্রু আর স্বস্তির আশা নিয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে তারা অঙ্গীকার করল— দেশ স্বাধীন করার জন্যে যেমন বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ পালন করেছে, তেমনি সদ্যমুক্ত বাংলাদেশকে গড়ে তোলার কাজে একইভাবে বঙ্গবন্ধুর হাতকে শক্তিশালী করে তুলবে তারা।

যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ। শূন্য তহবিল। রাস্তাঘাট, শহর, বন্দর, হাট-বাজার ও বহু প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে গেছে পাকসেনা ও তাদের দোসর আলবদর-রাজাকারেরা। সব কিছু নতুন করে গড়ে তুলতে হবে। সাড়ে সাত কোটি মানুষের খাবার জোগাড় করা থেকে শুরু করে, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও আবাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। অতিদ্রুত বঙ্গবন্ধু তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে একটি একটি করে সমস্যার সমাধান করে মাত্র সাড়ে তিন বছরে দেশকে প্রায় স্বনির্ভরশীলতায় দাঁড় করিয়ে ফেললেন। কিন্তু তাঁকে আরো এগোতে হবে। তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলাকে নতুন রূপে গড়ে তোলার লক্ষ্যে তিনি এক বৈপ্লবিক পরিকল্পনা দেশবাসীর সামনে তুলে ধরলেন। স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রে বিশ্বাসী সব রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে একটিমাত্র রাজনৈতিক দল গঠন করে সবাইকে একই দলের হয়ে কাজ করার নির্দেশ দিলেন। দলটির নাম সংক্ষেপে বাকশাল, পুরো নাম বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ।

কিন্তু!

বঙ্গবন্ধুকে নতুনরূপে বাংলাদেশ গড়ার সুযোগ দেওয়া হল না। দেশের শত্রু,

স্বাধীনতার বিরোধীরা অনেক দিন ধরেই গোপনে তৈরি হচ্ছিল বঙ্গবন্ধুকে চরমভাবে আঘাত করবে বলে, যাতে বাংলাদেশ নিজের পায়ে দাঁড়াতে না পারে, কৃষক, শ্রমিক, মজদুর ও সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি না আসে। স্বাধীনতার চেতনাকে নস্যাৎ করে দিয়ে একাত্তরে যারা মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছে— আলবদর রাজাকার আলসামস, তাদের দেশে ফিরিয়ে এনে সব সুযোগ-সুবিধা তাদের হাতে তুলে দেবে— সেই উদ্দেশ্যেই বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কিছু বিপথগামী সৈন্য বাংলাদেশের এই ধ্বংসাত্মক কাজের হীন চক্রান্তে যোগ দেয়। ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট ভোররাতের অন্ধকারে অতর্কিতে গোলাবারুদ ও ট্যাংক বাহিনী নিয়ে বঙ্গবন্ধুর ধানমণ্ডির ৩২ নম্বর সড়কের বাড়িটি আক্রমণ করে। গুলি করে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে। তাঁর স্ত্রী ফজিলাতুন নেসা, জ্যেষ্ঠ পুত্র শেখ কামাল, তাঁর স্ত্রী সুলতানা কামাল, দ্বিতীয় পুত্র শেখ জামাল ও তাঁর স্ত্রী রোজী জামাল, বঙ্গবন্ধুর ছোট ভাই শেখ নাসের এবং ৮ বছরের শিশুসন্তান শেখ রাসেলকেও নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। একই সময়ে হত্যা করে বঙ্গবন্ধুর অন্যান্য আত্মীয়স্বজন ও পরিবারের সদস্যদের যাঁরা দেশের রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। সেই রাতে বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা ঢাকায় ছিলেন না। তাঁরা ছিলেন জার্মানিতে। সৌভাগ্য বাংলাদেশের। ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের জন্য সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র কৃপায় তাঁরা বেঁচে রইলেন।

চার

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সাড়ে সাত কোটি বাঙালিকে তিনি পাকিস্তানের নিষ্ঠুরতা ও নির্যাতন থেকে মুক্ত করেছেন। তাদের হাতে তুলে দিয়েছেন হাজার বছরের স্বপ্ন— একটি স্বাধীন দেশ। তাই তিনি জাতির জনক।

প্রতিটি শিশুকে দেশের সুনাগরিক হিসেবে যথাযথভাবে গড়ে উঠতে হবে। তাদের জানতে হবে নিজের দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কেন জাতির জনক এবং কেন তিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি— সেই সব ঘটনা ও ইতিহাস যথাযথভাবে জানতে সাহায্য করার জন্যই এই সংকলন— 'জাতির জনক : তাঁর সারা জীবন'।

৪৮০ পৃষ্ঠার এই বইতে রয়েছে জাতির জনক কীভাবে বাংলার মানুষকে সাহসী করে তুলেছেন, নিজেদের অধিকার আদায় করে নেবার জন্যে পাকিস্তান স্বৈরশাসকদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেতৃত্ব দিয়েছেন, ১৯৪৮ থেকে ১৯৭১, এই ২৩ বছর ধরে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের সংগ্রাম এবং ১৯৭১-এর নয় মাসের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনে পাকিস্তানে বন্দি অবস্থায় থেকেও বঙ্গবন্ধুর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব— ইত্যাদি বিষয়ে উল্লেখ্যযোগ্য লেখাগুলো বাছাই করে এই বই তৈরি করা হয়েছে। দেশের খ্যাতিমান লেখকদের উল্লেখযোগ্য লেখা এতে সংকলিত করা হয়েছে। যেহেতু শিশুদের জন্য এই বই, তাই কিছু কিছু লেখার ভাষা সহজ এবং লেখার কলেবর সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। নতুন করে কিছু লেখা লিখিয়েও নেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনীয় ছবি শিল্পীরা এঁকে দিয়েছেন। বঙ্গবন্ধুর সংগ্রাম ও কর্মজীবনের উপর দুর্লভ ও ঐতিহাসিক ছবি যথাসম্ভব সংগ্রহ করা হয়েছে।

লেখা, আঁকা ছবি ও আলোকচিত্র সমন্বয়ে 'জাতির জনক : তাঁর সারা জীবন' একটি সমৃদ্ধ, মূল্যবান ও ঐতিহাসিক উপহার হিসেবে শিশুদের হাতে তুলে দিতে পেরেছি বলে আমরা সম্পাদনা পরিষদ মনে করি।

জয় বাংলা। জয় বঙ্গবন্ধু।

হাশেম খান

সভাপতি, সম্পাদনা পরিষদ



আমরা সম্পাদনা পরিষদের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই এই সংকলনের লেখক, আলোকচিত্রী, বিভিন্ন সংগঠন, প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে যাঁদের সক্রিয় সহযোগিতায় আমরা শিশুদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি গ্রন্থ প্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছি।

বাংলাদেশের খ্যাতিমান আলোকচিত্রীদের বিভিন্ন সময়ের তোলা জাতির জনকের অনেক ছবি এই সংকলনে ব্যবহার করা হয়েছে। এঁরা হলেন: গোলাম মাওলা, মোজাম্মেল হোসেন, মোঃ মুসা, লুৎফর রহমান, রশীদ তালুকদার, আফতাব আহমেদ, জহিরুল হক, আনোয়ার হোসেন, খন্দকার কামরুল হুদা, পাভেল রহমান প্রমুখ। ভারতীয় আলোকচিত্রশিল্পী কিশোর পারেখের তোলা কয়েকটি ছবিও আমরা ব্যবহার করেছি এ সংকলনে। বঙ্গবন্ধুর বেশ কিছু আলোকচিত্র ও ড্রইং একাধিকবার ব্যবহার করা হয়েছে ঘটনার প্রাসঙ্গিকতার কারণে এবং ঐতিহাসিক গুরুত্বের জন্য। শিশুরা এবং অন্যান্য পাঠক চিত্রের পুনারাবৃত্তির জন্য বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতা ও গুরুত্ব বুঝতে সক্ষম হবে।

এঁদের বেশির ভাগ ছবি সরাসরি পাইনি। সংগ্রহ করেছি 'জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট' প্রকাশিত 'জাতির জনক' অ্যালবাম ও অন্যান্য বই থেকে। 'জাতির জনক অ্যালবামে'র প্রকাশক ও প্রতিষ্ঠানের প্রতি আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

বঙ্গবন্ধুর বিষয়ে কয়েকটি লেখা ও লেখকদের উদ্ধৃতিগুলোর বিষয়ে সময় স্বল্পতার কারণে ও ঠিকানা জানা না থাকায় তাঁদের পূর্ব অনুমতি নিতে পারিনি। আমাদের বিশ্বাস— শিশুদের কথা বিবেচনায় রেখে তাঁরা বিষয়টি ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখবেন।

সংকলনটি মুদ্রণকালে মুস্তাফা মাসুদ ভাষা, শব্দ, বানান ইত্যাদি বিষয়ের শুদ্ধিকরণে সনিষ্ঠ সহযোগিতা করেছেন। তাঁকে ধন্যবাদ।

জাতির জনক তাঁর সারা জীবন

সূচিপত্র

প্রবন্ধ

জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু	: শওকত ওসমান	২৫
শিশুদের মাঝে বঙ্গবন্ধু	: রোকনুজ্জামান খান	৩৩
এক যে আছে বাড়ি	: শামসুর রাহমান	৪২
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি	: কে. এম. সোবহান	৪৬
জনকের সন্ধানে	: মুস্তাফা নূরউল ইসলাম	৫০
শেখ মুজিব জাতির পিতা	: আবুল মাল আবদুল মুহিত	৫২
ইতিহাসের সন্তানের মৃত্যু নেই	: আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী	৫৫
পাকিস্তানের জেলখানায়	: আবদুল মতিন	৭৩
বঙ্গবন্ধুকে অবলোকন	: আনিসুজ্জামান	৮৩
কীভাবে জাতির জনক হলেন	: বেলাল চৌধুরী	৮৭
অগ্রনায়ক বঙ্গবন্ধু	: সনৎ কুমার সাহা	৯০
কৃষি ও কৃষকের দেশ	: মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন	১০৬
বাংলাজুড়ে এক নাম	: মমতাজউদদীন আহমদ	১১৩
বঙ্গবন্ধু যেভাবে বেড়ে উঠলেন	: সিরাজ উদদীন আহমেদ	১৩৪
৬-দফা : বাঙালির মুক্তিসনদ	: মুহম্মদ শফিকুর রহমান	১৪২
তিনি আমাদের পরিচয়	: ড. আতিউর রহমান	১৪৮
কবিতায় সেই খোকা	: শফিউল আলম	১৫১
সোনার বাংলার স্বপ্ন	: শাহ্জাহান কিবরিয়া	১৫৫
এক দুঃসাহসী কিশোরের কথা	: ওবায়দুল কাদের	১৬১
জাতীয় সংগীত নির্বাচন	: বেলাল মোহাম্মদ	১৬৫
টুঙ্গিপাড়া থেকে টুঙ্গিপাড়া	: সুব্রত বড়ুয়া	১৭২
আমার শেখ মুজিব	: বেলাল বেগ	১৭৪
তাঁর স্মরণে	: রবিউল হুসাইন	২০২
গোপালগঞ্জের সেই কিশোর	: আনোয়ারা সৈয়দ হক	২১০
পরিবারের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু	: বেবী মওদুদ	২২১
বঙ্গবন্ধুর স্বদেশফেরা	: মুনতাসীর মামুন	২২৮
জনগণের রাজনীতির নায়ক	: আবুল মোমেন	২৩০
তীর্থভূমি	: রশীদ হায়দার	২৩৪
এক মহান নেতা	: এম নজরুল ইসলাম	২৩৭
জাতিসংঘে প্রথম বাঙালি	: মোহাম্মদ হাননান	২৭৪
মুক্তিযুদ্ধ ও কৌতুক ছবি	: রিয়াজ আহমেদ	২৮০
বঙ্গবন্ধু ও তিনটি ঘটনা	: স্বদেশ রায়	৩১১
কিশোর মুজিব	: ডেনিস দিলীপ দত্ত	৩১৩
বাঙালি জাতির ভালোবাসার	: ফালগুনী হামিদ	৩১৫
বঙ্গবন্ধুর সেরা অবদান বাংলাদেশের সংবিধান	: শাহরিয়ার কবির	৩১৭
শেখ মুজিবের থেকে বঙ্গবন্ধু	: আমিনুল ইসলাম বেদু	৩২৮
নবাব সিরাজউদ্দৌলা, সুভাষ বসু ও শেখ মুজিব	: অমিত বসু	৩৫৩

কবিতা ও ছড়া

বঙ্গবন্ধু স্মরণে	: অন্নদাশঙ্কর রায়	১৮
বঙ্গবন্ধু	: জসীম উদ্‌দীন	১৯
ডাকিছে তোমারে	: সুফিয়া কামাল	২৪
ফিরে আসছেন শেখ মুজিব	: সিকান্‌দার আবু জাফর	৩২
জাগরূক	: রণেশ দাশগুপ্ত	৩৮
থাকো, আরো কিছুদিন থাকো	: আবুল হোসেন	৪০
মুজিব! মুজিব!	: সৈয়দ শামসুল হক	৪১
আমি মুজিবের কাছে	: মযহারুল ইসলাম	৫৪
কোন ছবিগুলি	: জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী	৫৪
রক্ত চাইতে আসিনি	: নির্মলেন্দু গুণ	৮২
মুজিব ফিরে আসে	: মহাদেব সাহা	১৭৭
দিয়েছিলে অসীম আকাশ	: আসাদ চৌধুরী	১৭৮
মুজিব শিশু বাংলাময়	: মুহম্মদ নূরুল হুদা	১৭৯
পাঠ্য বইয়ে যে কথা নেই	: রফিক আজাদ	১৮০
সাতই মার্চ ১৯৭১	: নাসির আহমেদ	১৮১
সাহসী সঞ্চয়	: হাবীবুল্লাহ সিরাজী	১৮২
মুজিব	: মুহাম্মদ সামাদ	১৮২
একটি স্বপ্ন	: শিহাব সরকার	১৮৩
মুজিবকে সালাম জানাই	: অসীম সাহা	১৮৪
মুখখানি কবিতার বড় ছিল	: কামাল চৌধুরী	১৮৫
শতাব্দীর বরপূত্র	: বিমল গুহ	১৮৬
শোনো এক খোকার গল্প	: রবীন্দ্র গোপ	১৮৭
মহান মুজিবুর	: আলম তালুকদার	১৮৭
যা আমার প্রিয়	: কাজী রোজী	১৮৮
সে নাম মুজিব	: খালেক বিন জয়েনউদদীন	১৮৮
মহান মুজিবর	: আসলাম সানী	১৮৯
বাঙালি	: রহীম শাহ	১৮৯
তিনিই জাতির পিতা	: সুজন বড়ুয়া	১৯০
সেই মহাশিশু	: ফারুক নওয়াজ	১৯২
জিজ্ঞাসা বঙ্গবন্ধুর	: আখতার হুসেন	২৪১
ধন্য তুমি যে	: আহমাদ মাযহার	২৪৫
বত্রিশ নম্বরের বাড়ি	: শিবু কান্তি দাশ	২৪৫

বাঙালির রাজা মানুষের রাজা : আশরাফুল আলম পিন্টু ২৪৬
জাতির পিতা : জ্যোতির্ময় মল্লিক ২৪৭
বাংলা মায়ের মুক্তিদাতা : শাফিকুর রাহী ২৪৮
ধানমণ্ডির বুকে : রাশেদ রউফ ২৪৯
তিনি আমাদের জাতির জনক : আহসান মালেক ২৫০
বাংলা মুজিবময় : বুলবুল মহলানবীশ ২৫১
জাতির জনক তিনি : আলী হাবিব ২৫২
বঙ্গবন্ধু : আবু আসাদ ২৫৩
জাদুকর : আনজীর লিটন ২৫৪
বঙ্গবন্ধু : রমজান মাহমুদ ২৫৫
বঙ্গবন্ধু : ওয়াসিফ-এ-খোদা ২৫৫
জীবন জাগানো ঢেউ : জাহাঙ্গীর আলম জাহান ২৫৬

স্মৃতিকথা

আমার দেখা মুজিব : সুফিয়া কামাল ২২
স্মৃতিতে বঙ্গবন্ধু : কবীর চৌধুরী ৩০
বাবার সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর দুটি ঘটনা : সন্‌জীদা খাতুন ৫৩
দেশের বেতার ও শেখ মুজিব : আশরাফ-উজ-জামান ৫৯
শেখ মুজিব আমার পিতা : শেখ হাসিনা ৬৩
বিদেশি সাংবাদিকের মোকাবিলায় বঙ্গবন্ধু : এম আর আখতার মুকুল ৭০
বঙ্গবন্ধু : কাছ থেকে দেখা : শাহ্ এ এম এস কিবরিয়া ৭৭
আমার বন্ধু শেখ মুজিব : খান শামসুর রহমান ৯৭
বঙ্গবন্ধুর শেষ বিদেশ সফর : জাওয়াদুল করিম ১০২
স্মৃতিগুলো : মহাপুরুষের ছবি : রামেন্দু মজুমদার ১০৪
আমার বন্ধু শেখ মুজিব : মমতাজ আহম্মেদ ১১০
বাবাকে মনে পড়ে : শেখ রেহানা ১২১
লন্ডনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব : সুলতান মাহমুদ শরীফ ১২৯
জাতির জনক
কর্মময় জীবনের শেষ সপ্তাহ : শাহরিয়ার ইকবাল ১৩৭
ভিন্ন কিছু অভিজ্ঞতা : রফিকুন নবী ১৫৮
বঙ্গবন্ধু স্মরণে : রাজিয়া খান ১৬৩
বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলাপ : শামসুজামান খান ১৬৭
বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড : এ. এফ. এম. মুহিতুল ইসলাম ১৯৯
অনন্য মহামানব : মাহবুব তালুকদার ২০৬
শিশুর বন্ধু বঙ্গবন্ধু : ফজল-এ-খোদা ২০৮
অসাধারণ পিতা : ইয়াফেস ওসমান ২১৭
বঙ্গবন্ধু ও বাংলা একাডেমী : সেলিনা হোসেন ২২৫
দু'ফোঁটা চোখের জল : তপন চক্রবর্তী ২৩২
ছবি আঁকার সেরা পুরস্কার : শেখ আফজাল ২৬২
৭ মার্চ '৭১ ও বঙ্গবন্ধু : ম. হামিদ ২৬৯
স্মৃতির অ্যালবামে বর্ণাঢ্য বঙ্গবন্ধু : লুৎফর রহমান রিটন ২৭৬
ও নবাব সিরাজউদ্দৌলা : হাশেম খান ৩৪৯
মনে পড়ে : মমিনুল হক খোকা ৩৫৫

গল্প

মাঝি বায়া যা : বুলবন ওসমান ৫৬
মার্চ মাসের গল্প : রাহাত খান ১১৪
পারুল ফুল : বিপ্রদাশ বড়ুয়া ১২৩
বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কাকার গল্প : আমীরুল ইসলাম ১৯৩
মানুষ বড় কাঁদছে : ইমদাদুল হক মিলন ২৫৭
এক সন্ধ্যার গল্প : মুস্তাফা মাসুদ ২৬৬
বত্রিশ নম্বর : ফয়সাল শাহ ২৭২
গাছের ভাস্কর্য : শরীফ খান ২৮৯
রাজা ও রাখালের গল্প : শিরীন বকুল ২৯৪
স্পর্শ : সৈয়দ ইকবাল ৩০০
একদিন রেসকোর্স এবং : রফিকুর রশীদ ৩২২
সুখরাজা দুখরাজা : শাহনেওয়াজ চৌধুরী ৩২৬
শেখ মুজিবের পতাকা : মনি হায়দার ৩৩০
সেই ছেলেটা : হুমায়ুন কবীর ঢালী ৩৩৫
প্রবালের কৌতূহল : আফরোজা পারভীন ৩৩৭
আব্বুর ফিরে আসা : স.ম. শামসুল আলম ৩৪২
মানুষটা : মাহবুব রেজা ৩৪৬

নাটিকা

খোকন খোকন করে মায় : বেগম মমতাজ হোসেন ১৯৬

ভাষণ

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে
প্রথম বাংলা সাহিত্য সম্মেলনে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ ৩৫৭

উদ্ধৃতি

ড. সালাহ উদ্দীন আহ্‌মদ, সরদার ফজলুল করিম, অমর্ত্য সেন, প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সি, জাতীয় অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক, ফিদেল কাস্ট্রো, বিচারপ্রতি সৈয়দ মোহাম্মদ হোসেন, জ্যোতি বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, লর্ড ব্রকওয়ে, আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী, ড. আনিসুজ্জামান, সৈয়দ শামসুল হক, ড. আব্দুল খালেক, মোহাম্মদ হাইকেল, নচিকেতা ভরদ্বাজ, ড. রাজিয়া খান, মুনতাসীর মামুন, মেজর রফিকুল ইসলাম, সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, দক্ষিণারঞ্জন বসু, মুহম্মদ জাফর ইকবাল, শেখ রেহানা, নিউজ উইক ইউ এস এ।

আলোকচিত্র ৩৬১-৪৮০

আমি জন্মেছি বাংলায়, আমি বাংলায় কথা বলি,...
যখন আমার জনকের নাম শেখ মুজিবুর রহমান;
তাঁরই ইতিহাস প্রেরণায় আমি বাংলায় পথ চলি—
চোখে নীলাকাশ, বুকে বিশ্বাস, পায়ে উর্বর পলি ।

সৈয়দ শামসুল হক

বাংলাদেশের ইতিহাসে অনেকগুলি তারিখ আছে যা আমাদের মনে রাখতে হবে। এর মধ্যে ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ অন্যতম। ... ভাষণটি ছিল স্বাধীনতার আহ্বান। কীভাবে লড়াই করতে হবে তার নির্দেশ। এই ভাষণ ছিল বাঙালির মুক্তির সনদপত্র। এর গুরুত্ব আরো বেশি। কারণ, সেদিনই বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ভিত্তি তৈরি হয়ে যায়। পাকিস্তানকে বাঙালিরা প্রত্যাখান করে। আর সেদিনই শেখ মুজিবুর রহমান গণমানুষের চেতনায় জাতির জনক বা জাতির পিতায় রূপান্তরিত হয়ে যান।

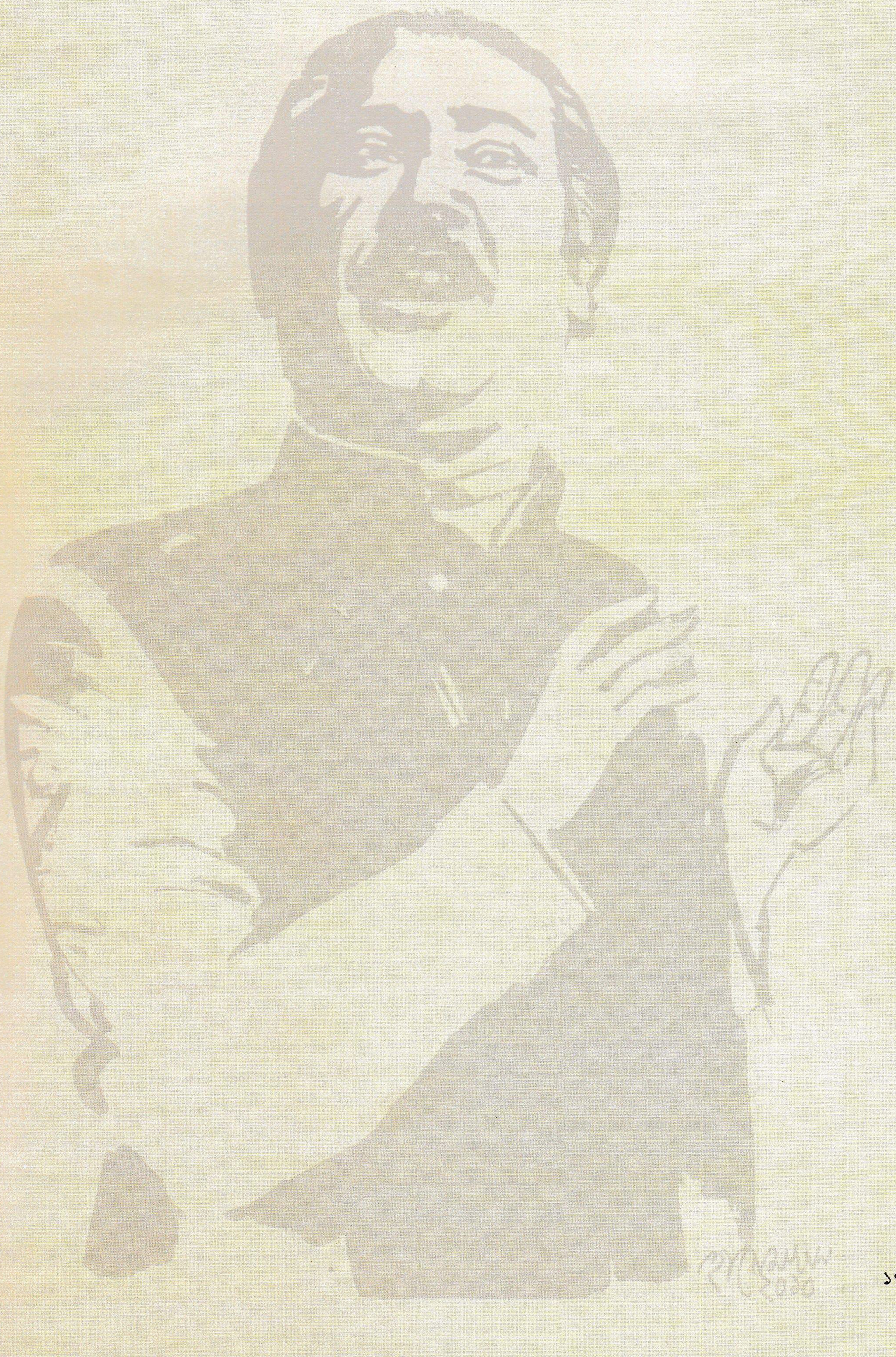
মুনতাসীর মামুন

.... রাত করে ফেরাটা কিছুতেই মেনে নিতে পারতাম না। রাগ করে বলতাম, "পলিটিক্স করো কেন?" বাবা বলতেন, "তুই এমন কথা বলিস কেন? আমার কাছে তুইও যা, সাড়ে সাত কোটি মানুষও তা!"

.... ঝড়-তুফান হলে সারা রাত তিনি ঘুমাতেন না। তস্‌বিহ্ নিয়ে ছুটাছুটি করতেন আর বলতেন "আল্লাহ্ আমার দেশ গরিব, তুমি রহমত করো"। আমরা তাঁকে একটু ঘুমাতে বললে বলতেন, "তোরা বুঝিস্ না, আজ কেউ বাঁচবে না"

সবার জন্য তাঁর অফুরন্ত ভালোবাসা ছিল।

বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ রেহানা



বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মরণে

অন্নদাশঙ্কর রায়

নরহত্যা মহাপাপ, তার চেয়ে পাপ আরো বড়ো
করে যদি যারা তাঁর পুত্রসম বিশ্বাসভাজন
জাতির জনক যিনি অতর্কিতে তাঁরই নিধন।
নিধন সবংশে হলে সেই পাপ আরো গুরুতর।

সারা দেশ ভাগী হয় পিতৃঘাতী সে-ঘোর পাপের
যদি নেয় সাধুবাদ, যদি করে অপরাধ ক্ষমা।
কর্মফল দিনে দিনে বর্ষে বর্ষে হয় এর জমা
একদা বর্ষণ হয় বজ্ররূপে সে অভিশাপের।

রক্ত ডেকে আনে রক্ত, হানাহানি হয়ে যায় রীত।
পাশবিক শক্তি দিয়ে রোধ করা মিথ্যা মরীচিকা
পাপ দিয়ে শুরু যার নিজেই সে নিত্য বিভীষিকা।
ছিন্নমস্তা দেবী যেন পান করে আপন শোণিত।

বাংলাদেশ! বাংলাদেশ! থেকো নাকো নীরব দর্শক
ধিক্কারে মুখর হও। হাত ধুয়ে এড়াও নরক।

রচনাকাল ১৯৭৫



বঙ্গবন্ধু

জসীম উদ্‌দীন

মুজিবর রহমান
ওই নাম যেন বিসুভিয়াসের অগ্নি-উগারী বান।
বঙ্গদেশের এ-প্রান্ত হতে সকল প্রান্ত ছেয়ে,
জ্বালায় জ্বলিছে মহাকালানল ঝঞ্ঝা-অশনি বেয়ে।
বিগত দিনের যত অন্যায়, অবিচার-ভরা মার,
হৃদয়ে হৃদয়ে সঞ্চিত হয়ে সহ্যের অঙ্গার;
দিনে দিনে হয় বর্ধিত স্ফীত শত মজলুম বুকে,
দগ্ধিত হয়ে শত লেলিহান ছিল প্রকাশের মুখে;
তাহাই যেন-বা প্রমূর্ত হয়ে জ্বলন্ত শিখা ধরি
ওই নামে আজ অশনি দাপটে ফিরিছে ধরণী ভরি।

মুজিবর রহমান
তব অশ্বেরে মোদের রক্তে করায়েছি পূত-স্নান!
পীড়িতজনের নিঃশ্বাস তারে দিয়েছে চলার গতি,
বুলেটে নিহত শহীদেরা তার অঙ্গে দিয়েছে জ্যোতি।
দুর্ভিক্ষের দানব তাহারে দেছে অদম্য বল,
জঠরে জঠরে অনাহার-জ্বালা করে তারে চঞ্চল।
শত ক্ষতে লেখা অমর কাব্য হাসপাতালের ঘরে,
মুহুর্মুহু যে ধ্বনিত হইছে তোমার পথের পরে।

মায়ের বুকের ভায়ের বুকের বোনের বুকের জ্বালা,
তব সম্মুখ পথে পথে আজ দেখায়ে চলিছে আলা ।
জীবন দানের প্রতিজ্ঞা লয়ে লক্ষ সেনানী পাছে,
তোমার হুকুম তামিলের লাগি সাথে তব চলিয়াছে ।
রাজ ভয় আর কারাশৃঙ্খল হেলায় করেছ জয়
ফাঁসির মঞ্চে মহত্ত্ব তব কখনো হয়নি ক্ষয় ।
বাংলাদেশের মুকুটবিহীন তুমি প্রমূর্ত রাজ,
প্রতি বাঙালীর হৃদয়ে হৃদয়ে তোমার তক্ত-তাজ ।
তোমার একটি আঙ্গুল হেলনে অচল যে সরকার
অফিসে অফিসে তালা গেছে– স্তব্ধ হুকুমদার ।

এই বাঙলায় শুনেছি আমরা সকল করিয়া ত্যাগ,
সন্ন্যাশী বেশে দেশ-বন্ধুর শান্ত-মধুর ডাক ।
শুনেছি আমরা গান্ধীর বাণী জীবন করিয়া দান,
মিলাতে পারেনি প্রেম-বন্ধনে হিন্দু-মুসলমান ।
তারা যা পারেনি তুমি তা করেছ, ধর্মে ধর্মে আর,
জাতিতে জাতিতে ভুলিয়াছে ভেদ সন্তান বাঙলার ।
তোমার হুকুমে রেল-জাহাজের চাকা যে চলেনি আর
হাইকোর্টের বন্ধ দরজা খুলিবে সাধ্য কার!
সেনাবাহিনীর অশ্বে চড়িয়া দম্ভ-স্ফীত ত্রাস,
কামান গোলার বুলেটের জোরে হানে বিষাক্ত শ্বাস ।

তোমার হুকুমে তুচ্ছ করিয়া শাসন-ত্রাসন-ভয়,
আমরা বাঙালী মৃত্যুর পথে চলেছি আনিতে জয় ।
ধন্য এ-কবি এ-যুগে এখনো রয়েছে জীবন লয়ে,
সম্মুখে তার মহাগৌরবে ইতিহাসে চলে বয়ে ।
ভুলিব না সেই মহিমার দিন, ভাষার আন্দোলনে
বুলেটের ভয় তুচ্ছ করিয়া ছেলেরা দাঁড়ায় রণে ।

বরকত আর জব্বার আর সালাম পথের মাঝে,
পড়ে বলে গেল, "আমরা চলিনু ভাইরা আসিও পাছে ।"
উত্তর তার দিয়েছে বাঙালী জানুয়ারী সত্তরে,
ঘরের বাহির হইল ছেলেরা বুলেটের মহা-ঝড়ে!
পথে পথে তারা লিখিল লিখন বুকের রক্ত দিয়ে,
লক্ষ লক্ষ ছুটিল বাঙালী সেই বাণী ফুকারিয়ে ।
মরিবার সে কী উন্মাদনা যে, ভয় পালাইল ভয়ে,
পাগলের মত ছোটে নর-নারী মৃত্যুরে হাতে লয়ে ।

আরো একদিন ধন্য হইনু সে মহাদৃশ্য হেরি,
দিকে-দিগন্তে বাজিল যেদিন বাঙালীর জয়ভেরী ।
মহাহুঙ্কারে কংস-কারার ভাঙিয়া পাষাণ দ্বার
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবেরে করিয়া আনিল বার ।



আরো একদিন ধন্য হইব ধন-ধান্যতে ভরা,
জ্ঞানে-গরিমায় হাসিবে এদেশ সীমিত-বসুন্ধরা ।
মাঠের পত্রে ফসলেরা আসি ঋতুর বসনে শোভি,
বরণে সুবাসে আঁকিয়া যাবে নক্‌সী কাঁথার ছবি ।

মানুষে মানুষে রহিবে না ভেদ, সকলে সকলকার,
একসাথে ভাগ করিয়া খাইবে সম্পদ যত মার ।
পদ্মা-মেঘনা-যমুনা নদীর রূপালীর তীর পরে
পরান-ভুলানো ভাটিয়ালী সুর বাজিবে বিশ্ব ভরে ।
আম-কাঁঠালের ছায়ায় শীতল কুটিরগুলির তলে,
সুখ যে আসিয়া গড়াগড়ি করি খেলাইবে কুতূহলে ।

আরো একদিন ধন্য হইব চির-নির্ভীকভাবে,
আমাদের জাতি নেতার পাগড়ি ধরিয়া জবাব চা'বে:
"কোন অধিকারে জাতির স্বার্থ করিয়াছ বিক্রয়?"
আমার এদেশ হয় যেন সদা সেইরূপ নির্ভয় ।

রচনাকাল ১৯৭১



আমার দেখা মুজিব

সুফিয়া কামাল

শেখ মুজিবুর রহমান যখন 'বঙ্গবন্ধু' হয়নি, বলা যেতে পারে তার কিশোর বয়স থেকে আমি তাকে জানি। সোহরাওয়ার্দীর সাথে তাকে প্রথম দেখি কলকাতায়। তখন ইসলামিয়া কলেজের ছাত্র সে। রাজনীতিতে সোহরাওয়ার্দীর খ্যাতি তখন তুঙ্গে, সেই সময় থেকে ছাত্রকর্মী-ছাত্রনেতা হিসেবে মুজিবুর রহমানকে আমি চিনি আজীবন। নেতা হিসেবে সারা বিশ্বে পরিচিত হয়েছেন মুজিবুর রহমান। কিন্তু আমার কাছে আমার ছোটভাইয়ের মতনই ছিল সে। বরাবর আমাকে 'আপা' বলে সম্বোধন করেছে। কাছে গেছি, মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছি, তারপর একই পাড়ায় থাকার কারণে মুজিবের সঙ্গে আমার একটা পারিবারিক সম্বন্ধের মতন গড়ে উঠেছিল।

মুজিবের কথা বলতে গেলে মুজিবের স্ত্রীর কথাও বলতে হয়। এত ধৈর্যশীলা, এত শান্ত, এত নিষ্ঠাবতী মহিলা খুব কমই দেখা যায়। বছরের বারো মাসের মধ্যে বেশিরভাগ সময় মুজিবের কেটেছে জেলে। যখনই শুনেছি মুজিবকে ধরে নিয়ে গেছে, ছুটে গিয়েছি। দেখেছি মুজিবের স্ত্রী অবিচল মুখে কাপড়-বিছানা-বালিশ গুছিয়ে পাঠানোর ব্যবস্থা নিচ্ছে। বলেছে, আপনার ভাই তো জেলে গেছে। বেচারি খুব ধৈর্যের সাথে সংসারটাকে টেনেছে। বাপকে জেলে নিয়ে গেছে বলে কোনো স্কুলে হাসিনাকে ভর্তি করবে না– এমনও দিন গেছে। নারী শিক্ষা মন্দিরে আমরা তাকে ভর্তি করে নিলাম। তখন নারী শিক্ষা মন্দিরের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলাম।

একুশে ফেব্রুয়ারির সকালে পায়ে হেঁটে হেঁটে মুজিবের সাথে গিয়েছি শহীদ মিনারে ফুল দিতে। মুজিব বলেছে, আহা আমার বোনটা, আমার আপাটা এরকম করে হেঁটে যাবে? আপা, আপনি হেঁটে যাবেন না। আপনি রিকশায় যান। আমরা হেঁটে যাই। আমি বলেছি, না ভাই, আমি হেঁটেই যেতে পারব। এভাবে মুজিবের সঙ্গে হেঁটে গিয়ে মিটিং-এ যোগ দিয়েছি। আন্দোলনে যোগ দিয়েছি। মুজিব সবসময় আমাকে বড় বোনের মতন সাথে রেখেছে। রাস্তায় দেখা হলে গাড়ি থামিয়ে বলেছে, আপা, শিগগির আসেন গাড়িতে আসেন। আমি বলেছি, না ভাই, এইটুকুন পথ তো– এইখান থেকে এখানে, হেঁটে যেতে পারব। কিন্তু মুজিব বলেছে, না আমি পৌঁছে দিয়ে আসি। ড্রাইভারকে বলেছে, আমার বোনকে আমার বোনের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসো।

মুজিবের বাড়িতে গিয়েছি। শত মিটিং হলেও মুজিব এসে বলেছে, আপনি এসে আমাকে খবর দেন কেন? আপনি সরাসরি আমার কাছে চলে আসবেন। আপনি এসে কেন নিচে বসে থাকেন? আমার বাড়ি আপনার বাড়ি। আমি আপনাকে বড় বোন বলে মনে করি।

মুজিব প্রতিদিন ভোরবেলা তার বাড়ি থেকে আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে পায়ে হেঁটে একচক্কর দিত। একদিন আমাকে দেখতে পেয়ে হাসতে হাসতে বলল, গতকাল মনে হল যে, আমার বাড়িতে তো পিঠা হচ্ছে। আপাকে একটা ডাক দেব নাকি? কিন্তু অত ভোরে আপাকে আর ডাক দিলাম না। এই পর্যন্ত তার একটা আন্তরিকতা ছিল আমাকে নিয়ে পিঠা খাওয়াবে।

আমার মেয়ের স্বামী আব্দুল কাহ্হার চৌধুরী চাটগাঁ রেডিও'র অফিসার ছিল। একাত্তর সালে পাক বাহিনীর হাতে মারা যায়। দেশে ফেরার পর মুজিব এ ঘটনা শুনল। বলল, কই, দুলু কোথায়? আমার মেয়ে বিধবা হলে যেরকম কষ্ট পেতাম সেরকম কষ্ট বোধ করছি। দুলু যা চায়, আমি ওকে সব দেব। আমি বললাম, হাজারো মানুষ এরকম গেছে। আমার জামাইও গেছে। তার জন্যে শুধু দোয়া করো। মুজিব আবার বলল, আপা, আমি আপনার কাছে হাত জোড় করে বলছি, আপনি বলেন দুলুকে আমি কি সাহায্য করতে পারি? আমি বললাম, ভাই, রক্তের বিনিময়ে আমার মেয়েকে কিছু দিতে হবে না। দেশের হাজারো মেয়ের মতো আমার দুলুও বিধবা হয়েছে। অনেক বিধবা তো আমার আশ্রয়েই রয়েছে। ওদের জন্যে শুধু দোয়া করো।

তারপর যখন সে রাষ্ট্রপতি হল, আমাকে বলেছে, একবার এসে আমাকে দোয়া করে যান। গাড়ি পাঠাল। আমি

একুশে ফেব্রুয়ারি সকালে পায়ে হেঁটে হেঁটে
মুজিবের সাথে গিয়েছি শহীদ মিনারে ফুল দিতে ।.....
এভাবে মুজিবের সঙ্গে হেঁটে গিয়ে মিটিং-এ যোগ দিয়েছি ।
আন্দোলনে যোগ দিয়েছি

গেলাম। ওই প্রথম যাওয়া। ওই শেষ যাওয়া আমার প্রেসিডেন্ট হাউসে। তখন বাকশাল গঠিত হয়েছে। মুজিব বলল, একটা লোক পাচ্ছি না যাকে আমি বাকশালের ভার দেব। আপা, আপনি যদি রাজি হন তবে বাকশালের সভানেত্রী হয়ে থাকুন। আপনি যেরকম বলবেন, সেরকমই হবে। আমি বললাম, ভাই, আমি রাজনীতি বুঝি না। আমাকে মাফ করো। এই আমি সেই বাকশালে গেলাম না। কিন্তু যখনই কোনো মিটিং হয়েছে, আমি মুজিবের সাথে গিয়েছি। তারপরে বলেছে, আওয়ামী লীগের মহিলা কমিটি গঠন করে সেখানে আপনি সভানেত্রী থাকুন। সবসময় আমাকে সে সম্মানের পদ দিতে চেয়েছে। আমি বলেছি, ভাই, রাজনীতির মধ্যে আমি পারব না। রাস্তায় নামতে পারি, কিন্তু রাজনীতির কোনো সংশ্রবে আমি থাকব না। তখন মুজিব বলেছে, আপা, আপনাকে আমি মাথায় রাখব, না আপনার পায়ে হাত দিয়ে সালাম করব? আমি আপনার কাছে মিনতি করছি। আমি বলেছি, ভাই, আমিও মিনতি করছি।

ধানমণ্ডি পাড়ায় মুজিবের আগে আসি আমি। তাকে গ্রেফতারের সময়গুলোতে তার ছেলেমেয়েদের স্কুলে ভর্তির সমস্যা দেখা দিয়েছে। তার বউ একটা বাড়ি খুঁজে পাচ্ছে না। এই দুর্দশার ভেতর দিয়ে মুজিবুর রহমান নেতা হয়েছে। মুজিবের ত্যাগের কোনো সীমা নেই। তার নিষ্ঠার কোনো পরিসীমা নেই। দেশকে যে সে কতখানি ভালবাসত তার পরিমাণ কোথাও নেই। মানুষের জন্যে মমত্ববোধ, আত্মার একটা টান তার ছিল। আজকের দিনে তার মতো একটি মানুষ সারা বিশ্বে আমি দেখতে পাচ্ছি না। তার পলায়নী মনোবৃত্তি ছিল না। যেখানে সঙ্কট, যেখানে সংগ্রাম, যেখানে সংঘাত দেখেছে, সে এসে আগে দাঁড়িয়েছে। মরণকে ভয় করেনি। তার পেছনে লক্ষ জনতা 'মুজিব ভাই' বলে লাফিয়ে পড়ে এই দেশকে স্বাধীন করেছে। 'বাঙালি আমাকে মারবে না'– মুজিবের এই বিশ্বাস ছিল বাঙালির ওপর। সেই বাঙালির হাতে মুজিব-হত্যা হয়েছে। এই বাঙালি জাতির সেই পাপের, সেই গুনাহ্‌র প্রায়শ্চিত্ত কবে হবে, আমি জানি না। মুজিবকে আমি সারা অন্তর দিয়ে এখনো উপলব্ধি করি। সে যা দিয়ে গেছে– সোনার বাংলা, সেই সোনার বাংলায় এখন যারা আগুন জ্বালাচ্ছে, তাদের ধিক্কার দেওয়ার মতো ভাষা আমার নেই। মুজিবের দেশপ্রেমের আদর্শ নতুন প্রজন্মের মধ্যে ব্যাপ্ত হোক– এই প্রার্থনা করি।

দুই

বোমা, বন্দুক, গগনভেদী বিস্ফোরণের শব্দ অতিক্রম করে ৭ই মার্চ উন্মুক্ত মাঠে জলদ-গম্ভীর একটি কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল: 'এবারের সংগ্রাম, আমাদের মুক্তির সংগ্রাম'। সেই কণ্ঠ অনুসরণ করে শুরু হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের জয়যাত্রা।

মহান নেতা, দেশপ্রেমিক বলিষ্ঠ সাহসী নেতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর সেই স্বরে ছিল মুক্তির আহ্বান। দেশের মুক্তি, মানবাত্মার মুক্তি, আত্মশক্তির মুক্তি। তাই নিরস্ত্র, বিপন্ন বাঙালিরা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল মুক্তিযুদ্ধে, অসম সাহসে তারা অসুর শক্তিকে বিনাশ করে দেশকে মুক্ত ও স্বাধীন করেছিল।

মা দিয়েছে তার বত্রিশ নাড়ি-ছেঁড়া ধন সন্তানকে, বধূ দিয়েছে স্বামীকে, বোন দিয়েছে ভাইকে, অসহায়ের আর্তনাদ উপেক্ষা করে পাকিস্তানি বর্বরেরা চালিয়েছে তাদের নির্মম অত্যাচার, কিন্তু দমন করতে পারেনি বাঙালির শৌর্যকে। আল্লাহ্‌র নামে শেখ মুজিবের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে এগিয়ে চলেছে। বিশ্ববিবেক বিস্ময়ে অবলোকন করেছে এই মহান আত্মত্যাগ। তাই এগিয়ে এসেছেন ভারতের মহীয়সী নারী ইন্দিরা গান্ধী, এগিয়ে এসেছে মানবধর্মী রাশিয়া।

বাঙালির মুক্তিযুদ্ধে শেখ মুজিবের মুক্তিবাণী তাই বিশ্বের বিস্ময় হয়ে চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

[১৯৯৬ সালের ১৪ই এপ্রিল লন্ডনের ট্র্যাফালগার স্কোয়ারে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশের স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী উৎসবে পঠিত]

ডাকিছে তোমারে

সুফিয়া কামাল

এই বাংলার আকাশ-বাতাস, সাগর-গিরি ও নদী
ডাকিছে তোমারে বঙ্গবন্ধু, ফিরিয়া আসিতে যদি
হেরিতে এখনও মানবহৃদয়ে তোমার আসন পাতা
এখনও মানুষ স্মরিছে তোমারে, মাতা-পিতা-বোন-ভ্রাতা ।

যত অসহায় অক্ষম আর উপেক্ষিতরা সব
করুণ নয়নে হেরিছে এ-দেশে বিলাসের উৎসব
শূন্য উদরে সুরম্য পথে চলিতে চলিতে তারা
ভাবিছে তোমার এ-দেশে আবার আসিয়া বসিল কারা?

তোমার জীবন-যৌবন ভরি সুদীর্ঘ কারাবাস
মুক্ত করিল, স্বাধীন করিল মুক্তির নিঃশ্বাস
ত্যাজিয়া মানুষ বাংলার মাটি বাংলার এ-বাতাসে
তোমারই দেওয়া মুক্তির বাণী জীবনের আশ্বাসে
গাহিয়া উঠিল গান
তোমার বিহনে ব্যাহত হয়েছে লক্ষ মানব প্রাণ ।

বাংলার গান, বাংলার ধান, বাঙালির খাদ্যকণা
লুট হয়ে যায়, বিনিময়ে তার আসিছে নকল সোনা ।
জাহাজ আসিছে, আসে সম্ভার যত মেকি ঝলমল
সোনা চলে যায় সাগরের পাড়ে আবার গৃধ্নুদল

বাংলার বুকে হানা দিয়ে আসে, তোমার বজ্রস্বরে
সেই মূষিকেরা লুকাইয়া ছিল অন্ধ গুহার ঘরে
তারা আসে আজ, তোমার আওয়াজ ধ্বনিবে না আরবার
যত বেঈমান এই বাংলারে করেছিল ছারখার
দিবস রাতে দস্যুর দল হানা দিয়ে ঘরে ঘরে
নিত্যই দেখি এখানে-সেখানে মৃতদেহ আছে পড়ে;
তোমার শোণিতে রাঙানো এ-মাটি কাঁদিতেছে নিরবধি
তাইত তোমারে ডাকে বাংলার কানন, গিরি ও নদী ।

রচনাকাল ১৯৭৫

জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু

শওকত ওসমান

জয় বাংলা।

দুটো মাত্র শব্দ। তার ধাক্কা কত প্রবল হতে পারে?

কিশোর-কিশোরী ভাইবোনেরা, তোমাদের যদি জিজ্ঞেস করা হয়, তোমরা কী জবাব দেবে?

নিশ্চয় অবাক হয়ে যাবে এবং তোমরা একে অপরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করবে। এটা আবার কী ধারার প্রশ্ন। দুটো শব্দ, তার আবার ধাক্কা? ধাক্কা যদি থাকে, তা আর কতটুকু হবে? তোমরা মনে মনে তোলপাড় করবে, অথবা একে অপরকে জিজ্ঞেস করবে। অথবা ভাববে, প্রশ্নকর্তার মাথায় নিশ্চয় ছিট আছে। ছিট বা কোনো গোলমাল।

কিন্তু না, প্রশ্নকর্তার কোথাও কোনো গণ্ডগোল নেই।

তোমার বয়স যদি আজ কমপক্ষে পঁয়ত্রিশ কি ছত্রিশ হত তাহলে বুঝতে পারতে 'জয় বাংলা' শব্দ দুটোর ধাক্কা কত প্রচণ্ড হতে পারে। তোমাদের বয়স কমপক্ষে ধরা হল পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ। আমি যখন এই লেখা তৈরি করছি তখন ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ। তোমার জন্ম তা হলে ১৯৬২-১৯৬৩ সালে। ১৯৭১ সালে তাহলে তোমাদের বয়স কত ছিল? আট কি নয়। অত ছোটবেলার কথা কি মনে থাকে কারো? ধরে নিলাম, থাকে। তাহলে তোমরা বুঝতে পারতে শব্দ দুটোর ধাক্কা কী রকম, কত প্রবল বা প্রচণ্ড। জয় বাংলা।

এই দুটো শব্দ কোটি কোটি মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিল। যে কোনো কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার পূর্বে হাজার হাজার লোক হাঁক দিয়ে উঠত– জয় বাংলা।

সৈনিক যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, কুচকাওয়াজ মার্চ করার সময় সে গলা ফাটিয়ে ফুকার দিয়ে উঠত– জয় বাংলা।

খেয়াল করে দেখো। যুদ্ধক্ষেত্রের কথা। লড়াই মানে বাঁচা, মরা অথবা জখম। একদম জুয়া খেলার মতো। দান ধরেছ। কোন ছকে উঠবে তুমি জান না। তুমি মরতে পার, বেঁচেও যেতে পার। অথবা আহত হবে। এমন পরীক্ষার মুখে তোমার বুকে শক্তি জোগাচ্ছে দুটি শব্দ– জয় বাংলা।

হাজার হাজার লোক যখন সমস্বরে হেঁকে উঠত– জয় বাংলা, তা আমরা যারা নিজ কানে শুনেছি, তারা জানি শত সমুদ্রের গর্জনও তার কাছে কিছু নয়।

কোনো লোক হোটেল দেবে কি ছোট চা-খানা তৈরি করবে। একটা নাম দিতে চায়। নাম তো তৈরি আছে– জয় বাংলা রেস্টুরেন্ট বা হোটেল।

পত্রিকার নাম 'জয় বাংলা।'

নতুন বাস চালু হবে, বাসের নাম জয় বাংলা পরিবহন।

শুধু কি এমনভাবেই থেকে যাবে শব্দ-দুটো?

না।

১৯৭১ সালের পঁচিশ মার্চের পর এই দেশের মানুষ কেউ নিজের বাড়িঘরে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেনি। নিরাপদ জায়গা খুঁজেছে সকলে হন্যে হয়ে। পাশে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত। হাজার হাজার মানুষ শিশু-কিশোর, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, নরনারী বাড়িঘরদোর ছেড়ে চলেছে বর্ডারের দিকে। বর্ডার মানে দেশের সীমান্ত। তারপরই অন্য দেশ, অন্য রাষ্ট্র। সেই সময় এক কোটি লোক আশ্রয় পেয়েছিল প্রতিবেশী রাষ্ট্রে। নয় মাস তারা শুধু আশ্রয় দিয়ে ক্ষান্ত হয়নি, খাওয়া-দাওয়ারও ব্যবস্থা করেছিল। অসুখ-বিসুখে চিকিৎসার বন্দোবস্ত ছিল অবশ্যি।

এক কোটি লোককে কেন ঘর ছাড়তে হল? কারণ, সৈন্যদের হামলা। তারা গণহত্যা শুরু করেছিল। গণহত্যা কেন



জান? প্রথমে হিন্দু মারা শুরু করে। হিন্দু-মুসলমান দুই-ই বাঙালি। দেখতে এক রকম। ফাঁপরে পড়ে পাকিস্তানি সৈন্যরা। তাদের সোজা সমাধান– যাকে পাও মারো। হিন্দু-মুসলমান দেখার দরকার কী? এই দেশের অধিবাসী হলেই গুলি করত। কসুর-অপরাধ থাক বা না-ই থাক। এইসব সৈন্য কোথা থেকে এল? তারা পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৈন্য।

বাংলাদেশে পাকিস্তানি সৈন্য? এ কেমন কথা? অন্য রাষ্ট্রের সৈন্য আমাদের রাষ্ট্রে আসবে কেন? তখন আমাদের দেশ বাংলাদেশ ছিল না। তখন এই ভূখণ্ডের নাম ছিল পূর্ব পাকিস্তান। পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্গত একটি খণ্ড। অপর খণ্ড পশ্চিম পাকিস্তান। দুয়ে মিলে পাকিস্তান রাষ্ট্র। বারো শ' মাইল দূরে অন্য খণ্ড।

তা হলে বাংলাদেশ এল কোথা থেকে?

অখণ্ড পাকিস্তান ভেঙে বেরিয়ে এল বাংলাদেশ। আর এই

এক কোটি লোককে
কেন ঘর ছাড়তে হল?
কারণ, সৈন্যদের হামলা।
তারা গণহত্যা শুরু করেছিল।
... প্রথমে হিন্দু মারা... হিন্দু-মুসলমান
দুই-ই বাঙালি।
..... যাকে পাও মারো।

আর তাই নয় মাস ধরে অস্ত্র হাতে
যুদ্ধ করল বাঙলার মুক্তিযোদ্ধারা,
বুকে ছিল– 'জয় বাংলা'





ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল
৭ই মার্চ ১৯৭১ বঙ্গবন্ধু সাড়ে
সাত
কোটি বাঙালিকে যার যা কিছু
আছে-
তাই নিয়ে যুদ্ধ করে দেশকে
স্বাধীন করার উদাত্ত আহ্বান
জানালেন শেষ করলেন–
'জয় বাংলা'
ধ্বনি উচ্চারণ করে।

ভাঙা মানে যুদ্ধ। পূর্ব পাকিস্তানকে লড়াই করতে হল নয় মাস। তিরিশ লাখ লোকের প্রাণ গেল সেই যুদ্ধে। অন্যান্য ক্ষতির পরিমাণ এখন না শুনলেও চলবে।

তোমরা এসব জানতে ইতিহাস পড়ো। সেই নয় মাসের কাহিনী কোনো সুখময় কাহিনী নয়। কল্পনা করো, গ্রামের পর গ্রাম পুড়ে যাচ্ছে। পাকিস্তানি সৈন্যরা আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। কোথাও কোথাও লুটপাট চলছে। মেয়েদের জোর করে বুড়ো বাপ-মার কাছ থেকে নিয়ে যাচ্ছে ছিনিয়ে। পাকিস্তানি সৈন্যদের ভয়ে পাটক্ষেতে লুকিয়ে পড়েছে কত মানুষ। সবাই যেন নিঃশ্বাস বন্ধ করে বসে আছে। শব্দ হলে তো সিপাইরা টের পাবে।

এমনও দেখা গেছে, বাচ্চা ছেলে হঠাৎ কেঁদে উঠতে গেছে, মা তার মুখ চেপে ধরেছে। দু-তিন মিনিটের বেশি মুখ চেপে ধরলে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে বাচ্চা মরে যাবে। বাচ্চার বুকে আর কত তাগদ? মা আতঙ্কে কি হিসাব রাখতে পারে? তাছাড়া বহু জনের জান যাবে যদি পাকিস্তানি সৈন্যরা টের পায়। মা বাচ্চার মুখ চেপে ধরে আছে তো আছেই। যখন মা হাত সরাল, দেখা গেল, বাচ্চার ধড়ে আর প্রাণ নেই। হতভাগিনী মা মরা বাচ্চা কোলে বসে আছে। সে তো কাঁদতেও পারে না শব্দ করে। তা হলেও বুকের যন্ত্রণা কিছু হাল্কা হয়। গুম হয়ে বসে আছে সে। কোলে মৃত সন্তান।

এমন হাজার রকম দুঃখের কাহিনী সেদিন বাংলাদেশের আকাশে-বাতাসে ছড়িয়ে ছিল।

পাকিস্তানি সৈন্যদের এ দেশের কেউ কি সাহায্য করেনি? তা হবে কেন? কিছু লোক তো ছিল যারা ওদের দোসর। পথঘাট চিনিয়ে নিয়ে যেত বিভিন্ন গ্রামে, শহরে। তারা মনে করত পাকিস্তান না থাকলে ইসলাম ধর্ম ধ্বংস হয়ে যাবে।

ওরা চাকরি নিয়েছিল পাকিস্তানি সিপাইদের। ওদের বলা হত রাজাকার, আলবদর, আলশামস্ প্রভৃতি। সেই দুখের দিনে ওরা মওজে থাকত। নামগুলো ওদের ধর্মের আলখেল্লায় মোড়া– যদিও পেশা জল্লাদের, লুটেরা ও খুনির।

সেইসব দিনে 'জয় বাংলা' শব্দ দুটির ধাক্কা কী প্রচণ্ড ছিল, আজ তোমাদের কল্পনা করে নিতে হবে।

একটা ব্যাপার থেকে তোমাদের বুঝতে সহজ হবে। আগে বলেছি, এক কোটি লোককে প্রতিবেশী রাষ্ট্র আশ্রয় দিয়েছিল। সবসময় সব মানুষের নাম তো মনে রাখা যায় না। তাই ডাক দিত– 'ও ভাই জয় বাংলা।' বাংলাদেশের সব মানুষের পরিচয় তখন ওই দুই শব্দে– 'ও ভাই জয় বাংলা।'

এই দুই শব্দ তখন মন্ত্রে পরিণত হয়েছিল। অজানা-অচেনা কিছুর নামকরণ হত ওই সংক্ষিপ্ত স্বরে।

তখন দেখা দিয়েছিল হঠাৎ শরীর কেঁপে কেঁপে জ্বর। পরক্ষণে জ্বর চলে যেত। কিন্তু কাঁপুনি যেত না। এই রোগের কী নাম? 'জয় বাংলা' রোগ।

এখন অনেকের হাসি আসতে পারে। কিন্তু ১৯৭১ সালে রোগের অমন নামে কেউ হাসতে পারত না।

কোথা থেকে এমন শব্দ?

শব্দ নয় তো, যেন মন্ত্র। কে এই মন্ত্রের কবি? লড়াই-বা কেন শুরু হল পাকিস্তানের দুই খণ্ডে? কেন দেশময় জুলুমের অমন ঝড় বয়ে গেল?

ইতিহাস তার জবাব দিতে পারবে।

আজ শুধু জেনে রাখো, পূর্ব পাকিস্তান নামক এই এলাকায় শোষণ চলত পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক। রাজ্যের সব কলকাঠির গোড়া তো সেইখানে। ফন্দি সেখানেই তৈরি হত।

একটা উদাহরণ দিই।

১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে 'জয় বাংলা' ধ্বনি শুনে পাক হানাদার বাহিনী ও আলবদর-রাজাকাররা ভয়ে কেঁপে উঠত। অস্ত্র ফেলে দৌড়ে পালাত।

পৃথিবীর বাজারে এ দেশের পাটের খুব চাহিদা ছিল। সেই পাট দিয়ে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হত। তা দিয়ে আধুনিক জগতের যন্ত্রপাতি কেনা যেত। কিন্তু সেইসব মেশিন বসত পশ্চিম পাকিস্তানে। সিন্ধু দেশের রাজধানী তখন করাচি। এই শহর ছিল সমুদ্রের মাছ ধরার জন্য খ্যাত বন্দর। এই মাছধরা শহর আধুনিক শহরে পরিণত হল শুধু পাটে অর্জিত বিদেশি মুদ্রায়। পূর্ব পাকিস্তানে ছিটে-ফোঁটা কিছু আসত বৈকি। এই শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় উঠল, 'না, এ শোষণ চলতে দেওয়া হবে না।'

১৯৪৭ সালে ভারত ভেঙে হিন্দুস্থান ও পাকিস্তান হয়েছিল। ১৯৭১ সালে আবার পাকিস্তান ভাঙা সারা হল। অবশ্যি ১৯৪৭ থেকে চব্বিশ বছর এই ভাঙনের জের চলল। শেষে শেষ ধস্ নামল। এই ধসের কারিগর একজন ছিলেন, যিনি কোনোদিন সেই লক্ষ্য চোখ-ছাড়া করেননি। তাঁর কণ্ঠ থেকেই ধ্বনিত হয়েছিল, জয় বাংলা।

'জয় বাংলা' নামক পরিণত মন্ত্র যুদ্ধের দিকে এগিয়ে দিল এ দেশের মানুষকে। এই মন্ত্র বুক থেকে সব হতাশা মুছে দিল, ভয় ঘুচিয়ে দিল। প্রতিবাদ করতে মানুষ আর ভীত নয়। আর পাকিস্তান নয়। এবার স্লোগান–

তোমার আমার ঠিকানা,
পদ্মা মেঘনা যমুনা।

'জয় বাংলা' মন্ত্রের কবি-কারিগরের নাম তোমরা জানো কি? এখন হয়তো জেনেছ, জয় বাংলা প্রথমেই মানুষ উচ্চারণ করে না। তার পূর্বে যোগ করে শ্রদ্ধা এবং তাজিমের সঙ্গে জয় বঙ্গবন্ধু।

তারপর শেখ মুজিবুর রহমান কেউ আর বলে না। প্রিয়জনকে সবাই এমন সংক্ষেপ করে নেয়।

লেখাটি 'কিশোর রচনা' থেকে সংকলিত

স্মৃতিতে বঙ্গবন্ধু

কবীর চৌধুরী



ব্যক্তিগতভাবে ঘনিষ্ঠ ছিলেন আমার চাইতে অনেক বেশি আমার ছোট ভাই মুনীর চৌধুরী, যিনি ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলনভিত্তিক নাটক 'কবর' লিখে অমর হয়ে আছেন। ১৯৭১ সালের ১৪ই ডিসেম্বর, বাংলাদেশ স্বাধীন হবার মাত্র দু'দিন আগে, পাকিস্তান দখলদার বাহিনীর ঘৃণ্য সহযোগী ঘাতক আলবদর বাহিনীর কতিপয় সদস্য মুনীর চৌধুরীকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যায় ও হত্যা করে। তাঁর মৃতদেহ আমরা খুঁজে পাইনি। 'কবর'-এর রচয়িতার নিজের কোনো কবর হয়নি। এই মুনীরের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ ও নিবিড়।

১৯৭১-এর গোড়া থেকেই বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলন অত্যন্ত বেগবান হয়ে ওঠে। এ অঞ্চলের মানুষের মনে বাঙালিত্বের চেতনা প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠতে থাকে। বাঙালির হাজার বছরের সাহিত্যের ইতিহাস, তার ঐশ্বর্যময় সংস্কৃতি, তার লোকজীবনের সমৃদ্ধ বৈচিত্র্য, তার মানবতাবাদী জীবনদর্শন প্রভৃতি সম্পর্কে মানুষের উৎসাহ ও আমার স্মৃতিতে বঙ্গবন্ধুর সাহচর্যের কয়েকটি ঘটনা হীরের টুকরোর মতো জ্বল জ্বল করে। এর কিছু আমার কাজের সঙ্গে যুক্ত, দায়িত্ব পালনের সঙ্গে সম্পর্কিত; আর কিছু একান্ত ব্যক্তিগত।

বাঙালিত্বের চেতনা বিকাশের সঙ্গে, তা উপলব্ধি করার সাথে সাথে, বাঙালির জন্য একটি স্বাধীন সার্বভৌম স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের অপরিহার্যতাও অনেকের কছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আর এর পেছনে গগনচুম্বী ভূমিকা পালন করেন কোটি বাঙালির প্রাণপ্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

১৯৭১-এর ফেব্রুয়ারিতে আমি বাংলা একাডেমীর প্রধানরূপে কর্মরত। আমরা প্রতি বছরই ২১শে ফেব্রুয়ারি বিশেষ মর্যাদার সঙ্গে উদযাপন করি। ১৯৫২-এর ভাষা- শহীদদের শ্রদ্ধা জানাবার ব্যাপারটি সামনে রেখে আমরা বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে নানা রকম আলোচনা অনুষ্ঠান করি। সেবার '৭১-এর ২১শে ফেব্রুয়ারি উদযাপনে আমরা নতুন মাত্রিকতা আনার কথা ভাবলাম। সিদ্ধান্ত নিলাম আমাদের অনুষ্ঠানমালায় প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানাব বাংলার রাখাল রাজা শেখ মুজিবকে। বাঙালির স্বাধিকার অর্জনের লক্ষ্যে তাঁর কর্মসূচি, তাঁর বক্তৃতা-ভাষণ, তাঁর উদ্দীপনাময় 'জয় বাংলা' স্লোগান, তাঁর অতুলনীয় নেতৃত্ব তখন তাঁকে জনগণের চিত্তে এক অনন্য আসনে বসিয়েছে। হ্যামেলিনের বাঁশিওয়ালার পেছনে যেমন একদা সব শিশু অধীর হয়ে ছুটেছিল, বাংলার সব মানুষ সেদিন তেমনিভাবে

পাকিস্তানিরা তাঁকে হত্যা করতে পারেনি। ..... যাঁর দীপ্ত শ্লোগান 'জয় বাংলা' কণ্ঠে ধারণ করে বাংলাদেশের দামাল ছেলেরা দেশকে স্বাধীন করেছিল।

বঙ্গবন্ধুর পেছনে এসে জড়ো হয়েছে। এখনই তো সময় বঙ্গবন্ধুকে বাংলা একাডেমীতে প্রধান অতিথি করে আনার।

আমি আমাদের অনুরোধ নিয়ে তাঁর কাছে গেলাম। তিনি ঈষৎ কৌতুকের সুরে বললেন, বাংলা একাডেমী তো পণ্ডিতদের জায়গা, আমি যে মাঠের মানুষ। আমাকে কেন? কোনো একজন প্রবীণ শ্রদ্ধাভাজন সাহিত্যিক বা গবেষককে প্রধান অতিথি করুন। আমার কথাগুলি হুবহু মনে নেই, কিন্তু এ ধরনের কিছু যে বলেছিলেন সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। যাই হোক, তেমন গুরুত্বের সঙ্গে তিনি কথাগুলি বলেননি। তাছাড়া বাংলা একাডেমীকে তিনি ভালোবাসতেন, আমার প্রতিও তিনি ছিলেন একই সঙ্গে শ্রদ্ধা ও স্নেহশীল। বাংলা একাডেমীর অনুষ্ঠানে তিনি এসেছিলেন সেবার। প্রধান অতিথির উদ্বোধনী ভাষণ দেন তিনি। তাঁর স্বভাবসিদ্ধ উদাত্ত কণ্ঠে তিনি দেশের শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীদের সাধারণ মানুষের পাশে এসে দাঁড়াবার আহ্বান জানান। তাঁরা যেন সাধারণ মানুষের জীবনকে সুখী ও সমৃদ্ধ করার সর্বাত্মক প্রয়াসে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। ওই অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু বাংলা একাডেমী পরিচালিত বাংলা ভাষা শিক্ষা কোর্সে সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ অবাঙালি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রশংসাপত্র বিতরণ করেছিলেন। ওই ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ছিল জর্ডানের এক যুবক যার মাতৃভাষা ছিল আরবি, যুক্তরাষ্ট্রের একাধিক শ্বেতাঙ্গিনী মহিলা যাদের মাতৃভাষা ছিল ইংরেজি, রাশিয়ার একজন বৃত্তিধারী যুবক যার মাতৃভাষা ছিল রুশ এবং পশ্চিম পাকিস্তানের একাধিক তরুণ-তরুণী, যাদের মাতৃভাষা ছিল উর্দু, পাঞ্জাবি ও সিন্ধি। এরা যখন বঙ্গবন্ধুর হাত থেকে প্রশংসাপত্র গ্রহণ করছিল তখন তাদের মুখে ফুটে উঠেছিল গভীর শ্রদ্ধা, আনন্দ ও তৃপ্তির ভাব। বঙ্গবন্ধুর মুখও দেখাচ্ছিল হাস্যোজ্জ্বল ও সুখী।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন দীর্ঘ ন'মাস বঙ্গবন্ধু শত্রুপুরী পাকিস্তানের কারাগারে দুঃসহ বন্দিজীবন কাটিয়েছেন। তাঁর কারাপ্রকোষ্ঠের পাশে তাঁর জন্য কবর খোঁড়ার শব্দ তিনি শুনতে পেয়েছেন। কিন্তু মুহূর্তের জন্যেও তিনি ভেঙ্গে পড়েননি। পাকিস্তানের সামরিক জান্তার কাছে তিনি শুধু একটি অনুরোধই রেখেছিলেন। প্রহসনমূলক বিচারের শেষে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার পর তাঁর মৃতদেহ যেন তাঁর প্রিয় স্বদেশভূমি সোনার বাংলায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়, তিনি সেখানেই সমাহিত হতে চান।

পাকিস্তানিরা তাঁকে হত্যা করতে পারেনি। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বীর বাঙালি সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করে। যাঁর প্রদীপ্ত মুখচ্ছবি হৃদয়ে লালন করে, যাঁর দৃপ্ত স্লোগান 'জয় বাংলা' কণ্ঠে ধারণ করে বাংলাদেশের দামাল যোদ্ধারা দেশকে স্বাধীন করেছিল তাদের সেই প্রাণপ্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মুক্ত স্বাধীন বাংলাদেশে বিজয়ীর জয়মুকুট মাথায় পরে ফিরে আসেন ১৯৭২ সনের ১০ই জানুয়ারি। সেদিন প্রথমে ঢাকার বিমান বন্দরে, তারপর রাজপথে-রাজপথে, এবং শেষে সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে যে অভূতপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা হয়েছিল তার স্মৃতি অবিস্মরণীয়। তবে আমি এখন যে ব্যক্তিগত স্মৃতির কথা বলব তা ১০ই জানুয়ারির নয়, সেটা ২৬শে জানুয়ারির।

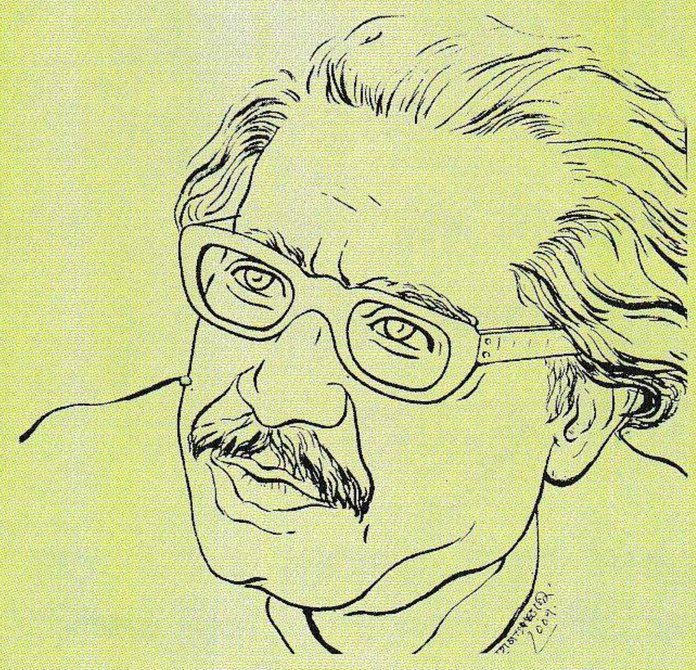
১৯৭২ সালের ২৬শে জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু ঢাকার ভারতীয় দূতাবাস কর্তৃক আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেন হোটেল ইন্টারকনে। উপলক্ষ ছিল ভারতের জাতীয় দিবস। সে সময় বাংলাদেশে ভারতীয় দূতাবাসের প্রধান ছিলেন মি. জে. এন. দীক্ষিত। একজন আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে আমিও ওই অনুষ্ঠানে যোগ দিই। এক সময় বঙ্গবন্ধু সভাকক্ষে এসে উপস্থিত হলেন। দেশে ফিরে এসে এরকম আনুষ্ঠানিক আয়োজনে বোধ হয় সেটাই ছিল তাঁর প্রথম উপস্থিতি। আমরা সভাকক্ষে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছি। বঙ্গবন্ধু ধীর দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে আসছেন। কী যে ব্যক্তিত্বপূর্ণ, প্রশান্ত কিন্তু মর্যাদাময় দেখাচ্ছিল তাঁকে তা কথায় বোঝাতে পারব না। দীর্ঘদেহী, দরাজ, প্রদীপ্ত চোখের চাউনি, মুখে স্মিত হাসির আভাস। তিনি সকলের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছেন, কারো সঙ্গে দু'একটি কথা বলছেন। তিনি আমার সামনে এসে এক মুহূর্তের জন্য দাঁড়ালেন, আমার চোখে চোখ রাখলেন, হাত মেলালেন, বললেন, কেমন আছেন? তারপর আমার বাহুতে তাঁর একটি হাত জড়িয়ে আমাকে সঙ্গে নিয়ে একটু হাঁটলেন। এক পর্যায়ে নীরবতা ভেঙ্গে মৃদু কোমল কণ্ঠে শুধু উচ্চারণ করলেন, মুনীর নাই। তারপর আমার হাতে মৃদু চাপ দিলেন। আমি কোনো রকমে চোখের জল সামলে নিজেকে মুক্ত করে আবার নিজের জায়গায় গিয়ে দাঁড়াই।

বঙ্গবন্ধুর একান্ত সান্নিধ্যের আরো কিছু কিছু অন্তরঙ্গ স্মৃতি আমার মনে সযত্নে সঞ্চিত আছে। ১৯৭৩ সালে তাঁর শুভজন্মদিনে একটি শাপলা ফুল হাতে নিয়ে তাঁকে শুভেচ্ছা জানাতে তাঁর ধানমণ্ডি ৩২ নম্বর রোডের বাড়িতে গিয়েছিলাম। একবার ১৯৭৪ সালে আমার ছোট মেয়ে সোভিয়েত রাশিয়ায় বৃত্তি নিয়ে চিকিৎসাবিজ্ঞান পড়তে যাবার আগে বঙ্গবন্ধুকে এক নজর কাছে থেকে দেখার ঐকান্তিক আগ্রহ প্রকাশ করায় তাকে আমি বঙ্গবন্ধুর কাছে নিয়ে গিয়েছিলাম। শত ব্যস্ততার মধ্যেও বঙ্গবন্ধু আমাদের সময় দিয়েছিলেন, মেয়েকে আদর করেছিলেন, মিষ্টি খাইয়েছিলেন, আশীর্বাদ করে বলেছিলেন, সাফল্যের সঙ্গে শিক্ষা শেষ করে দেশে ফিরে যেন দেশের মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করে।

এমনি আরো কিছু স্মৃতি আছে। এত বছর পরও সেসব স্মৃতি আগের মতোই উজ্জ্বল ও অমলিন হয়ে আছে। কিন্তু সেসব কথা অন্য দিন বলা যাবে, আজ নয়।

ফিরে আসছেন শেখ মুজিব

সিকান্দার আবু জাফর



মুক্তিকামী মানুষের শুভেচ্ছার পথে
বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জনক
শেখ মুজিবুর রহমান
ফিরে আসছেন বাংলাদেশে ।
ফিরে আসবেন জানা ছিল,
জানা ছিল ব্যর্থ হতে পারে না কখনও
সাড়ে সাত কোটি বাঙালির কণ্ঠে
সমস্বর বিশ্বের জাগ্রত গণদাবি ।
মানুষের অমানুষের সংঘর্ষের প্রস্তরফলক পেরিয়ে
ফিরে আসছেন তিনি ইতিহাসে অশনাক্ত পথে ।
পেরিয়ে আসছেন সশস্ত্রের অস্ত্রে ঝরা
নিরস্ত্রের রক্তের নদী,
কোটি কোটি দীর্ঘশ্বাসের ঝড়-সওয়ার
তিনি আসছেন বঙ্গবন্ধু বিজয়ী মুজিব,
পায়ে পায়ে বেজে উঠছে ইতস্তত করোটি কঙ্কালের
প্রতিজ্ঞার জয়ধ্বনি ।
ফিরে আসছেন বধূ-ভগ্নী-জননীর
লুণ্ঠিত নারীত্বের আর্তনাদ পেরিয়ে
অগ্নিদগ্ধ গ্রাম-কুটিরের অগণিত
সংসার-ভস্মের অভ্যর্থনা ছুঁয়ে
বাঙালির শতচূর্ণ প্রীতি-মমতা-প্রেমের
সমাধি-সংকুল রাজপথে
সাড়ে সাত কোটি বাঙালির কান্নার পাথরে গড়া
সুমসৃণ পথে ফিরে আসছেন তিনি
ফিরে আসছেন বঙ্গ-ভারতের
সম্মিলিত রক্তস্নাত মহাপুণ্য পথে
বাংলাদেশের মরণ-বিজয়ী মুক্তিসেনানী ।
ছাত্র-জনতার
করতালি-মুখরিত পথে
ফিরে আসছেন তিনি জাতির জনক
সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে
নির্ভয় ভবিষ্যতের স্বপ্নদীপ্ত
নিরঙ্কুশ প্রত্যাশার পথে ।

[সংক্ষেপিত]

শিশুদের মাঝে বঙ্গবন্ধু

রোকনুজ্জামান খান

আমাদের এই সুন্দর বাংলাদেশে অনেক গৌরবদীপ্ত মানুষের জন্ম হয়েছে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, জগদীশচন্দ্র বোস, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন, শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন প্রমুখ কৃতী সন্তানদের জন্ম দিয়ে বাংলাদেশ গর্বিত। এদের সবারই জন্ম বাংলাদেশে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী প্রমুখ অসাধারণ গুণী ব্যক্তিদের জন্ম বর্তমান বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমানার বাইরে হলেও তাঁরা বাঙালি। আর দেশের মানুষকে ঘিরেই তাঁদের সৃষ্টিশীল কর্মজীবনের সাফল্য, যা চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে এদেশের কৃতী সন্তান শেখ মুজিবুর রহমানের অবদানের কথা। একটি স্বাধীন দেশের জন্ম দিয়ে তিনি জাতির জনকের সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। এদেশের মানুষকে ভালবেসে তিনি মানুষেরই দেওয়া উপাধি পেয়েছেন 'বঙ্গবন্ধু'।

একজন ছাত্রকর্মী থেকে তিনি একটি স্বাধীন দেশের স্থপতি-রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। অবশ্য কোনো আকস্মিক সুযোগের সদ্ব্যবহার করে তিনি এভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হননি। সংগ্রামী জীবনের প্রায় প্রতিটি মুহূর্ত কেটেছে তাঁর প্রচণ্ড বাধার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। এই বাধাকে অতিক্রম করে, দিনের পর দিন জীবন-সৌধের প্রতিটি ইট একটি একটি করে তাঁকে গেঁথে তুলতে হয়েছে। তিনি তাঁর জীবনের যে সুদীর্ঘ সময় পাকিস্তানের কারাগারে অতিবাহিত করেছেন, এদেশের বহু রাজনৈতিক নেতার গোটা রাজনৈতিক জীবনের পরিধিও তার চেয়ে কম। বাংলার মানুষের জন্যে তাঁর আন্তরিক দরদ ও উদারতা কিংবদন্তিতে রূপ নিয়েছে। আমার এ ক্ষুদ্র নিবন্ধে দেশের প্রতি তাঁর সার্বিক অবদানের প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করব না। আমার এ স্মৃতিচারণ শুধু শিশুদের প্রতি তাঁর আন্তরিক দরদের কিছু ঘটনা নিয়ে।

১৯৬৩ সালের কথা। শীতকাল। ঢাকায় প্রেসক্লাব প্রাঙ্গণে কচি-কাঁচার মেলা ১০ দিনব্যাপী শিশুদের এক আনন্দমেলার আয়োজন করেছে। প্রতিদিন বিকালে শুরু হয়ে সন্ধ্যার পর শেষ হয় এ আনন্দ মেলা। একদিন বিকালে দেখা গেল, আলোয়ান গায়ে এই আনন্দমেলা ঘুরে দেখছেন শেখ মুজিবুর রহমান। কিন্তু তিনি যেখানে যাচ্ছেন, তাঁর পেছনে চলছে এক ভিক্ষুক। গায়ে তার ছেঁড়া কাঁথা জড়ানো।

এই আনন্দমেলার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। মেলার স্বেচ্ছাসেবী থেকে শুরু করে পুলিশ বাহিনী, গোয়েন্দা বাহিনী, বিচারকমণ্ডলী প্রভৃতি সবকিছু গড়ে তোলা হয় ছোটদেরকে দিয়ে। শিশু-কিশোররাই গোটা আনন্দ মেলা পরিচালনা করত। আর লক্ষণীয় ব্যাপার ঘটল সেই ছেঁড়া কাঁথা গায়ে জড়ানো লোকটিকে নিয়ে। কচি-কাঁচার মেলার ক্ষুদে গোয়েন্দা বাহিনীর হাতে লোকটি ধরা পড়ে গেল। আসলে সে ছিল সরকারি গোয়েন্দা। আসল গোয়েন্দা ক্ষুদে গোয়েন্দার চোখকে ফাঁকি দিতে পারল না। সবাই বিস্মিত হল। আনন্দ মেলার বিচারালয়ে তাকে ধরে আনা হল। শুরু হবে তার বিচার। ক্ষুদে বিচারক (১০ম শ্রেণির এক ছাত্রী) এজলাসে বসে গেল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে ছুটে এলেন শেখ সাহেব। সব শুনে বিরক্ত হয়ে বললেন, এই পবিত্র শিশুদের সঙ্গে খানিকক্ষণ মিশে মনটাকে একটু হালকা করব তাতেও দেখি এরা বাধ সাধবে। লোকটির প্রতিও তিনি ব্যঙ্গোক্তি করলেন, গোয়েন্দাগিরি করতে এসে এই বাচ্চা গোয়েন্দাদের কাছেও ধরা পড়ে গেলে, বাহাদুর বটে! বলা বাহুল্য, এরপর শেখ সাহেবের অনুরোধে লোকটিকে আনন্দ মেলার ক্ষুদে পুলিশ বাহিনী ধরে নিয়ে বাইরে বের করে দেয়। সেবারের আনন্দমেলা যখন শেষ হল, শ্রীমঙ্গলের স্টলের কর্মীরা

ঠিক করল, তাদের কিছু দুষ্প্রাপ্য গাছের চারা তারা দিয়ে যাবে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদের। টবে লাগানো ছিল সে-সব চারা। এর মধ্যে বড় এলাচির চারা দেওয়া হল বেগম মুজিবকে, কমলালেবুর চারা বেগম রোকাইয়া আনোয়ারকে, চা-গাছের চারা শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনকে, আর পাহাড়ি আনারসের চারাটি আমাকে। চারাসহ টবগুলো যখন আমাদের হাতে তুলে দিচ্ছিল শ্রীমঙ্গলের কর্মীরা, তার একটা ছবিও তোলা হল। ছবিটি আমার কাছেই ছিল। দীর্ঘদিন পর ১৯৭২ সালে একদিন সুযোগ পেয়ে বঙ্গবন্ধুকে ছবিটি দেখালাম। বেগম মুজিব এলাচির চারাসহ টবটি গ্রহণ করছেন, সেই ছবি। মনে হল, তিনি ক্ষণিকের জন্যে ১৯৬৩ সালের দিনগুলোতে ফিরে গেলেন। অপূর্ব স্মরণশক্তি তাঁর। সেই গোয়েন্দার প্রসঙ্গটি বললেন। আর আফসোস করে বললেন, এলাচির চারাটি ধানমণ্ডির বাসায় লাগিয়েছিলাম। বেশ বড় ঝাড় হয়েছিল সেই চারা থেকে। কিন্তু একাত্তর সালে পাকিস্তানি সিপাইদের বুটের চাপে সবগুলো গাছ মরে গেছে। আমি ফিরে এসে দেখি একটি গাছও বেঁচে নেই।

আমার ধারণা ছিল, কচি-কাঁচাদের দেওয়া ওই সামান্য একটি এলাচি-চারার প্রতি অতটা গুরুত্ব দেবেন না শেখ-পরিবার। কিন্তু আমার সে ভুল সেদিন ভাঙ্গল।

আর এক দিনের ঘটনা। দেশ তখন সদ্য স্বাধীনতা লাভ করেছে। ১৯৭২ সালের মার্চ মাসের প্রথম দিকে বঙ্গবন্ধু যাচ্ছেন মস্কো সফরে। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন পরামর্শ দিলেন, আমাদের এমন কিছু উপহার সামগ্রী বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেওয়া প্রয়োজন যা সেদেশের মানুষের মনে একটা প্রভাব ফেলতে পারে। কিন্তু কি সে উপহার? শিল্পাচার্যই বলে দিলেন : শিশুদের আঁকা কিছু ছবির একটি অ্যালবাম। ছবির বিষয় হবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও গণহত্যা। যেসব শিশু বাংলাদেশে থেকে মুক্তিযুদ্ধকে দেখেছে, হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছে, অনুভব করেছে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী আর তার দোসরদের গণহত্যার বিভীষিকা, তারা আঁকবে সেই ছবি।



ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৪ : কচি-কাঁচার মেলার সম্মেলনে গার্ড অব অনার গ্রহণ করছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান



শিশুদের প্রতি বঙ্গবন্ধুর ছিল অকৃত্রিম ভালোবাসা। শিশুদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও খাদ্য বিষয়ে তিনি বিশেষ যত্নবান ছিলেন। উপরের ছবিটিতে রংপুরের একটি মেয়েদের স্কুলে তিনি ছাত্রীদের আদর জানাচ্ছেন

কথামতো কাজ হল। রং-তুলির ছোঁয়ায় স্বাধীন বাংলাদেশের শিশুরা ফুটিয়ে তুলল মুক্তিযুদ্ধের চিত্র। কী বীরত্বব্যঞ্জক সে সব ছবি! আর আঁকল নরপশুদের গণহত্যার ছবি। নির্যাতনের ছবি। ১৫-১৬টি শিশু, যাদের বয়স ৫ থেকে ১২, তাদের আঁকা ৩০টি ছবি একটি সুন্দর প্যাকেটে পুরে অ্যালবাম তৈরি করা হল প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর হাতে দেবার জন্য। এ উপহার তিনি বয়ে নিয়ে যাবেন মস্কোতে। বাংলাদেশের শিশুদের পক্ষ থেকে তিনি তা উপহার দেবেন মস্কোর শিশুদের। আমরা চাইলাম, ছবিগুলো যেসব শিশু এঁকেছে, তারা নিজেরা গিয়ে অ্যালবামটি বঙ্গবন্ধুর হাতে তুলে দেবে। সঙ্গে আমরা বড়রা দু'একজন থাকব। কিন্তু এখানেই বাধ সাধল আমলাতান্ত্রিক মানসিকতা। প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয় তখন পুরনো গণভবনে। প্রথমেই আপত্তি জানালেন প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ের জনৈক কর্তাব্যক্তি। তাঁর বক্তব্য হলো, প্রধানমন্ত্রী সারাদিন এত ব্যস্ত থাকেন এবং প্রতিদিন দেশি-বিদেশি এত দর্শনার্থী তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসে যে, তিনি দম ফেলতে পারেন না। ভদ্রলোক পরামর্শ দিলেন আমাকে, বঙ্গবন্ধুর কাছে একদল 'বাচ্চা-কাচ্চা' নিয়ে গিয়ে তাঁকে আর বিব্রত না করে আমি নিজেই যেন এক ফাঁকে অ্যালবামটি তাঁর হাতে দিয়ে আসি। কিন্তু আমরাও নাছোড়াবান্দা। তাঁকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম এই ১৫-১৬টি

শিশু নিজেদের আঁকা ছবিগুলো নিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করলে প্রধানমন্ত্রী নিশ্চয়ই খুশি হবেন। কত ছোট্ট শিশুরা এসব ছবি এঁকেছে, তিনি নিজের চোখে তাদের দেখতে পেলে মুগ্ধ হবেন। শিশুরা উৎসাহিত হবে। কিন্তু না, এত সহজেই কাজ হাসিল হল না। খবর শুনে শিল্পাচার্য বিরক্ত হলেন। সেসময়ের প্রধানমন্ত্রীর যিনি প্রেস সচিব ছিলেন, তাঁর শিশুকন্যারও আঁকা একটি ছবি ছিল এই অ্যালবামে। তিনি আমাদের সাহায্যে এগিয়ে এলেন। তাঁর প্রচেষ্টায় এবং আমাদের নিজেদের চেষ্টা-তদ্বিরে ফল হল। স্বাধীন বাংলাদেশের শিশুশিল্পীরা তাদের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার অনুমতি পেল। শিশুরা সংখ্যায় ছিল ১৪-১৫ জন। সঙ্গে আমরা তিনজন– ড. আবদুল্লাহ আল-মুতী, লুতফুল হায়দার চৌধুরী আর আমি। শিশুদের নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কক্ষে ঢুকতেই তিনি উঠে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে ওদের অভ্যর্থনা জানালেন। মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথের গানের সেই বিখ্যাত কলিটি মনে পড়ল: 'আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে।' শিশুরাই যে সব কালে সব দেশের রাজা বঙ্গবন্ধু সে রাজাদের উপেক্ষা করবেন কীভাবে। তিনি ওদের আদর করলেন। তারপর আমি অ্যালবামটি খুলে একটি একটি করে ছবিগুলো তাঁকে দেখাতে লাগলাম। সঙ্গে সঙ্গে ছবির ক্ষুদে শিল্পীর সঙ্গেও তাঁর পরিচয় করিয়ে দিলাম। তিনি মুগ্ধ, অভিভূত হলেন। বললেন, আমার দেশের শিশুরা এমন নিখুঁত ছবি আঁকতে পারে, এসব না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। মাঝে মাঝে ছবির বিষয়ের প্রতি লক্ষ করতে গিয়ে তাঁর চোখ অশ্রুসজল হয়ে আসছিল। বঙ্গবন্ধুকে ঘিরে ছিল শিশুরা। একটি ছোট্ট বাচ্চাকে একেবারে কোলের কাছে টেনে নিয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি এঁকেছ? শিশুটি দেখিয়ে দিল তার আঁকা একটি ছবি। মুক্তিযুদ্ধের ছবি। যুদ্ধের ন'মাস মুক্তিযদ্ধের কথা শুনতে শুনতে তার যে অভিজ্ঞতা জন্মেছে, তার আলোকেই সে এঁকেছে এই ছবি।

সেদিনের এই সাক্ষাৎকারের শেষে আমরা যখন বেরিয়ে আসছিলাম, বঙ্গবন্ধু বললেন, আজকের কর্মব্যস্ত সারাটা দিনের মধ্যে এই একটুখানি সময়ের জন্যে আমি শান্তি পেলাম। শিশুদের সান্নিধ্য আমাকে সব অবসাদ থেকে মুক্তি দিয়েছে। ভাবছিলাম একবার সচিবালয়ের সেই কর্তাব্যক্তিকে শুনিয়ে দিয়ে আসি বঙ্গবন্ধুর এই উক্তির কথা। কিন্তু ওরা সঙ্গে থাকায় ইচ্ছেটা চেপে গেলাম।

আর একটি ঘটনা। ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাস। ঢাকার গুলিস্তান হলের সামনের শহীদ মতিউর শিশুপার্কে চলছে কচি-কাঁচার মেলার জাতীয় শিক্ষা শিবির। জেলা থেকে ছেলেমেয়েরা এসেছে শিবিরে প্রশিক্ষণ নিতে। প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুরও শিবির পরিদর্শনে আসবার কথা ছিল। কিন্তু শিবিরের শেষ দিন খবর পাঠালেন, ব্যস্ততার কারণে তিনি আসতে পারছেন না। তবে ছেলেমেয়েরা সবাই যেন গণভবনে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে। তিনি ওদের যাতায়াতের জন্যে বাস পাঠালেন কয়েকটি। আমরা ১৭টি জেলার ছেলেমেয়েদের নিয়ে হাজির হলাম রমনা পার্কের পাশে গণভবনের সবুজ আঙ্গিনায়। তারপর কচি-কাঁচার মেলার টুপি মাথায় দিয়ে তিনি ওদের গার্ড অব অনার পরিদর্শন করলেন, মার্চ পাস্টের সালাম নিলেন। ঢোল আর কাঁসর বাজনার তালে তালে শিক্ষার্থীদের লাঠিখেলা দেখলেন। সবশেষে নিজে সবার হাতে মিষ্টির প্যাকেট তুলে দিতে লাগলেন। একটি ছেলেকে কাছে পেয়ে তিনি তার নাম জিজ্ঞেস করলেন। ঘটনাচক্রে তার নামটিও ছিল মুজিবুর রহমান। নামটি শুনে বঙ্গবন্ধু আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে ছেলেটিকে জড়িয়ে ধরে বলে উঠলেন, পেয়েছি, আমার মিতাকে পেয়েছি।

বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে শিশুদের শেষ সাক্ষাৎ ঘটে তাঁর সর্বশেষ জন্মদিনে। ১৯৭৫ সালের ১৭ই মার্চ ছিল দিনটি। জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাবার জন্যে চারটি সংগঠনের শিশুরা সমবেত হল শেরে বাংলা নগরে নতুন গণভবন প্রাঙ্গণে। আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান বয় স্কাউটস্ এবং গার্ল গাইডস্, আর জাতীয় প্রতিষ্ঠান কচি-কাঁচার মেলা ও খেলাঘর আসরের ছেলেমেয়েরা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে তাঁর প্রতীক্ষা করছিল। চারটি সংগঠনের সদস্যসংখ্যা ৮শ'। প্রত্যেকে যার যার প্রতিষ্ঠানের ইউনিফরম পরা। শেরে বাংলা নগরের সেই মনোরম সবুজ চত্বরে শিশুদের প্রাণঢালা শুভেচ্ছা কুড়িয়ে সবার মাঝে ঘুরতে ঘুরতে ওদেরই একজন হয়ে গেলেন তিনি। সারিবদ্ধ ছেলেমেয়েরা ক্ষণিকের জন্যে তাদের প্রিয় মানুষটিকে কাছে পেয়ে উল্লসিত হয়ে উঠল। শিশুদের মাঝে কোনো প্রটোকলের বালাই নেই– বারবার এ কথাটিই সেদিন মনে হচ্ছিল বঙ্গবন্ধু আর শিশুদের সেই মহামিলনের দৃশ্যটি দেখে।

সেদিন তিনি গণভবনে গাড়ি থেকে নামতেই কচি-কাঁচার মেলার একদল মেয়ে তাঁকে ঘিরে ধরে ব্রতচারী আন্দোলনের একটি গান গেয়ে উঠেছিল। একটি বিখ্যাত গান: 'সে যে মোদের সবার প্রিয়/ সকলের আদরণীয়/ সকল কাজে বরণীয়। বিভু, তোমায় এই মিনতি/ দীর্ঘ জীবন তারে দিও/ সফল জীবন তারে দিও।'

কিন্তু কচি-কাঁচার মেলার মেয়েদের সেদিনের সে শুভকামনা পূরণ হয়নি। তিনি দীর্ঘজীবন লাভ করেননি। এই ঘটনার মাত্র পাঁচ মাস পরই ঘাতকের হাতে সপরিবারে তাঁকে নৃশংসভাবে প্রাণ দিতে হয়। আসলে সবাই যা চায়, সব সময় তো তা পাওয়া যায় না। শিশুরা যা চায়, দেশবাসী সাধারণ মানুষ যা চায়, সবক্ষেত্রে সে প্রাপ্তি ঘটে না। নইলে আব্রাহাম লিঙ্কন ঘাতকের হাতে প্রাণ দেবেন কেন? তাঁর অমন মৃত্যু কি কেউ কামনা করেছিল? কেউ কি কামনা করেছিল গান্ধীজীর উন্মুক্ত বক্ষ বুলেটের ঘায়ে বিদীর্ণ হবে? অথবা মার্টিন লুথার কিং-এর প্রাণহীন দেহ অমনি করে মাটিতে লুটিয়ে পড়বে ঘাতকের অস্ত্রাঘাতে! আমরা জানি, তবুও মহৎ মানুষের মৃত্যু



১৯৭৫ সালের ১৭ মার্চ, জাতির জনকের জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানাতে এসেছে কচি-কাঁচার মেলা, খেলাঘর, বয়স্কাউট ও গার্লস গাইডের শিশুরা। জমজমাট এই অনুষ্ঠানে তিনিও শিশুদের আদর জানাচ্ছেন, শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন। তাঁর ঠিক পেছনে শিশুদের আরেক প্রিয় মানুষ রোকনুজ্জামান খান দাদাভাই

নেই। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথের কবিতার সেই দুটি বিখ্যাত লাইন মনে পড়ছে। বঙ্গবন্ধুর উদ্দেশ্যেই আজ সেই লাইন দুটি অন্তরের সব শ্রদ্ধা আর দরদ ঢেলে মনে মনে উচ্চারণ করছি :

"এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।"
চিরঞ্জীব বঙ্গবন্ধু, তোমাকে হাজারো সালাম।

লেখাটি বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত 'ধানশালিকের দেশ' পত্রিকা থেকে সংকলিত

জাগরূক

রণেশ দাশগুপ্ত

কখনো খুব কাছে থেকে কখনো বা দূর থেকে দেখা হত তবে
আবহ থেকেছে প্রায় একই রকম। রয়ে গেছে
চারদিকে মজুরের কৃষকের গণ-বিক্ষোভের
আবাহন ও ঝড়। আর যদি ঝড় দাঁড়িয়েছে থমকে কখনো তবু
ঘাটতি হয়নি আশাবাদ কিংবা প্রত্যয়ে ছাত্রসমাজে কবি
শিক্ষক ও শিল্পী সমাজে থেকে গেছে চাপা স্ফুলিঙ্গেরা।

ময়দানে দপ্তরে সমিতির চত্বরে কারাগারে তাই
পেয়েছি ভিড়ের মধ্যে কিংবা একা যদি একেবারে একান্তে
আবহ থেকেছে প্রায় একই রকম। প্রায় অদৃশ্য এবং
দৃশ্য গন্‌গনে লোকঅভ্যুত্থানে পিঠ রেখে দেখা হত
হত হাঁকডাক করে আলাপ।

ময়দানে দপ্তরে সমিতির চত্বরে কারাগারে
দলবাঁধা সমবেত বহু মতের বহু সাথীর মাঝখানে
সকলের যে-কোনো সময়ে একজন বলেই হয়তো বিশেষ একজন
বিপর্যয়ে কখনো বা প্রচণ্ড বিপদের হুমকির মুখে কিংবা
সাময়িক সাফল্যের আনন্দে সম-অংশীদার হতে রাজি তাই
মনে পড়বেই তাকে অন্য কোনো বিবেচনা না হয় বাদ দিলাম।

নারী ও পুরুষ নির্বিশেষে যেটা দরকার হয় যৌথ কাজে
সংগ্রামে এবং নিশ্চয় বিপ্লবের আয়োজনে। এই সূত্রে
বহু বহু বন্ধু ও বান্ধবীকে নানাভাবে বুঝাবার মাঝখানে
দেখেছি পূর্ব বাংলায় তথা বাংলাদেশে অবিশ্রান্ত লোকঅভ্যুদয় তাকে
ভাই ও বোনের মতো যেন খেলায় টেনেছে পেতে
কাণ্ডারী-রূপে একেবারে ঝঞ্ঝাকেন্দ্রে। দেখেছি তা
কখনো খুব কাছে থেকে কখনো দূর থেকে দেখেছি তাঁকেও
নিজে থেকে নেমে যেতে মুহূর্তে ঝড়ের মধ্যে নৌকা নিয়ে খরস্রোতে।

আটচল্লিশে বাহান্নতে চুয়ান্নতে বাষট্টিতে চৌষট্টিতে
ছেষট্টিতে আটষট্টিতে এবং ঊনসত্তরে ও একাত্তরে
কারাগারে কিংবা ময়দানে রাস্তায় অথবা ট্রেনে যেতে যেতে কোনো
গ্রাম্য রেল স্টেশনের জনসমাবেশে শোনা কথাবার্তা হাঁকডাক থেকে
বুঝতাম অন্তরের সৌহার্দ্য দরদ মমতাই তাঁর কাছে ছিল
নির্দেশ দেবার ছাড়পত্র মুহূর্তে কোটি কোটি হৃদয়ে জারি করার





সঙ্গে সঙ্গেই মনে হত এ ভাণ্ডার কোনোদিনই বাংলাদেশের
প্রাণ থাকতে খালি হতে পারে না কোন অবস্থাতেই কারণ
আসলে বাংলাদেশটাই দেখতে দেখতে চোখের সামনেই
উঠে আসছিল ভর করে দরদ সৌহার্দ্যে মমতায় ঘর ও বাহিরের ।

শেষাবধি হল তাই
সার্বভৌম স্বাধীন ও স্বতন্ত্র গণপ্রজাতন্ত্ররূপে
বাংলাদেশ উঠে এল
লাখো লাখো নারী ও পুরুষ মুক্তিসংগ্রামী শহীদের রক্তধারাকে আর
মাতা ভগ্নি বধূ কন্যাদের অশ্রুপ্রবাহকে
মুক্তিযুদ্ধে মহা গণ-আবেগপ্রবাহে যুক্ত করে ।

বিপ্লবের চার নীতি চার আদর্শকে–
সমাজতন্ত্র জাতীয়তা ধর্মনিরপেক্ষতা আর গণতন্ত্রকে
ভর করে এই ভাণ্ডারেই দুনিয়ার শ্রমজীবীদের
আন্তর্জাতিকতায় হাত রেখে জাতীয়তা এগিয়েছে ।

সময় লাগছে কাণ্ডারীকে শোকাবহভাবে
হারাবার পরে আরও বেশি করে ।
তবে সময় লাগলেও সময়কে জয় করা যাবে
সাক্ষী সার্বভৌম স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
কিভাবে উঠল কাণ্ডারীকে সামনে রেখে
লাখো শহীদের রক্ত বৃথা যায়নি তো ।
সময়কে জয় করা যাবে আজও
আজও অফুরন্ত রয়েছে কোটি কোটি হৃদয়ের ভাণ্ডারে আবেগ
সৌহার্দ্য মমতা আরও সেই সঙ্গে দরদ ।

সে তাগিদই নিয়ে জাগরূক কাণ্ডারীরা দেশে-দেশান্তরে
একান্তভাবে সাম্প্রতিক শহীদেরা লুমুম্বারা জাগরূক
যেমন জাগরূক সালভাদর আলেন্দে চিলিতে
ওলাফ পালমে সুইডেনে
সামোয়া মাচেল মোজাম্বিকে
বাংলাদেশে শেখ মুজিবুর ।

[সংক্ষেপিত]

থাকো, আরও কিছুদিন থাকো

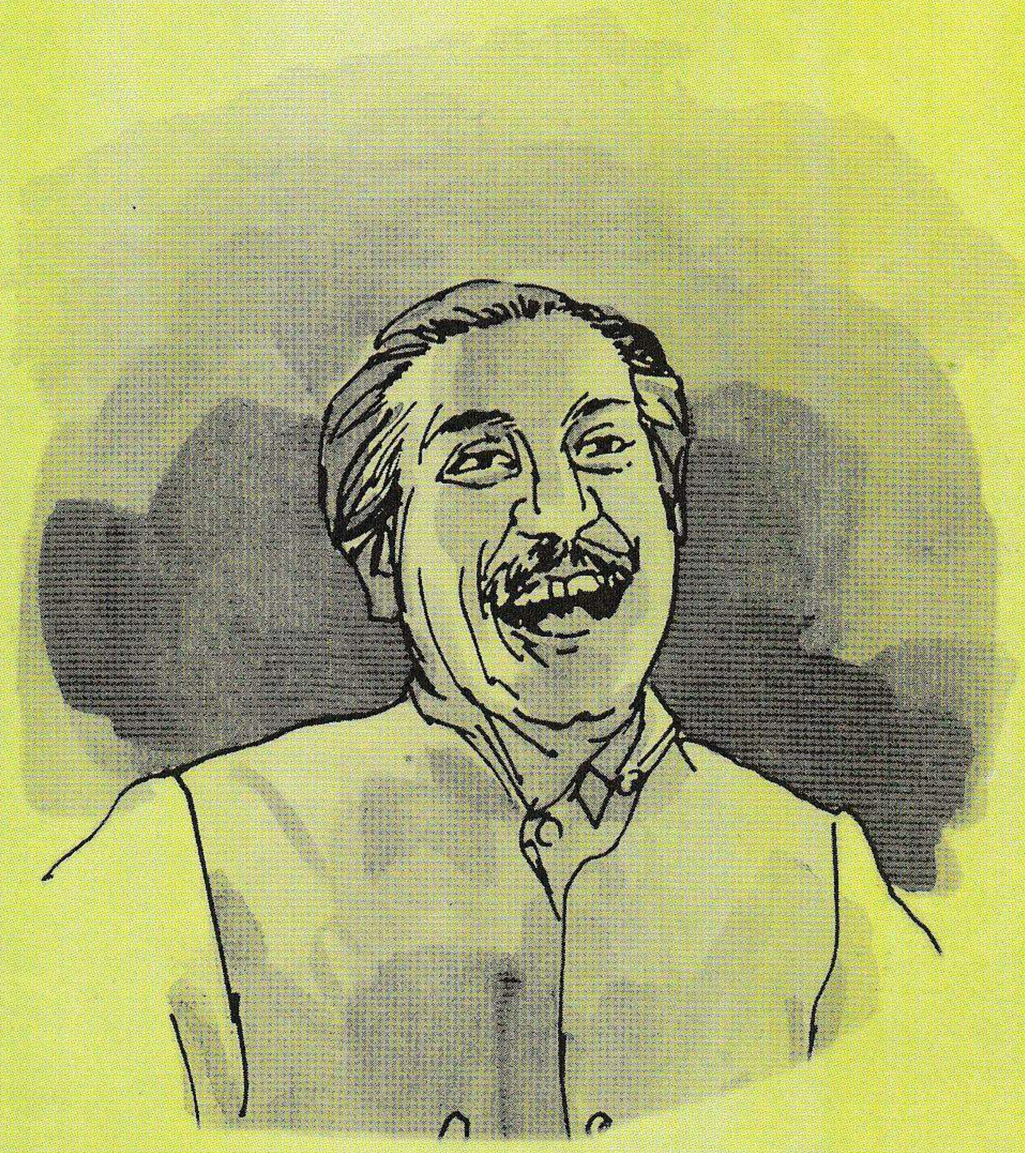
আবুল হোসেন

তোমাকে হারাতে পারি না এখনও
হে নায়ক, তুমি চলে যেতে পারো না ।
এমনি হঠাৎ হুট করে তুমি
চলে যাবে, ছিল এমন কি তাড়না?

তুমি তো কখনও আমাদের ছেড়ে
থাকোনি, যাওনি জলুসের আসনে,
তুমি চলে গেলে থাকবে কি আর,
থাকবে কি আর আমাদের জীবনে?

কার ডাকে গলা মেলাব আমরা
জ্বালব আগুন স্লোগানের মশালে,
হই হই করে ঘর ছেড়ে এসে
চুমু খাব বড় রাস্তার দু'গালে?

হাসতে হাসতে হাতকড়া পরে
জেলের সেলেই আস্তানা গাড়ব.
ঝড়ে পড়ে আর বন্যায় ভেসে
জীবনের মুখ দেখে তবে ছাড়ব?



বিশ্বাসে বুক ভরে দিয়ে পথ
কে আর দেখাবে দুস্তর রাত্রে?
কার হাতে হাত রেখে নির্ভয়ে
উঠে যাব খাড়া পাহাড়ের গাত্রে?

তোমাকে ছাড়তে পারি না এখনও,
হয়নি সময় তোমার যাওয়ার,
এখনও তোমার কাছে আমাদের
বাকি আছে ঢের চাওয়া-পাওয়ার ।

চিরকাল যদি না-ই থাকো, আরও
কিছুদিন থাকো আমাদের সঙ্গে,
দিয়ে যাও আলো আর কিছু গান,
হাসিখুশিহীন এ স্বাধীন বঙ্গে ।

মুজিব! মুজিব!

সৈয়দ শামসুল হক

মুজিব! মুজিব! আকাশের নীল কালো মেঘে ঢেকে যায়।
মুজিবের খুনে আকাশটা লাল আজো প্রতি সন্ধ্যায়।
মুজিব ছিল তো! মুজিব কোথায়! ভাঙে পাড় পদ্মায়।
ধানের সবুজে মুজিবের ঢেউ বাংলায় বহে যায়।
মুজিব এখনো ডাক দিয়ে যায় প্রতি জয় বাংলায়।
মুজিবের ধ্বনি বিজয়ের ধ্বনি ইতিহাস-পৃষ্ঠায়।
মুজিব! মুজিব! ডাক ভেঙে ওঠে ঘন সুর দোতারায়।
মুজিব! মুজিব! জেগে ওঠে ভোর রাত্রির সীমানায়।
মুজিব আছে তো তাই আজো মাঝি টান দেয় বৈঠায়।
মুজিবের সাথে বাড়ি ফেরে আজো যাত্রীরা নৌকায়।
বাড়িতে বাড়িতে বড় হয় শিশু ধূলিমাখা আঙিনায়।
মাঠে মাঠে আজো কৃষক মাটিতে বীজধান বুনে যায়।
আজো শ্রমিকেরা কারখানা কলে জাগে হাতুড়ির ঘায়।
মুজিব ছিলো তো! মুজিব এখনো! ওই তাঁকে দেখা যায়।
দেখা যায় ওই দিনের রৌদ্রে রাতের পূর্ণিমায়।
আঁধারের বুকে এখনো আঘাত মুজিবই তো করে যায়।
মুজিব মরে না, মরেনি মুজিব কোনো বুলেটের ঘায়।
বুলেটে পতিত দেহই কেবল, অমর সে আত্মায়।
মুছে ফ্যালো মিছে অশ্রু তোমার, আজো এই বাংলায়
কুটিরে পাথারে নগরে ও গ্রামে পায়ে পায়ে হেঁটে যায়–
অবিরাম হেঁটে চলেছে মুজিব রক্তচাদর গায়।
মুজিব! মুজিব! জনকের নাম এত সহজেই মোছা যায়!

এক যে আছে বাড়ি

শামসুর রাহমান

এক যে আছে বাড়ি আমাদের এই ঢাকা শহরেই। কোনো প্রাসাদ নয়। এখানে কখনো হাতিশালে হাতি ছিল না, ছিল না ঘোড়াশালে ঘোড়া। আর দশটি বাড়ির মতোই সাধারণ এক বাড়ি। কিন্তু এই সাধারণ বাড়িতেই একদা বাস করতেন একজন অসাধারণ মানুষ। নাম তাঁর শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি জন্মেছিলেন টুঙ্গিপাড়া নামে এক পাড়াগাঁয়। সেখানে কেটেছে তাঁর ছেলেবেলা। গাঁয়ের পুকুরে সাঁতার কেটেছেন, হেঁটে বেড়িয়েছেন সবুজ ঘাস-ঢাকা মাঠে, দুচোখ ভরে দেখেছেন পাখপাখালির ওড়াউড়ি। বালক মুজিব খেলায় মেতেছেন ছেলেদের সঙ্গে। বালক বয়সেই তাঁর সঙ্গীরা তাঁকে দলপতি হিসেবে মেনে নিয়েছিল। ছেলেবেলায় পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে ভাবতেন সেসব মানুষের কথা, যারা খেত-খামারে কাজ করে, সারাদিন বোঝা বয়ে কোনোমতে খেয়ে-পরে বাঁচে। এদের-দুঃখকষ্ট তাঁকে খুব নাড়া দিত।

একদিন পড়াশোনা করার জন্যে তিনি চলে এলেন বড় শহরে। গরিবদের দুঃখকষ্ট দূর করতে হবে, এই শপথ তিনি নিয়েছিলেন মনে-মনে। তিনি জানতেন, শপথ নিলেই চলে না, কাজও করতে হয় মনপ্রাণ দিয়ে। এজন্যেই তিনি জড়িয়ে গেলেন রাজনীতিতে। যখন ইংরেজরা আমাদের দেশ শাসন করত তখনই রাজনীতিতে শেখ মুজিবের হাতেখড়ি। বড় বড় নেতাদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। তিনি খুব কাছ থেকে দেখেছেন তাঁদের। এই ধরো, শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক, মওলানা ভাসানী, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী– তাঁদের স্নেহের ছায়া পেয়েছিলেন শেখ মুজিব। এই নেতাদের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি কিছু কিছু জিনিস শিখে নিয়েছিলেন। পরে এগুলো তাঁর কাজে লেগেছিল। একদিন তিনি নিজেই হয়ে উঠলেন খুব বড় মাপের এক নেতা।

ভারত ভেঙে ভাগ হওয়ার ফলে পাকিস্তানের জন্ম হয়। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ পর্যন্ত আমাদের দেশ পাকিস্তানেরই অংশ ছিল। কিন্তু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৭ই মার্চের বিরাট জনসভায় স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। হ্যাঁ, এতদিনে শেখ মুজিব এ দেশের মানুষের কাছে বঙ্গবন্ধু হয়ে গেছেন। দেশের মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর জন্যে তাঁকে সইতে হয়েছে পাকিস্তানি শাসকদের অনেক জেলজুলুম। বারবার তাঁকে জেলে পাঠানো হয়েছে, ফাঁসি দেয়ার ষড়যন্ত্র করা হয়েছে। কিন্তু জনগণের নেতা মুক্তি পেয়েছেন জনগণেরই প্রতিবাদ ও লড়াইয়ের ফলে। বঙ্গবন্ধু এ দেশের মানুষের মনে স্বাধীনতার আলো জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। ফলে পাকিস্তানের দাসত্বের শেকল ছিঁড়ে ফেলে আমরা হলাম মুক্ত। জন্ম হল স্বাধীন বাংলাদেশের। যুদ্ধে ছেঁড়া-খোঁড়া স্বাধীন বাংলাদেশের হাল ধরলেন শেখ মুজিব। নানা সমস্যার মুখোমুখি দেশটিকে চালানোর চেষ্টা করলেন তিনি তাঁর সাধ্যমতো। কিন্তু অনেকে বাধা তৈরি করল নানা অছিলায়। যারা স্বাধীন বাংলাদেশ চায়নি, মনের ভেতর পাকিস্তানকেই জাগিয়ে রেখেছিল, তারা মেতে উঠল ষড়যন্ত্রে।

ধানমণ্ডির ৩২ নম্বর সড়কের ১০ নম্বর বাড়িতেই শেখ মুজিবুর রহমান থাকতেন। একটি সাধারণ বাড়িতে একজন সাধারণ মানুষের মতোই বাস করতেন তিনি। আমরা ভুলেই গিয়েছিলাম যে, বাড়িটির নম্বর দশ। আসলে সড়কের নম্বরই আমাদের কাছে হয়ে গিয়েছিল বঙ্গবন্ধুর নিজের বাড়ির নম্বর। সবার কাছে ধানমণ্ডির ৩২ নম্বরই হল শেখ মুজিবের বাড়ি। এই অসামান্য নেতার জন্যে ৩২ নম্বরের এই বাড়িটি হয়ে উঠেছিল সকল বাঙালির গন্তব্য। বিদেশিরাও এই বাড়িটিকে বাংলাদেশের কেন্দ্রবিন্দু বলে মনে করত।

যিনি এ দেশের মানুষের জন্যে জীবনের বহু বছর কাটিয়েছেন জেলে, নিজের আরাম-আয়েশের জন্যে খেয়াল করেননি কোনোদিন; যিনি তাঁর ত্যাগ ও আপোসহীন সংগ্রামের জন্যে জাতির জনকে পরিণত হয়েছিলেন, তাঁকে এই বাড়িতেই



কয়েকজন বিবেকহীন ষড়যন্ত্রকারী হঠাৎ হামলা করে খুন করে। বুলেটের বৃষ্টিতে ঝাঁঝরা করে তাঁর বুক। সেই রক্তপিপাসু ঘাতকেরা নারীদেরও রেহাই দেয়নি। শেখ মুজিবের শিশুপুত্র রাসেলকে খুন করতেও ওদের হাত কাঁপেনি।

এখন বত্রিশ নম্বরের সেই সাধারণ বাড়িটি বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর। যদি তোমরা কোনোদিন এই স্মৃতি জাদুঘরে যাও তাহলে দেখবে, এখনো সাধারণ বাড়িটার গায়ে লেগে আছে বুলেটের দাগ, রক্তের ছোপ। তোমরা আরো অনেক কিছু দেখতে পাবে। কিছু আসবাবপত্র। খাট, ড্রেসিং টেবিল, চেয়ার। আর তোমাদের চোখে পড়বে কয়েকটি ছবি। আলমারি ভরা বইও দেখবে তোমরা। এসব বই পড়তেন সেই লম্বা, সুদর্শন পুরুষটি, যাকে ভালোবাসতো এদেশের সাধারণ মানুষ, যাকে ওরা ডাকত শেখ সাহেব বলে। সাধারণ বাড়ির এই অসাধারণ মানুষটির কিছু সাধারণ, পুরানো কাপড়চোপড় রাখা আছে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরে। শিশু রাসেল যে ছোট্ট সাইকেলটি চালাত হাসিমুখে, সেটি খাঁখাঁ দাঁড়িয়ে আছে এক কোণে। কেউ আর সেই শূন্য আসন পূর্ণ করবে না। পায়রার ঘরও আছে। বঙ্গবন্ধু পায়রা খুব পছন্দ করতেন। নিজে দেখাশোনা করতেন ওদের, খাবার খেতে দিতেন নিজের হাতে। পায়রার খোপগুলো খালি পড়ে রয়েছে একুশ বছর ধরে। না, এখানে আর কোনো পায়রা থাকবে না, খাবার খুঁটে খাবে না।

বত্রিশ নম্বরের বাড়িতে পা রাখলেই মন কেমন করে। ভারি উদাস লাগে। মনে হয় বুকের ভেতর ঝিমানো দুপুর আর থেমে থেমে ঘুঘুর ডাক। সেই বাড়িতে আস্তে চলাফেরা করলেই যেন মানায়। অনেকে ঘুমিয়ে রয়েছেন সেখানে, মনে হয় একটু শব্দ করলেই যেন ওরা জেগে উঠবেন। তাঁদের ঘুম ভাঙানো কি উচিত? যদি যাও, আস্তে সুস্থে পা ফেলো সিঁড়িতে, সেখানেই তো খুনিদের গুলি খেয়ে পড়ে গিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু।

অবশ্যই তোমরা যাবে বত্রিশ নম্বরের বাড়িতে। সেটি কোনো রাজরাজড়ার প্রাসাদ নয়, নয় কোনো জমিদারের ভবন। সেখানে হাতিশালে হাতি নেই, নেই ঘোড়াশালে কোনো ঘোড়া। তবে আছে ইতিহাস, বাংলাদেশের ইতিহাসের একটি বিরাট অংশ। তাই তোমাদের সবাইকে যেতে হবে সেখানে। সেই ইতিহাসকে মুছে ফেলতে চেয়েছিল কয়েকজন ঘৃণ্য ঘাতক। পেরেছে কি? পারেনি। যত চেষ্টাই করুক, কেউ কোনোদিন পারবে না।

তোমাদের কাছে আমার একটি প্রশ্ন, তোমরা কি কোনোদিন ক্ষমা করতে পারবে শেখ মুজিবের হত্যাকারীদের? রাসেলের ঘাতকদের? এই প্রশ্ন বত্রিশ নম্বরের সেই মাথা-তুলে-দাঁড়ানো সাধারণ বাড়িটারও।

আবু হাসান শাহ্‌রিয়ার সম্পাদিত 'চোখের আলোয় দেখেছিলেম' গ্রন্থ থেকে সংকলিত

১৯৯৬

ধন্য সেই পুরুষ

শামসুর রাহমান

ধন্য সেই পুরুষ যাঁর নামের উপর
পতাকার মতো
দুলতে থাকে স্বাধীনতা,
ধন্য সেই পুরুষ যাঁর নামের উপর ঝরে
মুক্তিযোদ্ধাদের জয়ধ্বনি।

স্বৈরাচারের মাথায় মুকুট পরাচ্ছে
ফেরেব্বাজের দল।
দেখ, প্রত্যেকটি মানুষের মাথা
তোমার হাঁটুর চেয়ে এক তিল উঁচুতে
উঠতে পারছে না কিছুতেই।

(অংশবিশেষ)

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি

কে. এম. সোবহান

বিবিসি'র জরিপের উপর বাংলাদেশের জনগণ নির্ভর করেনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বলতে। যেকোনো সমাবেশে একজন বাঙালি বঙ্গবন্ধুকে এই কথা বলে তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করে নিজেদের গর্বিত মনে করেছে। অনেকে তাঁকে শেখ সাহেব বলে থাকেন– যেমন করে অন্য যেকোনো অপরিচিত ব্যক্তি সম্বন্ধে বলা হয়। ভারতের কোনো নাগরিক কি মহাত্মা গান্ধীকে গান্ধী বাবু বলে বা পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুকে জওহরলাল বাবু বলে সম্বোধন করবেন– তা তিনি যে মতাবলম্বীই হোন না কেন! নেতাজী সুভাষ বসুকে কি কেউ সুভাষ বাবু বলে সম্বোধন করেন? করেন না। যদি কেউ করেনও তাহলে তার মধ্যে আত্মম্ভরিতা অসীম। জিন্নাহ সাহেব কোনোদিন গান্ধীকে মহাত্মা বলে উল্লেখ করেন নাই। তিনি বলতেন মিঃ গান্ধী। জিন্নাহ সাহেব গান্ধীজীর সমসাময়িক ছিলেন এবং রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীও ছিলেন; তাঁর পক্ষে মিঃ গান্ধী বলার অর্থ অন্যরকম। এ ডাকের মধ্যে সমকক্ষতা আছে। কিন্তু বাংলাদেশের একজন বাঙালির মুখে বঙ্গবন্ধুকে শেখ সাহেব সম্বোধনের মধ্যে একটা অর্বাচীনতার ভাব থাকে। এরা বঙ্গবন্ধুকে জাতির পিতা বলে মানতে বা বাংলাদেশের স্থপতি বলে স্বীকার করতে দ্বিধান্বিত হয়। দ্বিধান্বিত হয় এই কারণে যে, তারা জিন্নাহ সাহেবকে কায়েদে আজম বলে গর্ব বোধ করে, লিয়াকত আলীকে কায়েদে মিল্লাত বলতে অহঙ্কার বোধ করে। এরা স্বাধীন বাংলাদেশে বাস করে এখানকার অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা সুদৃঢ় করলেও পাকিস্তানের মোহ কাটেনি। যেমন মহাকবি মাইকেল মধুসূদন ইংল্যান্ডের স্বপ্ন দেখতেন। তাঁর সে মোহ কেটেছিল এবং গর্বের সঙ্গে লিখেছিলেন: "হে বঙ্গ! ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন/ তা সবে অবোধ আমি অবহেলা করি..." তবে তিনি ছিলেন মহাকবি। আর যারা শেখ সাহেব বলেন তারা নেহাতই সাধারণ। ১৯৭৩-এর আলজিয়ার্সে ন্যাম সম্মেলনে ফিদেল ক্যাস্ট্রো বঙ্গবন্ধুকে বলেছিলেন: "আমি হিমালয় দেখিনি, তবে শেখ মুজিবকে দেখেছি।"

বঙ্গবন্ধুকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বলাতে কোনো রাজনৈতিক দল অত্যন্ত খাটো বোধ করেছে, পরাজিত মনে করেছে। তারা ভীষণ ক্ষুব্ধ। বিবিসি শ্রোতাদের কাছে জানতে চেয়েছিল সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি কে? শ্রোতাদের মধ্য থেকে নানা জনে নানা জনকে সেই ব্যক্তি মনে করেছিলেন। সেই মনে করার মধ্যে যেমন ছিলেন তিতুমীর, তেমনি ছিলেন অমর্ত্য সেন। ড. শহীদুল্লাহ্ ছিলেন, তার সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দও ছিলেন। বৌদ্ধধর্মের সাধক অতীশ দীপংকর ছিলেন, তার সঙ্গে জগদীশচন্দ্র বসুও ছিলেন। ছিল না কেবল বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য যিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধ করে দেশকে স্বল্পকালের জন্যও স্বাধীন করেছিলেন, ফাঁসির মঞ্চে যিনি জীবনের জয়গান গেয়েছিলেন সেই মাস্টারদা সূর্যসেনের নাম। জরিপে উল্লেখজনক স্থানে আসেনি। কোটি কোটি বাঙালির মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের স্থান করেছেন নেতাজী সুভাষ।

উপরের দিকে উঠে এসেছে– তৃতীয় সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠর আসন অলংকৃত করেছেন জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম। সেইভাবে কবিগুরু এসেছেন দ্বিতীয় আসনে। কিন্তু শ্রেষ্ঠত্বের শিখরে এসেছেন বাঙালির

স্বাধীনতা যিনি এনেছেন। বাংলাদেশকে সার্বভৌম রাষ্ট্রের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন, যাকে জাতিসংঘ স্বীকৃতি দিয়েছে। এই আসনের দাবি বঙ্গবন্ধু ছাড়া আর কারোরই নয়।

সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালির আসনে বিবিসির শ্রোতৃমণ্ডলীর নির্বাচন দেশ স্বাধীন হওয়ার পর একটি সত্যের সঙ্গে তাঁরা একমত হয়েছেন। সর্বশ্রেষ্ঠ হওয়ার পেছনে আছে গণতন্ত্রের জন্য বাংলাদেশের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের সংগ্রাম এবং সর্বশেষ মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বের অবদান। পাকিস্তান সরকারের ২৪ বছর শাসনকালে বঙ্গবন্ধুকে ১৮বার কারাগারে বন্দি রাখা হয়েছে। তাঁর এই বন্দিত্বের সময়সীমা ১২ বছরেরও অধিক। এই বন্দিত্বের সূত্রপাত হয় তাঁর ছাত্রাবস্থা থেকেই। সেই সংগ্রামকালে তিনি একবার রাষ্ট্রদ্রোহিতার (আগরতলা ষড়যন্ত্র) মামলায় প্রাণদণ্ডের আদেশের আগেই গণঅভ্যুত্থানের ফলে যে ট্রাইবুনালে বিচার হচ্ছিল তা বাতিল হল। এই ট্রাইবুনালে তিনজন সদস্যের মধ্যে দু'জন ছিলেন বাঙালি বিচারপতি। তার মধ্যে একজন বিচারপতি মকসুমুল হাকিম বিএনপির উপদেষ্টামণ্ডলীর সঙ্গে সম্পৃক্ত। অপর সদস্য ছিলেন প্রয়াত বিচারপতি মুজিবর রহমান।

এই গণঅভ্যুত্থানে সদ্য কারামুক্ত শেখ মুজিবুর রহমানকে বাংলাদেশের ছাত্রসমাজ একবাক্যে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করেন। এ উপাধি দেওয়া হয়েছিল রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা বিচারের জন্যে। ছাত্রদের সেই বিশাল সভায় তাঁকে উপাধি দিতে কারও দ্বিমত ছিল না। সেদিন থেকে বাংলাদেশের জনগণ তাঁকে 'বঙ্গবন্ধু'ই বলে। কিন্তু এদেশের কেউ কেউ 'বঙ্গবন্ধু' বলতে কুণ্ঠাবোধ করেন।

দ্বিতীয়বার তাঁর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগের কারণ ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে ১০ লক্ষাধিক জনসমুদ্রে 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' ঘোষণার জন্যে। এই সমাবেশে বাংলাদেশের 'ডি ফ্যাক্টো' স্বাধীনতা ঘোষণা করেন তিনি। সেদিন থেকে পূর্ব পাকিস্তান সরকার পরিচালিত হয়েছে বঙ্গবন্ধুর আদেশে এবং তাঁর জারি করা আদেশক্রমে। ৭ মার্চ থেকে ২৬ মার্চ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান সরকার বাংলাদেশ সরকার হয়ে গিয়েছিল, যার প্রধান ছিলেন বঙ্গবন্ধু। এই স্বাধীন সত্তার কথা স্বীকৃত হয়েছিল পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট

১৯৭৩-এ আলজিয়ার্সে ন্যাম সম্মেলনে ফিদেল ক্যাস্ট্রো বঙ্গবন্ধুকে বলেছিলেন: "আমি হিমালয় দেখিনি, তবে শেখ মুজিবকে দেখেছি।"

এবং প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জে: ইয়াহিয়া খানের ২৬ মার্চ জাতির উদ্দেশে দেওয়া এক ভাষণে। সেই ভাষণে তিনি বলেছিলেন: 'শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রদ্রোহী। সে পাকিস্তানের পতাকার অবমাননা করেছে, জাতির পিতার প্রতিকৃতিকে অপবিত্র করেছে। এমন কি ঢাকায় আমার উপস্থিতি সত্ত্বেও তিন সপ্তাহ ধরে একটি সমান্তরাল সরকার পরিচালনা করেছে। এই অপরাধের জন্য এবার তাকে শাস্তি পেতেই হবে।' 'ডি ফ্যাক্টো' স্বাধীনতা ঘোষণা এবং সেই স্বাধীন সরকার পরিচালনার জন্যে পাকিস্তানের স্পেশাল ট্রাইবুনালে তাঁর বিচার হয় এবং প্রাণদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর বিচার এবং মুক্তিযুদ্ধ তাঁর নামে পরিচালিত হওয়ায় বিশ্বের স্বাধীনতাকামী শক্তিগুলো পাকিস্তানের কাছে প্রতিবাদ পাঠায় এবং তাঁর মুক্তি দাবি করে। এর মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিবাদ ছিল কঠোর। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, যা পরিচালিত হচ্ছিল বঙ্গবন্ধুর নামে, তাকে গণচীন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া আর সব গুরুত্বপূর্ণ দেশই সমর্থন জানিয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধ বঙ্গবন্ধুর নামে পরিচালিত হয়েছিল, তার কারণে ১০ এপ্রিল ১৯৭১ স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র লেখা হয়। ১৭ এপ্রিল মুজিবনগরে (যার পূর্বনাম বৈদ্যনাথতলা ছিল) ১০ হাজারের এক জনসমাবেশে, যার মধ্যে শতাধিক বিদেশি সাংবাদিক ছিলেন, সেখানে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণাপত্র পাঠ করা হয়। এই ঘোষণাপত্র বাংলাদেশের সাংবিধানিক দলিল। ঘোষণাপত্র পাঠ শেষে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয় এবং সরকারের কর্মকর্তাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয় জনগণের সঙ্গে। এই সরকারের প্রধান নির্বাচিত হন ১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচনে বিশাল ভোটে জয়ী আওয়ামী লীগ-

প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর অনুপস্থিতিতে সৈয়দ নজরুল ইসলাম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন এবং তাজউদ্দীন আহমদ প্রধানমন্ত্রী হন। স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার-প্রধানের নামে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়েছিল। তাঁর গ্রেফতার ও বিচার অবৈধ ছিল। তার কারণ, ২৬ মার্চ ১৯৭১ তাঁকে হানাদার পাকিস্তান বাহিনী গ্রেফতার করার আগে তিনি বিশ্বের কাছে এক বার্তায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার কথা বলেন এবং জানান, পাকিস্তান হানাদার বাহিনী বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গা আক্রমণ করেছে এবং বাংলাদেশের জনগণ তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করছে। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে গ্রেফতারকৃত বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান এবং সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ককে জেনেভা কনভেনশন অনুযায়ী বিচার করার কথা।

যে জননেতা দেশ স্বাধীন করার জন্য দু'বার প্রাণদণ্ডের অপরাধে বিচারের সম্মুখীন, যে নেতা পাকিস্তান সরকারের প্রধানের উপস্থিতিতে তাঁর ঘোষিত স্বাধীন রাষ্ট্র পরিচালনা করেন, সে জননেতা ইতিহাসের এক অনন্যসাধারণ নায়ক। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব হেনরি কিসিঞ্জার বঙ্গবন্ধুর উপর ভীষণ অসন্তুষ্ট ছিলেন। বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে তার আরোপিত বিশেষণ আর জে: ইয়াহিয়ার দেওয়া বিশেষণের অর্থ একই। পার্থক্য যা তা হচ্ছে ক্রুদ্ধ এক পরিশীলিত মন্ত্রীর ভাষা; আর অন্যটি এক ক্রুদ্ধ মাতাল সামরিক বাহিনীর প্রধানের ভাষা।

বিবিসি ওয়ার্ল্ড সার্ভিস এরকম জরিপ চালিয়েছিল– সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রিটন কে? এই জরিপে স্যার আইজ্যাক নিউটন প্রথম হন ২১.৪% জনমতে, দ্বিতীয় স্থানে স্যার উইনস্টন চার্চিল পান ১৭%, প্রিন্সেস ডায়ানা পান ১৩% এবং শেক্সপিয়রের স্থান ছিল চতুর্থ। বিবিসি হোম সার্ভিসে আগস্ট ২০০৩ ঐ একই ব্যক্তিত্বের জরিপে প্রথম ব্রিটন উইনস্টন চার্চিল, শেক্সপিয়র ছিলেন তৃতীয় স্থানে। বিবিসি'র নভেম্বর ২০০২ সালের এক জরিপে, যাতে ১০ লক্ষ শ্রোতা অংশগ্রহণ করেন, তাতে চার্চিল প্রথম স্থানে, শেক্সপিয়র পঞ্চম স্থানে, এবং রানী প্রথম এলিজাবেথ অষ্টম স্থান পান। সর্বশ্রেষ্ঠ আরবীয়ের যে জরিপ বিবিসি চালিয়েছিল, তাতে প্রথম স্থানে আসেন ওসামা বিন লাদেন, দ্বিতীয় স্থানে আসেন সাদ্দাম হোসেন। জেড ডি এফ জার্মানিতে নভেম্বর ২০০৩ সালে এক জরিপ চালায়– শ্রেষ্ঠ জার্মান কে? এতে ৩০ লক্ষ জার্মান অংশ নেয়। প্রথম স্থান পান যুদ্ধোত্তর প্রথম চ্যান্সেলর কনরাড আডেনয়ার, দ্বিতীয় স্থানে কার্ল মার্কস, আলবার্ট আইনস্টাইন তৃতীয় এবং ব্যোয়েটে চতুর্থ স্থান পান।

এইসব বিভিন্ন জরিপে দেখা যায়, জনমত সবসময়ে গেছে রাজনৈতিক জননেতার দিকে। কালজয়ী সাহিত্যিক কবি তৃতীয়, চতুর্থ বা পঞ্চম স্থান অধিকার করেছেন। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বিবিসি'র জরিপে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দ্বিতীয় স্থানে নির্বাচিত করার জন্যে অনেকে বিস্মিত, কেউ বা ক্ষুব্ধ হয়েছেন। এই জরিপ চালানো হয়েছে বিবিসি'র বিশ্বব্যাপী বাংলা শ্রোতাদের মধ্যে। বিবিসি'র নিজস্ব করণীয় কি ছিল এই নির্বাচনে তা জানা নেই। সম্ভবত বিবিসি জনমতের সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে এই ফলাফল প্রকাশ করেছে।

বিবিসি যখন শ্রোতাদের কাছ থেকে পাঁচটি নাম পাঠানোর জন্যে ঘোষণা করছিল প্রতিদিন তাদের বাংলা খবরের সময়, তখন অনেকে আশ্চর্য হয়েছিলেন– বিবিসি নাম পাঠাবার ঠিকানা দিতে অত্যন্ত কুণ্ঠিত ছিল। সকাল সাড়ে ছয়টা এবং সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার খবরের মাঝে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালির নামের জন্যে আহ্বান জানালেও তাদের টেলিফোন নাম্বার, পোস্টাল ঠিকানা বা ই-মেল ঠিকানা জানাতে অত্যন্ত কার্পণ্য করেছে। হয়ত দু'একদিন এসব ঠিকানা দিয়েছে, কিন্তু শতকরা ১০ দিন এ ঠিকানা বলেছে কিনা তাতে সন্দেহ আছে।

যারা বিস্মিত বা ক্ষুব্ধ হয়েছেন তাঁরা অকারণেই এই মনোভাব পোষণ করেছেন। কবিগুরুও সোনার বাংলাকে ভালবেসেছেন, কিন্তু তিনি পরাধীন সোনার বাংলাকে ভালবেসেছেন। তিনি স্বাধীনতার কামনায় অনেক কবিতা লিখেছেন। তিনি ভারতের স্বাধীনতার কথা বলেছেন। তাঁর মেধা-মনন-প্রতিভার অসামান্যতার ছাপ তিনি রেখে গেছেন শুধু ভারতেই নয়– সারা বিশ্বে। সে ছাপ রেখে ভারতীয়দের সম্মানের আসনে বসিয়েছেন এবং বিশেষ করে বাঙালি জাতিকে বিশ্ব-দরবারে পরিচিত করেছেন। স্বাধীনতার আন্দোলনের প্রতি তাঁর সহানুভূতি ও একাত্মতা অবিস্মরণীয়। জালিয়ানওয়ালাবাগে নিরস্ত্র সমাবেশকারীদের জে: ডায়ারের সৈন্যরা গুলি করে হত্যা করেছিল। তার প্রতিবাদে তিনি তাঁর নাইট উপাধি পরিত্যাগ করেন। এতে কতবড় সম্মান তিনি

আন্দোলনকারীদের দেখিয়েছিলেন তার সাক্ষী থাকবে ইতিহাস। তিনি নিশ্চয়ই চেয়েছিলেন তাঁর সোনার বাংলা স্বাধীন সার্বভৌম হোক। তাঁর এই চাওয়াকে বাস্তবে পরিণত করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। কবিগুরুর সোনার বাংলাকে স্বাধীন করতে গিয়ে বঙ্গবন্ধুর ত্যাগ-তিতিক্ষার কথা বিশ্ববাসী জানেন। ইতিহাস যতই বিকৃত করার প্রচেষ্টা হোক না কেন, তাঁর অবদান বিশ্ববাসী কোনোদিন ভুলবে না; তিনি ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন কবিগুরুর মতোই। একজন চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন তাঁর কবি-প্রতিভার জন্যে, আর একজন চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন কবিগুরুর স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করার জন্যে। কবিগুরুর স্বপ্নের সোনার বাংলাকে বঙ্গবন্ধু কবিগুরুর মতোই বিশ্ব-দরবারে এক বিশিষ্ট স্থানে স্থাপন করেছেন। বঙ্গবন্ধু কবিগুরুর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেই তাঁর লেখা 'আমার সোনার বাংলা'-কে জাতীয় সঙ্গীত করেছেন। বঙ্গবন্ধু বাংলা ভাষাকে বাংলাদেশের মতোই বিশ্বদরবারে প্রতিষ্ঠিত করেছেন জাতিসংঘে বাংলায় ভাষণ দিয়ে। বাংলা ভাষা আজ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত।

২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালন করার জন্যে নির্দেশ দিয়েছে জাতিসংঘ। এই বাংলা ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর অসামান্য অবদান আছে। ১৯৪৮-এর ১১ মার্চ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গ্রহণ করার দাবির জন্যে প্রথম যেসব ছাত্রনেতা গ্রেফতার হন, বঙ্গবন্ধু তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছাত্রনেতা ছিলেন। জেলের মধ্যে থেকে বাধ্য হয়ে ছাত্রনেতাদের কাছে চুক্তিনামা দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দিন। এই চুক্তিনামা অনুমোদন যারা করেন তাঁদের অন্যতম ছিলেন বঙ্গবন্ধু। এই চুক্তিনামা করে প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দিন তাঁর প্রধানমন্ত্রিত্ব রক্ষা করেছিলেন। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে এই চুক্তিনামার অন্যতম শর্ত অনুযায়ী ছাত্রনেতাদের মুক্তি দেওয়া হয়। কিন্তু বঙ্গবন্ধু কারাগার থেকে বের হতে অস্বীকার করেন– যতক্ষণ না সমস্ত রাজবন্দিদের জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দিন বাধ্য হয়েছিলেন সে শর্ত মেনে নিতে। সে সময় দুই কমিউনিস্ট নেতা রনেশ দাশগুপ্ত ও ধরণী রায় রাজবন্দি হিসেবে আটক ছিলেন জেলে।

বঙ্গবন্ধু নিজে কবিগুরুকে অন্য সকল বাঙালির মতোই শ্রদ্ধা করতেন। শ্রদ্ধা করতেন কবিগুরুর বাঙালিকে বিশ্বে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে স্থাপন করার জন্যে। ভারতের স্বাধীনতার

বঙ্গবন্ধু বাংলা ভাষাকে বাংলাদেশের মতোই বিশ্ব-দরবারে প্রতিষ্ঠিত করেছেন জাতিসংঘে বাংলায় ভাষণ দিয়ে। বাংলা ভাষা আজ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত।

কথা যখন কবিগুরু বলতেন তখন ভারত অখণ্ড ছিল, কাজেই আলাদা বাংলার স্বাধীনতার কথা তখন উঠতই না। তার মধ্যেও সোনার বাংলাকেই তিনি ভালবেসে গেছেন, সোনার বাংলার মাহাত্ম্য রচনায় তাঁর সকল প্রতিভা নিয়োগ করেছেন। কল্পনা করা যায়, কবিগুরুর জীবদ্দশায় যদি বাংলাদেশ স্বাধীন হত তাহলে স্বাধীনতার নায়ককে তিনি কী ভাষায় বরণ করতেন! তিনি যখন লিখেছিলেন– 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য উচ্চ যেথা শির, জ্ঞান যেথা মুক্ত,... নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি পিতঃ, ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত।'– তখন ভারত পরাধীন ছিল। ভারতের স্বাধীনতার চব্বিশ বছর পর সোনার বাংলাকে 'সেই স্বর্গে জাগরিত' করেছিলেন বঙ্গবন্ধু। অনাগত বঙ্গবন্ধুর জন্য প্রার্থনা করেছিলেন তাঁর স্বপ্ন সার্থক করার জন্য। বঙ্গবন্ধু এক ভাষণে কবিগুরুর 'সাত কোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননী! রেখেছ বাঙালি করে মানুষ করনি'– এই লাইন দুটি উচ্চারণ করেন। 'মানুষ করনি'– বলতে কবিগুরু নিশ্চয়ই স্বাধীন মানুষের কথা বলেছেন। কারণ 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়।' বঙ্গবন্ধু সেই বাঙালির জন্যে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সেই দেশের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তির জরিপ করেছেন। এই জরিপে দেখা গেছে, জন-মানুষ অগ্রাধিকার দিয়েছে স্বাধীনতার জয়-সূর্য যিনি এনেছেন তাঁকে। এর অর্থ এই নয় যে, কবি-সাহিত্যিক, জ্ঞানী-গুণী প্রমুখ কোনো অংশে কম। স্বাধীনতাহীনতায় কেউ বাঁচতে চায় না। তাই স্বাধীনতা যিনি আনেন তিনিই পান অগ্রাধিকার, তিনিই হন জাতির পিতা– যেমন: ভারতের গান্ধীজী, সোভিয়েত ইউনিয়নের লেনিন, নব্য চীনের মাও সে তুং, ভিয়েতনামের হো চি মিন, দক্ষিণ আফ্রিকার নেলসন ম্যান্ডেলা, আমেরিকার আব্রাহাম লিংকন।

জনকের সন্ধানে

মুস্তাফা নূরউল ইসলাম

বিরল ভাগ্য বলে মানি আমরা, যারা বাংলার মুখ দেখেছিলাম। তারপর প্রেমে ভালোবাসায়, কী এক মরণজয়ী প্রেরণায় উদ্দীপিত হয়ে উঠেছিলাম ঐ বাংলার জন্যে। পুনরায় বলি যে, অভিশপ্ত আমরা বাংলার মুখকে নিহত হতে দেখেছিলাম। অন্ধকারকে বর্ম করে বেরিয়ে এসেছিল হত্যাকারী কুৎসিত পাপ– সংখ্যায় ক'জন ছিল ওরা? পেছনকার ষড়যন্ত্র শক্তি, দেশি-বিদেশি, সেটাই বা কত বৃহৎ, অমিতধর ছিল যে শতাব্দীর সেই মহানায়ককে সবংশে নিহত করা গিয়েছিল? কে? হত্যাকারী চক্র মূলত ওরা কারা?

এইসব ইতিহাসের জিজ্ঞাসা। চলমান ঘটনাপুঞ্জের কার্যকারণ উদঘাটনে উৎসুক জনের অনুসন্ধানের বিষয়। আর ঐ ইতিহাসেরই স্বার্থে সে কর্মসাধন অবশ্য প্রয়োজন।

কিন্তু আমরা যারা সেই বাংলার সন্তান, কী জবাব রয়েছে আমাদের– আমরা যে বাংলার মুখকে অমনভাবে ভালবেসেছিলাম এবং কোটি স্বদেশেবাসীর শৃঙ্খল মুক্তির লক্ষ্যে দুর্জয় প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়েছিলাম আটষট্টিতে-ঊনসত্তরে-সত্তরে-একাত্তরে? পঁচাত্তরে আগস্টের কালরাত্রিতে সংঘটিত হল মহাকালের সবচাইতে মর্মন্তুদ মহাপাতক। পিতৃহত্যার মহাপাতক। কী জবাব রয়েছে আমাদের? সন্তান আমরা, কথাটি বলিনি। বিমূঢ় বিস্ময়ে উপরন্তু দেখলাম কারা কারা আপোস করে নিয়েছিল ঘাতক শয়তানের সঙ্গে। ঘোষণা করে বলা হল, ওরা 'সূর্য সন্তান'। আপোসকারীরা সায় দিল। সত্য যে, ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বার্থে ঐ নারকীয় কাণ্ড মেনে নেওয়া হয়েছিল। পুনরায় স্মরণ করব, একদা আমরা বাংলার মুখ দেখেছিলাম, বাংলার মুখ ভালবেসেছিলাম। তিনি ডাক দিয়েছিলেন 'ভায়েরা আমার! ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল।' আমরা তাই করেছিলাম, প্রতিরোধের দুর্জয় প্রাচীর গড়ে তুলেছিলাম। বীর বাঙালিরা অস্ত্র ধরেছিল, পাকিস্তানি দুঃশাসনকে পরাভূত করে বাংলাদেশ স্বাধীন করেছিল।

আকাশ-ভাঙা ধিক্কার-লানৎ আমাদের ওপর– ঐ পনেরই আগস্টের পর তুচ্ছ ঘৃণ্য মূষিকে পরিণত হলাম আমরা! এত কাল কেটে গেল, বাংলার মুখ আর আমাদের দেখতে দেওয়া হয়নি।

এখন আমরা জনকের সন্ধান করছি। যথার্থ যে, নবীন প্রজন্মের স্বতঃজিজ্ঞাসা আমাদের জনকের প্রতীক কোন অবয়বে। বাইরে তাকাই– মার্কিনিরা খুঁজে পায় জর্জ ওয়াশিংটনে, আব্রাহাম লিংকনে; আধুনিক তুরস্কের রয়েছেন কামাল আতাতুর্ক– তুরস্কের আতা পিতা; প্রতিবেশী ভারতের বাপুজী, ভিয়েতনামের আংকল হো; ইন্দোনেশিয়ার জান্তা সরকার অপসারিত করেছিল সুকর্ণকে, কিন্তু ধারণ করে রেখেছে বাং কার্ণোকে; আজকের পিপলস চায়না বর্জন করেছে মাওবাদের 'কালচারাল রেভোলিউশন; কিন্তু বেজিং-এ রক্ষিত মাও-এর মরদেহ স্মৃতিসৌধে সকাল-সন্ধ্যা অদ্যাপি অন্তহীন মানুষের ঢল। প্রসঙ্গত কতিপয় উদাহরণের উল্লেখ এখানে করা গেল। বলা বাহুল্য, এ সমস্তই মানুষের অন্তর-বিশ্বাসজাত।

আসলে মানুষ যে বেঁচে থাকে বৈরী শক্তি আর প্রতিকূল পরিবেশকে লড়ে লড়ে তাকে এগোতে হয়– এ দুঃসাধ্য কৃতীর সাধনে তার অমিতবীর্য সহায়ক অবলম্বনের বড় প্রয়োজন। সেই অবলম্বন তার বিশ্বাস। বিশ্বাসই তাঁর অপ্রতিরোধ্য প্রেরণার উৎস। সেটি যখন অর্জন করা গেল মানুষ তখন 'মানুষে'র মতো বাঁচে, প্রবলভাবে বাঁচে, তারপর তার লব্ধ তাবৎ অভিজ্ঞতা এবং মানস-সম্পদ সঞ্চারিত করে দেয় উত্তর-পুরুষের বহমানতায়। এইটে মানুষের ইতিহাস।

অতএব জানতেই হবে জনক পিতার কথা। নইলে সন্তান কদাপি তার সেই বিশ্বাসের অবলম্বন খুঁজে পাবে না; আপন জন্মের সূত্রটি নিজের কাছে ধোঁয়াশায় আচ্ছন্ন হয়ে রইবে। তবে কি কোনো লজ্জার, কোনো পাপের পঙ্ক থেকে আমি জাত? কেন জানব না জন্মদাতা পিতার কথা? তেমনি জাতির ক্ষেত্রেও A nation is born, ইয়োরোপের রেনেসাঁ কাল থেকে অদ্যাবধি সে ইতিহাস তো বেশি দিনের নয়। কেমন করে 'nationhood'-এর উদ্ভব, বিকাশ। আর এই শতাব্দীরই ঘটনা নবীন সব জাতিরাষ্ট্রের সৃষ্টি: আলজিরিয়া-তুরস্ক থেকে প্রাচ্যের প্রান্ত ইন্দোনেশিয়া-ভিয়েতনাম অবধি, এবং এতদঞ্চলে সাম্প্রাতিকতম সংযোজন বাংলাদেশ।

একটা জাতির জন্ম নিশ্চয়ই অকস্মাৎ আকাশ থেকে

নাজেল হয় না। জন্মকে সম্ভব করতে হয় গণনাতীত মানুষের সর্বস্ব ত্যাগ, জীবন উৎসর্গের বিনিময়ে। পুনরাবৃত্তির কি প্রয়োজন রয়েছে, আমাদের বাংলাদেশের জন্যে রক্তের অভিজ্ঞতায় সেই ইতিহাস সৃষ্ট। গোড়ায় কাজ করেছে কি? প্রত্যন্ত অঞ্চলব্যাপী তৃণমূল অবধি সর্বাত্মক প্রেরণা, যা দেশবাসী মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। এইখানে আসে ঐ অন্তর-বিশ্বাসের কথা। আর বিশ্বাসটি রূপ পরিগ্রহ করে, উচ্চারিত হয়ে থাকে প্রতীকের মাধ্যমে। সেই প্রতীক কদাপি ব্যক্তির সংকীর্ণ পরিমাপ-আয়তনে আবদ্ধ নয়। বহু মানুষের হিতের, কল্যাণের, মুক্ত জীবনের এই প্রকারের সমুদয় সুস্থতার সমন্বিত অবয়ব ধারণ করে তা সর্বজনের বিশ্বাসের প্রতিনিধিত্ব করে। এবং তা দীর্ঘকাল ধরে নানা দুর্যোগে-দুর্দিনে দুঃশাসনের প্রহারে কখনই হার না মেনে ক্রমে হয়ে ওঠে... বলছিলাম বাংলাদেশে আমরা জনক পিতার সন্ধান করছি। সেই সন্ধান পাই ঐ প্রতীকের আশ্রয়ে। কোনো অজ মফস্বল গোপালগঞ্জের গ্রামীণ পরিবেশে জন্মেছিলেন মানুষটি, নাম পরিচয়ে শেখ মুজিবুর রহমান, তাঁকে আমরা তেমনিভাবে 'হয়ে' উঠতে দেখেছি; তারপর কখন একদিন কোটি দেশবাসীর প্রতীকে পরিণত হয়ে গেলেন তিনি। এইখানে স্মরণ করব, ১৯৪০-এর নেতাজী সুভাষ বসুর নেতৃত্বে হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণ আন্দোলনের কাল থেকে '৬৬-তে ছয়দফা, অতঃপর '৬৮-'৭১-এর সেই মহান গণঅভ্যুত্থান অবধি তিন দশক ধরে তাঁর ঐ 'হয়ে ওঠা'। আমরাই সময়কালের প্রত্যক্ষ সাক্ষী এ 'ব্যক্তি' নন মোটে (আমেরিকার 'Declaration of independence'-এর) জেফারসন, (ফরাসি বিপ্লবের) রুশো-ভল্টেয়ার, কী (of the people by the people for the people-এর) লিংকন, (করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে'র) গান্ধী এবং কৃষ্ণাঙ্গ নেতা লুথার কিং, আজকের ম্যান্ডেলা এমনি আরো। কালে-কালান্তরে এমনই হয়ে থাকে। একদা কোনো এক 'সাধারণ' কখন তার ব্যক্তি-গণ্ডিবদ্ধতার সীমানা ছাড়িয়ে যায় অভ্রংলিহ্ উচ্চতায়। তবে অবশ্যই আকস্মিকতা নয়, দৈবানুগ্রহ নয় কদাপি। শক্ত ভিত থেকে থাকে কোথাও। পূর্বের কথার জের টেনে এখন জিজ্ঞাসা: কী ছিল ঐ মানুষটির, শেখ মুজিবের? জবাবটা অজানা নয়, তখন যারা অন্তত কাছে থেকে তাঁকে দেখেছেন– মানুষের জন্যে ভালোবাসা। সেই ভালোবাসার জন্যে কমিটমেন্ট, অপরিমেয় সাংগঠনিক দক্ষতা, দুঃসাহসিক এবং আপোসহীন নেতৃত্ব ইত্যাকার সমুদয় মিলিয়ে আমাদের ঘরের মানুষ ঐ শেখ মুজিব প্রয়োজনের মাহেন্দ্রক্ষণে বঙ্গবন্ধুর আসনে সমাসীন। ঊনসত্তরের ফেব্রুয়ারিতে উত্তাল জনসমুদ্রের ছবিটি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, ছাত্র-তরুণরা বরণ করে নিয়েছিল তাঁকে 'বঙ্গবন্ধু' অভিধা ঘোষণায়। সে ডাক ছড়িয়ে গেল সবখানে। এবং ততোদিনে তা সমগ্র দেশবাসীরই প্রাণের উচ্চারণ। তারপর ইতিহাস আর থেমে থাকেনি, দ্রুতগামী অশ্বারোহী ইতিহাস এগিয়েই চলল। সেই কালে এইটেই ছিল বিধির নির্দেশ। যাদের শোনবার সৌভাগ্য হয়েছে, ঈর্ষণীয় অভিজ্ঞতা তাদের: সে কী বজ্রনির্ঘোষ আহ্বান তাঁর কণ্ঠে সত্তরে 'জয় বাংলা', একাত্তরের মার্চে 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' এবং পাকিস্তানি আগ্রাসী শক্তির মোকাবিলায় সারাদেশ জুড়ে আমরা শঙ্কাহীন অনুপ্রেরণায় 'অতিমানুষে' পরিণত হয়েছিলাম। 'বঙ্গবন্ধু', 'জয় বাংলা', 'মুক্তির সংগ্রাম' সব মিলে একাকার হয়ে গেল। এমনটিই কি ঘটেছিল ফরাসি বিপ্লবের কালে? ১৭৯২-এ রণসঙ্গীত লা-মার্সাই, আর ১৯৭১-এ মার্চে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ কাল ব্যবধান দুই শ বছরের, ফারাক দেখি না অনুপ্রেরণার অগ্নিমন্ত্রে। পনেরই আগস্টে আজ আমরা জাতীয় শোক দিবস উদ্‌যাপন করছি। জাতির জনককে সবংশে হত্যা করা হয়েছিল। স্বভাবতই এমন বিশেষ দিনে নানা আনুষ্ঠানিকতা পালন করা হয়ে থাকে। অনেক পবিত্র শুভ্রবাচ্য আমরা উচ্চারণ করে থাকি। তাবৎ কর্মকাণ্ড অবশ্যই গভীর তাৎপর্যমণ্ডিত। অতঃপর জিজ্ঞাসা এখানে কি সমাপ্ত?

মনে করি, ইতোমধ্যে সময় এসেছে অন্যভাবে দেখবার, বিবেচনা করবার। শোক জ্ঞাপন, প্রতিকৃতিতে-স্মৃতিসৌধে-মাজারে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ, ধর্মীয় অনুষ্ঠান, সেই বিরাটের মহিমা কীর্তন– তারপরও থেকে যায় গুরুতর অনেক কিছু। বলতে চাই যে, উদ্‌যাপনের অনুষ্ঠান উপলক্ষবিশেষ, তাৎপর্য অন্যত্র, আরো গভীরে। সেই গভীরের সন্ধান এই ক্ষণে বড়ো জরুরি। পঁচাত্তরের আগস্টের সে-রাতে কেবলি কি জনককে হত্যা করা হয়েছিল? অপশক্তির যুগপৎ ষড়যন্ত্র ছিল বাঙালির আত্মপরিচয়ের, শুভ মূল্যবোধের শেকড়োৎপাটন। পরবর্তী যে বাংলাদেশ, আশংকা হয়, অনেকাংশে সেই পাপ ষড়যন্ত্র কুরে কুরে খেয়েছে। নইলে প্রত্যহই যে তরুণকে দেখি, যাদেরকে সর্বত্র দেখি, কিসের তাড়নায় এই প্রজন্ম এত পীড়িত, এমন দিশেহারা? আসলে ঠিকানা খুঁজে পাচ্ছে না। কোনো অবলম্বনে বিশ্বাস প্রোথিত করতে চায়, কেবলি হারিয়ে যায় তা। থই-হারা আজকের মানুষ। তাই বুঝি, এখন বড়ো দুঃসময়।

আমাদের তো জানা, জনক উঠে এসেছিলেন অন্তর-বাংলার মাটি থেকে, প্রাকৃত স্বজন মানুষের ঘর থেকে তাদের মুখের ভাষা নিয়ে, হাজার বছরের উত্তরাধিকার বহন করে, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা-অধিকার-স্বপ্নের প্রতিভূ হয়ে। সেই জন্যেই জোরটা এইখানে যে, বটে পাপ শয়তান রক্তমাংসের দেহধারী প্রাণীকে হত্যা করেছিল; কিন্তু স্বপ্নকে, বিশ্বাসকে, প্রতীককে হত্যা করবে কে? ইতিহাস সাক্ষী : সক্রেটিস-যিশুদের, যোয়ান অব আর্ক-লিংকনদের, গান্ধী-লুথার কিংদের মৃত্যু নেই। এঁরা সত্যের জন্যে, মানুষের কল্যাণের জন্যে লড়েছিলেন। কী মহৎ গর্ব আমাদের, 'বাঙালি'র জনক শেখ মুজিব প্রতীকটি যুক্ত হয়ে রইল মহাকালের ইতিহাসে– ঐ মৃত্যুঞ্জয়ীদের সারিতে!

শেখ মুজিব জাতির পিতা

আবুল মাল আবদুল মুহিত

সহস্র বছর ধরে যে যৌগিক বাঙালি জাতি গঠিত হচ্ছিল তারা বাংলাদেশের ভূ-খণ্ডে–৫৭ হাজার বর্গমাইলে–প্রতিষ্ঠা করল বাঙালিদের স্বাধীন দেশ। যে জাতীয়তাবোধ এতদিন ধরে বিকশিত হচ্ছিল তার আত্মপ্রকাশ হলো বাংলাদেশে। তাই বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে যে বাঙালি নৃতাত্ত্বিক-গোষ্ঠী তাদের স্বপ্নের দেশ, গৌরবের দেশ প্রতিষ্ঠা পেল বাংলাদেশ। বাঙালি জাতিরাষ্ট্রের সৃষ্টি বাংলাদেশ। এখানেই এই জাতি ঘোষণা করে তাদের স্বাধীন সার্বভৌম দেশ। এই যে একটি অনন্যসাধারণ অর্জন, এর স্বপ্নদ্রষ্টা ও পরিচালক হলেন ক্ষণজন্মা মহামানব–বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধুর ছিল এই জাতির জন্য এক গভীর ভালোবাসা। তাঁর নিজস্ব সত্ত্বা এই জাতির সত্ত্বায় বিলীন হয়ে যায়। এই জাতির মঙ্গলসাধন ছিল তাঁর জীবনের ধ্যান-ধারণা ও ব্রত। এই যৌগিক জাতিকে তিনি গড়ে তোলেন একটি ধর্মনিরপেক্ষ, সমাজতান্ত্রিক, আধুনিক জাতি হিসেবে। এই সমাজে ধর্ম নিয়ে ঝগড়া থাকবে না, ধর্মকর্ম রাষ্ট্রকর্মকে প্রভাবিত করবে না। এই সমাজে বঞ্চনা চলবে না, বাঁচবার অধিকার থাকবে প্রতিটি নাগরিকের। এই সমাজে কেউ জ্ঞানের আলো ও চয়নের স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হবে না। এই সমাজে সবাই স্বাদ পাবে অর্থনৈতিক মুক্তির। এই সুন্দর স্বপ্ন দেখেন ও আমাদের দেখান টুঙ্গিপাড়ার আমাদের মতোই একজন– বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। দেশ পরিচালনার রূপরেখাও তিনি আমাদের দিয়ে যান। বিশ্বসভায় আমরা সকলের বন্ধু, কারু সঙ্গে নেই বিবাদ। কারুর প্রতি নেই আমাদের বিশেষ আকর্ষণ এবং সকলের প্রভাবই আমাদের উপর সমান। যেখানে মানবাধিকার লুণ্ঠিত, সেখানেই আমরা সোচ্চার। অন্যায় ও বঞ্চনা আমরা কখনো মানি না।

আমার মনে পড়ে ওয়াশিংটনে ১৯৮৭ সালে একটি এরশাদ-বিরোধী বিক্ষোভের কথা। ভয়েস অব আমেরিকার ইকবাল বাহার চৌধুরী সেই বিক্ষোভের বিবরণ ধারণ করতে গিয়ে আমার মন্তব্য গ্রহণ করেন। আমরা তখনো বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়তে বিভোর। সামরিক স্বৈরাচারের পতন চাই। সেই সময়ে একটি আনুষ্ঠানিক আসরে ইকবাল আমাকে একটি প্রশ্ন করেন। ইকবাল ছাত্র বয়স থেকেই আমার পরিচিত। আমার স্ত্রীর সতীর্থ ছাড়াও সাংস্কৃতিক অঙ্গনের একজন হিসেবে আমার ঘনিষ্ঠ। ইকবালের প্রশ্ন, 'আপনি কোন বাঙালি সন্তানকে বেশি শ্রদ্ধা করেন?' নির্দ্বিধায় আমার উত্তর ছিল, 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।' ইকবালের যথাযথ প্রশ্ন ছিল কাকে সবচেয়ে বেশি এড্‌মায়ার করেন। এডমিরেশনে শুধু শ্রদ্ধাবোধই যথেষ্ট নয়, সেখানে মুগ্ধবোধ ও আনুগত্যের বিষয়টিও রয়েছে। শেখ মুজিবকে ছাত্রজামানায় চিনি মুজিব ভাই হিসেবে। তিনি ছাত্রসমাজের নেতা ছিলেন, আমি তাঁর পছন্দের দলের (ছাত্রলীগ) সদস্য ছিলাম না। তাঁর সম্বন্ধে প্রশ্ন ছিল, তবে তাঁকে শ্রদ্ধা করতাম। তাঁকে মনে হত এমন এক ব্যক্তি যাঁর কথা বা অঙ্গীকার বা উদ্দেশ্য কার্যকরী করতে তিনি কার্পণ্য করবেন না ও সফল হবেন। চাকরি-জীবনে পাকিস্তান আমলে ক'দিন দেখি ব্যস্তসমস্ত মন্ত্রী ও দল-সংগঠক হিসেবে এবং পরবর্তী বারো বছর দেখি বিদ্রোহী, নির্যাতিত জননেতা হিসেবে। আইয়ুবের সামরিক সরকার এবং তার ক্রীতদাস গভর্নর আবদুল মোনেম খান শেখ সাহেবের জীবনটিকে দুর্বিষহ করে তোলেন। রোজগারের রাস্তা বন্ধ, চলাফেরার স্বাধীনতা বন্ধ, কথা বলার অধিকার অপহৃত। মামলার পর মামলা লড়তে আর সারাদেশের আদালতে হাজিরা দিতে দিতে হয়রান। এবং মাসের পর মাস, বছরের পর বছর কারাগারে বন্দি। কিন্তু যখনই দেখা হয়েছে শির উঁচা করে সুপুরুষটি বহাল, সদাহাস্যে উদ্ভাসিত, প্রচণ্ড ক্ষোভে ক্রুদ্ধ সময়ে সময়ে। সর্বকালে জনগণের কল্যাণের রাস্তা খুঁজতে লিপ্ত, বঞ্চনার প্রতিবিধানের কৌশল রপ্তে আগ্রহী। এর মধ্যে ফুটবল খেলায় দারুণভাবে আগ্রহী, সময়ে অসময়ে দর্শকের গ্যালারিতে বন্ধুবান্ধব পরিবেষ্টিত।

ইকবাল আরো খতিয়ে দেখতে চান। সাংবাদিকের অনুসন্ধান সবদিক বিবেচনা করতে চায়। তার পরবর্তী প্রশ্ন হয় আরো যে-সব নেতৃবৃন্দ সম্বন্ধে অবহিত বা যাঁদের দেখেছেন তাঁদের সঙ্গে তুলনা করেও কি অভিমতটি সিদ্ধ? আমি বেশ কজন নেতাকে নানাভাবে দেখেছি ও চিনেছি। শেরে বাংলা ফজলুল হক, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ও স্যার খাজা নাজিমুদ্দিন সাহেবকে বেশ চিনতাম–দু'জনকে আমার কৈশোর থেকে এবং একজনকে যৌবনে। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে খানিকটা চিনতাম। পাকিস্তানের অনেক নেতৃবৃন্দ ও সেনাপতিদেরও কাছে থেকে দেখার সুযোগ পাই। লেখাপড়ায় অনেকেই ছিলেন অনেক প্রাগ্রসর। আদব-কায়দায় কেউ কেউ ছিলেন আদর্শ মানুষ। সততা ও বিশ্বাসেও অনেকে ছিলেন সমতুল্য। বঙ্গবন্ধুর অবস্থানটি ছিল অন্য মার্গের। জনগণের নাড়ীনক্ষত্রের খবর তাঁর ছিল অসাধারণ– জনহিতে নিবেদিত এমন নেতা আমি আর দেখিনি। তাঁর নিকটতম অন্য ব্যক্তি ছিলেন তাঁর ডানহাত তাজউদ্দিন আহমদ। জনগণের মঙ্গল, বাঙালির সুখী জীবন তাঁর মন, তাঁর ভুবন, তাঁর চিন্তা-চেতনা সব সময় আচ্ছন্ন করে ছিল। ত্যাগের ক্ষেত্রে তাঁর সমকক্ষ সম্ভবত যাঁরা জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করত সেই বিপ্লবী বাঙালি ছাড়া অন্য কেউ ছিল না। দেশের ও দেশের জন্য তাঁর ত্যাগ ও তীতিক্ষা তাঁকে দেয় বঙ্গবন্ধু আখ্যা। তাঁর আত্মসম্মানবোধে শ্লাঘা বোধ করবার ব্যক্তিগত সুযোগ আমার হয়েছে বারবার। তাঁর সাহস যেমন ছিল সীমাহীন, তাঁর বাস্তবতাবোধ বা প্রয়োগবাদী চেতনাও ছিল তেমনি জাগ্রত ও ধারালো। একজন সাধারণ বাঙালি যার পাণ্ডিত্য তেমন অসাধারণ ছিল না, তিনিই শেষ বিচারে প্রতিষ্ঠা করেন বাঙালিদের জাতিরাষ্ট্র–সহস্র বছরের ঘাত-প্রতিঘাত ও আরাধনার ফসল। রবীন্দ্রনাথ শিল্প-সাহিত্য ও রুচির বিকাশে দিশারী। দেশবন্ধু সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার পথিকৃৎ। জাতীয়তাবোধ জাগরণে বিপিন পাল চির-বিদ্রোহী। সমাজ বিনির্মাণে রাজা রামমোহন রায় সংস্কারের অগ্রদূত। বাংলা ভূখণ্ডের একীভূত অবস্থান রচনায় গোপাল, ইলিয়াস শাহ, শায়েস্তা খানরা মহা সম্রাট। ধর্মপ্রচারে হযরত শাহজালাল বা অতীশ দীপঙ্কর অথবা শ্রীচৈতন্য নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেছেন।

আমাদের আপনজন, একান্তভাবে বাংলার শাশ্বত উত্তরাধিকারের বাহক, একজন সাধারণ বাঙালি শেখ মুজিবুর রহমান এদের সবার উপর বাঙালি জাতিকে উপহার দেন একটি জাতিরাষ্ট্র–৫৭ হাজার বর্গমাইলে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ। বিশ্ব-বাঙালির প্রাণের দেশ, গৌরবের ধন, পরিচয়ের ধারক। একবিংশ শতাব্দীর নতুন প্রজন্ম যখন দেশটিকে নিয়ে ভাবতে শুরু করবে, রাজনীতিতে অনীহাকে যখন আগ্রহে পরিণত করতে পারবে, তখন বাস্তবেই সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালির স্বপ্নটি বাস্তবায়িত হবে।

বাবার সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর দু'টি ঘটনা

সন্‌জীদা খাতুন

৫০ দশকের শেষ দিকে বোধ করি, টি বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমান সেগুনবাগিচায় আমাদের বাড়ির পশ্চিমের বাড়িটিতে বাস করতে এসেছিলেন। হাসিনা তখন কিশোরী। সীমানা প্রাচীরের এপারে-ওপারে তার সঙ্গে আমার ভাগ্নিদের কথাবার্তা চলত। হাসিনার কোলে তার ভাই থাকত। মনে হয় কামালই হবে।

সেই সময়কার কথা। এক সন্ধ্যায় ধুম বৃষ্টি নেমেছে। আমার বাবা কাজী মোতাহার হোসেন যেন কোথা থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। বৃষ্টি থেকে মাথা বাঁচাতে তাড়াহুড়ো করে নিজের বাড়ি মনে করে এক বাসায় ঢুকে পড়লেন। সেটি শেখ সাহেবের বাসা। মুজিব তাঁকে মাথাটা মুছিয়ে সাদরে বৈঠকখানায় বসিয়ে, চা-নাস্তা দিতে বললেন বাসার লোকজনদের। নাস্তা খাওয়া হলে, বাবা ঘরের চারদিকে তাকিয়ে টাকিয়ে বলে উঠলেন, কই, এটা তো আমার বাড়ি না! ততক্ষণে বৃষ্টি ধরেছে। শেখ মুজিব হেসে নানা সৌজন্য করে তাঁকে ছাতা আর লোক দিয়ে আমাদের বাড়িতে পৌঁছিয়ে দিলেন।

মুক্তিযুদ্ধের শেষ দিকে দাবা খেলার জন্যে বিদেশ যাবার কথা ছিল কাজী সাহেবের। দাবার কথায় তো দিনদুনিয়া বিস্মরণ হয় তাঁর। চলে গেলেন করাচিতে। কিন্তু করাচিতে বাঙালিদের ফেলে রেখে পাকিস্তানিরা বিদেশে চলে গেল খেলতে। ভাগ্যিস আমাদের ছোট বোন ওখানে চাকরি করত। সেখানেই আটকে গেলেন বাবা। ডিসেম্বরে ভারত আমাদের পক্ষ নিয়ে যুদ্ধ শুরু করল। স্বাধীনতার পরে আমরা বঙ্গবন্ধুর কাছে রেডক্রসের সূত্রে বাবাকে ফিরিয়ে আনবার জন্যে দরবার করেছিলাম। রেডক্রসের আনা প্রথম ব্যাচেই, যদ্দূর মনে হয়, বাবাকে ফিরিয়ে আনেন বঙ্গবন্ধু। বাবা ফিরে এলে উচ্চপদস্থ কাউকে ফুল দিয়ে পাঠিয়েছিলেন তিনি শ্রদ্ধা জানাবার জন্যে। তারপরে প্রথমে যে ক'জনকে বঙ্গবন্ধু শ্রদ্ধাভরে 'জাতীয় অধ্যাপক' ঘোষণা করেছিলেন, কাজী মোতাহার হোসেন তার অন্যতম। গুণী মানুষের প্রতি এমনই ছিল শেখ মুজিবুর রহমানের শ্রদ্ধা আর সম্মানবোধ।

এবার আরেকদিনের ঘটনা বলি। নিজের একটা কাজে কাকভোরে ৩২ নম্বরের বাড়িতে গেলে সবাই জিজ্ঞেস করল, কেন এসেছেন, কি ব্যাপার? ওপরে ফোন করে বঙ্গবন্ধুকে বাবার কথা জানানো হল। ঘুম থেকে উঠে তখনও চোখে-মুখে পানি দেওয়া হয়নি দেশপ্রধানের। তিনি বললেন, শিগগির ওপরে নিয়ে আয়। বলতে বলতে, আমরা সিঁড়ির কয়েক ধাপ উঠতেই লুঙ্গি পরা অবস্থাতেই নেমে আসতে লাগলেন তিনি। হাত ধরে বাবাকে নিয়ে গিয়ে বসালেন বৈঠকখানায়। হুলস্থুল লাগিয়ে বললেন, ওরে চা দে, নাস্তা দে ...। আমি বললাম, উনি তো চা খান না। বললেন, কী খান তবে? বললাম, দুধ খেতে ভালোবাসেন আর ফলমূল। লোক ছুটল গোয়ালে, দুধ দুইয়ে জ্বাল দিয়ে ওঁকে খাওয়াবার জন্যে। বড় কাচের গেলাসে দুধ এল, এল ফলপাকুড়।

আমার সমস্যার কথাগুলো মন দিয়ে শুনলেন বঙ্গবন্ধু। কিন্তু প্রতিকারের সময় হল না আর। কেন না, তার কিছুদিন পরেই পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্টের বীভৎস ঘটনা ঘটে গেল। সেদিনকার ঘটনার ছবি দেখেছি। দেখেছি এ নিয়ে শিল্পীর আঁকা ছবি। আমার চোখে এখনও দোতলার সিঁড়ি বেয়ে তাঁর নেমে আসার ছবি ভাসে। তারপরই সেই ছবি হয়ে যায় তাঁর শেষ দিনের ছবি। দেখি, সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছেন তিনি। পড়তেই থাকেন ... পড়তেই থাকেন ....।

লেখাটি বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত 'ধানশালিকের দেশ' পত্রিকা থেকে সংকলিত

আমি মুজিবের কাছে

মযহারুল ইসলাম

আমি মুজিবের কাছে দীক্ষা নিয়েই
অস্ত্র হাতে যুদ্ধে নেমেছিলাম
এক সূর্যের কাছে উত্তাপ নিয়ে
মাঠে মাঠে সব ছড়িয়ে দিয়েছিলাম ।

সেই রণাঙ্গনের শপথ আমার শপথ
চলবে চালাব জয়ের দীপ্ত রথ
বাংলা মায়ের ললাটে অরুণ রক্তের লাল টীকা
আমিই পরিয়ে দিলাম
আমি মুজিবের কাছে..... নেমেছিলাম ।

আমার যুদ্ধ মুজিবের নামে থামবে না কোনোদিন
চলবেই অবিরাম
আমার দু'বাহু মানবে না কোনো বরাভয়
তার গতিবেগ উদ্দাম
সিন্ধুর ঢেউ আজ উতরোল
বাতাসে বাতাসে বাজে কল্লোল
বজ্রকণ্ঠ ডাকছে সাবাস! সে ডাক আমার
কণ্ঠেই তুলে নিলাম
আমি মুজিবের কাছে..... নেমেছিলাম ।

কোন ছবিগুলি

জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী

কোন ছবিগুলি সেই স্বপ্ন অবসরে
তুমি দেখেছিলে, দ্রুত, স্মৃতির পর্দায়?
প্রিয়াকে? ছেলেকে? মা-কে? শৈশবের ঘরে
তুলে রাখা রঙিন ঘুড়িকে? কলকাতায়
'বেকার'র ছোট কামরা? অথবা ঢাকায়
সেন্ট্রাল জেলের দীর্ঘদিন, দীর্ঘ রাত!
অথবা উধাও দিন কাজের চাকায়,
ঘরে ফেরা অনেক রাত্তিরে, ঠাণ্ডা ভাত...
অথবা এসব কিছু নয়! যে মরণ
জীবনের পায়ে পায়ে ছিল, তুমি যাকে
কখনো পিছনে ফিরে দেখেও দেখোনি,
ঘুম থেকে হঠাৎ ঝাঁকিয়ে সে যখন
বলেছিল, চলো, তার আশ্চর্য স্পর্ধাকে
কি ব'লে জবাব দেবে, সে-ভাষা শেখোনি ।

ইতিহাসের সন্তানের মৃত্যু নেই

আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী

পনেরোই আগস্ট তোমার মৃত্যুদিন নয় বঙ্গবন্ধু, জন্মদিন। মৃত্যুর মাতৃগর্ভ থেকে তোমার জন্ম। দানবের অস্ত্রাঘাতে তোমার জন্ম। বাংলার গৈরিক মাটিতে নিজের শোণিতধারা থেকে তোমার জন্ম। তুমি আজ এক মুজিব নও। শত মুজিব। সহস্র মুজিব। কোটি মুজিব। বঙ্গবন্ধু, তুমি আমাদের রক্ত-অভিবাদন গ্রহণ করো। যুগে যুগে তোমার অভ্যুদয়। কখনো তুমি ঈশা খাঁ। কখনো সিরাজ। কখনো তিতুমীর। কখনো সূর্যসেন। কখনো ক্ষুদিরাম। তুমি শুধু নেতা নও। মুক্তিদাতা পিতা এবং বন্ধু। তুমি বাংলার দুর্জয় তারুণ্যের হিমালয়। তুমি পদ্মা, মেঘনা, যমুনার কালজয়ী কল্লোল। যুগে যুগে তুমি বাংলার মানুষের জন্য আত্মদান করেছ। তোমার বুকে কখনো আঘাত হেনেছে মীরজাফর, কখনো মুশতাক, কখনো মোহম্মদী বেগ, কখনো ফারুক-ডালিমের দল। কিন্তু তোমার মৃত্যু ঘটেনি বর্বর ঘাতকের অস্ত্রে।

ভাগীরথী থেকে বুড়িগঙ্গা। পলাশী থেকে ধানমণ্ডি। ১৭৫৭ থেকে ১৯৭৫। কালের যাত্রার ধ্বনি বাংলার আকাশে একই রক্তিম খেলায় তার অধ্যায় সাজিয়ে গেছে। সেই ইতিহাসে আজ একটা নাম সব চাইতে দীপ্ত ভোরের শুকতারা। সেই নাম শেখ মুজিব। মুজিব আজ একটি মানুষের নাম নয়, একটি দেশের নাম। একটি ভূখণ্ডের নাম। একটি মানচিত্রের নাম। বিশাল জনগোষ্ঠীর নাম।

বঙ্গবন্ধু, তাই তোমার মৃত্যু নেই। তুমি মৃত্যুঞ্জয়ী। তুমি আমাদের সংগ্রামী অভিবাদন গ্রহণ করো। তুমি বাংলার পদাবলী। তুমি বাংলার মঙ্গলকাব্য। তুমি রবীন্দ্রনাথের সুর। নজরুলের বিদ্রোহ। জীবনানন্দের স্বপ্ন। সুকান্তের বিপ্লবী কণ্ঠ। তুমি বাংলার হাজার বছরের ইতিহাস। তুমি ইতিহাস-বাংলার সন্তান। মূর্খ নরপিশাচের দল জানে না ইতিহাসের সন্তানের মৃত্যু নেই। মৃত্যু হয় না। তাদের পরাজয় নেই। তারা চিরজয়ী। তাই দেশে তুমি লিংকন, লুমুম্বা, গান্ধী। আর নাথুরাম গডসে থেকে ফারুক-ডালিমের দল ইতিহাসের ঘৃণ্য আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত। আজ প্রায় দেড় হাজার বছর ধরে প্রতি মহরমে আর্তকণ্ঠে ক্রন্দসীর সুধার আর্তকণ্ঠে ধ্বনি ওঠে হায় হোসেন, হায় হোসেন! কেউ মুহূর্তের জন্য স্মরণ করে না ঘাতক এজিদ কিংবা সীমারকে। কী করে মুছবে ঘাতকের দল তোমার নাম বাংলার মাটি থেকে? বাংলার মানুষের হৃদয় থেকে? বাংলার পাখির সুর থেকে? বাংলার নদীর কলতান থেকে? তুমি বাংলার হাজার বছরের ভূখণ্ড। তোমার রাজনীতি কখনো দক্ষিণা বাতাস। কখনো সাইক্লোন। তোমার নশ্বর দেহ আজ নেই আমাদের মাঝে। কিন্তু পাশে চেয়ে দেখি কৃষকের কাস্তে হাতে, মজুরের শাবল হাতে, লেখকের লেখনী হাতে মুজিব। মুজিবের নাম আজ সংগ্রাম, বাংলার সাড়ে সাত কোটি গণমানুষের মুক্তির শেষ সংগ্রাম।

ভোরের শিশির হয়তো আজ তোমার নাম লিখছে সংগোপনে ঝরা শিউলির বনে। কিন্তু ষড় ঋতুর বাংলাদেশে এটাই শেষ সত্য নয়। ঈষাণে ঝড়ো মেঘ জমেছে। বজ্রে তৈরি হচ্ছে নতুন রণ-দামামা। আর প্রলয় শিহরণে শিহরিত, স্পন্দিত বাংলার বিদ্রোহী যৌবন।

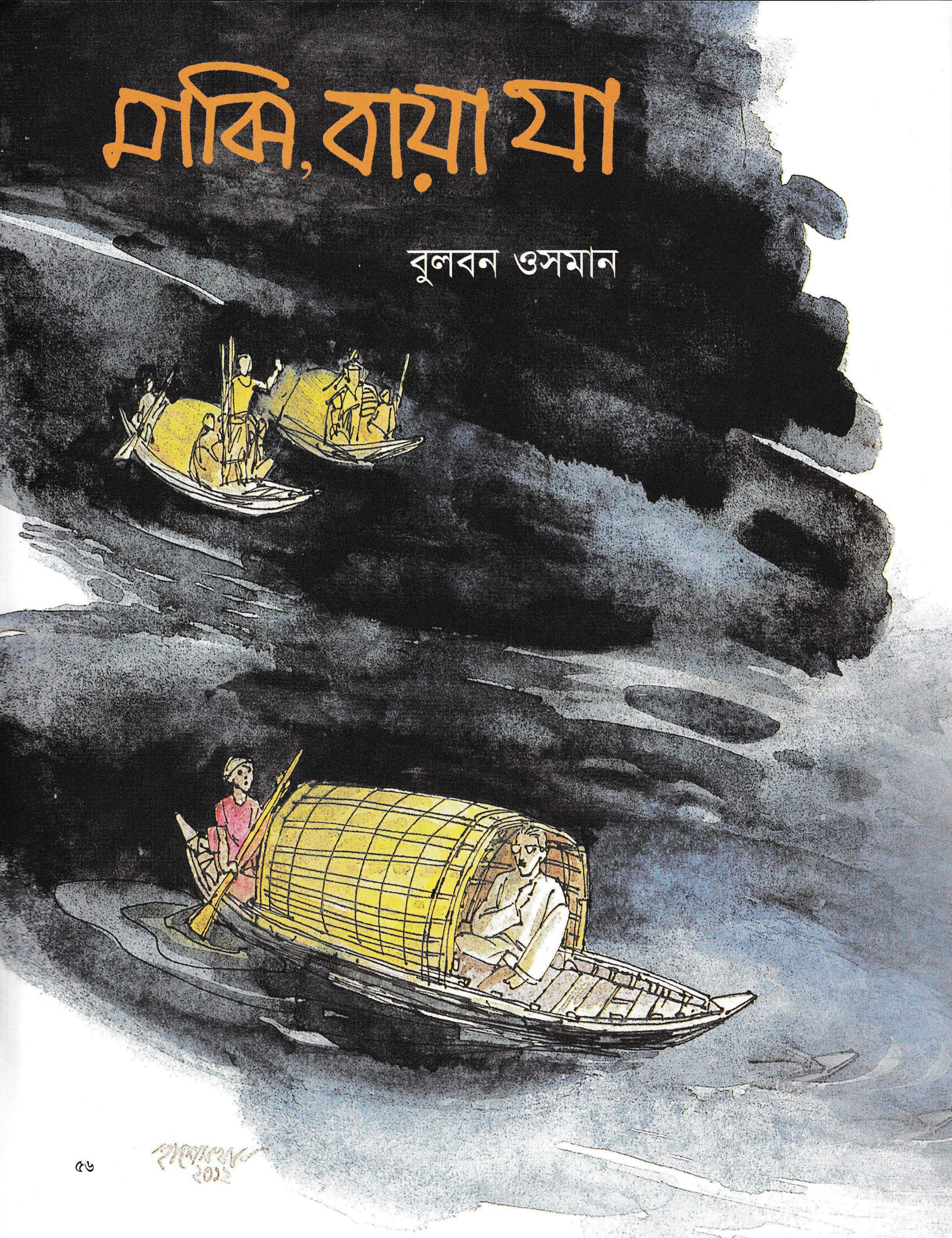
সহসা অনেক রাত্রে দেশদ্রোহী
ঘাতকের হাতে
দেশপ্রেম-দৃপ্ত প্রাণ রক্ত ঢালে
সূর্যের সাক্ষাতে।

বঙ্গবন্ধু, এই সূর্য অস্তমিত হয়নি। কুৎসা, নিন্দা ও ষড়যন্ত্রের কুয়াশার আড়ালে ঢাকা পড়েছে মাত্র। এই কুয়াশার জাল ছিন্ন করার সংগ্রাম আমাদের। সুকান্তের ভাষায় আজো আমাদের ঘোষণা :

"কুয়াশা কাটছে কাটবে আজ কি কাল
ধুয়ে ধুয়ে যাবে কুৎসার জঞ্জাল।
ততদিন প্রাণ দেব শত্রুর হাতে
মুক্তির ফুল ফুটবে সে সংঘাতে।"

চকি, বায়া থা

বুলবন ওসমান



চৈত্র মাস। গঞ্জের ঘাটের বালি বাতাসে হু হু করে উড়ছে। সন্ধ্যা হয় হয়। এমন সময় দীর্ঘদেহী একজন ঘাটে নেমে এলেন। মাঝিদের মধ্যে তখন প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেছে। কে এই মানুষটিকে নিজের নৌকোর সওয়ারি করতে পারবে। তার মনে হল মানুষটি তাদের খুব প্রিয় একজন, যে তাঁকে ওঠাতে পারবে তার খুব সুনাম হবে।

মাঝিদের চেঁচামেচি দেখে মানুষটি থেমে গেলেন। চুপ করে কি যেন ভাবলেন, তারপর বলেন : এই, সিরাজ মাঝি কই? মানুষটির গলা খুব ভারী। সচরাচর এমন ভারী গলা কম শোনা যায়। মাঝিরা হুড়োহুড়ি থামিয়ে ফেলে। দূর থেকে সিরাজ মাঝি জবাব দেয় : ভাই, এই যে আমি।

: ওকে সামনে আসতে দে! কণ্ঠ থেকে ভারী স্বরের নির্দেশ এল। সিরাজ মাঝিকে জায়গা করে দিতে অন্য মাঝিরা সরে যেতে লাগল। নৌকো একেবারে কিনারে চলে আসে। সিরাজ মাঝি মাঝবয়সী, হাতে বৈঠা নিয়ে নিচে নামে, তারপর নৌকো ধরে রাখে, যাতে উঠতে গিয়ে টলে না যায়। সিরাজের নৌকোয় আরো দু'জন জোয়ান মাঝি আছে। সবার চেহারা তামাটে এবং সতেজ। তিনি নৌকোয় উঠে বলেন: এরা কারা?

আমার ভাতিজা ... সিরাজ মাঝির উত্তর।

: ওপারে যেতে পারবি?

নদীতে তখন ভাটির প্রবল টান, যেতে হবে উত্তরে। নদীর জল চলছে দক্ষিণে।

: আপনি অর্ডার দিলে সব পারব, সিরাজ মাঝির জবাব।

: তাহলে চল। কতক্ষণ লাগবে?

: রাত বারটার কাছাকাছি হয়ে যাবে।

: বারটা ... উচ্চারণ করে তিনি কি যেন ভাবলেন।

: চাচা, এদিকে তো রাতে ডাকাতি হয় ... এক যুবক বলে।

: তাই নাকি! বেশ মজা পেলেন যেন মানুষটি। বলেন : চল, ডাকাত পেলে মজাই হবে। ওদের সঙ্গে একটু গল্প করা যাবে সময়টা ভালো কাটবে।

মাঝিরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। বলেন কি মানুষটি! ডাকাতের সঙ্গে গল্প করবেন! অবশ্য মানুষটির হাত একেবারে খালি, তবে পকেটে কি আছে তা তো আর জানে না। তাঁর পরনে সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি ... বেশ ঢোলা ... চেহারার সঙ্গে মানানসই। চুল আর মোটা গোঁফে কিছু পাক ধরেছে, তাতে মানুষটির ভারিক্কি ভাবটা আরো বেড়েছে। মানুষটিকে দেখলে জমিদার-জমিদার ভাব জাগে। তাই মাঝিদের আরো চিন্তা। ডাকাতরা তো আর সাধারণ লোকের দিকে নজর দেয় না!

নৌকোর মাঝে পাটি বিছানো। ছোট একটা বালিশও আছে। তিনি পকেট থেকে রুমাল বের করে বালিশের ওপর রাখেন। তারপর সটান লম্বা হয়ে শুয়ে পড়েন। আকাশে তারারা তখন উঁকি মারছে। দ্বিতীয়ার চাঁদও দেখা যাচ্ছে, কাস্তের মতো।

মানুষটি শুয়ে শুয়ে মাঝে মাঝে সিরাজ মাঝির সংসারের খবর নেন। ছেলেমেয়ে ক'জন, দিনে কেমন আয় হয় ... সংসার কেমন চলছে ... এমনি কথার মাঝে মাঝে গভীর চিন্তায় ডুবে থাকেন। বাংলার আলো-বাতাস তাঁর গায়ে মায়া মাখিয়ে দেয়। তাঁর ঘুম পায়। আর এর মধ্যে নৌকোর দুলুনি ঘুমের আমেজ তৈরি করে। স্রোতের বিপরীতে নৌকো দ্রুতগতিতে চলতে পারে না। চলছে ধীরগতিতে। শুধু একটা ছপ ছপ ধ্বনি নিস্তব্ধতা কাটিয়ে দেয়। একটা ছন্দ তোলে। বৈঠার কোঁচ কোঁচ আওয়াজও ওঠে থেকে থেকে, ছন্দে ছন্দে।

তিনি ঘুমিয়ে না জেগে তা কেউ বুঝতে পারে না। রাত বাড়ছে। কাস্তের মতো চাঁদটা অনেকক্ষণ হল অস্ত গেছে। আকাশে হাজার তারার মেলা। আকাশ ঘন আঁধারে ভরা। তরুণ মাঝিরা হঠাৎ একটু সচেতন হয়ে ওঠে। তাদের মনে হয় তাদের নৌকো লক্ষ করে আরো ক'টা নৌকো যেন খুব তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসার চেষ্টা করছে।

তারা সিরাজ মাঝিকে ব্যাপারটা খেয়াল করতে বলে। সিরাজ মাঝি কান খাড়া করে। ঠিক! মনে হচ্ছে একসঙ্গে তিনটে নৌকো পেছনে খুব দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসছে। স্রোতের বিপরীতে বলে তাড়াতাড়ি আসতে পারছে না, কিন্তু তাদের নৌকোর চেয়ে ওদের গতি বেশি। সিরাজ মাঝিরও কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ে। কিন্তু সাহস বজায় রেখে বলে,



ভাতিজারা, নাওয়ের গতি বাড়াও, আমার ভালো ঠেকতাছে না।

জোয়ান ছেলে দুটো গতি বাড়ায়। একটা ঝাঁকুনি খেয়ে নৌকা এগোয়।

বিছানায় মানুষটি একটু নড়ে ওঠেন। বলেন: কি হলো তোদের?

: না, একটু জোরে চালাতে বলছি ... রাত অনেক হল তো!

: ক'টা বাজে?

: ভাই, সাড়ে দশটা-এগারটা হবে ..

: আর কতক্ষণ লাগবে?

: জোয়ারের সময় এসে গেছে ... আর ঘণ্টা খানেকের বেশি লাগবে না।

মানুষটি আবার চুপ। অন্ধকারে তাঁর চিন্তার সূত্র বোঝা যায় না।

স্রোত কমে যাওয়ায় পেছনের নৌকোগুলোর দাঁড়ের ছপছপ আওয়াজ বেশ কানে বাজে। আর সে আওয়াজ ক্রমশ এগিয়ে আসছে, জোরে শব্দ তুলে। এবার এরা তিনজন একসঙ্গে টান মারে। নৌকো আরো গতি নেয়।

: এই তোদের হল কি, এত জোরে টানছিস কেন? বেশ তো ভালোই চলছিল ...

: ভাই, ওরা অনেক কাছে এসে পড়েছে ...

: তোরা তোদের মতো বায়া যা।

কিন্তু ওরা জোরেই বাইতে থাকে।

পেছনের নৌকো তিনটে তখন আরো কাছে চলে এসেছে। দুটো প্রায় দু'পাশে, আর একটা পেছনে।

: ভাই, ওরা যে এসে পড়ল, ভয়ে ভয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় বলে সিরাজ মাঝি।

গম্ভীর কণ্ঠে তিনি বলেন: বায়া যা ...

: ওরা যে একেবারে কাছে এসে পড়ল।

নিস্তরঙ্গ স্বরে তিনি বলেন: মাঝি, বায়া যা ...

অল্পক্ষণ পরই দুটো নৌকো একেবারে কাছে এসে পড়ে। পেছন থেকে আওয়াজ আসে: এই থাম, না হলে গুলি করব!

: ভাই, এখন কি করব? কাঁদো-কাঁদো স্বর সিরাজ মাঝির।

মানুষটির এক কথা: সিরাজ, বায়া যা ..

: পেছন থেকে এই সময় একটা ফাঁকা গুলির আওয়াজ হল। কারণ, নৌকো তাদের নির্দেশ মেনে থামছে না।

মানুষটি এবার সিরাজ মাঝিকে ডাকেন।

: এই সিরাজ!

: জি ...

: বল, নৌকোয় শেখ মুজিব আছে ...

সিরাজ মাঝি চিৎকার করে বলে : নৌকোয় শেখ মুজিব আছেন!

সবগুলো নৌকো তখন থেমে গেছে।

পেছন থেকে একজন বলে ওঠে: আগে বলবি তো!

সিরাজ মাঝির নৌকো ধীরগতিতে এগিয়ে চলে। তাদের পাড়ে পৌঁছতে আর দেরি নেই। বাকি নৌকো তিনটে তখন আর সামনে এগোয় না। অনেক পেছনে চলে গেছে।

দেশের বেতার ও শেখ মুজিব

আশরাফ-উজ-জামান

যদি কেউ প্রশ্ন করেন, আমার জীবনের সবচাইতে উল্লেখযোগ্য ঘটনা কোনটি? নিঃসন্দেহে উত্তর হবে: পাকিস্তান সরকারের বেতারে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ প্রচার করা।

যতটা সহজে বাক্যটি লেখা হল ততটা সহজ ছিল না সেই সময় পাকিস্তান সরকারের প্রচার কেন্দ্র থেকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত বঙ্গবন্ধুর ভাষণ প্রচার।

পরিচয়সূত্র ধরে ফিরে যেতে বালক মুজিবকে দেখা যাবে গোপালগঞ্জের হাই স্কুলের মাঠে ফুটবল খেলারত। তৃতীয় দশকের শুরুতে। পরনে গুটানো পায়জামা এবং শার্ট। সহযোগী খেলোয়াড়দের মধ্যে রয়েছে আমার ছোট দু'ভাই আমির-উজ-জামান ও আহমদ-উজ-জামান। মুজিব মাঠ জুড়ে খেলে প্রাণপণ চেষ্টা করছে গোল করতে, শেষ পর্যন্ত গোল হবার পর খেলা শেষ হয়েছিল।

সকলকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা ছিল ছাত্র মুজিবের তখন থেকেই। স্কুলের ফুটবল মাঠেরও লিডার ছিলেন শেখ মুজিব। গোপালগঞ্জ স্কুল থেকেই ম্যাট্রিক দিয়ে কলকাতায় পড়তে এলেন এবং বেকার হোস্টেলে থেকে ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হলেন। আবার দেখা কলকাতায়। ছোট ভাইদের সহপাঠী এবং বন্ধু হওয়াতে বড় ভাই'র সম্মানই আমাকে দিতেন। ইসলামিয়া কলেজে অধ্যয়নকালেই তিনি ছাত্র-সংসদের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন এবং কলেজের খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। মনে আছে, কলেজের এক শিক্ষকের বিদায়-অনুষ্ঠানে তাঁর অনুরোধে একটি বিদায়ী গান রচনা করে দিয়েছিলাম। তখনকার কলকাতার বিশিষ্ট গায়ক ধীরেন দাশ ইসলামিয়া কলেজে এসে বিদায়ী অনুষ্ঠানে সেই গান গেয়েছিলেন।

বুলবুল পত্রিকার সম্পাদক হাবিবুল্লাহ বাহার তখন মুসলিম লীগের সঙ্গে জড়িত, এবং সেখান থেকেই রাজনীতিতে অংশগ্রহণ শুরু শেখ মুজিবের। ১৯৪৭-এ পাকিস্তান হওয়ার পর নানা কারণে মুসলিম লীগের সঙ্গে সংগতি রাখতে পারেননি শেখ মুজিব। ঢাকায় এসে মুসলিম লীগের প্রতিপক্ষ ছাত্র-আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন তিনি।

পাকিস্তানের ভাবধারার সঙ্গে ঢাকার ছাত্রসমাজ প্রথম থেকেই একমত হতে পারেনি। পাকিস্তান সৃষ্টিকর্তা জিন্নাহ ঢাকা এসে একমাত্র উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষাকরণের প্রস্তাব ছাত্ররা মেনে নিতে চায়নি। ছাত্রদের নিয়ে দল গড়ে তোলা শেখ মুজিবের পক্ষে সহজ হয়ে উঠেছিল এবং প্রকাশ্যে তাঁর দলের সঙ্গে বিরোধ বেধে উঠেছিল।

বলতে গেলে দেশের সর্বসম্মত নেতা বলে তিনি জনসমর্থন পান আগরতলা মামলাকালে। রাজনৈতিক কারণেই দেশের বেতারে তাঁর কখনো প্রবেশাধিকার ঘটেনি। যখনি দেখা হয়েছে, বলেছেন দেশের বেতারতো আমাদের জন্যে নিষিদ্ধ, তবে মাঝে মাঝে রবীন্দ্রসংগীত প্রচার করবেন, সময় পেলে শুনব। অবশ্য পাকিস্তান আমলে প্রায়ই রবীন্দ্রসংগীত নিষিদ্ধ করা হত বেতার থেকে।

প্রবল গণ-আন্দোলনে আইয়ুব খান এবং মোনায়েম খানের অপসারণের পর প্রথম বেতারের অনুষ্ঠান প্রচার নিয়ে আলাপ হয় শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে। দেশের জনতা ইতোমধ্যেই তাঁকে বঙ্গবন্ধু আখ্যায় ভূষিত করেছে। দেখা হতেই তিনি প্রথম বেতার নিয়ে মন্তব্য প্রকাশ করলেন। বললেন, দেশের সঙ্গে সমন্বয় রেখে অনুষ্ঠান প্রচার করতে না পারলে বেতার বন্ধ করে দিন। পরে কাছে এসে হেসে বলেছিলেন, একবার রবীন্দ্রনাথের 'আমার সোনার বাংলা' গানটি বেতার থেকে প্রচার করতে পারেন না?

সরকারি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে সমস্ত বেতার-কর্মীদের একান্ত সহায়তায় পরদিনই বেতার থেকে প্রচারিত হয় 'আমার সোনার বাংলা' গান এবং আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্ত করে বেতারের অনুষ্ঠান প্রচারের ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

সামরিক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বেতার অনুষ্ঠান নিয়ে তেমন বাধ্যবাধকতার সৃষ্টি করেননি, এবং বেতার থেকেই তিনি

প্রচার করেছিলেন দেশে নির্বাচন দিয়ে গণ-প্রতিনিধিদের হাতেই দেশের শাসনভার তুলে দেবেন।

দেশের নির্বাচন এবং তৎপরবর্তী কথা সকলেরই জানা। তবে এই নির্বাচনকে উপলক্ষ করেই শেখ মুজিবের আরো কাছাকাছি আসার সুযোগ হয়েছিল। নির্বাচনের প্রাক্কালে দেশের সকল দল-প্রধানদেরই বেতারে নিজ নিজ দলের পক্ষ হয়ে নির্বাচনী প্রচারণার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। খবর নিয়ে বেতার অফিস থেকে সহকারী পরিচালক আলীম-উজ-জামান চৌধুরীকে নিয়ে সেগুনবাগিচা আওয়ামী লীগ অফিসে গিয়ে বঙ্গবন্ধুকে তাঁর বক্তব্য প্রচারের জন্যে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম। একইভাবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল মুসলিম লীগ নেতা ফজলুল কাদের চৌধুরীকে, ভাসানীপন্থি ন্যাপের নেতা মওলানা ভাসানীকে এবং অন্য দলনেতাদের।

বঙ্গবন্ধু হেসে বলেছিলেন, এতদিনে দেশের সরকার বেতারে আমার প্রবেশাধিকার দিলেন। কিন্তু আমি নিজের দলের হয়ে কতখানি বলতে পারব?

সরকার একটি নির্বাচনী শর্তাবলি তৈরি করে দিয়েছিল। বক্তব্যের প্রচারকাল ২৫ মিনিট। বক্তব্যে কোনো ব্যক্তিবিশেষ কিংবা দলকে আক্রমণ না করা। নিজের দল সম্বন্ধে কার্যকরী তথ্য প্রচার। প্রচারের দশ দিন পূর্বে কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের জন্য পাণ্ডুলিপি পেশ করা।

বঙ্গবন্ধু শর্তগুলি মেনে নিয়ে বলেছিলেন, প্রথম বারের মতো দেশের বেতারে কিছু বলার সুযোগ পাচ্ছি, শর্ত আমাকে মেনে চলতেই হবে। আমি সব সময়ই শর্ত মেনে চলতে চাই, কিন্তু সব সরকারই আমাকে ভুল বুঝেছে, ইয়াহিয়াও আমাকে ভুল বুঝবে কিনা কে জানে?

দুই ছাত্রনেতা তোফায়েল আহমদ এবং আবদুল কুদ্দুস মাখন আলাপের সময় সেগুন বাগিচার অফিসে উপস্থিত ছিলেন। বেতার এবং টেলিভিশন থেকে একই ভাষণ এবং একই সঙ্গে প্রচারের ব্যবস্থায় ডিআইটি ভবনে স্থাপিত টেলিভিশন স্টুডিও থেকে ভাষণ রেকর্ড করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

সরকারের প্রদত্ত শর্তাবলি মেনে নিয়েই বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণ তৈরি করেছিলেন, কিন্তু মুসলিম লীগ নেতা ফজলুল কাদের চৌধুরী এবং আবদুল হামিদ খান ভাসানীর পাণ্ডুলিপি নিয়ে কিছু বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল, যা তাঁদের সঙ্গে বিশেষভাবে আলাপ করে মেটাতে হয়েছিল।

বঙ্গবন্ধু টেলিভিশন স্টুডিও-তে এসে তাঁর বাল্যবন্ধু আমির-উজ-জামানকে দেখে খুশি হয়ে উঠেছিলেন, বলেছিলেন– বড় ভাই আমাকে ধরে নিয়ে এলেন, না এসে উপায় কি? (সেই সময়কালে দেশের বেতার ও টেলিভিশন আমাদের দুই ভাই'র আয়ত্তাধীন ছিল) বঙ্গবন্ধুর ভাষণ রেকর্ড করাকালে বিদ্যুৎবিভ্রাট ঘটেছিল এবং দ্বিতীয় বারের প্রচেষ্টায় রেকর্ডিং সঠিক করা হয়েছিল। অন্যান্য নেতার রেকর্ডিং বেতারের স্টুডিও থেকেই করা হয়, তবে মওলানা ভাসানীর কণ্ঠস্বর ধারণের জন্য আমাদের রেকর্ডিং মেশিনসহ কাগমারীতে যেতে হয়েছিল।

অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল দেশে। নির্বাচনী প্রচারণা এবং নির্বাচনের ফলাফল প্রচার নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল বেতারের কর্মচারীদের কয়েকদিন। নির্বাচন শুরু হওয়ার আগেই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বেতার থেকে পুনর্বার তাঁর ভাষণ প্রচার করে দেশবাসীকে জানিয়েছিলেন, দেশে সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন হলে জনপ্রতিনিধিদের হাতেই তিনি তুলে দেবেন দেশের কর্তৃত্বভার।

শেষ পর্যন্ত ইয়াহিয়া খান তাঁর সেই বেতার ভাষণের সত্যতা রক্ষা করতে পারেননি, এবং দেশজুড়ে নেমে এসেছিল দারুণ বিপর্যয়। আওয়ামী লীগ নির্বাচনে শতকরা ৯৭-১০০ ভাগ সার্থকতা অর্জনের পরও দলনেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে ডাকা হল না সরকার গঠনে।

ন্যায়তভাবেই দেশজুড়ে শুরু হয়েছিল গণ-আন্দোলন। বাঙালিরা দেশবিভাগের পর থেকেই নানাভাবে বঞ্চিত হয়েছে তাদের ন্যায্য অধিকারে। সংকল্পবদ্ধ হয়েই শেখ মুজিব দেশজুড়ে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিলেন। দেশের বেতার-টিভিসহ সরকারি সকল অফিস-আদালতই সাড়া দিয়েছিল সেই ডাকে। দেশের কয়েকটি স্থানে পাকিস্তানি সৈন্যদের হাতে নির্যাতিতও হল আন্দোলনকারীরা।

শেখ মুজিব বুঝতে পারছিলেন, আন্দোলন চলাকালে দেশবাসীকে একটা দিক-নির্দেশনা দিতে হবে। খবর আসছিল প্লেন ভরে ভরে সৈন্য এসে জমা হচ্ছে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে। সাবধানবাণীও শোনাতে হবে সকলকে। যেভাবে দেশ চলছে কখন কি ঘটে যাবে বলা যায় না। তিন তারিখ সকালে ছাত্রনেতা তোফায়েল আহমদ আমিনুল হক বাদশাহসহ এসে জানালেন, বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চ রমনার রেসকোর্সে জনগণকে উদ্দেশ করে এক ভাষণ দিচ্ছেন। বেতার থেকে সেই ভাষণ রীলে করে সমস্ত দেশবাসীকে জানানো যায় কিনা জানতে এসেছেন।

খুব সঙ্কটের ভেতর দিয়ে তখন বেতারকে পরিচালনা করতে হচ্ছিল। অসহযোগের ডাক দিয়েছেন শেখ মুজিব। দেশে সামরিক শাসন বর্তমান। একদল পাকিস্তানি সৈন্য এসে বেতার ভবনে অবস্থান নিয়েছে বঙ্গবন্ধু হরতাল আহ্বান করার পর থেকে। উভয় সঙ্কটে বেতার কর্মচারীরা কাজ করে যাচ্ছে। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে রীলে করে প্রতিদিনের খবর এবং ন্যাশনাল হুক-আপ অনুষ্ঠান শোনাচ্ছি সকলকে, আপরদিকে 'আমার সোনার বাংলা' গানসহ আন্দোলনের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেও অনুষ্ঠান প্রচারিত হচ্ছে বেতার থেকে। স্টুডিওর বাইরে থেকে সরকারি অনুষ্ঠান ছাড়া অন্যকিছু প্রচার করা সম্পূর্ণ আইনবিরুদ্ধ।

দেশের সঙ্গে সমন্বয় রেখে অনুষ্ঠান প্রচার করতে না পারলে বেতার বন্ধ করে দিন। পরে কাছে এসে হেসে বলেছিলেন, একবার রবীন্দ্রনাথের 'আমার সোনার বাংলা' গানটি বেতার থেকে প্রচার করতে পারেন না ?

সরকারি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে সমস্ত বেতারকর্মীদের একান্ত সহায়তায় পরদিন বেতার থেকে প্রচারিত হয় 'আমার সোনার বাংলা.....'



ইতোমধ্যে বেতারের সঙ্গে এসে যোগ দিলেন সরকারের তথ্য দপ্তরের তৎকালীন জয়েন্ট সেক্রেটারি জহুরুল হক। তিনি এসে সাহস যোগালেন আমাদের। জানালেন, পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী এখন নিজেদের গোছাতেই ব্যস্ত, কাজে কাজেই বেতার-টেলিভিশনের কোনো প্রচার নিয়ে তারা মাথা ঘামাবে না এখন। বঙ্গবন্ধুর ভাষণ প্রচারের এই সুযোগ আমাদের হাতছাড়া করা উচিত হবে না।

ভাষণ প্রচারের চাপ আসছিল চারদিক থেকেই। আওয়ামী লীগের কর্মকর্তারা আসছিলেন, ছাত্ররা আসছিল, দিন-রাত টেলিফোন আসছিল বিভিন্ন স্তরের মানুষের কাছ থেকে।

বেতার কর্মচারীরা একযোগ হয়েই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল বঙ্গবন্ধুর ভাষণ রীলে করার। আমাদের সিদ্ধান্তের কথা বঙ্গবন্ধুকে জানালে বলেছিলেন, আপনাদের কোনো বিপদের মুখে ফেলতে চাই না, যা করবেন বুঝেসুজে করবেন।

আমাদের আয়োজন এগিয়ে নিয়ে যেতেও কোনো বাধার সৃষ্টি হয়নি সরকার পক্ষের কাছ থেকে। স্টুডিও থেকে বক্তৃতা মঞ্চ পর্যন্ত টেলিফোন লাইন, বিদ্যুৎ সংযোগ, ঢাকার বাইরে বেতার স্টেশনগুলিকে ভাষণ রীলে সম্বন্ধে অবহিত করা– সব কাজই সম্পন্ন হয়েছিল সুনির্দিষ্ট সময়ে। রীলে করার ব্যাপারে কোনো বাধার সৃষ্টি না হওয়াতে আমরা নিশ্চিন্ত মনেই এগিয়ে যাচ্ছিলাম আমাদের কাজ নিয়ে। সতর্কতার জন্যে আগে কোনো ঘোষণা না দিয়ে ৬ মার্চ থেকে ভাষণ প্রচার সম্বন্ধে আমাদের ঘোষণা শুরু হয়েছিল।

বিরাটকায় মঞ্চ তৈরি হয়েছিল রমনার রেসকোর্স ময়দানে। সকাল থেকেই লোকে লোকারণ্য ময়দান। লক্ষ জনতা অপেক্ষা করছে বঙ্গবন্ধুর মঞ্চে আগমনের। আমাদের সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন। চিন্তাও করতে পারিনি আর কোনো বাধা আসতে পারে।

কিন্তু বাধা এসেছিল, প্রচণ্ডভাবেই এসেছিল। বঙ্গবন্ধু তখন মঞ্চে উঠে এসেছেন। লক্ষ লক্ষ মানুষের অভিনন্দন গ্রহণ করে এগিয়ে যাচ্ছেন তাঁর নির্দিষ্ট স্থানের দিকে, ঠিক তখনি বেজে উঠল বেতারের স্টুডিওর সঙ্গে সংযুক্ত টেলিফোন। স্টুডিও প্রান্তে নিযুক্ত বেতার প্রকৌশলীর কণ্ঠস্বর– স্যার, রিলে হচ্ছে না। আমরা চারদিক থেকে আক্রান্ত। তাঁবু থেকে পাক সৈন্যরা বেরিয়ে এসে আমাদের ঘিরে রেখেছে।

জীবনের একটা মস্তবড় পরাজয়ের দিন বলে আমরা মেনে

বঙ্গবন্ধুর বিশেষ আমন্ত্রণে তাঁর শয়নকক্ষে তাঁর পরিবারের সঙ্গে মিলিত হয়ে একসঙ্গে আমরা শুনেছিলাম বঙ্গবন্ধুর সেই ভাষণ। জীবনের একটি স্মরণীয় দিন হয়ে আছে .....

নিয়েছিলাম সেদিন। ডায়াসের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বঙ্গবন্ধুকে জানালে তিনিও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন এবং বক্তৃতা প্রচারের শুরুতেই মাইকে সকলকে জানিয়েছিলেন, তাঁর ভাষণ বেতার থেকে প্রচারিত হচ্ছে না।

বেতারের কর্মীরা কিন্ত এ পরাজয় সহজভাবে মেনে নিতে পারেনি। ভাষণ চলাকালেই আমরা মঞ্চ থেকে নিচে নেমে এসেছিলাম এবং সকলে মিলে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, বেতারে আর ফিরে যাব না।

সান্ধ্য অধিবেশন বিকেল পাঁচটায়। ঢাকা বেতার নীরব হয়ে রইল। বিচলিত হয়ে উঠল কুর্মিটোলায় পাক সামরিক সরকারের কর্মকর্তারা।

হঠাৎ বেতার বন্ধ হয়ে যাওয়াতে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল সমস্ত দেশেই। রাত ন'টার পর আমাদের খুঁজে পেলেন যুগ্ম সচিব জহুরুল হক ধানমণ্ডিতে আওয়ামী লীগ সদস্য নূরুল ইসলামের বাড়িতে। জানালেন, সামরিক শাসনকর্তা রাও ফরমান আলী খান হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছেন আমাদের, তাৎক্ষণিক যোগাযোগ করুন তাঁর সঙ্গে।

টেলিফোন ডায়েল করতেই ফরমান আলীকে পাওয়া গেল, উৎকণ্ঠিত কণ্ঠস্বর– বেতার বন্ধ করলেন কেন? তাৎক্ষণিক চালু করার ব্যবস্থা করুন।

জানালাম, বঙ্গবন্ধুর ভাষণ প্রচার না হলে বেতার পরিচালনা অসম্ভব। কর্মচারীরা কেউ কাজে যোগ দেবে না।

কিন্ত ভাষণ প্রচার কি সম্ভব এখন? দিনের বেলাতেই ভাষণ প্রচার হয়ে গেছে।

সেটা আমাদের ব্যাপার। বাধা না পেলেই হল।

অ্যালাউড, কিন্ত এক্ষুণি বেতার চালু করতে হবে।

অসম্ভব, সব হ্যান্ডস চারদিকে ছড়িয়ে, সকালে যথারীতি চালু হবে। আর একটি কথা।

আরো শর্ত?

না, অনুরোধ, বেতার ভবন থেকে সেনাদল ফিরিয়ে নিতে হবে।

আজ রাতেই তাদের উইদড্র করা হবে।

বিজয়ীর মতোই সেদিন রাত্রেই আমরা নূরুল ইসলামের বাড়ি থেকে বেরিয়ে বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে হাজির হয়েছিলাম। সব শুনে তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, সেটা কি করে সম্ভব হবে, ভাষণের সব কথাতো আমার মনে নেই। জানিয়েছিলাম, আমরা সম্ভব করে তুলব। ভাষণ বেতারে প্রচার না করা গেলেও স্টুডিওতে রেকর্ড করে নেওয়া হয়েছে। তাই প্রচারিত হবে বেতারে।

সব শুনে খুশি হয়ে উঠেছিলেন বঙ্গবন্ধু। পরদিন সকাল ঠিক ৭টায় বেতার স্টেশন চালু করে দেশের লক্ষ লক্ষ উৎকণ্ঠিত মানুষকে জানানো হয়েছিল বেতারে বঙ্গবন্ধুর রমনার রেসকোর্সে প্রদত্ত ভাষণ প্রচারের কথা এবং পূর্ব পাকিস্তানের সবক'টি বেতার কেন্দ্র থেকে একযোগে প্রচারিত হয়েছিল সকাল সাড়ে আটটায় বঙ্গবন্ধুর সেই ঐতিহাসিক ভাষণ।

বঙ্গবন্ধুর বিশেষ আমন্ত্রণে তাঁর শয়নকক্ষে তাঁর পরিবারের সঙ্গে মিলিত হয়ে একসঙ্গে আমরা শুনেছিলাম বঙ্গবন্ধুর সেই ভাষণ। জীবনের একটি স্মরণীয় দিন হয়ে আছে সেই দিনটি।

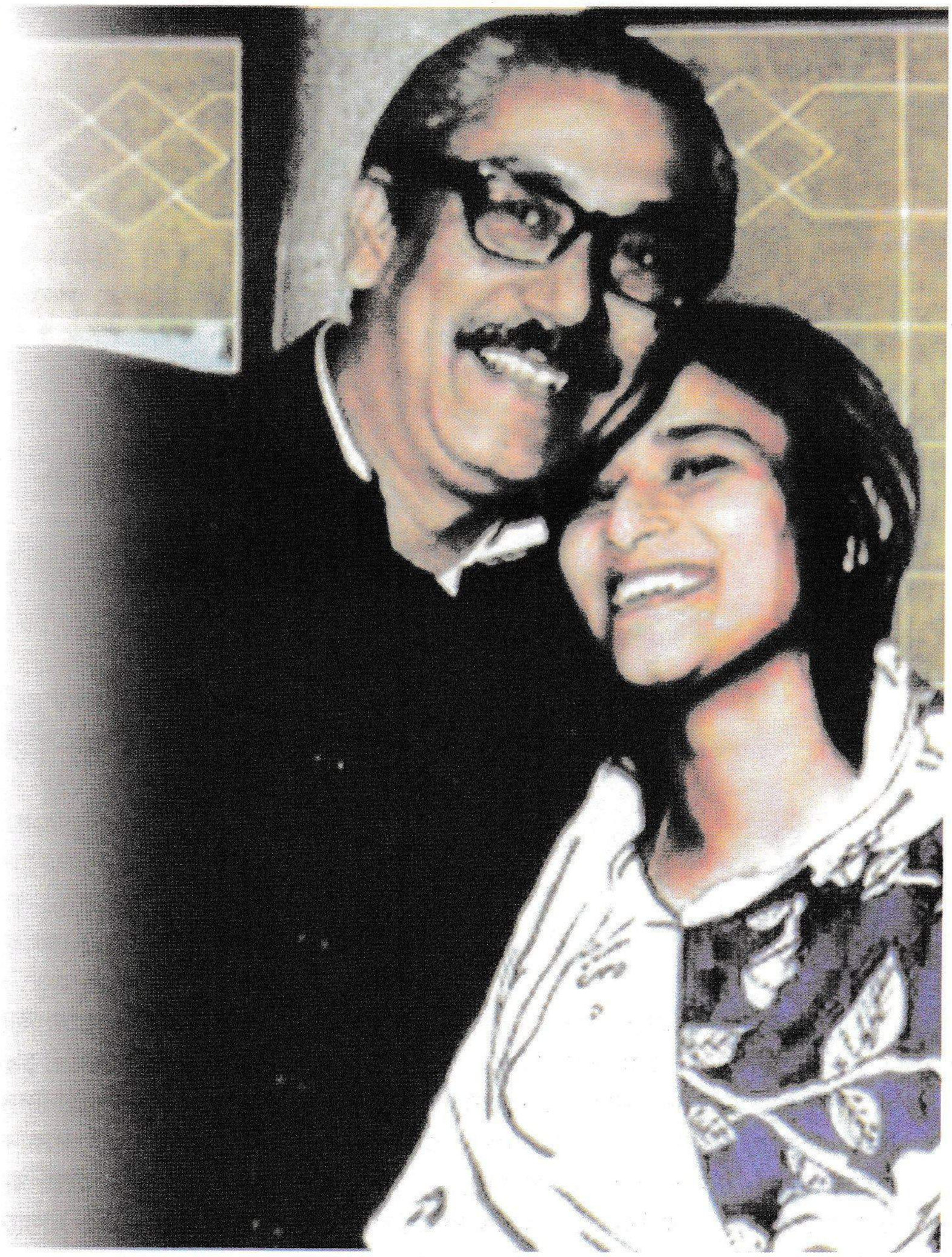
লেখাটি 'বেতার বাংলা'র সংকলন 'ধন্য সেই পুরুষ' থেকে সংকলিত

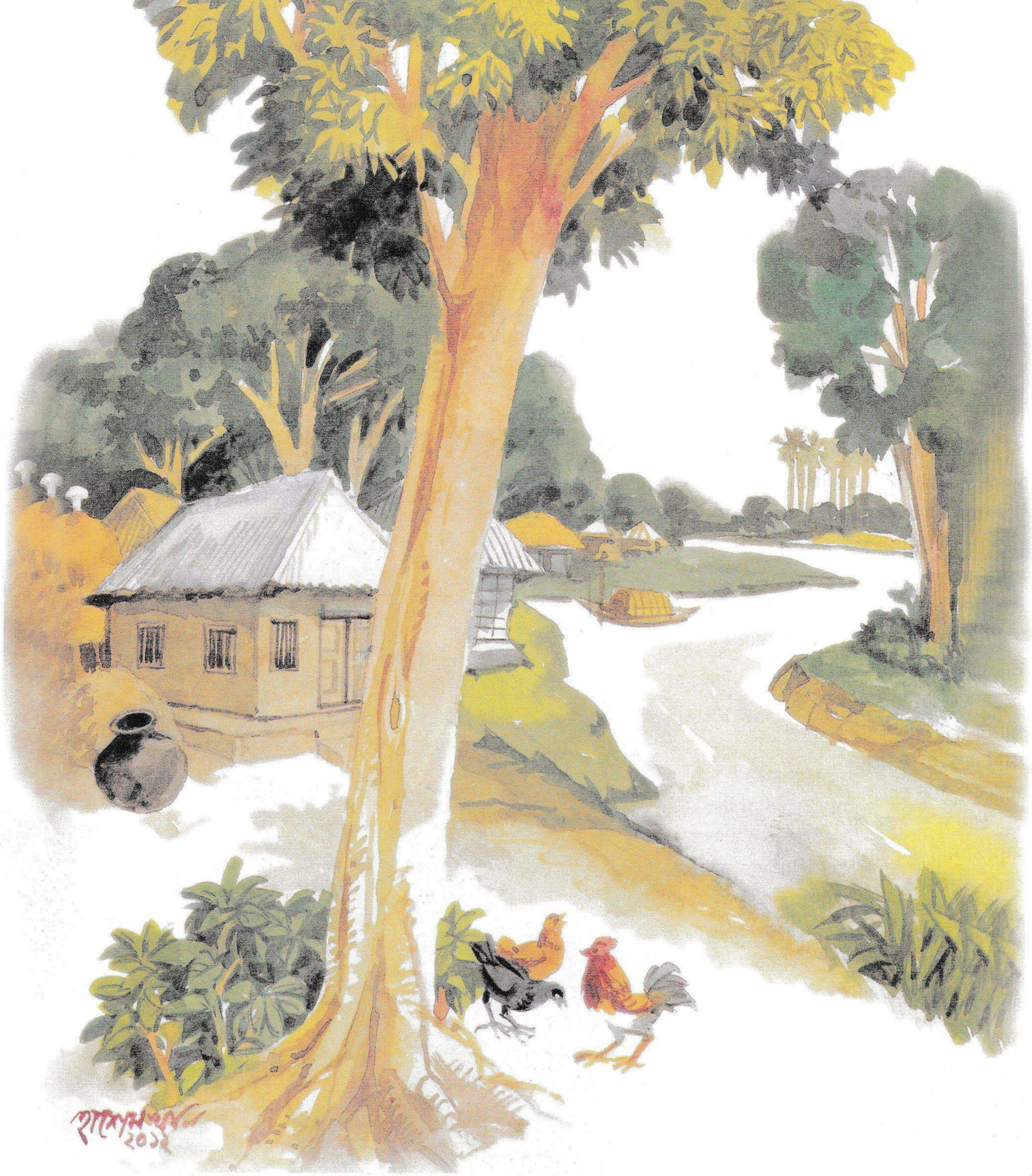
শেখ মুজিব আমার পিতা

শেখ হাসিনা

বাইগার নদী ঘেঁষে ছবির মতো সাজানো সুন্দর একটি গ্রাম। সে গ্রামটির নাম টুঙ্গিপাড়া। বাইগার নদী এঁকেবেঁকে গিয়ে মিশেছে মধুমতী নদীতে। এই মধুমতী নদীর অসংখ্য শাখার একটি বাইগার নদী। নদীর দু'পাশে তাল, তমাল, হিজল গাছের সবুজ সমারোহ। ভাটিয়ালি গানের সুর ভেসে আসে হালধরা মাঝির কণ্ঠ থেকে। পাখির গান আর নদীর কলকল ধ্বনি এক অপূর্ব মনোরম পরিবেশ গড়ে তোলে।

প্রায় দু'শ বছর পূর্বে মধুমতী নদী এই গ্রাম ঘেঁষে বয়ে যেত। এই নদীর তীর ঘেঁষেই গড়ে উঠেছিল জনবসতি। প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে ধীরে ধীরে নদীটি দূরে সরে যায়। চর জেগে গড়ে ওঠে আরো অনেক গ্রাম। সেই দু'শ বছর আগে ইসলাম ধর্ম প্রচারের দায়িত্ব নিয়েই আমাদের পূর্বপুরুষেরা এসে এই নদীবিধৌত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও সুষমামণ্ডিত ছোট্ট গ্রামটিতে তাদের বসতি গড়ে তোলেন। এবং তাঁদের ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল কলকাতা বন্দরকে কেন্দ্র করে। অনাবাদি জমিজমা





চাষবাস শুরু করেন এবং গ্রামে বসবাসকারী কৃষকদের নিয়ে একটা আত্মনির্ভরশীল গ্রাম হিসেবেই এই গ্রামটিকে বেশ বর্ধিষ্ণু গ্রামরূপে গড়ে তোলেন। যাতায়াত ব্যবস্থায় প্রথমে শুধু নৌকাই ছিল একমাত্র ভরসা। পরে গোপালগঞ্জ থানা স্টিমার ঘাট হিসেবে গড়ে ওঠে। আমাদের পূর্বপুরুষেরা টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জমিজমা ক্রয় করে বসতির জন্য কলকাতা থেকে কারিগর ও মিস্ত্রি এনে দালানবাড়ি তৈরি করেন, যা সমাপ্ত হয় ১৮৫৪ সালে। এখনো কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেই দালানের ধ্বংসাবশেষ। ১৯৭১ সালে যে দুটো দালানে বসতি ছিল, পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী আগুন দিয়ে সে দুটোই জ্বালিয়ে দেয়। এই দালানকোঠায় বসবাস শুরু হবার পর ধীরে ধীরে বংশবৃদ্ধি হতে থাকে আর আশপাশে বসতির সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। এই দালানেরই উত্তর-পূর্ব কোণে টিনের চৌচালা ঘর তোলেন আমার দাদার বাবা শেখ আবদুল হামিদ। আমার দাদা

শেখ লুৎফর রহমান এই বাড়িতেই সংসার গড়ে তোলেন। আর এখানেই জন্ম নেন আমার আব্বা, ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ। আমার আব্বার নানা শেখ আবদুল মজিদ আমার আব্বার আকিকার সময় নাম রাখেন শেখ মুজিবুর রহমান। আমার দাদির দুই কন্যা সন্তানের পর প্রথম পুত্র সন্তান, আমার আব্বা। আর তাই আমার দাদির বাবা তাঁর সমস্ত সম্পত্তি দাদিকে দান করেন এবং নাম রাখার সময় বলে যান, 'মা সায়রা, তোর ছেলের নাম এমন রাখলাম, যে নাম জগৎজোড়া খ্যাত হবে।'

আমার আব্বার শৈশব কেটেছিল টুঙ্গিপাড়ার নদীর পানিতে ঝাঁপ দিয়ে, মেঠোপথের ধুলোবালি মেখে, বর্ষার কাদাপানিতে ভিজে। বাবুই পাখি বাসা কেমন করে গড়ে তোলে, মাছরাঙা কীভাবে ডুব দিয়ে মাছ ধরে, কোথায় দোয়েল পাখির বাসা– এসব দেখে। দোয়েল পাখির সুমধুর সুর আমার আব্বাকে দারুণভাবে আকৃষ্ট করত। আর তাই গ্রামের ছোট ছোট ছেলেদের সঙ্গে করে মাঠেঘাটে ঘুরে প্রকৃতির সাথে মিশে বেড়াতে তাঁর ভালো লাগত। ছোট্ট শালিক পাখির ছানা, ময়না পাখির ছানা ধরে তাদের কথা বলা ও শিস দেওয়া শেখাতেন। বানর ও কুকুর পুষতেন, তারা তাঁর কথামতো যা বলতেন তাই করত। আবার এগুলো দেখাশোনার ভার দিতেন ছোট বোন হেলেনের উপর। এ পোষা পাখি, জীবজন্তুর প্রতি এতটুকু অবহেলা তিনি সইতে পারতেন না। মাঝে মাঝে এজন্য ছোট বোনকে বকাও খেতে হত। আমাদের বাড়ির দক্ষিণ-পশ্চিম দিক ঘেঁষে একটা সরু খাল চলে গেছে, যে খাল মধুমতী ও বাইগার নদীর সংযোগ রক্ষা করে। এই খালের পাড়েই ছিল বড় কাছারি ঘর। আর এই কাছারি ঘরের পাশে মাস্টার, পণ্ডিত ও মৌলভী সাহেবদের থাকার ঘর ছিল। এঁরা গৃহশিক্ষক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত ছিলেন এবং তাঁদের কাছে আমার আব্বা আরবি, বাংলা, ইংরেজি ও অঙ্ক শিখতেন।

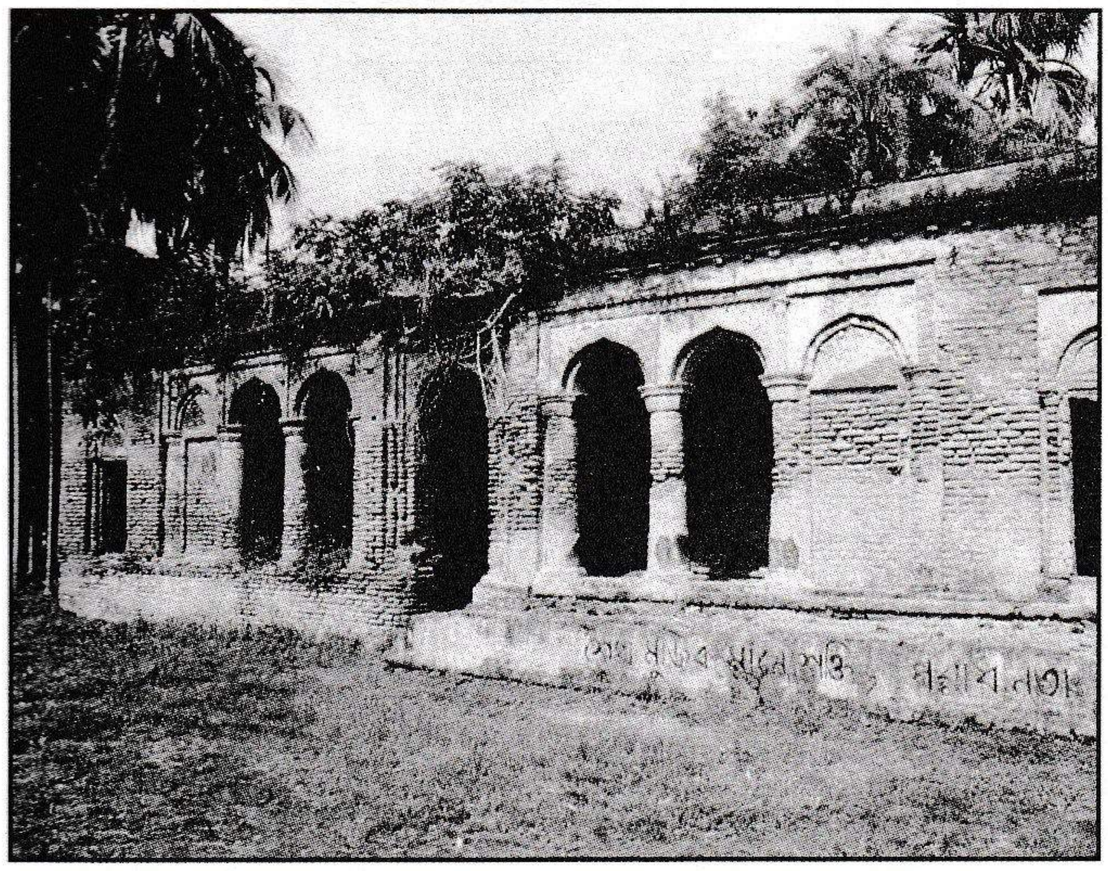
আমাদের পূর্বপুরুষদেরই গড়ে তোলা গিমাডাঙ্গা টুঙ্গিপাড়া স্কুল। তখন ছিল প্রাথমিক বিদ্যালয়। বাড়ি থেকে প্রায় সোয়া কিলোমিটার দূর। আমার আব্বা এই স্কুলেই প্রথম লেখাপড়া করেন। একবার বর্ষাকালে নৌকা করে স্কুল থেকে ফেরার সময় নৌকাডুবি হয়ে যায়। আমার আব্বা খালের পানিতে পড়ে যান। এরপর আমার দাদি তাঁকে আর ঐ স্কুলে যেতে দেননি। একরত্তি ছেলে, চোখের মণি, গোটা বংশের আদরের দুলাল, তাঁর এতটুকু কষ্ট যেন সকলেরই কষ্ট! সেই স্কুল থেকে নিয়ে গোপালগঞ্জ মিশনারি স্কুলে ভর্তি করে দেন। গোপালগঞ্জ আমার দাদার কর্মস্থল ছিল। সেই থেকে গোপালগঞ্জেই তিনি পড়ালেখা করতে শুরু করেন। মাঝখানে একবার দাদা মাদারীপুর বদলি হন। তখন কিছুদিনের জন্য মাদারীপুরেও আব্বা লেখাপড়া করেন। পরে গোপালগঞ্জেই তাঁর কৈশোরবেলা কাটে।

আমার আব্বার শরীর ছিল বেশ রোগা। তাই আমার দাদি সব সময়ই ব্যস্ত থাকতেন কীভাবে তাঁর খোকার শরীর ভালো

আব্বার শৈশব কেটেছিল টুঙ্গিপাড়ার নদীর পানিতে ঝাঁপ দিয়ে, মেঠোপথের ধুলোবালি মেখে, বর্ষার কাদাপানিতে ভিজে। বাবুই পাখি বাসা কেমন করে গড়ে তোলে, মাছরাঙা কীভাবে ডুব দিয়ে মাছ ধরে, ... দোয়েল পাখির সুমধুর সুর আমার আব্বাকে দারুণভাবে আকৃষ্ট করত।

করা যায়। আদর করে দাদা-দাদিও খোকা বলেই ডাকতেন। আর ভাইবোন গ্রামবাসীর কাছে ছিলেন 'মিয়াভাই' বলে পরিচিত। গ্রামের সহজসরল মানুষদের সঙ্গে অত্যন্ত সহজভাবে মিশতেন। আমার দাদি সবসময় ব্যস্ত থাকতেন খোকার শরীর সুস্থ করে তুলতে। তাই দুধ, ছানা, মাখন ঘরেই তৈরি হত। বাগানের ফল, নদীর তাজা মাছ সব সময় খোকার জন্যে বিশেষভাবে প্রস্তুত থাকত। কিন্তু আমার আব্বা ছোট্টবেলা থেকেই ছিপছিপে পাতলা ছিলেন, তাই দাদীর আফসোসেরও





১৯৭১ সালে পাক হানাদার বাহিনী আমাদের বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়ার পর ধ্বংসপ্রাপ্ত অবশিষ্ট অংশ

সীমা ছিল না যে, কেন তাঁর খোকা একটু হৃষ্টপুষ্ট নাদুসনুদুস হয় না! খাবার বেলায় খুব সাধারণ ভাত, মাছের ঝোল, সব্জিই তিনি পছন্দ করতেন। খাবার শেষে দুধ-ভাত-কলা ও গুড় খুব পছন্দ করতেন। আমার চার ফুফু এক চাচা ছিলেন। এই চার বোনের মধ্যে দুই বোন বড় ছিলেন। ছোট্ট ভাইটির যাতে কোনো কষ্ট না হয়, এজন্য সদাসর্বদা ব্যস্ত থাকতেন বড় দুই বোন। বাকিরা ছোট্ট, কিন্তু দাদা-দাদির কাছে খোকার আদর ছিল সীমাহীন। আমাদের বাড়িতে আশ্রিতের সংখ্যাও ছিল প্রচুর। আমার দাদার বা দাদির বোনদের ছেলেমেয়ে, বিশেষ করে যারা পিতৃহারা-মাতৃহারা তাদেরকে দাদা-দাদির নিজেদের কাছে এনেই মানুষ করতেন। আর তাই প্রায় সতের-আঠারজন ছেলেমেয়ে একই সঙ্গে বড় হয়ে ওঠে।

আব্বার যখন দশ বছর বয়স, তখন তাঁর বিয়ে হয়। আমার মায়ের বয়স ছিল মাত্র তিন বছর। আমার মা পিতৃহারা হবার পর তাঁর দাদা এই বিয়ে দিয়ে সমস্ত সম্পত্তি মা ও খালার নামে লিখে দেন। আমার খালা মায়ের থেকে তিন-চার বছরের বড়। আত্মীয়ের মধ্যেই দুই বোনকে বিয়ে দেন এবং আমার দাদাকে (গার্ডিয়ান) মুরুব্বি করে দেন। আমার মার যখন ছয়-সাত বছর বয়স, তখন তাঁর মা মারা যান। এবং তখন আমার দাদি কোলে তুলে নেন আমার মাকে। আর সেই থেকে একই সঙ্গে সব ছেলেমেয়ের সঙ্গে তিনি বড় হতে থাকেন।

আমার আব্বার লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলার প্রতি দারুণ ঝোঁক ছিল। বিশেষ করে ফুটবল খেলতে খুব পছন্দ করতেন। মধুমতী নদী পার হয়ে চিতলমারী ও মোল্লারহাট যেতেন খেলতে। গোপালগঞ্জে স্কুলের টিম ছিল। এদিকে আমার দাদাও খেলতে পছন্দ করতেন। আব্বা যখন খেলতেন, তখন দাদাও মাঝে মাঝে খেলা দেখতে যেতেন। দাদা আমাদের কাছে গল্প করতেন যে, 'তোমার আব্বা এত রোগা ছিল যে, বলে জোরে লাথি মেরে মাঠে গড়িয়ে পড়ত।' আব্বা যদি ধারেকাছে থাকতেন, তবে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করতেন। আমরা তখন সত্যিই খুব মজা পেতাম। এর পেছনে মজার ঘটনা হল, মাঝে মাঝে আব্বার টিম ও দাদার টিমের মধ্যেও খেলা হত। এখনো আমি যখন ঐ সমস্ত এলাকায় যাই, অনেক বয়স্ক লোকের সঙ্গে পরিচয় হয়– যারা আব্বার ছোটবেলার কথা বলেন। আমাদের বাড়িতে এই খেলার অনেক ফটো ও কাগজ ছিল। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী আমাদের বাড়ি পুড়িয়ে দেয়। ফলে সব শেষ হয়ে যায়।

তিনি ছোটবেলা থেকে অত্যন্ত হৃদয়বান ছিলেন। তখনকার দিনে ছেলেদের পড়াশোনার তেমন সুযোগ ছিল না। অনেকে বিভিন্ন বাড়িতে জায়গির থেকে পড়াশোনা করত। চার-পাঁচ মাইল পথ হেঁটে স্কুলে আসতে হত। সকালে ভাত খেয়ে স্কুলে আসত। আর সারাদিন অভুক্ত অবস্থায় অনেকদূর হেঁটে তাদের ফিরতে হত। যেহেতু আমাদের বাড়িটা ছিল ব্যাংকপাড়ায়, আব্বা তাদেরকে বাড়িতে নিয়ে আসতেন। স্কুল থেকে ফিরে দুধভাত খাবার অভ্যাস ছিল এবং সকলকে নিয়েই তিনি খাবার খেতেন। দাদির কাছে শুনেছি, আব্বার জন্যে মাসে কয়েকটা ছাতা কিনতে হত। কারণ আর কিছুই নয়– কোনো ছেলে গরিব, ছাতা কিনতে পারে না, দূরের পথ রোদ বা বৃষ্টিতে কষ্ট হবে দেখে তাকে ছাতা দিয়ে দিতেন। এমন কি পড়ার বইও মাঝে মাঝে দিয়ে দিতেন।

দাদির কাছে গল্প শুনেছি, যখন ছুটির সময় হত, তখন দাদি আমগাছের নিচে এসে দাঁড়াতেন। খোকা আসবে, দূর থেকে রাস্তার উপর নজর রাখতেন। একদিন দেখেন তাঁর খোকা গায়ে চাদর জড়িয়ে হেঁটে আসছে, পরনের পাজামা-পাঞ্জাবি নেই। কী ব্যাপার? এক গরিব ছেলেকে তার শতছিন্ন কাপড় দেখে সব দিয়ে এসেছেন।

আমার দাদা-দাদি অত্যন্ত উদার প্রকৃতির ছিলেন। আমার আব্বা যখন কাউকে কিছু দান করতেন, তখন কোনোদিনই তাঁকে বকাঝকা করতেন না, বরং উৎসাহ দিতেন। আমার দাদা ও দাদির এই উদারতার আরো অনেক নজির রয়েছে।

স্কুলে পড়তে পড়তে আব্বার বেরিবেরি রোগ হয় এবং চোখ খারাপ হয়ে যায়। ফলে চার বছর লেখাপড়া বন্ধ থাকে। তিনি সুস্থ হবার পর পুনরায় স্কুলে ভর্তি হন। এই সময় আব্বার একজন গৃহশিক্ষক ছিলেন, তাঁর নাম ছিল হামিদ মাস্টার। তিনি ছিলেন ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় এবং বহু বছর জেল খাটেন। পরবর্তী পর্যায়ে আব্বা বিভিন্ন সময় যখন জেলে থাকতেন অথবা পুলিশ গ্রেফতার করতে আসত, আমার দাদি মাঝে মাঝেই সেই মাস্টার সাহেবের নাম নিতেন আর কাঁদতেন। এমনিতে আমার দাদা-দাদি অত্যন্ত উদার মনের মানুষ ছিলেন। ছেলের কোনো কাজে কখনো তাঁরা বাধা দিতেন না, বরং



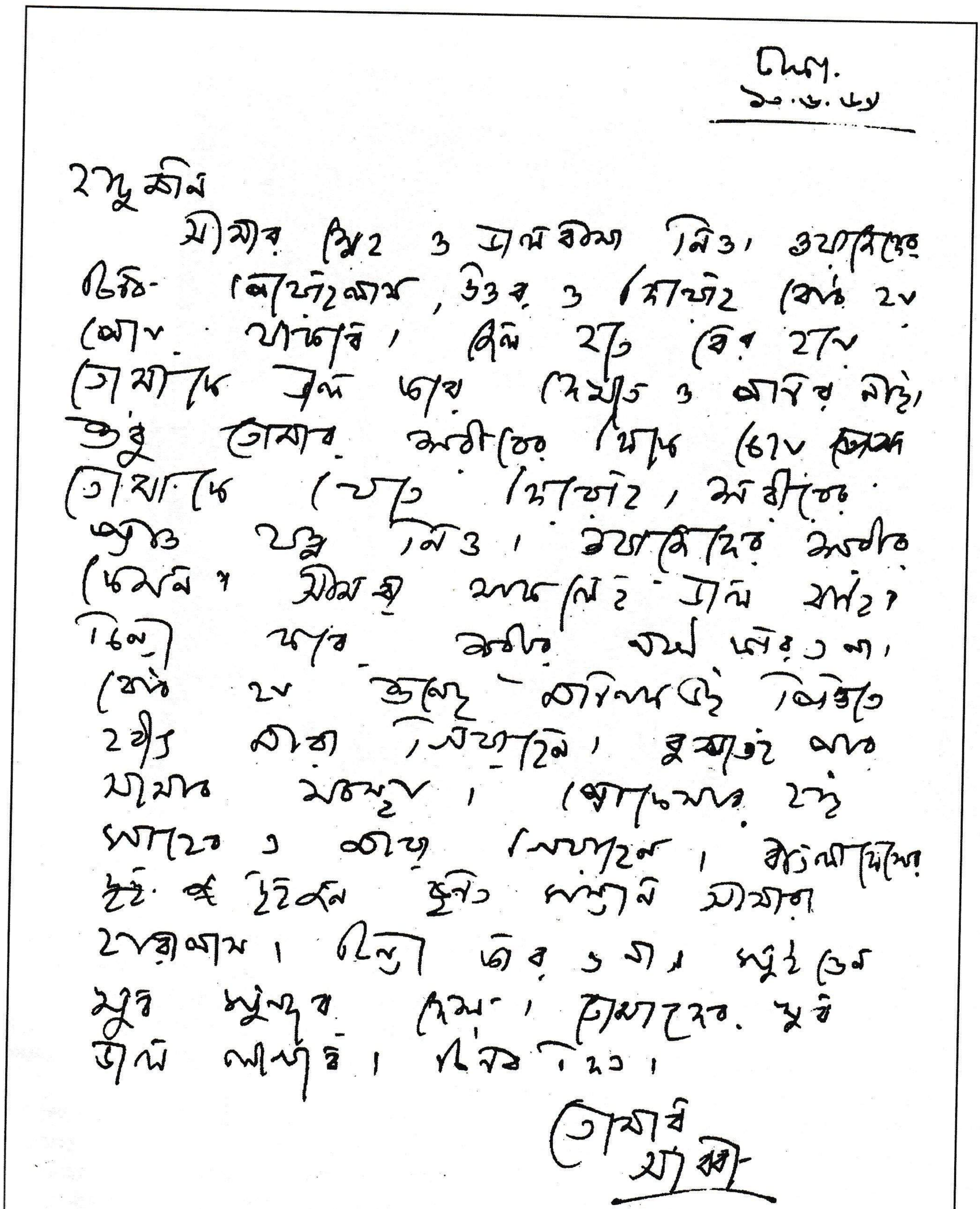
বাবা-মার আদর সেই ছোটবেলা থেকে সব সময়ই পেয়েছেন

উৎসাহ দিতেন। অত্যন্ত মুক্ত পরিবেশে আমার বাবার মনের বিকাশ ঘটেছে। প্রতিটি কাজ যখনই যেটা ন্যায়সঙ্গত মনে হয়েছে, আমার দাদা তা করতে নিষেধ না করে বরং উৎসাহ দিয়েছেন।

আব্বার একজন স্কুল মাস্টার ছোট্ট একটা সংগঠন গড়ে তুলে বাড়ি বাড়ি ঘুরে ধান, টাকা, চাল যোগাড় করে গরিব মেধাবী ছেলেদের সাহায্য করতেন। অন্যতম সক্রিয় কর্মী হিসেবে আব্বা তাঁর সঙ্গে কাজ করতেন এবং অন্যদের উৎসাহ দিতেন। যেখানেই কোনো অন্যায় দেখতেন, সেখানেই তিনি প্রতিবাদ করতেন। একবার একটি অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে তিনি প্রথম সরকার সমর্থকদের দ্বারা ষড়যন্ত্রের শিকার হন ও গ্রেফতার হয়ে কয়েকদিন জেলে থাকেন।

কৈশোরেই তিনি খুব বেশি অধিকার সচেতন ছিলেন। একবার যুক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শেরেবাংলা গোপালগঞ্জে সফরে যান এবং স্কুল পরিদর্শন করেন। সেই সময় সাহসী কিশোর মুজিব তাঁর কাছে স্কুলঘরে বর্ষার পানি পড়ার অভিযোগ তুলে ধরেন এবং মেরামত করাবার অঙ্গীকার আদায় করে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

গোপালগঞ্জ স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করে তিনি কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে পড়তে যান। তখন বেকার হোস্টেলে থাকতেন। এই সময় তিনি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সংস্পর্শে আসেন। হলওয়েল মনুমেন্ট আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন সক্রিয়ভাবে। এই সময় থেকে তাঁর রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ শুরু হয়।



১৯৪৭ সালে তিনি বি. এ. পাস করেন। পাকিস্তান-ভারত ভাগ হবার সময়ে দাঙ্গা হয়, তখন দাঙ্গা দমনে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। কাজ করে যেতেন নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে। আমার মেজো ফুফু তখন কলকাতায় থাকতেন। ফুফুর কাছে শুনেছি, মাঝে মাঝে অভুক্ত অবস্থায় হয়তো দুদিন বা তিন দিন কাজ করে গেছেন। মাঝেমাঝে যখন ফুফুর খোঁজখবর নিতে যেতেন তখন ফুফু জোর করে কিছু খাবার খাইয়ে দিতেন। অন্যায়কে তিনি কোনোদিনই প্রশ্রয় দিতেন না। ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য জীবনের ঝুঁকি নিতে তিনি কখনো পিছ-পা হননি।

পাকিস্তান হবার পর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে ভর্তি হন। তখন তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের আন্দোলনে সমর্থন দেন ও সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। সচিবালয়ের সামনে অবস্থান ধর্মঘট করতে গিয়ে গ্রেফতার হন। অল্প কয়েকদিন পর মুক্তি পান। এই সময় পাকিস্তানের প্রতিটি বাঙালি প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। ছাত্র সমাজ এই আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। এই আন্দোলনে ১৯৪৯ সালে আমার আব্বা গ্রেফতার হন। আমি তখন খুবই ছোট্ট, আর আমার ছোট্ট ভাই কামাল কেবল জন্মগ্রহণ করেছে। আব্বা ওকে দেখারও সুযোগ পাননি।

একটানা ১৯৫২ সাল পর্যন্ত তিনি বন্দি ছিলেন। সেই সময়ে আমাদের দুই ভাইবোনকে নিয়ে আমার মা দাদা-দাদির কাছেই থাকতেন। একবার একটা মামলা উপলক্ষে আব্বাকে গোপালগঞ্জ নিয়ে যাওয়া হয়। কামাল তখন অল্প অল্প কথা বলা শিখেছে। কিন্তু আব্বাকে ও কখনো দেখেনি, চেনেও না। আমি যখন বারবার আব্বার কাছে ছুটে যাচ্ছি, 'আব্বা আব্বা' বলে ডাকছি, ও শুধু অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছে। গোপালগঞ্জ থানায় একটি বড় পুকুর আছে, যার পাশে বড় খেলার মাঠ। ঐ মাঠে আমরা দুই ভাইবোন খেলা করতাম ও ফড়িং ধরার জন্য ছুটে বেড়াতাম। আর মাঝেমাঝেই আব্বার কাছে ছুটে আসতাম। অনেক ফুলপাতা কুড়িয়ে এনে থানার বারান্দায় কামালকে নিয়ে খেলতে বসেছি। ও হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'হাসু আপা, তোমার আব্বাকে আমি একটু আব্বা বলি?' কামালের সেই কথা আজ যখন মনে পড়ে, আমি তখন চোখের পানি রাখতে পারি না! আজ ও নেই, আমাদের আব্বা বলে ডাকারও কেউ নেই। ঘাতকের বুলেট শুধু আব্বাকেই ছিনিয়ে নেয়নি; আমার মা, কামাল, জামাল, ছোট্ট রাসেলও রেহাই পায়নি। রেহাই পায়নি কামাল-জামালের নবপরিণীতা বধূ সুলতানা ও রোজী, যাদের হাতের মেহেদির রং বুকের রক্তে মিশে একাকার হয়ে গেছে। খুনিরা এখানেই শেষ করেনি, আমার একমাত্র চাচা শেখ নাসের, তরুণ নেতা আমার ফুপাত ভাই শেখ মণি, আমার ছোট্টবেলার খেলার সাথী শেখ মণির অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী আরজুকে খুন করেছে। এই খুনিরা একই সাথে আক্রমণ করেছে আবদুর রব সেরনিয়াবত (আমার ফুফা), তাঁর তের বছরের কন্যা বেবী, দশ বছরের ছেলে আরিফকে; তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র আবুল হাসানাত আবদুল্লাহর চার বছরের শিশুপুত্র বাবুও খুনিদের হাত থেকে রেহাই পায়নি। কর্নেল জামিল, যিনি আমার পিতার জীবন রক্ষার জন্য ঘুম থেকে উঠে ছুটে এসেছিলেন, তাঁকেও তারা হত্যা করে। এ কেমন বর্বর

বারান্দায় কামালকে নিয়ে খেলতে বসেছি। ও হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'হাসু আপা, তোমার আব্বাকে আমি একটু আব্বা বলি?' কামালের সেই কথা আজ যখন মনে পড়ে, আমি তখন চোখের পানি রাখতে পারি না!



শেখ হাসিনা ও শেখ কামাল

নিষ্ঠুরতা? আজো গুলির আঘাতে পঙ্গু হয়ে আছেন আমার মেজো ফুফু।

সেদিন কামাল আব্বাকে ডাকার অনুমতি চেয়েছিল, আমি সঙ্গে সঙ্গে ওকে আব্বার কাছে নিয়ে যাই। আব্বাকে ওর কথা বলি। আব্বা ওকে কোলে তুলে নিয়ে অনেক আদর করেন। আজ আর তাঁরা কেউ বেঁচে নেই। আজ বারবার আমার মন আব্বাকে ডাকার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। মায়ের স্নেহ, ভাইদের সান্নিধ্য পাবার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকি। কিন্তু শত চিৎকার করলেও তো কাউকে আমি পাব না। কেউ তো আর সাড়া দিতে পারবে না। তাঁদের জীবন নৃশংসভাবে বুলেট দিয়ে চিরদিনের মতো যে ঘাতকেরা স্তব্ধ করে দিল, তাদের কি বিচার হবে না?

[রচনাকাল : ১৩ আগস্ট ১৯৯১]

বিদেশি সাংবাদিকদের মোকাবিলায় বঙ্গবন্ধু

এম আর আখতার মুকুল

আমার সৌভাগ্য যে, প্রায় তিন দশক ধরে আমি বঙ্গবন্ধুর রাজনীতি এবং কর্মদক্ষতা অন্তরঙ্গ আলোকে দেখেছি। আজকের নিবন্ধ তারই ছোট্ট দু'টি ঘটনার স্মৃতিচারণ। ১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসের কথা। তখন সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সবেমাত্র প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। এসময় তিনজন মার্কিনী সাংবাদিক এলেন বাংলাদেশ সফরে। উদ্দেশ্য হচ্ছে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ সম্পর্কে রিপোর্ট সংগ্রহের পর প্রধানমন্ত্রীকে ইন্টারভিউ করা। কিন্তু দু'দিন ধরে চেষ্টা করেও মার্কিনী সাংবাদিকরা সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত স্থানীয় জনৈক সাংবাদিক এ মর্মে পরামর্শ দিলেন যে, বঙ্গবন্ধু দুপুরে সামান্য বিশ্রামের পর প্রতিদিন বিকাল সাড়ে ৪টা নাগাদ পুরনো গণভবনে অফিসের জরুরি ফাইল দেখা এবং রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্যে আগমন করে থাকেন। তাই আগে থেকেই গণভবনের গাড়ি-বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকলে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবের সঙ্গে কথাবার্তা হতে পারে।

এই পরামর্শেই কাজ হল। তিনজন মার্কিনী সাংবাদিক সেদিন বিকাল ৪টা থেকে পুরনো গণভবনের গাড়ি-বারান্দায় পায়চারি করতে লাগল। ঠিক বিকাল সাড়ে ৪টায় শীতের পড়ন্ত রোদে একটা পতাকাবাহী গাড়িতে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান হাজির হলেন। গাড়ি থেকে নামার মুহূর্তে সাদা চামড়ার সাংবাদিকদের দেখে তাঁর ভ্রূ দুটো কুঁচকে উঠল। ইন্টারভিউ দেয়ার আর শেষ নেই নাকি? তাই নেমেই তিনি বারান্দা দিয়ে হন হন করে গণভবনের পিছনের দিকে রওনা হলেন। সাংবাদিকরাও নাছোড়বান্দা, তারাও দ্রুত প্রধানমন্ত্রীর পিছু নিলেন। এরপর বারান্দায় দাঁড়িয়ে কথোপকথন ছিল নিম্নরূপ :

১ম সাংবাদিক : মি. প্রাইম মিনিস্টার, আমরা আপনাকে ইন্টারভিউ করতে চাই। কিন্তু আমরা সে সুযোগ পাচ্ছি না কেন? আপনি কি বিদেশি সাংবাদিকদের ভয় পান?

শেখ মুজিব : প্রথমেই আমি আপনাদের একটা পাল্টা প্রশ্ন করতে চাই। আপনারা কোনোরকম এপয়েন্টমেন্ট ছাড়াই আমার সঙ্গে কথা বলছেন। আমাদের বাংলাদেশের কোনো সাংবাদিক কি এভাবে মার্কিনী প্রেসিডেন্ট নিক্সনের সঙ্গে কথা বলা কিংবা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার সুযোগ পাবে? আর ভয়ের কথা বলছেন? শেখ মুজিব তার যৌবনের প্রায় অর্ধেকটাই কাটিয়েছে কারাগারের অভ্যন্তরে। আর জীবনে দু'দুবার রাষ্ট্রদ্রোহিতার মিথ্যা ষড়যন্ত্র মামলার ফাঁসির আসামি ছিল। তাই শেখের ডিকশনারিতে ভয় বলে কোনো শব্দ নেই। আপনারা আমাকে যেকোনো প্রশ্ন জিজ্ঞেসা করতে পারেন।

২য় সাংবাদিক: মি. প্রাইম মিনিস্টার, আপনি কি অস্বীকার করতে পারেন যে, বর্তমানে বাংলাদেশে আইন ও শৃঙ্খলাজনিত পরিস্থিতি খুবই খারাপ? এর উন্নতির জন্যে আপনার সরকার কি ধরনের ব্যবস্থা নিয়েছে? পরিস্থিতির উন্নতি হওয়ার আদৌ কোনো সম্ভাবনা আছে কি?

শেখ মুজিব: আমি এতক্ষণ এ ধরনের একটা প্রশ্ন আশা করেছিলাম। আসুন, আমরা পরিস্থিতি বুঝবার জন্য একটা পরীক্ষা করি। আপনারা নিশ্চয়ই হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে (শেরাটন) উঠেছেন? তাহলে আজ গভীর রাতে– ধরুন, ১১টা কিংবা ১২টা নাগাদ কোনো গার্ড ছাড়াই আপনারা একাকী পায়ে হেঁটে এই গণভবন থেকে হোটেলে যাবেন। আমি দেখতে চাই, আপনাদের কেউ ছিনতাই কিংবা স্পর্শ করে কিনা?

২য় সাংবাদিক : এটা আবার কি ধরনের পরীক্ষা?

শেখ মুজিব : শোনেন সাহেবরা। আইন-শৃঙ্খলার কথাই যখন ওঠালেন, তখন আমি আপনাদের ছোট্ট একটা প্রশ্ন করতে চাই। দুনিয়ার সবচেয়ে সভ্য দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। সেই দেশের সবচেয়ে বড় দু'টো মহানগরী হচ্ছে নিউইয়র্ক আর শিকাগো সিটি। তাহলে আমাকে বলতে পারেন কি– এদু'টো মহানগরীতে কোনো মহিলাতো দূরের কথা, কোনো ভদ্রলোকের পক্ষে সন্ধ্যার পর ফুটপাত দিয়ে হেঁটে যাওয়া কি সম্ভব?

৩য় সাংবাদিক : মি. প্রাইম মিনিস্টার, আপনিতো আমার

আমার তো মনে হয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও নিগ্রোরা সেদেশের বস্তিগুলোতে যেভাবে জীবনযাপন করছে, সে তুলনায় বাংলাদেশের বিহারিরা অনেক ভালো আছে।

প্রশ্নগুলো এড়িয়ে যাচ্ছেন?

শেখ মুজিব: আমি কোথায় প্রশ্ন এড়ালাম? পরিস্থিতি ভালো করে বোঝাবার জন্যে আমিতো শুধুমাত্র আপনাদের সুসভ্য দেশের সঙ্গে আমাদের দেশের আইন-শৃঙ্খলাজনিত পরিস্থিতির তুলনা করলাম মাত্র।

৩য় সাংবাদিক: এবার আমি আপনাকে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করতে চাই।

শেখ মুজিব: আমি সানন্দে প্রশ্নের জবাব দিব। কিন্তু এটাই হবে আপনাদের শেষ প্রশ্ন। আমার জরুরি কাজ রয়েছে।

৩য় সাংবাদিক: মি. প্রাইম মিনিস্টার, আপনি বিহারিদের ব্যাপারে কী পদক্ষেপ নিয়েছেন? বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্যাম্পে কয়েক লাখ বিহারি পরিবার যে নারকীয় অবস্থায় জীবনযাপন করছে তা স্বচক্ষে দেখার জন্যে আপনি ফুরসত পেয়েছেন কি?

শেখ মুজিব: আপনি আমাকে একই সঙ্গে দু'টো প্রশ্ন করেছেন। প্রথমটার উত্তর সোজা, এসব বিহারি একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর দোসর হিসেবে নির্বিচারে নারীধর্ষণ, লুণ্ঠন এবং অগ্নিসংযোগের মতো মানবতাবিরোধী কাজে লিপ্ত ছিল। তবুও স্বাধীন বাংলাদেশে এরা প্রাণে রক্ষা পেয়েছে। উপরন্তু এরা আন্তর্জাতিক রেডক্রসের মাধ্যমে নিজেদের পাকিস্তানি নাগরিক হিসেবে দাবি জানিয়েছে। স্বাভাবিকভাবে এদের পুরো দায়িত্বই হচ্ছে পাকিস্তান সরকারের। এখন সবার উচিত হবে, পাকিস্তান সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ করে বিহারিদের পাকিস্তানে ফেরত নেওয়ার ব্যবস্থা করা।

দ্বিতীয়ত, আপনি এদের ক্যাম্প জীবনের অবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন করেছেন। আমার তো মনে হয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও নিগ্রোরা সেদেশের বস্তিগুলোতে যেভাবে জীবন-যাপন করছে, সে তুলনায় বাংলাদেশের বিহারিরা অনেক ভালো আছে। কেমন কিনা? (মুচকি হেসে) আপনাদের সংবাদপত্রে আমার জবাবগুলো হুবহু ছাপালে আমি খুশিই হবো। ধন্যবাদ।

[দুই]

মাত্র দিন কয়েকের ব্যবধানে আলোচ্য মার্কিনী সাংবাদিকদের প্রশ্নের বিষয় থেকে শুরু করে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার স্টাইল ও ধরনের সঙ্গে ব্রিটিশ নাগরিক ও সাংবাদিক অ্যান্থনী ম্যাসকার্নহাসের প্রশ্ন ও স্টাইলের হুবহু মিল দেখে চমকে উঠলাম। তাহলে কি এসব সাম্প্রতিক ঘটনাবলির মধ্যে একটা গোপন যোগসূত্র রয়েছে?

সাংবাদিক সাক্ষাৎকারের একেবারের শেষ পর্যায়ে এসে হঠাৎ করে ম্যাসকার্নহাসের চেহারা পরিবর্তন হল। মুহূর্তে বিলীন হল রাগান্বিত ভাব, চেহারায় উদ্ভাসিত হল এক অমায়িক হাসি। এবার কথোপকথন হচ্ছে নিম্নরুপ:

ম্যাসকার্নহস: মি. প্রাইম মিনিস্টার, আমি আপনাকে আর বিরক্ত করব না। আপনার সঙ্গে আমার মাত্র দু'মিনিটের একটা গোপন কথা রয়েছে। ঘর খালি হলে বলতে পারি।

শেখ মুজিব: তথ্য দফতরের মহাপরিচালক এম আর আখতার মুকুলের সামনে আপনি নিশ্চিন্তে কথা বলতে পারেন। ও তো আপনার পূর্বপরিচিত, কেমন কিনা? আমাদের খুব বিশ্বাসী অফিসার।

ম্যাসকার্নহাস: মুজিব ভাই, আপনি তো জানেন গত বছর আমি বাংলাদেশের জন্যে কি দুঃসাহসিক কাজ করেছি। লন্ডনের 'সানডে টাইমস' পত্রিকায় প্রকাশিত আমার এসব চাঞ্চল্যকর রিপোর্টের দরুন বিশ্ব-জনমত বাংলাদেশের পক্ষে সোচ্চার হয়েছে।

শেখ মুজিব: আমরা তো আপনার এই অবদানের স্বীকৃতি বারবার করে যাচ্ছি। এখন বলুন, আপনার আসল বক্তব্য কি?

ম্যাসকার্নহাস: আপনি তো জানেন, শুধুমাত্র এই একটি রিপোর্ট ছাপাবার উদ্দেশ্যে আমাকে এতগুলো ছেলেমেয়ে নিয়ে দেশত্যাগ করতে হয়েছে। আমি এখন বাস্তুহারা এবং বৃটেনের শরণার্থী।

শেখ মুজিব: ১৯৪৭ সালে প্রথমবার ভারতের গোয়া থেকে

বিশ হাজার পাউন্ড? মানে আমাদের প্রায় ৮ লক্ষ টাকা; আমি হচ্ছি একটা গরিব দেশের প্রধানমন্ত্রী। এখানকার অফিসারদের সর্বোচ্চ বেতন হচ্ছে এক হাজার টাকা। আমি এত টাকা বৈদেশিক মুদ্রায় পাব কোত্থেকে? না, টনী আমার দ্বারা সম্ভব হবে না।

করাচিতে এসেছেন। দ্বিতীয়বার ১৯৭১-এ করাচি থেকে লন্ডনে পাড়ি জমিয়েছেন। এখন বলুন আপনি আমার কাছে কি চান?

ম্যাসকার্নহাস: সম্প্রতি পশ্চিম লন্ডনের শেফার্ড বুশের কাছে একটা বাড়ি কেনার চেষ্টা করছি। এজন্য বহু অর্থের প্রয়োজন। মুজিব ভাই, আমি আপনার কাছে হাজার বিশেক পাউন্ড চাচ্ছি। কথা দিচ্ছি, এরপর কোনোদিন আর আপনাকে বিরক্ত করব না।

শেখ মুজিব: বলেন কি, বিশ হাজার পাউন্ড? মানে আমাদের প্রায় আট লাখ টাকা; আমি হচ্ছি একটা গরিব দেশের প্রধানমন্ত্রী। এখানকার অফিসারদের সর্বোচ্চ বেতন হচ্ছে মাত্র এক হাজার টাকা। আমি এত টাকা বৈদেশিক মুদ্রায় পাব কোত্থেকে? না টনী, আমার দ্বারা সম্ভব হবে না। আমাকে মাফ করতে হবে।

ম্যাসকার্নহাস: বলছিলাম কি, গভর্নমেন্টের তো অনেক সিক্রেট ফান্ড থাকে। সে সব কোনো ফান্ড.....

শেখ মুজিব: টনী, আমি দুঃখিত। গভর্নমেন্টের কোনো ফান্ড থেকে এভাবে নগদ ২০ হাজার পাউন্ড দেওয়া সম্ভব নয়। তবে ইংল্যান্ডের সিলেটীদের, বিশেষ করে সেখানকার আওয়ামী লীগ সভাপতি গাউস খানকে অনুরোধ করতে পারি আপনাকে সাহায্য করার।

এর মাত্র বছর তিনেক পরের কথা। ১৯৭৫ সালের জানুয়ারিতে আমি লন্ডনে বাংলাদেশ হাই কমিশনে সবেমাত্র প্রেস কাউন্সিলারের দায়িত্বে। এটা এমন এক সময়, যখন বাংলাদেশের রুশ সমর্থকদের পরামর্শে সৃষ্ট 'গণঐক্য জোট' -এর ব্যর্থতার পর একদলীয় বাকশাল গঠনের তোড়জোড় শুরু হয়েছে।

হাইকমিশনে যোগদানের পর স্থানীয় পরিস্থিতি সম্পর্কে ব্রিফিং নেওয়ার সময় একটা গোপনীয় ফাইল থেকে জানতে পারলাম যে, 'দি রেপ অব বাংলাদেশ'-এর লেখক এবং বিশিষ্ট সাংবাদিক অ্যান্থনী ম্যাসকার্নহসকে তাঁর সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ডের জন্যে অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের তালিকাভুক্ত করা হয়েছে অর্থাৎ ঢাকার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পূর্ব অনুমতি ছাড়া দূতাবাস থেকে ভিসা ইস্যু করা যাবে না এবং রাষ্ট্রীয় কোনো অনুষ্ঠানে ম্যাসকার্নহাসকে আমন্ত্রণ করা হবে না।

দূতাবাস থেকেই জানতে পারলাম যে, বাংলাদেশের সরকার-বিরোধী মহল ছাড়াও সম্প্রতি অ্যান্থনী ম্যাসকার্নহাসের নিবিড় সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছে পাকিস্তানি লবির সঙ্গে।

সত্যি কথা বলতে কি, মনটা আমার বিষণ্নতায় ভরে উঠল। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় যে অ্যান্থনী ম্যাসকার্নহাস একদিন নিজের ও পরিবারের জীবন বিপন্ন করে গণহত্যার রিপোর্ট সংগ্রহের পর বিশ্বের পত্র-পত্রিকায় প্রকাশের মাধ্যমে দুঃসাসিকতার নজির স্থাপন করেছিলেন, সেই ম্যাসকার্নহাস তাঁর প্রার্থিত বিশ হাজার পাউন্ড থেকে বঞ্চিত হয়ে ১৯৭৫-এ আবার গোপনে পাকিস্তানি এজেন্সির সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করে বসে আছে! পাকিস্তানিদের কাছে ম্যাসকার্নহাসের মূল্য এখন অনেক বেশি।

এখানেই শেষ নয়। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট ভোর রাতে ঢাকায় যারা বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার সঙ্গে জড়িত এবং পরবর্তীকালে নানা ঘটনাপ্রবাহে যাদের পরিবার লন্ডনে রয়েছে, অ্যান্থনী ম্যাসকার্নহাস এসময় হচ্ছেন তাদের স্থানীয় গার্ডিয়ান। এহেন অ্যান্থনী ম্যাসকার্নহাস ১৯৭৬ সালের আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে লন্ডনের 'ইনডিপেনডেন্ট টেলিভিশন'-এর 'ওয়ার্ল্ড ইন অ্যাকশন' অনুষ্ঠানে ফারুক-রশিদের চাঞ্চল্যকর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করলেন।

'জয়পত্র' সংকলন থেকে সংকলিত

পাকিস্তানের জেলখানায় শেখ মুজিব

আবদুল মতিন

সেদিন ২০শে ডিসেম্বর '৭১ সকালবেলা। জুলফিকার আলী ভুট্টো নিউ ইয়র্কে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের বিশেষ অধিবেশনে পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব করার পর রাওয়ালপিন্ডি ফিরে আসেন। প্লেন সঙ্গে সঙ্গে মি. ভুট্টো দেশের শাসনভার গ্রহণ করবেন বলে ঘোষণা করা হয়। পদত্যাগী প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে প্রায় তিন ঘণ্টা কাল গোপন আলোচনার পর তিনি প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক শাসক হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন।

২১শে ডিসেম্বর মি. ভুট্টো মন্ত্রিসভা গঠন করে পূর্ববর্তী সরকারের প্রধানমন্ত্রী নূরুল আমিনকে ভাইস-প্রেসিডেন্ট পদে নিয়োগ করেন। বাংলাদেশ তখনও পাকিস্তানের অঙ্গ বলে বহির্বিশ্বের কাছে প্রচার করার উদ্দেশ্যে এই নিয়োগ দান করা হয় বলে ওয়াকেবহাল মহল মনে করেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রতিনিধি হিসেবে নূরুল আমিন পূর্ব পাকিস্তান থেকে জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হন। পরে তিনি আরও ছ'টি, মূলত দক্ষিণপন্থী ও ধর্মীয় মৌলবাদী দলের সঙ্গে মিলে একটি জোট গঠন করেন। মি. ভুট্টো এই জোটকে অবজ্ঞাভরে 'দি জয়েন্ট স্টক কোম্পানি' বলে উল্লেখ করেন। (ফাইনান্সিয়াল টাইমস, ২২শে ডিসেম্বর, ১৯৭১)

সন্ধ্যাবেলা (২১শে ডিসেম্বর) নবনিযুক্ত প্রেসিডেন্ট ভুট্টো বিদেশি কূটনীতিবিদ ও সাংবাদিকদের জন্যে আয়োজিত এক অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে বলেন, শেখ মুজিবুর রহমানকে শীঘ্রই মুক্তি দিয়ে গৃহ-বন্দি করে রাখা হবে।

রাত্রিবেলা জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত এক বেতার বক্তৃতায় মি. ভুট্টো বলেন, নূরুল আমিনের পরামর্শ গ্রহণের পর তিনি পূর্ব পাকিস্তান থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা শুরু করবেন।

লন্ডনের বিভিন্ন সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় নিবন্ধে বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানি কারাগার থেকে মুক্তিদানের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করা হয়। ২১শে ডিসেম্বর 'দি গার্ডিয়ান'-এর সম্পাদকীয় নিবন্ধে ঢাকায় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি সম্পর্কে উল্লেখ করে বলা হয়, কেবল শেখ মুজিবুর রহমান এই অবনতি রোধ করতে পারেন। তাঁকে মুক্তি দেওয়ার ব্যাপারে এক দিনও দেরি করা চলবে না।

২৩শে ডিসেম্বর 'দি নিউইয়র্ক টাইম্‌স্'-এর সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলা হয়: মি. ভুট্টো আট বছর যাবৎ পাকিস্তানের সামরিক একনায়কত্বের সেবা করেন। তিনি ভারতের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের নীতির পক্ষে জোর প্রচারণা চালান। শেষ পর্যন্ত এই নীতি বর্তমান বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে। পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচিত নেতৃবৃন্দের স্বায়ত্তশাসনের দাবির বিরোধিতা করে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রধান রাজনৈতিক নেতা মি. ভুট্টো যে রাজনৈতিক সঙ্কট সৃষ্টি করেন, তার ফলেই পশ্চিম পাকিস্তান বিপদগ্রস্ত হয়। গোড়ার দিকেই তিনি কঠোর সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের পক্ষে অভিমত প্রকাশ করেন। এর ফলেই বাংলাদেশ পাকিস্তান থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়। পাকিস্তানের বর্তমান অবস্থার জন্য যারা দায়ী, তাদের মধ্যে একজন হলেন মি. ভুট্টো।

একই তারিখে লন্ডনের 'দি ডেইলি টেলিগ্রাফ'-এর সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হয়: রাজনীতি, কূটনীতি ও মানবতার খাতিরে শেখ মুজিবকে বাংলাদেশে ফেরার অনুমতি দেওয়া উচিত। এর ফলে পূর্ববঙ্গের বাঙালিরা তাদের অবিসংবাদী নেতাকে ফিরে পাবে এবং মি. ভুট্টো ও পাকিস্তান গণতান্ত্রিক বিশ্বের, বিশেষ করে ভারতের অভিনন্দন ও আস্থা অর্জন করবে। বাস্তব পরিস্থিতি উপেক্ষা করে মি. ভুট্টো এখনও 'অখণ্ড পাকিস্তান'-এর কথা বলছেন। নিঃসন্দেহে বলা যায়, এ প্রশ্ন

অবান্তর। কিন্তু উভয় দেশের মধ্যে যদি কোনো ধরনের সম্পর্ক বজায় রাখতেই হয় এবং সেটা যতই বিতর্কমূলক হোক না কেন, তবে শেখ মুজিবের উপরই বাজি রাখতে হবে। এর জন্যে প্রয়োজনীয় নেতৃত্বদানে মি. ভুট্টো সক্ষম বলে কোনো প্রমাণ এযাবৎ পাওয়া যায়নি।

২২শে ডিসেম্বর (১৯৭১) 'মুজিবনগর' থেকে ঢাকা রওয়ানা হওয়ার আগে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ 'দি টাইমস্'-এর প্রতিনিধিকে বলেন: "গত ন'মাসে যা' কিছু ঘটেছে তারপরেও পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামো মেনে নিয়ে একটি বোঝাপড়া করার জন্যে শেখ মুজিবকে রাজি করানো যাবে– এর চাইতে হাস্যকর কোনো প্রস্তাবের কথা ভাবাই যায় না।"

তিনি আরও বলেন, পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে স্বায়ত্তশাসনের দাবি আওয়ামী লীগই প্রথমে উত্থাপন করেছিল। কিন্তু পাকিস্তান শুধু স্বায়ত্তশাসনের দাবি অগ্রাহ্য করেনি, বরং পূর্ব বাংলার জনগণের উপর সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে এবং তার ফলেই স্বাধীনতার দাবি উত্থাপন করা হয়।

তাজউদ্দীন আহমদ আরও বলেন, মুক্তিযুদ্ধের ফলেই শেখ মুজিবের স্বপ্ন সফল হয়েছে। ('দি টাইম্স্', ২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৭১)

২৩শে ডিসেম্বর উচ্চপদস্থ পাকিস্তানি অফিসার মহল থেকে জানা যায়, প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টোর সঙ্গে আলাপ-আলোচনার জন্যে শেখ মুজিবুর রহমানকে রাওয়ালপিন্ডিতে নিয়ে আসা হয়েছে। তাঁকে জেল থেকে মুক্তি দিয়ে গৃহবন্দি করার পর পাকিস্তানি অফিসার মহল উল্লিখিত তথ্য প্রকাশ করেন। ন'মাসকাল বন্দি থাকার পর ২২শে ডিসেম্বর তাঁকে জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। ('দি গার্ডিয়ান', ২৪শে ডিসেম্বর, ১৯৭১)

২৭শে ডিসেম্বর রাত্রিবেলা প্রেসিডেন্ট ভুট্টো বলেন, আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে তিনি আলাপ-আলোচনা শুরু করেছেন। বঙ্গবন্ধুকে 'পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচিত নেতা' হিসেবে উল্লেখ করে মি. ভুট্টো সাংবাদিকদের বলেন: "আমি বৈঠক থেকে সরাসরি এখানে এসেছি। এই পদক্ষেপ নেওয়া সহজ ছিল না, কিন্তু এটার প্রয়োজন ছিল। বহুদিন আগেই পদক্ষেপ নেওয়া উচিত ছিল বলে আমি মনে করি।"

আলোচনার অগ্রগতি সম্পর্কে কিছুই বলতে পারবেন না বলে উল্লেখ করে মি. ভুট্টো বলেন : "তিনি আমার মুখে পদাঘাত করেননি এবং আমিও আগ্নেয়াস্ত্র বের করার প্রয়োজন বোধ করিনি। আমরা বসে আলাপ-আলোচনা করেছি এবং আমরা আলোচনা চালাতে থাকব।"

রাওয়ালপিন্ডি থেকে প্রেরিত উক্ত সংবাদে 'দি গার্ডিয়ান'-এর সংবাদদাতা মার্টিন উলাকোট বলেন, পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখা সম্বন্ধে কোনো রকম প্রতিশ্রুতি না দিয়েই কিংবা মামুলি আশ্বাস দিয়ে কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই শেখ মুজিব ঢাকা রওয়ানা হবেন বলে কোনো কোনো কূটনীতিবিদ মনে করেন।

সাংবাদিকদের সঙ্গে আলোচনাকালে মি. ভুট্টো বলেন, তিনি বৈঠক থেকে অখুশি হয়ে ফিরে আসেননি। বৈঠক আধঘণ্টা স্থায়ী হয়েছিল। তিনি আরও বলেন, তিনি নিজে কিংবা তাঁর একজন প্রতিনিধি শেখ মুজিবের সঙ্গে আবার সাক্ষাৎ করবেন। কথা প্রসঙ্গে মি. ভুট্টো বলেন, ইতিপূর্বে তাঁকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল– তিনি শেখ মুজিবের সঙ্গে কথা বলবেন কিনা, তিনি তখন প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে গিয়েছিলেন। কারণ, জনসাধারণের সম্মতি না নিয়ে তিনি এ ধরনের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে চাননি। তিনি মনে করেন, জনসাধারণ এখন আলাপ-আলোচনা শুরু করার পক্ষপাতী। একটা সন্তোষজনক সমাধানে পৌঁছানোর ব্যাপারে পাকিস্তানের জনসাধারণ তাঁদের উভয়ের মঙ্গল কামনা করে।

'দি গার্ডিয়ান'-এর সংবাদদাতা বলেন, আলোচনা থেকে কী পাবেন বলে মি. ভুট্টো আশা করেন, তা পরিষ্কার নয়। ন'মাস-কাল জেলে থাকার সময় শেখ মুজিবের চিন্তা-চেতনার ক্রমবিকাশের কথা কেউ জানে না। পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখা সম্বন্ধে তিনি কথা বলতে রাজি আছেন কিনা, তাও কেউ জানে না। কিন্তু সবাই জানেন, তিনি এবং মি. ভুট্টো কখনও, এমন কি সামরিক অভিযান শুরু হওয়ার আগেও, পরস্পরের বন্ধু ছিলেন না। যা' কিছু ঘটেছে তার জন্যে শেখ মুজিব নিশ্চয় মি. ভুট্টোকে অন্তত কিছুটা দায়ী বলে মনে করেন, একথা সবাই জানেন।

মি. উলাকোট মনে করেন, দু'জনের মধ্যে মুখোমুখি আলোচনা দীর্ঘস্থায়ী নাও হতে পারে। ('দি গার্ডিয়ান', ২৮শে ডিসেম্বর, ১৯৭১)

দিল্লি থেকে প্রেরিত এক সংবাদে বলা হয়, ২৪শে ডিসেম্বর (শুক্রবার) মি. ভুট্টো ও শেখ মুজিবের মধ্যে প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। রেডিও পাকিস্তান থেকে প্রচারিত সংবাদের উল্লেখ করে 'দি টাইম্স্'-এর সংবাদদাতা বলেন, উভয়ের মধ্যে দ্বিতীয় দফা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ২৭শে ডিসেম্বর।

উল্লিখিত সংবাদে আরও বলা হয়, শেখ মুজিবকে রাওয়ালপিন্ডিতে অবস্থিত প্রেসিডেন্ট ভবনের এক অংশে গৃহবন্দি করে রাখা হয়েছে। ('দি টাইম্স্', ২৮শে ডিসেম্বর, ১৯৭১)

২৮শে ডিসেম্বর রাওয়ালপিন্ডি থেকে 'ফাইনান্সিয়াল টাইম্স্'-এর প্রতিনিধি কেভিন র‍্যাফার্টি প্রেরিত সংবাদে বলা হয়, শেখ মুজিব পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট মি. ভুট্টোকে বলেছেন, তাঁর সঙ্গে চুক্তি করার উদ্দেশ্যে আলোচনা শুরু করার আগে তাঁকে (শেখ মুজিবকে) তাঁর দেশের জনগণের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করার সময় দিতেই হবে।

এই সংবাদে আরও বলা হয়, জেনারেল ইয়াহিয়ার আমলে বন্দি থাকাকালে পূর্ববঙ্গের পরিস্থিতি তাঁকে জানতে দেওয়া হয়নি এবং নির্জন সেলে রাখার ফলে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। কিন্তু এখন তিনি আগের তুলনায় অনেকটা সুস্থ রয়েছেন এবং তাঁকে দেশের সর্বশেষ পরিস্থিতি জানানো হয়েছে।

শেখ মুজিবের সঙ্গে আলোচনার জন্যে মার্চ মাসের আগে পাকিস্তানের যেসব নেতার সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল, তাঁদের আমন্ত্রণ জানানো হবে বলে গুজব শোনা যাচ্ছে। এ প্রচেষ্টা সফল হবে কিনা, সে সম্বন্ধে সন্দেহ রয়েছে। শেখ মুজিবের সঙ্গে ভুট্টোর বৈঠক সম্পর্কে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির নেতা খান আব্দুল ওয়ালী খান এ সপ্তাহে বলেছেন, এই আলোচনা অত্যন্ত দেরিতে শুরু করা হয়েছে। তা' ছাড়া শেখ মুজিব কিংবা বাংলাদেশকে দেওয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ কোনো কিছুই মি. ভুট্টোর হাতে নেই। ('ফাইনান্সিয়াল টাইম্‌স্', ২৯শে ডিসেম্বর, ১৯৭১)

১লা জানুয়ারি (১৯৭২) মার্কিন সাপ্তাহিক 'টাইম' পত্রিকা-সূত্রে প্রাপ্ত এক সংবাদে বলা হয়, আগামী দু'-এক দিনের মধ্যে বাংলাদেশের বন্দি নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দেওয়ার কথা প্রেসিডেন্ট ভুট্টো বিবেচনা করছেন। ওয়াশিংটন থেকে প্রেরিত এই সংবাদ ২রা জানুয়ারি লন্ডনের 'দি সানডে টেলিগ্রাফ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাঁর (শেখ মুজিবের) হৃদয়ে এখনও পর্যন্ত পাকিস্তানের আগুন জ্বলজ্বল করছে– এই আশা ও বিশ্বাস নিয়ে তিনি তাঁকে দু'-এক দিনের মধ্যে নিঃর্শত মুক্তিদানের কথা ভাবছেন।

মি. ভুট্টো বলেন: "আমি তাঁর কাছ থেকে কোনো প্রতিশ্রুতি আদায় করছি না। তাঁর উপর চাপ প্রয়োগ করে আমি আলোচনা চালাচ্ছি না, বরং পাকিস্তানের দুই অংশের নির্বাচিত নেতাদের মধ্যেই এই আলোচনা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

"অত্যন্ত ঢিলে-ঢালা একটা ব্যবস্থা সম্পর্কে একমত হওয়া সম্ভব, কিন্তু পাকিস্তান নামটি অন্ততপক্ষে থাকা উচিত। এটা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত আমাদের হাজার বছরের সম্পদ এবং আমরা তা' বিসর্জন দিতে পারি না।" ('দি সানডে টেলিগ্রাফ', ২রা জানুয়ারি, ১৯৭২)

ব্রিটিশ লেখক রবার্ট পেইন তাঁর একটি বইয়ে বাংলাদেশ পাকিস্তানের সঙ্গে ভবিষ্যতে সম্পর্ক বজায় রাখবে কিনা সে সম্বন্ধে জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে বঙ্গবন্ধু ও মি. ভুট্টোর কথোপকথন বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন।

মি. ভুট্টো বঙ্গবন্ধুকে বলেন : "প্রথম জিনিস সম্পর্কে আমাদের প্রথমেই আলাপ করা উচিত। আমাদের দু'টি পৃথক জাতি হওয়া চলবে না, শেখ সাহেব। যেমন করেই হোক আমাদের সম্পর্ক বজায় রাখতেই হবে; অবশ্য ঠিক আগের মতো নয়, তবে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান বলে চেনা যায়, এমন একটি দেশ হিসেবে। আর যাই হোক, আমাদের ধর্ম এক,

ভুট্টোর শেষ অনুরোধ: একটি অখণ্ড ও অবিভক্ত পাকিস্তান গঠনের ব্যাপারে আপনি কি আমাকে সাহায্য করবেন না? না, আমি এখনও আপনার বন্দি। ..... যতক্ষণ পর্যন্ত মুক্তি দেওয়া না হয় আমি নীরব থাকব।



উদ্দেশ্যও এক। দেখুন, শেখ সাহেব, সব কিছুর পরেও আমরা এখনও এক জাতি– সেই সত্যের মুখোমুখি আমরা হয়েছি। আমাকে বিশ্বাস করুন, আমরা এই বন্ধন ছিন্ন করতে পারি না। একথা আমাদের উভয়ের ভাবা উচিত। অবশ্য পশ্চিম পাকিস্তানে বসে একথা আমাদের আলোচনা করতে হবে, এমন কোনো কথা নেই। আমরা একটা নিরপেক্ষ দেশে আলোচনার জন্যে মিলিত হতে পারি। উদাহরণস্বরূপ ইরানের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রকৃতপক্ষে শাহিনশাহ্ আশা করেন, আমরা ইচ্ছা করলে তেহরানে আলোচনায় বসতে পারি। তিনি অনুগ্রহ করে তাঁর একটি প্রাসাদ আমাদের ব্যবহারের জন্যে দিতে রাজি হয়েছেন। ইরান যদি আপনার পছন্দ না হয়, তা'হলে আমরা সুইটজারল্যান্ডে মিলিত হতে পারি– শুধু আমরা দু'জন।"

"এখন আমরা যেমন মিলিত হয়েছি"– ব্যঙ্গোক্তির আভাস দিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান বললেন।

"ঠিক তাই, আমি আপনার সঙ্গে একমত। কোনো রকম বাধাবিপত্তি ছাড়া আমরা এখানে কাজটা সেরে ফেলতে পারি।

"আপনি ও আমি, আমরা দু'জনে নীতি সম্পর্কিত একটি বিবৃতি তৈরি করতে পারি। আমি একটা খসড়া তৈরি করেছি। আপনার তা পছন্দ হবে বলে আমি মনে করি। আপনাকে আমি এটি দেখাতে চাই।"

"না।"

"কেন নয়?"

"কারণ, আমি এখনও পর্যন্ত আপনার বন্দি। এমন কি আমার স্ত্রীকে আমি টেলিফোন করারও অধিকারী নই। আমি জানি না, তিনি এখনও জীবিত আছেন কিনা। আমার ছেলে-মেয়েরাও কী জীবিত আছে? আমার বৃদ্ধ পিতা-মাতা কী জীবিত আছেন? আমার মন্ত্রীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা না করে কীভাবে, আমার সামনে আপনি যে কাগজের টুকরো রেখেছেন, তাতে আমি দস্তখত করতে পারি? আপনার ইচ্ছা পূরণের জন্য আপনি আমাকে জোর করে রাজি করাবার চেষ্টা করছেন। আপনি আমাকে গুলি করতে পারেন, কিন্তু ঢাকায় গিয়ে আমার মন্ত্রীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ না হওয়া পর্যন্ত আমি কোনো কাগজে দস্তখত দেব না। আমাকে এখানে আটক রাখা হলে আমি আপনার বন্দি এবং আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আপনি আমার দস্তখত গ্রহণের চেষ্টা করছেন। কাজেই এখন থেকে আমাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না মুক্তি দেওয়া হয়, আমি নীরব থাকব।"

ভুট্টোর শেষ অনুরোধ: "একটি অখণ্ড এবং অবিভাজ্য পাকিস্তান গঠনের ব্যাপারে আপনি কি আমাকে সাহায্য করবেন, নাকি করবেন না?"

শেখ মুজিব নীরব থাকেন। (*The Tortured and the Damned,* Robert Payne, p.146)

ব্রিটেন ও আমেরিকার সাংবাদিকরা বঙ্গবন্ধুর কারামুক্তি এবং মি. ভুট্টোর সঙ্গে তাঁর আলাপ-আলোচনা সম্পর্কে রাওয়ালপিন্ডি থেকে যেসব প্রতিবেদন পাঠিয়েছিলেন, তাতে পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক বজায় রাখা সম্বন্ধে বঙ্গবন্ধুর আশ্বাসের কোনো ইঙ্গিত ছিল না। অথচ পাকিস্তানি সাংবাদিক অ্যান্থনী মাসকারেনহাস্ পরবর্তীকালে দাবি করেন, বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মধ্যে সম্পর্ক বজায় রাখার উদ্দেশ্যে মি. ভুট্টোর সঙ্গে একটি গোপন চুক্তির পরিকল্পনা সম্বন্ধে তাঁকে আভাস দিয়েছিলেন। ১৯৮৬ সালে প্রকাশিত তাঁর বই 'বাংলাদেশ: দি লিগেসী অব ব্লাড'-এ বলা হয়, ১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসে পাকিস্তান থেকে লন্ডন হয়ে ঢাকায় ফেরার পথে বঙ্গবন্ধু নাকি তাঁকে বলেছিলেন: "তোমার জন্য একটি 'স্কুপ' সংবাদ আছে। আমরা পাকিস্তানের সঙ্গে একটি সম্পর্ক বজায় রাখব, কিন্তু অন্যান্য সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করার আগে এ সম্পর্কে আর কিছু বলতে পারব না। আল্লাহ্-র দোহাই, আমি না বলা পর্যন্ত সংবাদটি প্রকাশ করবে না।" (*Bangladesh : The Legacy of Blood,* Anthony Mascarenhas, p.5.)

বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে নির্জলা মিথ্যা প্রচারণার কারণ ম্যাস্কারেনহাসের পেশাগত চরিত্রের মধ্যে নিহিত। 'লিগেসী অব ব্লাড্'-এর পাঠক-পাঠিকা একথা সহজেই অনুধাবন করতে পারবেন।

৩রা জানুয়ারি (১৯৭২) বিকেলবেলা করাচি শহরের নিস্তার পার্কে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় মি. ভুট্টো ঘোষণা করেন, আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে নিঃশর্ত মুক্তিদান করা হবে।

বক্তৃতা প্রসঙ্গে মি. ভুট্টো বলেন: "২৭শে ডিসেম্বর শেখ মুজিবের সাথে আমার প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। তাঁর প্রথম প্রশ্ন ছিল, 'আমি কি মুক্ত?' আমি তাঁকে বলেছি, 'আপনি স্বাধীন। আপনি যদি আমাকে কিছু সময় দেন, তা' হলে এ-ব্যাপারে আমার জনগণের মতামত যাচাই করতে পারব। তাদের সম্মতি ছাড়া আমি কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে চাই না। .... কেউ কেউ বলেন, শেখ মুজিব আমার 'তুরুপের তাস' এবং সুবিধা আদায়ের জন্য আমি তা ব্যবহার করতে পারি। অন্যরা বলেন, 'আমরা কেন সুবিধা আদায়ের চেষ্টা করব?' আমি তাদের সঙ্গে একমত। শেখ মুজিবকে ব্যবহার করে আমি লাভজনক কিছু করতে চাই না। এ ব্যাপারে আপনারা একমত কিনা ?"

বলাবাহুল্য, বিপুল জনতা শেখ মুজিবকে বিনাশর্তে মুক্তিদানের প্রশ্নে সম্মতিসূচক সাড়া দেয়।

উল্লিখিত রিপোর্টের শেষ দিকে 'দি গার্ডিয়ান' পত্রিকার সংবাদদাতা বলেন, আগামী তিন দিনের মধ্যে শেখ মুজিবকে একটি বিশেষ বিমানযোগে পাকিস্তানের বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। ('দি গার্ডিয়ান', ৪ঠা জানুয়ারি, ১৯৭২)

বঙ্গবন্ধুকে বিনাশর্তে মুক্তিদানের সিদ্ধান্তকে অভিনন্দন জানিয়ে 'দি গার্ডিয়ান' পত্রিকার সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হয়: "শেখ মুজিবই বাংলাদেশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর বিস্ময়কর বাগ্মিতার মাধ্যমে তিনি বাঙালিদের অসন্তোষকে একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক দলের কর্মসূচিতে পরিণত করেন। তাঁর বক্তৃতায় পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ভবিষ্যতে সুদিনের মুখ দেখার ভরসা পায়। তাঁকে যদি হত্যা করা হত, কিংবা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্দি হিসেবে রাখা হত, তা' হলে বাংলাদেশ সরকার কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই মারাত্মক নেতৃত্ব-সঙ্কটের মুখোমুখি হত। তাঁর মুক্তি বাংলাদেশকে বাঁচার একটি সুযোগ দিয়েছে।" ('দি গার্ডিয়ান', ৪ঠা জানুয়ারি, ১৯৭২)

৪ঠা জানুয়ারি করাচি থেকে 'দি ডেইলি টেলিগ্রাফ'-এর প্রতিনিধি প্রেরিত সংবাদে বলা হয়, শেখ মুজিবকে সরাসরি ঢাকায় পাঠানো হবে না বলে অনেকে মনে করেন। এমনও বলা হয়েছে যে, তাঁকে লন্ডন অথবা জেনেভার মতো 'নিরপেক্ষ' রাজধানীতে পাঠানো হতে পারে।

বঙ্গবন্ধু : কাছে থেকে দেখা

শাহ্ এ এম এস কিবরিয়া

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দীর্ঘ সাহচর্য লাভের সুযোগ অনেকের হয়েছে, কিন্তু আমাদের সেই সৌভাগ্য হয়নি। ১৯৭২ সালেই মাত্র এক বছর বঙ্গবন্ধুকে আমি কাছ থেকে দেখার এবং তাঁর সঙ্গে কাজ করার দুর্লভ সুযোগ লাভ করেছিলাম। অল্প দিনের সাহচর্য হলেও সেই দিনগুলোর স্মৃতি আজও আমার মানসপটে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

সদ্যপ্রতিষ্ঠিত পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে জরুরি তারবার্তা পেয়ে ১৯৭২ সালের ২৬ জানুয়ারি আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন থেকে বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করি। ওয়াশিংটনে বাঙালি কূটনীতিকদের ভূমিকা সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু অবহিত ছিলেন। পাকিস্তানের জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর বাংলাদেশে ফেরার পথে লন্ডন থেকেই তিনি আমাদের টেলিফোনে খোঁজ-খবর নিয়েছিলেন। দেশে ফেরার পর আমাকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে রাজনৈতিক বিষয়ের মহাপরিচালকের দায়িত্ব দেওয়া হয়। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তখন সবেমাত্র যাত্রা শুরু করেছে। প্রশাসনিক কাঠামো পর্যন্ত গড়ে ওঠেনি। সেই অবস্থাতেই বঙ্গবন্ধুর সোভিয়েত ইউনিয়নে রাষ্ট্রীয় সফরের প্রস্তুতি শুরু হল। সফরের ব্রিফ তৈরি করার দায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত হয়েছিল। কাজটি আমাকে একেবারে শূন্য থেকে শুরু করতে হয়েছিল, কারণ আমাকে সাহায্য করার মতো কোনো রেকর্ড বা কাগজপত্র মন্ত্রণালয়ে ছিল না। বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে কূটনৈতিক দায়িত্ব পালনের অভিজ্ঞতার আলোকে একটি ব্রিফ প্রস্তুত করে বঙ্গবন্ধুর কাছে নিয়ে গিয়েছিলাম। তিনি ধৈর্যের সঙ্গে ব্রিফটি পড়লেন। মধ্যপ্রাচ্যের আরব-ইসরাইলি সংঘাত এবং বিশ্বব্যাপী দুই পরাশক্তির স্নায়ুযুদ্ধ বা ঠাণ্ডা লড়াই সম্পর্কে আমাকে অনেক প্রশ্ন করলেন। বস্তুত মস্কো সফরের প্রাক্কালে স্নায়ুযুদ্ধের বিষয়টি আমাদের বিশেষ বিবেচনায় রাখতে হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনা অনুসরণ করে ব্রিফটি সংশোধন করে আবার আমি তাঁর নিকট নিয়ে যাই। তিনি আমাকে সেই ব্রিফের সারমর্মের ভিত্তিতে সংক্ষিপ্ত 'টকিং পয়েন্ট' তৈরি করার নির্দেশ দিলেন। মস্কোতে সোভিয়েত নেতা ব্রেজনেভ ও প্রধানমন্ত্রী কোসিগিন এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় রাষ্ট্রীয় আলোচনা সেই ব্রিফের ভিত্তিতেই করা হয়েছিল। এই সফরের সময়ই বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হওয়ার সুযোগ লাভ করি। ছাত্রজীবনে আমার কৃতিত্বের কথা কার নিকট শুনেছিলেন জানি না, তবে জেনে তিনি খুশি হয়েছিলেন। ভালো ছাত্রদের প্রতি তাঁর বিশেষ দুর্বলতা ছিল বলে মনে হয়। তাদের তিনি কাছে টানতেন। আমাকেও তিনি তাঁর জাদুকরী ব্যক্তিত্বের বলে অতি সহজেই কাছে টেনেছিলেন।

রাষ্ট্রক্ষমতা গ্রহণের পর বঙ্গবন্ধু ৬ ফেব্রুয়ারি মাত্র একদিনের জন্যে অতি সংক্ষিপ্ত সফরে কলকাতা গিয়েছিলেন। ভারতের জনগণকে, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের জনগণকে আমাদের মুক্তিযুদ্ধে সাহায্য ও শরণার্থীদের আশ্রয় দেওয়ার জন্যে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করাই ছিল ঐ সফরের মূল লক্ষ্য। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ঐ সংক্ষিপ্ত সফরেই বঙ্গবন্ধু ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আলোচনার মাধ্যমে বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার করার তারিখ নির্ধারণ করেন।

আসলে সোভিয়েত ইউনিয়নের আমন্ত্রণে মস্কো সফরই ছিল সরকার-প্রধান হিসেবে বঙ্গবন্ধুর প্রথম রাষ্ট্রীয় সফর। এই সফরের সময়ই আমি রাষ্ট্র পরিচালনায় তাঁর গভীর দূরদৃষ্টির পরিচয় পাই। অনেকের হয়তো স্মরণ আছে, ঐ সময় চট্টগ্রাম বন্দর কতিপয় জাহাজ ডোবার কারণে কার্যত অচল ছিল। এসব জাহাজ উদ্ধার করে বন্দরকে জাহাজ চলাচলের উপযোগী না করা হলে দেশের আমদানি-রপ্তানির কর্মকাণ্ড শুরু করা সম্ভব ছিল না। দ্রুত খাদ্য আমদানির জন্যে বন্দর পুনর্বাসনের কাজে কোনো কারণেই বিলম্বের অবকাশ ছিল না। এদিকে ভাসমান মাইন স্থাপনের কারণে বিদেশি জাহাজ চট্টগ্রামে আসতে সম্মত ছিল না। এই বিপজ্জনক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে মস্কোতে দ্বিপক্ষীয় আলোচনার সময় সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী কোসিগিন চট্টগ্রাম বন্দরকে ব্যবহারযোগ্য ও নিরাপদ করে তোলার জন্যে প্রয়োজনীয় সাহায্য 'অনুদান' হিসেবে দেওয়ার প্রস্তাব করলেন। প্রস্তাবটি ছিল অত্যন্ত আকর্ষণীয়; কারণ, বন্দর চালু না করা হলে দেশের অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের কাজ আরম্ভ করাই কঠিন ছিল। কিন্তু বঙ্গবন্ধু বিষয়টির রাজনৈতিক তাৎপর্য অনুধাবন করে প্রস্তাবটি তৎক্ষণাৎ গ্রহণ না করে বিবেচনার জন্যে সময় চাইলেন। তখনও তিনি আশাবাদী ছিলেন যে, জাতিসংঘের মাধ্যমেই এই কাজটি করা সম্ভব হবে। দেশে ফিরে এসে কালবিলম্ব না করে তিনি জাতিসংঘের প্রতিনিধি মিঃ ভিক্টর উমব্রিখটের সঙ্গে আলোচনা করলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, এই কাজের জন্যে একটি পরাশক্তির সাহায্য নেওয়া হলে অপর পরাশক্তি ও তার দোসররা এই সিদ্ধান্তকে সহজভাবে নেবে না। আসলে তাই হয়েছিল, কিন্তু তখন কোনো উপায়ান্তর ছিল না। দেশের অর্থনীতিকে সচল করা ও জরুরিভিত্তিতে খাদ্য আমদানি করার স্বার্থে তাঁকে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল। তাঁর প্রখর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদৃষ্টির পরিচয় আমি ঐ সময় প্রত্যক্ষ করেছি। তিনি আশংকা করছিলেন যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা-বিরোধী শক্তিগুলি এই সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে অপপ্রচারে লিপ্ত হবে। অনেকের হয়তো স্মরণ আছে যে, চট্টগ্রাম বন্দরে একটি সোভিয়েত নৌ-ঘাঁটি স্থাপিত হয়েছে– এই মর্মে একটি গুজব অতি সুপরিকল্পিতভাবে রটিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন হলেও দীর্ঘদিন এই গুজবকে ব্যবহার করে বাংলাদেশের ভাবমূর্তিকে মসিলিপ্ত করা হয়েছে। বস্তুত বাংলাদেশের স্বাধীনতা-বিরোধী অপশক্তি তখন যেমন সক্রিয় ছিল, এখনো তেমনই সক্রিয় আছে। তারাই বলে বেড়াচ্ছে যে, ফেনী থেকে শুরু করে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের সবটাই ভারতের নিকট বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, আটাশ বছরের ব্যবধানেও অপপ্রচারের বিরাম নেই।

মস্কো সফর থেকে ফেরার কয়েকদিন পরই ১১ মার্চ ১৯৭২ তারিখে বঙ্গবন্ধু আমাকে গণভবনে ডেকে পাঠালেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আব্দুস সামাদ আজাদ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বঙ্গবন্ধু জানালেন যে, আমাকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে এবং মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত থাকবে। উল্লেখ্য যে, ঐ সময়ের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে দু'টি সচিবের পদ সৃষ্টি করা হয়েছিল। পদোন্নতিতে আমি খুশি হয়েছিলাম–বিশেষ করে বঙ্গবন্ধু স্বয়ং আমাকে ডেকে এই সুসংবাদ দিয়েছেন। মস্কো সফরের সময়ে আমার কাজে সন্তুষ্ট হয়েই তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, এতে সন্দেহ নেই। কিন্তু শুধু প্রশাসনিক দায়িত্ব পেয়ে আমি খুশি হতে পারিনি। আমি বঙ্গবন্ধুকে জানালাম যে, আমি তো প্রশাসনিক অফিসার নই, নীতি নির্ধারণ এবং রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতা এই পদে তেমন কাজে লাগবে না। এসব কাজ থেকে আমি বিচ্ছিন্ন হতে চাই না। বঙ্গবন্ধু তখন আমাকে আশ্বাস দিলেন যে, উপ-মহাদেশের দ্বিপক্ষীয় কূটনৈতিক বিষয়গুলি আমার দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

পরবর্তী দিনগুলি ছিল উদ্বেগ, উত্তেজনা ও সাফল্যের আনন্দে পূর্ণ। বঙ্গবন্ধুর সার্বিক দিকনির্দেশনায় আমি ও আমার সহকর্মীরা দৈনিক ১২/১৪ ঘণ্টা কাজ করে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কাঠামো তৈরি করেছিলাম। কাজ করে আনন্দ ছিল, তৃপ্তি ছিল। তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুস সামাদ আজাদ আমাদের উৎসাহ দিয়েছেন। সরকারি ফাইল নিয়ে অনায়াসে বঙ্গবন্ধুর নিকট যেতে পারতাম। মন্ত্রণালয়ের চেয়ার-টেবিল থেকে শুরু করে ফাইল কভার, টাইপ রাইটার ইত্যাদি সবকিছুই ঐ সময়ে আমরা ক্রয় করে কাজ শুরু করি। জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত ছয় মাসের বাজেট ঐ সময়ে তৈরি করেছিলাম। তৎকালীন অর্থমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমদ বাজেট নিয়ে আমাদের সঙ্গে একটি একান্ত বৈঠক করেছিলেন। বিদেশে বাংলাদেশের দূতাবাস স্থাপন করার সিদ্ধান্তগুলোও তখন বঙ্গবন্ধুর দিকনির্দেশনা অনুসরণ করে গ্রহণ করা হয়েছিল। অনেক প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত দ্রুত গ্রহণ করতে হয়েছিল; কারণ, আমলাতান্ত্রিক বিলম্বের তখন কোনো অবকাশ ছিল না। একটি ছোট্ট ঘটনা মনে পড়ছে। বর্তমান রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন 'পদ্মা' ও 'মেঘনা' আমরা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অঙ্গ-প্রতিষ্ঠান হিসেবে

স্থাপন করেছিলাম। জনাব রুহুল কুদ্দুস প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব হিসেবে এক আদেশ জারি করে এই রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবনগুলিকে তাঁর কর্তৃত্বাধীনে নিয়ে যান এবং সরকারি অতিথি ভবন হিসেবে নামকরণ করেন। আমার পূর্বসূরি জনাব মোমেন, প্রটোকল প্রধান জনাব ফারুক চৌধুরী এবং আমি– আমরা তিনজন বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে জরুরিভাবে সাক্ষাৎ করে এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য পেশ করি। আমরা তাঁকে ব্যাখ্যা করে বলি যে, বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশে এবং এমনকি অনেক উন্নত দেশেও রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন থাকে। রাষ্ট্রীয় অতিথিদের পরিচর্যা করার জন্যে বিশেষভাবে সজ্জিত এসব ভবনে কূটনৈতিক আলাপ-আলোচনার সুযোগ থাকে। এসব মামুলি সরকারি অতিথি ভবন নয়। বঙ্গবন্ধু তৎক্ষণাৎ পূর্ববর্তী আদেশ পরিবর্তন করে নতুন আদেশ জারি করেন এবং রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবনগুলো পরিচালনার দায়িত্ব আবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ত করা হয়। আজো সেই ব্যবস্থাই চালু আছে।

এমনি আরো ঘটনা স্মৃতির মণিকোঠায় ভাস্বর হয়ে আছে। বাহাত্তর সালের ফেব্রুয়ারি মাস। বঙ্গবন্ধু সচিবালয়ের অফিসে তখনো যেতেন। একদিন সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রীর অফিসে ফাইল নিয়ে গিয়েছি তাঁর স্বাক্ষরের প্রত্যাশায়। গিয়ে দেখি আমার মতো আরো দু'জন সচিব সেখানে উপস্থিত। স্বাধীন বাংলাদেশের ঐ প্রথম দিনগুলোতে প্রধানমন্ত্রীর অফিসের আনুষ্ঠানিকতার কড়াকড়ি ছিল না। আমরা তিনজনই প্রধানমন্ত্রীর অপেক্ষায় কিছুক্ষণ বসলাম। তিনি এসেই আমাদের বল্লেন, 'আপনারা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন। দু'জন সাক্ষাৎপ্রার্থীকে বিদায় দেওয়ার পর আপনাদের সাথে কথা বলব।' প্রথম সাক্ষাৎপ্রার্থী একজন যুদ্ধাহত পঙ্গু বিডিআর সৈনিক। তিনি ক্রাচে ভর করে এসে স্যালুট করে দাঁড়ালেন এবং তাঁর আবেদন পেশ করলেন। বঙ্গবন্ধু তাঁকে অর্থসাহায্য দেওয়ার জন্যে নির্দেশ দিলেন। প্রায় সাথে সাথে আসলেন একজন গ্রামীণ মহিলা। নরসিংদী এলাকার অধিবাসী এক শহীদ বিডিআর সৈনিক মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রী। সেই মহিলা নরসিংদীর পল্লীগ্রামের প্রচলিত ভাষায় বিলাপের সুরে তাঁর স্বামীর মৃত্যুকাহিনী বর্ণনা করা শুরু করলেন। সেই কাহিনী ছিল খুবই মর্মস্পর্শী। পিলখানা থেকে হানাদার বাহিনীর হাতে বন্দি হয়ে গুলি এবং বেয়োনেটের খোঁচায় আহত হয়ে সেই সৈনিক মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যান। আহত অবস্থায় পরিবারের নিকট ফিরে গিয়ে চিকিৎসার মাধ্যমে সুস্থ হয়ে ওঠেন, কিন্তু রাজাকারদের প্রদত্ত গোপন তথ্যের ভিত্তিতে হানাদার বাহিনী তাঁর গ্রামের

সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী কোসিগিন চট্টগ্রাম বন্দরকে ব্যবহারযোগ্য ও নিরাপদ করে তোলার জন্যে প্রয়োজনীয় সাহায্য 'অনুদান' হিসেবে দেওয়ার প্রস্তাব করলেন। ... দেশের অর্থনীতিকে সচল করা ও জরুরিভিত্তিতে খাদ্য আমদানি করার স্বার্থে তাঁকে (বঙ্গবন্ধু) দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল। .... তিনি আশংকা করছিলেন যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা-বিরোধী শক্তিগুলি এই সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে অপপ্রচারে লিপ্ত হবে। অনেকের হয়তো স্মরণ আছে যে, চট্টগ্রাম বন্দরে একটি সোভিয়েত নৌ-ঘাঁটি স্থাপিত হয়েছে– এই মর্মে একটি গুজব অতি সুপরিকল্পিতভাবে রটিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন হলেও দীর্ঘদিন এই গুজবকে ব্যবহার করে বাংলাদেশের ভাবমূর্তিকে মসিলিপ্ত করা হয়েছে। বস্তুত বাংলাদেশের স্বাধীনতা-বিরোধী অপশক্তি তখন যেমন সক্রিয় ছিল, এখনো তেমনই সক্রিয় আছে।

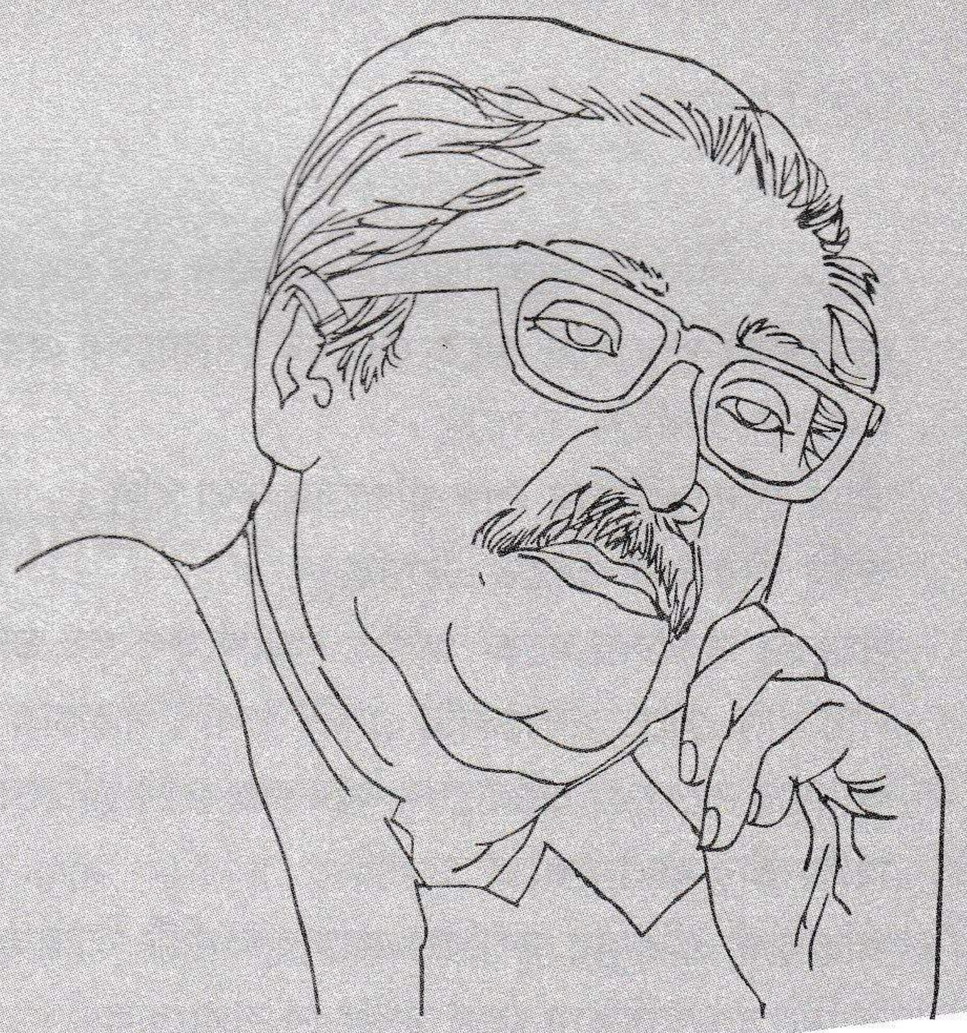
বাড়িতে গিয়ে তাঁর স্বামীকে বেয়োনেট দিয়ে খুঁচিয়ে যন্ত্রণা দেওয়ার পর গুলি করে নির্মমভাবে হত্যা করে। মহিলা সেই করুণ কাহিনী অশ্রুসজল কণ্ঠে কান্নার সাথে বর্ণনা করে যাচ্ছিলেন। আমার একজন সহকর্মী মহিলাকে তাঁর বক্তব্য সংক্ষিপ্ত করার অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধু হাত দিয়ে ইশারা করে তাঁকে থামিয়ে দিলেন। আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছিলাম বঙ্গবন্ধুর দু'চোখে অশ্রুর ধারা। একজন গ্রামীণ রমণীর দুঃখের কাহিনী শুনে জাতির জনকের কোমল হৃদয় বিগলিত হওয়ার সেই স্বর্গীয় দৃশ্য স্বচক্ষে দেখে অভিভূত না হয়ে পারিনি। বঙ্গবন্ধু খুবই স্নেহশীল ছিলেন, একথা সবাই জানেন। তাঁর স্নেহশীল মন সম্পর্কে অনেক কাহিনী অনেকেই বলেছেন। কিন্তু আমি নিজের চোখে দেখেছি ক্ষমতার শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত একজন সরকার-প্রধান কীভাবে একজন দুঃখী নারীর শোকগাথায় দুঃখী হয়ে অশ্রুমোচন করেছেন। আমার মনে হয় দেশের সাধারণ দুঃখী মানুষের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার তাঁর যে অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল সেই ক্ষমতার বলেই তিনি বাঙালি জাতিকে সম্মোহিত করতে পেরেছিলেন।

বঙ্গবন্ধুকে বাংলাদেশের প্রথম রাজনৈতিক পাসপোর্ট প্রদান করার দুর্লভ সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। পাসপোর্ট তৈরি করার প্রস্তুতি হিসেবে একটি ফরম নিয়ে আমি তাঁর অফিসে গিয়েছিলাম। বঙ্গবন্ধুকে বললাম যে, এই ফরম পূরণ করতে হবে। তবে আমি নিজের হাতে সবই লিখে দিচ্ছি, শুধু আপনি স্বাক্ষর করবেন। ফর্মের একটি অংশে জন্মের স্থান উল্লেখ করা প্রয়োজন ছিল। আমি তাঁকে জানালাম যে, তাঁর জন্মের স্থান ফরিদপুর লিখছি। বঙ্গবন্ধু বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে বলে উঠলেন, না, লেখো আমার জন্মের স্থান বাংলাদেশ। অবশ্যই তিনি সমগ্র বাংলাদেশকে তাঁর জন্মভূমি হিসেবে মনে করতেন। কোনো জেলার বা অঞ্চলের সীমাবদ্ধ পরিসরে আবদ্ধ থাকার কথা তিনি চিন্তাও করতে পারতেন না। লন্ডনে অবস্থানের সময় কীভাবে অতি অল্প দিনে তিনি সিলেটের অধিবাসীদের হৃদয় জয় করেছিলেন, সেই কিংবদন্তির কাহিনী এখনও অনেকের মুখেই শোনা যায়।

একথা অনস্বীকার্য যে, বিভিন্ন মহল থেকে সুপরিকল্পিতভাবে প্রচারণার ফলে বঙ্গবন্ধুর ভাবমূর্তিকে সাময়িক ও আংশিকভাবে হলেও মলিন করা হয়েছিল। দেশবাসী বিস্মিত এবং ব্যথিত হয়ে দেখেছে যে, বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়া ১৫ আগস্টকে তাঁর জন্মদিন হিসেবে বেছে নিয়ে সেইদিনকে উৎসবের দিন হিসেবে উদ্‌যাপন করছেন। ঐদিন বেগম জিয়ার জন্মদিন নয়, একথা সবাই জানে। কিন্তু জাতির জনকের স্মৃতির প্রতি অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধা প্রকাশ করার উপায় হিসেবে বোধহয় এই রুচিহীন পন্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। ২১ বছর ধরে জাতির জনকের ভূমিকা সম্পর্কে বিকৃত তথ্য প্রচার করে দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করার পরিকল্পিত প্রয়াস করা হয়েছে। কিন্তু ইতিহাসের অমোঘ লিখন কেউ মুছে ফেলতে পারে না। রাজাকার-জামাত ও বিএনপি নেতৃবৃন্দের সৃষ্ট মিথ্যা কুয়াশার জাল ভেদ করে বঙ্গবন্ধুর অবদান জাতির মানস-পরিমণ্ডলে ক্রমশ উজ্জ্বল হয়ে প্রতিভাত হচ্ছে। বর্তমান প্রজন্মের কেউ কেউ হয়ত জানে না– কীভাবে, ধাপে ধাপে, বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন এবং পরিশেষে চূড়ান্ত লক্ষ্য মুক্তি সংগ্রামের দিকে ধাবিত করেছিলেন। দুই দশকব্যাপী এসব সংগ্রামী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে কখন যে তিনি একটি রাজনৈতিক দলের নেতার আসন থেকে জাতীয় নেতার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন তা অনেকেই লক্ষ করেনি। তবে আমার মনে হয়, ১৯৬৬ সালের ঐতিহাসিক ছয়দফা দাবি উত্থাপনের পরই জনসমর্থনের দুর্বার জোয়ার তাঁকে নেতৃত্বের শীর্ষদেশে স্থাপন করেছিল। স্মরণ রাখা প্রয়োজন, বিশাল ব্যক্তিত্বের অধিকারী রাজনৈতিক নেতা বাংলাদেশে আরো বেশ কয়েকজনই জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁরা অনেক অবদানও রেখে গেছেন। কিন্তু বাঙালি জাতির সম্মুখে সুনির্দিষ্ট কোনো লক্ষ্য তাঁরা কেউই তুলে ধরতে পারেননি। বঙ্গবন্ধুর জাদুকরী নেতৃত্ব ও ব্যক্তিত্ব ছিল, সন্দেহ নেই; কিন্তু সেই কারণেই জাতি তাঁকে অনুসরণ করেনি। বাঙালি জাতি তাঁকে অনুসরণ করেছে, কারণ তিনি স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা– এই দুরূহ যাত্রাপথে তাদের বলিষ্ঠ ও সাহসী নেতৃত্ব দিয়েছেন। সাহস, আত্মপ্রত্যয়, দেশপ্রেম এবং আত্মত্যাগের মাধ্যমে তিনি জাতির অকুণ্ঠ আস্থা অর্জন করতে পেরেছিলেন।

জর্জ ওয়াশিংটনকে আমেরিকানরা তাদের হৃদয়ে প্রগাঢ় শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে শুধু প্রথম প্রেসিডেন্ট হিসেবে নয়, স্বাধীনতাযুদ্ধের নায়ক হিসেবেও। তেমনি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে মহাত্মা গান্ধীর আসন রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে নয়, কারণ তিনি কখনো রাষ্ট্র পরিচালনা করেননি। তিনি ভারতবর্ষের দরিদ্র ও বহুধাবিভক্ত জনগণকে স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত করে একটা ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত করেছিলেন। উগ্র সাম্প্রদায়িক মানসিকতায় অন্ধ কিছু লোক তাঁকে হত্যা করলেও ভারতীয়রা চিরকাল তাঁর নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে। তেমনি স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুত্থানের মহানায়ক হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের

১৯৬৬ সালের ঐতিহাসিক ছয়দফা দাবি উত্থাপনের পরই জনসমর্থনের দুর্বার জোয়ার তাঁকে নেতৃত্বের শীর্ষদেশে স্থাপন করেছিল।

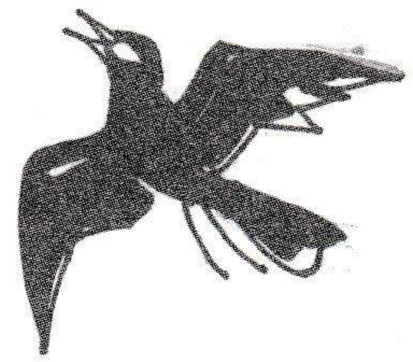


নাম বাঙালি জাতির মানসপটে চিরকাল ভাস্বর হয়ে থাকবে। আমাদের ইতিহাসের সবচেয়ে গৌরবময় অধ্যায়ে বাঙালি জাতির কাণ্ডারি ছিলেন টুঙ্গিপাড়ার শান্তস্নিগ্ধ পরিবেশে চিরনিদ্রায় শায়িত এই মহাপুরুষ। কে, কখন এবং কোথায় রেডিওতে একটা ঘোষণা পাঠ করেছিল, এসব তুচ্ছ বিতর্ক সময়ের ব্যবধানে এবং ইতিহাসের নির্মোহ বিচারে অতি গৌণ বিষয় বলেই বিবেচিত হবে।

আজ ২০০০ সালে ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস পালন করার মুহূর্তে বারবার আমাদের মনে পড়ছে কোটালিপাড়ার ভয়াবহ ষড়যন্ত্রের কথা। যেভাবে জাতির জনককে মাত্র সাড়ে তিন বছর শাসনের পরই হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থেকে অপসারিত করা হয়েছে, ঠিক একইভাবে বঙ্গবন্ধু-কন্যা শেখ হাসিনাকেও তাঁর শাসনের মাত্র চার বছরের মাথায় হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে ক্ষমতা থেকে অপসারিত করার ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল। পরম করুণাময় আল্লাহ তা'লার অশেষ কৃপায় তিনি রক্ষা পেয়েছেন, কিন্তু দেশবাসীর উদ্বেগ ও শংকার অবসান হয়নি। যে অপশক্তি ১৫ আগস্টের শোকাবহ ঘটনার জন্য দায়ী ছিল, সেই অপশক্তি আজও সক্রিয় রয়েছে। বিএনপি, জামাত এবং জাতীয় পার্টির মুখোশ খুলে পড়েছে। দেশবাসী তাঁদের সত্যিকার চেহারা দেখতে পাচ্ছে। বিএনপি-র কোনো কোনো নেতা প্রকাশ্যেই বলছে যে, নির্বাচনে তারা আওয়ামী লীগকে হারাতে পারবে না, অতএব আবার পঁচাত্তরের পুনরাবৃত্তির মাধ্যমেই তারা ক্ষমতায় যাবে। ধর্মব্যবসায়ী কিছু ব্যক্তি প্রকাশ্যেই বঙ্গবন্ধু-কন্যাকে হত্যার ঘোষণা দিয়েছে। কিন্তু এটা সত্তরের দশক নয়, জাতি আজ সতর্ক। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, বাঙালি জাতি এসব অপচেষ্টা সফল হতে দেবে না। দেশব্যাপী জনমত সৃষ্টির মাধ্যমে ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে এসব প্রতিক্রিয়াশীল অপশক্তির ষড়যন্ত্রকে নস্যাৎ করতে হবে।

আমি আজ কারো রক্ত চাইতে আসিনি

নির্মলেন্দু গুণ



সমবেত সকলের মতো আমিও গোলাপ ফুল খুব ভালবাসি,
রেসকোর্স পার হয়ে যেতে সেইসব গোলাপের একটি গোলাপ
গতকাল আমাকে বলেছে,
আমি যেন কবিতায় শেখ মুজিবের কথা বলি ।
আমি তাঁর কথা বলতে এসেছি ।
সমবেত সকলের মতো আমিও পলাশ ফুল খুব ভালোবাসি, 'সমকাল'
পার হয়ে যেতে সদ্যফোটা একটি পলাশ গতকাল কানে কানে
আমাকে বলেছে, আমি যেন কবিতায় শেখ মুজিবের কথা বলি ।
আমি তাঁর কথা বলতে এসেছি ।
শাহাবাগ এভিন্যুর ঘূর্ণায়িত জলের ঝর্নাটি আর্তস্বরে আমাকে বলেছে,
আমি যেন কবিতায় শেখ মুজিবের কথা বলি ।
আমি তাঁর কথা বলতে এসেছি ।
সমবেত সকলের মতো আমারো স্বপ্নের প্রতি পক্ষপাত আছে,
ভালোবাসা আছে– শেষরাতে দেখা একটি সাহসী স্বপ্ন গতকাল
আমাকে বলেছে, আমি যেন কবিতায় শেখ মুজিবের কথা বলি ।
আমি তাঁর কথা বলতে এসেছি ।
এই বসন্তের বটমূলে সমবেত ব্যথিত মানুষগুলো সাক্ষী থাকুক,
না-ফোটা কৃষ্ণচূড়ার গুষ্কভগ্ন অপ্রস্তুত প্রাণের ঐ গোপন মঞ্জরীগুলো
কান পেতে শুনুক,
আসন্ন সন্ধ্যায় এই কালো কোকিলটি জেনে যাক–
আমার পায়ের তলার পুণ্য মাটি ছুঁয়ে
আমি আজ সেই গোলাপের কথা রাখলাম, আজ সেই পলাশের
কথা রাখলাম, আজ সেই স্বপ্নের কথা রাখলাম ।
আমি আজ কারো রক্ত চাইতে আসি নি,
আমি আমার ভালোবাসার কথা বলতে এসেছিলাম ।



বঙ্গবন্ধুকে অবলোকন

আনিসুজ্জামান

স্বনামধন্য ভারতীয় অর্থনীতিবিদ ভবতোষ দত্ত ১৯৪৩ সালে কলকাতার ইসলামিয়া কলেজের শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছিলেন। আট দশক (কলকাতা, ১৯৮৮; তৃতীয় মুদ্রণ ১৯৯৫) নামে প্রকাশিত তাঁর স্মৃতিকথায় তখনকার কথা বলেছেন এভাবে :

ছাত্ররা আমাদের অত্যন্ত সমাদরে গ্রহণ করেছিলেন। আমরা মুসলমান নই বলে যেন কোনো আঘাত না পাই তারও চেষ্টা করতেন। প্রায় সব ছাত্রই অবশ্য লীগপন্থী। পাকিস্তান-কর্মী। মুসলমান শিক্ষকেরাও তাই। তবে কলেজ ইউনিয়নের নির্বাচনে দুটো দল হত। একটা বাংলাভাষীর দল আর অন্যটা উর্দুভাষীর দল। উর্দুভাষীরা নিজেদের একটু বেশি কুলীন মনে করতেন। কিন্তু বাংলাভাষীদের সংখ্যা ছিল বেশি। এই বাংলাভাষী দলের নেতা ছিল একটি কৃশকায় ছেলে, নাম শেখ মুজিবুর রহমান। তার নীতি শেষ পর্যন্ত অপরিবর্তিতই ছিল। বঙ্গবন্ধু মুজিবুর বাংলা ভাষাকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দিতে সফল হয়েছিলেন। ইসলামিয়ার ছাত্ররা যে আমাদের জন্য কতটা করতে পারত তার প্রমাণ পেলাম ১৯৪৬-এর রক্তাক্ত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়। বালিগঞ্জ থেকে ইসলামিয়া কলেজের রাস্তায় পদে পদে বিপদ। এই রাস্তা আমাদের ছাত্ররা পার করে দিত। ওল্ড বালিগঞ্জের কাছে অপেক্ষা করত আর সেখান থেকে ওয়েলেসলি স্ট্রিটে কলেজে নিয়ে যেত। আবার সেভাবেই ফিরিয়ে দিয়ে যেত।

বইয়ের অন্যত্র তিনি আবার উল্লেখ করেছেন দাঙ্গার সেই দিনগুলোর কথা :

এখানে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি ইসলামিয়া কলেজের সেইসব মুসলমান ছাত্রদের যাঁরা আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে বিপজ্জনক এলাকাটা পার করে দিতেন। এইসব ছাত্রের একজনের নাম ছিল শেখ মুজিবুর রহমান।

ভবতোষ দত্তের এই কথাগুলোই আমার প্রবন্ধের ভূমিকা।

শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক জীবনের সূচনা হয়েছিল মুসলিম লীগের কর্মীরূপে। মুসলিম লীগের তখনকার রাজনীতির মূলকথা ছিল দুটি: দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে মুসলমানদের পৃথক রাষ্ট্রগঠন; আর ভারতের প্রদেশগুলোর স্বায়ত্তশাসন লাভ। সেই নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা যখন দেখা দিল, মাউন্টব্যাটেন তখন স্পষ্টই বলছেন জিন্নাহকে, তাঁর যুক্তি মেনে নিয়ে ভারত ভাগ করতে হলে পাঞ্জাব ও বাংলা প্রদেশকেও ভাগ করতে হবে। জিন্নাহ্ প্রতিবাদ করে বললেন, তা কী করে হয়? ওরা তো আগে পাঞ্জাবি ও বাঙালি, পরে হিন্দু বা মুসলমান; তারা একই ভাষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও ইতিহাসের উত্তরাধিকার বহন করে। মাউন্টব্যাটেন বললেন, সেকথা তো সকল ভারতবাসী সম্পর্কেই বলা হচ্ছে। অগত্যা জিন্নাহ চুপ করে গেলেন। (ল্যারি কলিনস ও ডোমিনিক লাপিয়ের, 'ফ্রিডম অ্যাট মিডনাইট' নয়াদিল্লি, ১৯৭৬)। তবে তাঁর এই বক্তব্যই বোধ হয় দ্বিজাতিতত্ত্ব থেকে প্রথম সরে আসা। এরপরে সরে এলেন শেখ মুজিবের রাজনৈতিক গুরু হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী। তিনি ও আবুল হাশিম একদিকে, অন্যদিকে শরৎচন্দ্র বসু ও কিরণশঙ্কর রায় এক ভাষাভাষী রাষ্ট্র হিসেবে সার্বভৌম অখণ্ড বাংলা প্রতিষ্ঠার ব্যর্থ চেষ্টা করলেন। তারপর পাকিস্তান গণপরিষদের উদ্বোধনী অধিবেশনে জিন্নাহ বললেন, এখন থেকে হিন্দু আর হিন্দু থাকবে না, মুসলমান আর মুসলমান থাকবে না, সবাই হবে পাকিস্তানের নাগরিক। ধর্ম ব্যক্তিগত ব্যাপার, তার সঙ্গে রাষ্ট্রপরিচালনার সম্পর্ক থাকবে না। কিন্তু ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বরে করাচিতে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সর্বশেষ অধিবেশনে সোহ্‌রাওয়ার্দী যখন প্রস্তাব করলেন যে, পাকিস্তান অর্জিত হওয়ার পরে রাজনৈতিক

দলের দ্বার অমুসলমানদের জন্য উন্মুক্ত করা দরকার, জিন্নাহ্ তখন সম্মত হলেন না। এমন কী, সোহ্‌রাওয়ার্দী যখন নতুন রাজনৈতিক দল করলেন, তারও নাম দিলেন জিন্নাহ আওয়ামী মুসলিম লীগ।

লাহোর প্রস্তাবে মুসলমানদের দুটো পৃথক রাষ্ট্র দাবি করা হয়েছিল। ১৯৪৬ সালে দিল্লিতে আইনসভার মুসলিম লীগ দলীয় সদস্যদের সম্মেলনে তা বদলে একটা রাষ্ট্র করে দেওয়া হল। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরে দেশের কর্ণধারেরা প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের কথা একেবারেই ভুলে গেলেন। ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে গণপরিষদে শায়েস্তা সোহ্‌রাওয়ার্দী ইকরামউল্লাহ বলেছিলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ মনে করছে যে, ওই অঞ্চলকে দেখা হবে পশ্চিম পাকিস্তানের উপনিবেশ হিসেবে। তার কয়েকদিন পরে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত দাবি করেন বাংলাভাষার রাষ্ট্রীয় মর্যাদা। মার্চ মাসে দেশের প্রথম বাজেট আলোচনার সময়ে একাধিক সদস্য পূর্ব বাংলার স্বতন্ত্র স্বার্থের কথা বলেন এবং মাহমুদ হুসেন দেশের প্রদেশগুলির জন্য 'পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন' দাবি করেন।

এ সত্ত্বেও অসাম্প্রদায়িক রাজনীতি, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন, রাষ্ট্রভাষা, নাগরিক অধিকার ও সুশাসনের মতো বিষয়ে দেশবাসীর মধ্যে নানা রকম দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল। এসবের সংশয় দূর করেই কেবল যথাযথ লক্ষ্যে যাত্রা শুরু হতে পারত। সেই সম্ভাবনা প্রথম দেখা দেয় ১৯৪৮ সালে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে। শেখ মুজিবুর রহমান এই আন্দোলনের একজন নেতারূপে আত্মপ্রকাশ করেন এবং সেই সূত্রেই তিনি প্রথমবারের মতো কারাভোগ করেন।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরে মুসলিম লীগের যেসব নেতা ও কর্মীর মোহভঙ্গ হয়েছিল, তাঁরা যখন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীকে সভাপতি করে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন করেন, তখন কারারুদ্ধ শেখ মুজিবুর রহমানকে তার একজন যুগ্ম-সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়। এ থেকে অনুমান করা যায়, সেই ১৯৪৯ সালেই রাজনীতিক্ষেত্রে তিনি কী রকম মর্যাদা লাভ করেছিলেন।

মুক্তিলাভ করে শেখ মুজিব সর্বক্ষণ ব্যয় করেন আওয়ামী মুসলিম লীগের সাংগঠনিক কাজে। তবে কারাগারে যাওয়া তাঁর পক্ষে নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। তবু নিজের বিশ্বাস ও কর্তব্যবোধ থেকে তিনি এতটুকু সরে আসেননি এবং নিজের পরিবারের স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তা সম্পর্কেও উদ্বিগ্ন হননি। বাইরে আন্দোলন করেছেন, জনমত গঠন করেছেন; সংগঠনকে আওয়ামী মুসলিম থেকে আওয়ামী লীগ করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন; আবার গণপরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদে বক্তৃতা করেছেন বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে, পাকিস্তান রাষ্ট্রের অসাম্প্রদায়িক নাম দিতে, যুক্ত নির্বাচন প্রথার পক্ষে ও প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে। গণপরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের বিতর্ক পাঠ করলে এসব বিষয়ে তাঁর অনেকগুলো স্মরণীয় বক্তৃতার সন্ধান পাওয়া যাবে। যখন তিনি প্রাদেশিক মন্ত্রী, তখনো তিনি কথা বলেছেন অকুতোভয়ে– কেন্দ্রীয় সরকার কী ভাববে, পরিণাম কী হবে, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করেন নি। তার জন্য তাঁকে মূল্য দিতে হয়েছে, কিন্তু সেইসঙ্গে জনগণের হৃদয়েও তাঁর স্থান হয়েছে বেশি করে।

১৯৫৭ সালে কাগমারী সম্মেলনে মওলানা ভাসানী পশ্চিম পাকিস্তানের উদ্দেশে আসসালমু আলাইকুম বললেন। তারপরে স্বায়ত্তশাসন ও সামরিক জোটে পাকিস্তানের যোগদানের প্রশ্নে সোহ্‌রাওয়ার্দীর সঙ্গে মতবিরোধের ফলে আওয়ামী লীগ ছেড়ে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি গঠন করলেন। তিনি নিখিল পাকিস্তান-ভিত্তিক দল গড়লেন, সমাজতন্ত্র চাইলেন, জোর দিলেন পররাষ্ট্রনীতির উপরে এবং সেই সূত্রে সমর্থন দিলেন সামরিক শাসক আইয়ুব খানকে। সোহ্‌রাওয়ার্দীর মৃত্যুর পরে শেখ মুজিব হয়ে উঠলেন আওয়ামী লীগের একচ্ছত্র নেতা। সোহ্‌রাওয়ার্দী সংখ্যাসাম্য মেনে নিয়েছিলেন এবং স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে নমনীয়। শেখ মুজিব পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্যের কথা বললেন, সংখ্যার গুরুত্ব প্রতিষ্ঠার দাবি জানালেন এবং জোর দিলেন স্বায়ত্তশাসনের উপরে। ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ সকলকে দেখিয়ে দেয় যে, পূর্ব বাংলা ছিল অরক্ষিত। তাতে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে এ-অঞ্চলের মানুষের ক্ষোভ বাড়ে। শেখ মুজিব উপস্থাপন করেন ছয়দফা দাবিনামা। বামপন্থি রাজনীতিকরা বললেন, এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনা। সরকার বলল, এতে পাকিস্তানের সমূহ সর্বনাশ। কিন্তু পূর্ব বাংলায় মুজিবের নেতৃত্ব ও সংগঠন ক্রমশ সংহত হতে থাকল। আইয়ুব খান রুজু করলেন 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা'। ওতেই কাজ হল। শেখ মুজিবকেই মানুষ পূর্ব বাংলার একমাত্র স্বার্থ-রক্ষক হিসেবে দেখল। ছাত্ররা ছয় দফাকে এগারো দফায় অন্তর্ভুক্ত করে আন্দোলনে নামল। সে আন্দোলনকে মওলানা ভাসানী সমর্থন করলেন। ছাত্র- জনতার অভ্যুত্থানের মুখে আইয়ুব বিদায় নিলেন, মুজিব বঙ্গবন্ধু হলেন। আইয়ুবের উত্তরাধিকারীরা পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠতা মানতে বাধ্য হলেন এবং পাকিস্তানের ইতিহাসে দেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল।

নির্বাচনও নির্বিঘ্নে হয়নি। 'ভোটের আগে ভাত' চেয়েছিলেন অনেকে, বলেছিলেন ব্যালট বাক্সে লাথি মারতে। তাতে সামরিক শাসন প্রলম্বিত হবে জেনেও তাঁরা উদ্বিগ্ন

জলোচ্ছ্বাস ও বন্যার সময় দুস্থ মানুষের মাঝে বঙ্গবন্ধু



হননি। ঘূর্ণিঝড়ের প্রবল আঘাত সহ্য করে পূর্ব বাংলা ভোট দিল বঙ্গবন্ধুকে। তাঁর সমালোচকরা বললেন, এবারে মুজিব আপোস করবেন। আপোস তিনি করেননি, বরঞ্চ ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের চব্বিশ দিনে পৃথিবী দেখেছিল এক অবিস্মরণীয় অসহযোগ আন্দোলন– এক নেতার ডাকে মাথা তুলে দাঁড়াল পূর্ব বাংলা। এই সময়টা ছিল বঙ্গবন্ধুর জীবনের সবচেয়ে গৌরবময় সময়, আবার সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষারও সময়। অনেকগুলো বিকল্প থেকে তাঁকে সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছিল। পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যে ছয় দফার ভিত্তিতে সংবিধান রচনার পথ তিনি খুঁজছিলেন; কিন্তু তিনি ক্রমশই উপলব্ধি করছিলেন যে, সংকট সমাধানের সাংবিধানিক উপায় ক্রমেই দূরে চলে যাচ্ছে। অন্যদিকে তিনি এও জানতেন যে, দীর্ঘ যুদ্ধের প্রস্তুতি আমাদের ছিল না। পাকিস্তান ভাঙার এবং তার ফলে সম্ভাব্য রক্তপাতের দায়িত্ব তিনি নিতে চাইছিলেন না, আমরা স্বাধীনতা ঘোষণা করলে তার আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া কী হবে (একপক্ষীয় স্বাধীনতা-ঘোষণা। যুক্তরাষ্ট্র ও চীন বিরোধিতা করবে, তবে ভারত সমর্থন করবে, এটুকুই জানা ছিল), সে-

সম্পর্কেও তিনি নিশ্চিত ছিলেন না। তাই আলোচনার পথ খোলা রাখছিলেন। আবার ৭ মার্চের ভাষণে স্বাধীনতা-যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। এ-আহ্বান কারো কাছেই অস্পষ্ট থাকেনি। তিনি কখনো আত্মগোপনের রাজনীতি করেননি, তাই ২৫ মার্চ রাতে বাড়িতেই রয়ে গেলেন– যদিও জানতেন যে, পাকিস্তানিরা তাঁকে মেরে ফেলতে পারে।

মুক্তিযুদ্ধের সময়টায় বঙ্গবন্ধু অনুপস্থিত, কিন্তু তাঁর নামেই মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়েছিল। এমন কী, আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্বের যে অংশটি পাকিস্তানের সঙ্গে আপোসরফা করতে চেয়েছিল, তারাও বলত বঙ্গবন্ধুর প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টাই তারা করছে। তাদের সে প্রয়াস সফল হয়নি। বাংলাদেশ মুক্ত হয়েছিল এবং আন্তর্জাতিক চাপে স্বাধীন বাংলাদেশে তাঁকে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল পাকিস্তান।

দেশে ফিরে এসে তিনি সম্মুখীন হয়েছিলেন পর্বতপ্রমাণ সমস্যার। যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত দেশের পুনর্গঠন, বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জন, প্রাদেশিক সরকারকে জাতীয় প্রশাসনযন্ত্রে রূপান্তরিত করা, ঘাতক-দালালদের বিচার, যুদ্ধবন্দিদের বিচারের প্রশ্ন একদিকে, অন্যদিকে যুদ্ধবন্দিরা মুক্তি না পেলে পাকিস্তানে আটক বাঙালিদের ছাড়া হবে না বলে ভুট্টোর হুমকি, ঘাতক-দালাল-সংক্রান্ত আইন বাতিল করার দাবি, আটক বাঙালিদের পাকিস্তান থেকে ফিরিয়ে আনার জন্যে তাদের পরিবারের দাবি– এসব পরস্পরবিরোধী স্রোতের মধ্য দিয়ে তাঁকে চলতে হচ্ছিল। ১৯৭১ সালে দেশের যে তিনটি নীতি ঘোষিত হয়েছিল– গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, তার সঙ্গে তিনি জাতীয়তাবাদ যোগ করলেন। মুক্তিযোদ্ধাদের দিয়ে অস্ত্রসমর্পণ করালেন, দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব স্পষ্টগোচর করাবার জন্যে ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করালেন। নয় মাসে আমাদের সংবিধান প্রণীত হল, আঠারো মাসের মাথায় সাধারণ নির্বাচন হল। দেশের অবকাঠামো যতটা সম্ভব পুনর্গঠন করা গেল। বহু দেশের স্বীকৃতি পাওয়া গেল।

তবে সময়টা আগের মতো ছিল না। দেশের সর্বত্র অস্ত্রশস্ত্র ছড়িয়ে গিয়েছিল। তাঁর দলের মধ্যে কোন্দল সৃষ্টি হয়েছিল। তাঁর সমর্থক ছাত্রদের একটি বড় অংশ তাঁর আশীর্বাদ লাভে ব্যর্থ হয়ে শক্তিশালী প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়াল। বাংলাদেশ-বিরোধীরা মুক্তিযোদ্ধা-হত্যা থেকে পোস্ট অফিস লুণ্ঠন প্রভৃতি কাজে লিপ্ত হয়ে গেল। তাঁর অনুসারীদের সামলানোও অনেক সময় কঠিন হয়ে পড়ল। এই সমস্ত পরিস্থিতিতে সবচেয়ে ক্ষতিকর হল তাঁর সঙ্গে তাজউদ্দীনের দূরত্ব সৃষ্টি করতে একদল মানুষের সাফল্য। তাঁর প্রশাসনের প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবিচ্ছিন্ন বিরূপতার কথাও এ-প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে।

১৯৭১ সালে দেশের যে তিনটি নীতি ঘোষিত হয়েছিল– গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, তার সঙ্গে তিনি জাতীয়তাবাদ যোগ করলেন। মুক্তিযোদ্ধাদের দিয়ে অস্ত্রসমর্পণ করালেন, দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব স্পষ্টগোচর করাবার জন্যে ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করালেন। নয় মাসে আমাদের সংবিধান প্রণীত হল, আঠারো মাসের মাথায় সাধারণ নির্বাচন হল। দেশের অবকাঠামো যতটা সম্ভব পুনর্গঠন করা গেল। বহু দেশের স্বীকৃতি পাওয়া গেল।

বঙ্গবন্ধুর সাফল্যের তালিকা দীর্ঘতর করা যেতে পারে; ওই বৈরী পরিস্থিতিতে তাঁর ব্যর্থতা বা ভুল সিদ্ধান্তের তালিকাও তৈরি করা যেতে পারে। তিনি মানুষ ছিলেন– ভুলত্রুটির ঊর্ধ্বে ছিলেন না। বাকশাল গঠনের মতো তাঁর কোনো কোনো সিদ্ধান্তের সমালোচনা করলে তাঁর অনুরাগীদের অনেকে উত্তেজিত হয়ে যান। তাঁরা মনে করেন, এসব সমালোচনা বুঝি সপরিবারে বঙ্গবন্ধু হত্যার মতো নিষ্ঠুরতম কাজের সাফাই। তা কখনো হতে পারে না। হত্যাকারীদের কাছে বঙ্গবন্ধুর এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ সহচরদের একমাত্র অপরাধ ছিল বাংলাদেশের সৃষ্টি। একথা যাঁরা বোঝেন না, তাঁদের বোঝাতে চাওয়া বৃথা। যাঁরা বঙ্গবন্ধুকে ছোট করার চেষ্টা করেন কিংবা আরো বড়ো করতে গিয়ে ছোটো করে ফেলেন, তাঁদের জানতে হবে: ইতিহাসে বঙ্গবন্ধু অমরতা লাভ করেছেন, তিনি যা তিনি তাই, তাঁর আসন ধূলিমলিন হওয়ার নয়।

বঙ্গবন্ধু কীভাবে জাতির জনক হলেন

বেলাল চৌধুরী

একটা বয়স থাকে যখন সব কিছুতেই প্রবল আগ্রহ আর কৌতূহল কাজ করে। প্রাণী মাত্রই কম বেশি এই প্রবণতা থেকে মুক্ত নয়। আমিও যথাযথ সময়ে এই বয়সটা পেরিয়ে এলেও পেছনে ফিরে তাকালে মনে হয় কত ঘটনা আর কতশত জীবনের স্মরণীয় মুহূর্ত অতিক্রম করে এসেছি। সেই ঔপনিবেশিক আমল থেকে শুরু করে নব্যঔপনিবেশিক দুরাত্মা পাকিস্তানি আমল থেকে রীতিমতো মুক্তিযুদ্ধ করে দেশের স্বাধীনতার অমৃত সূর্যকে ছিনিয়ে এনেছি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আর তাঁর সংগ্রামী সহযোদ্ধা তাজউদ্দীন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, মনসুর আলী, কামরুজ্জামান আর অগণিত মুক্তিযোদ্ধাদের শৌর্য-বীর্য আর বীরত্ব গাথার কল্যাণে।

আমার আর কতই বা বয়স, সব কিছু আজ এতকাল পরে স্মৃতিতে জ্বলজ্বল করলেও সন-তারিখগুলি মোটা দাগে মনে করতে পারলে যথাযথ হবে কি না সন্দেহের অবকাশ রয়েছে।

যুদ্দূর মনে করতে পারি, আমি প্রথম শেখ মুজিবুর রহমানের নামটির সঙ্গে পরিচিত হই সাহিত্যিক মনোজ বসুর 'চীন দেখে এলাম' বইটি পড়ার সূত্রে। তখন মওলানা ভাসানী শান্তি সম্মেলন বা ঐ জাতীয় একটি আমন্ত্রণে নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে। চীনের সঙ্গে তখন ভারতের ভাই-ভাই সম্পর্ক। চীনারাও আসছেন ভারতে, পূর্ব পাকিস্তানে। সেই সময় একটি দলের সঙ্গে তরুণ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানও চীন সফর করেছিলেন। ঐ সফরে ভারত থেকে যারা গিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন সাহিত্যিক হিসেবে মনোজ বসু। উপমহাদেশে দেশভাগের ক্ষত থেকে তখনো রক্তক্ষরণ হয়ে চলেছে।

এদিকে ধীরে ধীরে মানুষের মনে পাকিস্তান যে তাদের ফাঁকিস্তান, এ বোধটা জন্ম নিতে শুরু করেছে। টুঙ্গিপাড়ার দীর্ঘকায় যুবকটিও ধীরে ধীরে উন্নতশীর্ষ চারাগাছ থেকে মহীরূহে পরিণত হওয়ার পথে। প্রথমে সোহরাওয়ার্দী সাহেবের একান্ত আপনজন। কুমিল্লা দারোগাবাড়িতে গুরু-শিষ্যের কথোপকথন– তো আতাউর মিয়াকে কেয়া কাহা; প্রত্যুত্তরে খাস গোপালগঞ্জিয়া জবানে বলছেন, আমি তো হেইয়ারে কইছি.....। এভাবে চতুর্থ শ্রেণির কর্মীদের ধর্মঘটে, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার, ভাষা আন্দোলনে নিজের নেতৃত্বে উঠে যাওয়া বা ইয়ার মোহাম্মদ খানের কারকুন-বাড়ি লেনে কাগজের স্তূপের উপর শুয়ে থাকা, বিকালে আরমানিটোলা ময়দানে আগুন ঝরানো বক্তৃতার প্রস্তুতি এভাবে কতদিনই না কতভাবে তাঁকে দেখেছি। এ দেখার শেষ নেই। এর পর কীভাবে ধাপে ধাপে তিনি একটার পর একটা বাধার বিন্ধ্যাচল পেরিয়ে ৭ই মার্চের মহাকাব্যিক ভাষণ শেষে ৯ মাসের মুক্তিযুদ্ধ শেষে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের জয় পতাকা ওড়ালেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু সর্বযুগের কুখ্যাত ৯২ ধারার কল্যাণে। স্বল্পকালীন জেলজীবনে আমৃত্যু স্মরণীয় হয়ে থাকার মতো আর একটি ঘটনা পরর্বতীকালে স্বাধীনতার রূপকার বা স্থপতি যাই বলা যাক না কেন, তখনও জাতির জনক বা বঙ্গবন্ধু হননি, চিরউন্নত শির ঋজু টানটান শেখ মুজিবুর রহমানের করস্পর্শে ধন্য হওয়া। ঢাকার কেন্দ্রীয় জেলে শুক্রবারে জুমার নামাজ আদায়ের জন্যে অস্থায়ী সাপ্তাহিক প্রার্থনাঘরে যাওয়ার অনুমতি মিলত। ধর্মেকর্মে তেমন মতি না থাকলেও জেল

যদ্দূর মনে করতে পারি,
আমি প্রথম
শেখ মুজিবুর রহমানের
নামটির সঙ্গে পরিচিত হই
সাহিত্যিক মনোজ বসুর
'চীন দেখে এলাম'
বইটি পড়ার সূত্রে

জীবনের কঠিন নিগড় থেকে ক্ষণিক মুক্তির স্বাদ পেতে অনেকটা মুখবদলের মতো ছুটে যেতাম সবাই মিলে; বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে নিয়ে আসা হত অন্যান্য রাজবন্দি মুসল্লীদেরও। আমাদেরটা ছিল কমিউনিস্ট ব্লক। অন্যান্য ব্লকে থাকতেন বিভিন্ন দলীয় এবং প্রথম শ্রেণিপ্রাপ্ত রাজবন্দীরা। আসলে দেখতাম, পারস্পরিক মেলামেশা আর দেখাসাক্ষাতের এই সুযোগটা কেউই হারাতে চাইতেন না। এই প্রায় একঘণ্টার মতো প্রাপ্ত সুযোগের সদ্ব্যব্যবহারের জন্যে সবাই যেন সপ্তাহব্যাপী উদগ্রীব ও উন্মুখ হয়ে থাকতেন। জেলখানার এক মৌলবী সাহেবের ইমামতিতে নামাজের ফাঁকেই চলত পারস্পরিক খবরাখবরের আদান-প্রদান। দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি থেকে বর্তমান ও ভবিষ্যত কর্মপন্থা কোনোটাই বাদ যেত না। নামাজের কল্যাণে রাজনীতিক কৌশলের বিনিময়। মোনাজাতের সময়ও অব্যাহত থাকত আলোচনা। অবশ্য জেলকর্মীদের অনেকেও এসব ক্ষেত্রে ছিলেন সহানুভূতিশীল। কমরেডদের মধ্যে আদর্শিক একাত্মবোধ এমন দৃঢ় ছিল যে, সেখানে ধর্মকর্ম নিয়ে কারোরই তেমন মাথাব্যথা ছিল না। যার ফলে জাতপাত নিয়ে কখনোই কেউ মাথা ঘামাবার প্রয়োজনবোধ করেননি।

সেই যাই হোক, এখানেই প্রথমদিন দেখলাম দীর্ঘকায়, কিস্তিটুপি পরিহিত শেখ মুজিবুর রহমানকে। কী করে যেন, কাতারবন্দি হয়ে দাঁড়াবার সময় তাঁর পাশেই দাঁড়িয়ে গেছি। এর আগেও তাঁকে অনেকবার দেখেছি– সেই কারকুন বাড়ি লেনে, সাপ্তাহিক ইত্তেফাক অফিসে, আরমানিটোলা ময়দানে, কুমিল্লা দারোগাবাড়িতে, সোহরাওয়ার্দী সাহেবের সঙ্গে। সেসব সবই দূর থেকে দেখা– কৌতূহলী কিশোরের চোখে।

কখন যেন হঠাৎ করে তাঁর চোখ পড়ল আমার দিকে। যেন এখানে আমি কি করে বা কেন? আমার মাথার চুল তখন রুখোসুখো এবং ঈষৎ লালচে। তাঁর হাত নেমে এল আমার মাথার অবিন্যস্ত চুলে। পাশ থেকে কে যেন একজন বলে উঠলেন, মুজিব ভাই, ও কিন্তু রাজবন্দি। তিনি কি ভেবেছিলেন কে জানে! আমি কিছু বলার আগেই তাঁর সেই স্বভাবসুলভ গোপালগঞ্জি উচ্চারণে স্বগতোক্তির মতোই যেন বলে উঠলেন, "হায়রে এন এম খাঁ, (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জবরদস্ত মুখ্যসচিব এবং হর্তাকর্তা বিধাতাদের একজন) তোমাদের এতই ভয়, নাক টিপলে দুধ বের হয়– এই মাসুম বাচ্চাকেও তোমরা ধরে এনেছো। খোদাতালারও সাধ্য নেই তোমাদের রক্ষা করে।" এরপর আরও বারতিনেক তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে। বলাবাহুল্য, উপরিল্লিখিত ওই একই অকুস্থলে। এই মহাপ্রাণের সঙ্গে সেই আমার প্রথম ও চাক্ষুষ দেখা। উচ্চতায় যাঁকে তখনই মনে হয়েছিল মহামানবতুল্য। এরপর তো সবটাই ইতিহাস ও মহাকালের অঙ্গীভূত। সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে বিশ্বের বুকে এক নতুন ইতিহাস গড়লেন।

এমন কি বাঙালির পোশাক-আশাকেও তিনি যে বিবর্তন আনলেন তাও এক বিরল দৃষ্টান্ত, যা বাঙালি জীবনে সম্পূর্ণ নতুন ধারারই প্রবর্তক। পাঞ্জাবি-পাজামার সঙ্গে তিনি যে অঙ্গবাস পরতে শুরু করলেন, তখন থেকে তার নামকরণ হয়ে গেল মুজিবকোট– উপমহাদেশে যার প্রথম ব্যবহার দেখা গিয়েছিল ইংরেজদের অনুকরণে– গায়ক, বিশেষ করে তবলচিদের মধ্যে। এরপর কালক্রমে স্বদেশি আন্দোলনের সময় খদ্দর আর চরকায় কাটা দেশজ পশমি কাপড় দিয়ে যে কোট ব্যবহার করা হত, তখন তার নামকরণ হয়েছিল নেহেরুকোট। এই ক্রমবির্তনের ধারায় বঙ্গবন্ধুর ব্যবহারের ফলে গোটা প্রেক্ষিতটাই পাল্টে যায়, অন্তত এতদঞ্চলের লোকজনের কাছে।

বঙ্গবন্ধুর প্রথম কোটটি যিনি তৈরি করেছিলেন তাঁর নামটা ভুলে গেলেও মনে আছে কলাবাগানের কাছে তাঁর বাড়ি ছিল। তাঁর আবার দুই ঘরণী ছিলেন। তাঁর এক কন্যাকে ওই আশির দশকে দেখা যেত। মেয়েটির নাম ছিল রমা। সেজন্য সেই দর্জি সাহেবকে সবাই রমার বাপ বলে ডাকতেন। এখন আর তাঁর খবর জানা নেই।

বাঙালি জীবনে বঙ্গবন্ধুর কী সুদূরপ্রসারী প্রভাব সেটা বোঝাবার জন্যেই এই ঘটনার উল্লেখ। তাঁর উদাত্ত বজ্রকণ্ঠের কথা আর না-ই বা বলা হল। আর তাঁর স্মৃতির কথা তো প্রবাদ-প্রতিম। সাহিত্য-প্রীতির কথা তো আজ আর কারুর অবিদিত নয়।

● শেখ মুজিবুর রহমান একটি মহাকাব্যের নায়ক ছিলেন। এই মহাকাব্য জাতীয়তাবাদের। আরো নির্দিষ্টার্থে এ হচ্ছে পাকিস্তানি রাষ্ট্র-কাঠামোর অধীনে বাঙালি জাতীয়তাবাদের অভ্যুত্থান ও পরিণতিতে নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার। সবাইকে তিনি ছাড়িয়ে গেছেন, ছাপিয়ে উঠেছেন। কেন পারলেন? অন্যরা কেন পারলেন না? কেন পিছিয়ে গেল তারাও, যারা বৈষয়িকভাবে অধিকতর প্রতিষ্ঠিত ছিল? প্রধান কারণ সাহস। শেখ মুজিবের মতো সাহস আর কারো মধ্যে দেখা যায়নি। ফাঁসির মঞ্চ থেকে তিনি একাধিকবার ফিরে এসেছেন, আপোস না করে।

● পাকিস্তানি নিষ্পেষণকালে শত্রুকে চিনতে তাঁর (বঙ্গবন্ধু) ভুল হয়নি। শত্রু ছিল রাষ্ট্র। মিত্র ছিল মধ্যবিত্ত ও জনগণ। মধ্যবিত্তের সেই অংশ প্রথমে আসেনি, যারা ছিল প্রতিষ্ঠিত, যারা সুযোগ-সুবিধা পেয়েছিল এবং আরো পাবে বলে আশা করেছিল; কিন্তু পরে তারাও এসেছে নতুন স্বপ্ন বুকে বেঁধে। সে হাত হয়ে উঠেছে দুর্বার।

● একাত্তরের আগে এবং একাত্তরেও তাঁর (বঙ্গবন্ধু) শত্রু ছিল বাইরে। তখন রাষ্ট্র তাঁর শত্রু। রাষ্ট্রের শাসক, তাঁর বিভিন্ন বাহিনী, তাঁর আমলাতন্ত্র, ব্যবসায়ী সবাই তাঁর সাধারণ শত্রু। মহাকাব্যের নায়কের যেমনটা থাকে, থাকার কথা। কিন্তু বাহাত্তরের পর বদলে গেছে শত্রু-মিত্রের পরিচিতি ও অবস্থান। শত্রু তখন আর বাইরে নেই। চলে এসেছে ঘরের ভেতর।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী
প্রফেসর ইমিরিটাস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

অগ্রনায়ক বঙ্গবন্ধু

সনৎ কুমার সাহা

একটা প্রশ্ন প্রায়ই মনে জাগে, এ যুগে আমাদের সাফল্য ও ব্যর্থতাকে আগামী শতাব্দীর মানুষ কী চোখে দেখবে? সে কি শুধুই দোষারোপ করবে– কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে আপন ভাগ্যের অভিশাপের দায় এ যুগের আত্মবিস্মৃতির ওপর চাপাবে? নাকি আপন অস্তিত্বের ঐশ্বর্যের সত্যকে আজকের বাংলাদেশের এই ভাগ্যাহত মানুষের তেজোদ্দীপ্ত প্রয়াসে আবিষ্কার করে শ্রদ্ধায় অবনত হবে? উনিশ শতকের বাঙালির মহান কীর্তি আমাদের স্তম্ভিত করে। রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ, প্রতিটি প্রাতঃস্মরণীয় পুরুষ যেন এক-একটি বিশাল মহীরুহ। বাঙালি আজ তার নিজস্বতাকে দাঁড় করাতে পেরেছে তাঁদের কীর্তির ওপরেই। তার বাঙালিসত্তার গভীরে অণুতে অণুতে সঞ্চারিত তাঁদের ব্যক্তিত্বের বিমলবিভা। উনিশ শতকে ওই ধীমান পুরুষদের উদ্যমের সমান্তরালে একইসঙ্গে গণজীবনে বিস্ফোরিত হয় বারবার কৃষকের আত্মরক্ষার সংগ্রাম। তিতুমীর, শরীয়তুল্লাহ, দুদু মিঞা, ঈশানচন্দ্র– এঁরা দিয়ে যান মাথা নত না করার শিক্ষা। তাঁদের রোখ, তাঁদের অবাধ্যতা– এসবেই আছে আজকের বাঙালির গর্বিত উত্তরাধিকার। কিন্তু এ যুগের বাঙালি কী দিয়ে যাবে আগামী শতাব্দীর মানুষকে? সে কি শুধুই বিশ্বাসঘাতকতা আর প্রতিশ্রুতিহীনতা, নাকি কোনো উজ্জ্বল উদ্ধার, কোনো মহান উত্তরণ, যা সমৃদ্ধ করে মানুষকেই?

কি দেখি আজকের বাংলাদেশে? এক জনাকীর্ণ ভুখা, আট কোটি মানুষের চাপে পিষ্ট; বুভুক্ষাতাড়িত অগণিত মানব-সন্তান জীবন-সংগ্রামে পর্যুদস্ত নিরেট নিশ্ছিন্দ্র বিস্তৃয়মান, কর্ষণে-কর্ষণে জীর্ণ পৃথিবী উৎপাদনের তাগিদে ক্লান্ত; কৃষি বিশ্রামহীন, শিল্প উৎপাদনহীন; জীবন অবলম্বনহীন, তবু হতশ্রী জনপদে সীমিত সম্পদের কাড়াকাড়ি, বিষয়-আশয় বাঁধা পড়ে পরনির্ভরতার নাগপাশে। নিশ্চয় কোনো আশা জাগায় না এই ভয়াবহ বর্তমান। ভবিষ্যতের মুখ-গহ্বরও ঢাকা থাকে অন্ধকারেই। অবস্থা যখন এই রকম, তখন শ্রদ্ধার সঙ্গে আগামী শতকে আমাদের কেউ স্মরণ করবে– এটা মনে হতে পারে দুরাশা; বরং আপন ভাগ্যের অশেষ দুর্গতির জন্য ধিক্কার দেবে পূর্বপুরুষদের– এইটেই বোধ হয় স্বাভাবিক কিছু। এখানেই কথা ওঠে, যে উনিশ শতক আমাদের এত গরিমাদীপ্ত তা কি মানুষের জীবনকে তুলনায় সচ্ছলতর, সুস্থতর করে রাখতে পেরেছিল? প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ইতিবাচক জবাব দেওয়া শক্ত। মারী ও মন্বন্তরে তখনও বারবার ছারখার হয়ে গেছে বহু গ্রাম-জনপদ। অধিকাংশ মানুষই লেখাপড়া শেখেনি। কুসংস্কার ছিল মজ্জাগত। সমাজজীবনে ছিল উৎকট বৈষম্য, অধিকার-বঞ্চিত কৃষক-সন্তানের ললাট-লিখন ছিল দারিদ্র্য ও অপমান। তবু অস্বীকার করা যায় না উনিশ শতকের শ্রদ্ধেয় উত্তরাধিকার। আমাদের স্বাতন্ত্র্যের, আত্মপরিচয়ের আকার গড়ে উঠতে থাকে এই সময়েই। শত অশিক্ষা ও লাঞ্ছনার ভেতরও অশুভকে পরাজিত করবার বাস্তব উদ্যোগ সুস্পষ্ট পথ রচনা করতে থাকে তখন থেকেই। আজকে আমাদের কোনো উদ্যম যদি অর্থবহ হয়, তবে তার পশ্চাতে নিশ্চিত কাজ করে এই ঐতিহ্যের নির্দেশনা, কাজ করে অতীত সুকৃতির অনুপ্রেরণা।

এখন প্রশ্ন হল, অনুরূপভাবে এ যুগের আমরা কি অনাগত কালের মানুষের জন্যে কোনো অবদান রেখে যেতে পারছি? মানুষের আদর্শ-ভূমি রচনা করতে না পারলেও সঞ্চয়ের খাতায় এমন কিছু কি রেখে যাচ্ছি না, যা বারবার মানুষকে উদ্বুদ্ধ করবে আদর্শ-ভূমি রচনায়? থমকে দাঁড়াতে হয়। মহৎ ঐতিহ্যের স্বীকৃতিই শুধু নয়, বরং মহত্তর ঐতিহ্যের সৃষ্টিতে ভাস্বর এ যুগে এদেশের বাঙালি উদ্যম। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন থেকে একাত্তরের মুক্তি সংগ্রাম বাঙালি জীবনেই মাত্র নয়, সমগ্র মানব সমাজের ইতিহাসেই এক অবিনাশী গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। এবং এ যুগের এক মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সমকাল

বাঙালি আজ তার নিজস্বতাকে দাঁড় করাতে পেরেছে তাঁদের কীর্তির ওপরেই ..... উনিশ শতকে ওই ধীমান পুরুষদের উদ্যমের সমান্তরালে একই সঙ্গে গণজীবনে বিস্ফোরিত হয় বারবার কৃষকের আত্মরক্ষার সংগ্রাম। তিতুমীর, শরীয়তুল্লাহ, দুদু মিঞা, ঈশানচন্দ্র এঁরা দিয়ে যান মাথা নত না করার শিক্ষা।

যে মূল্যই দিতে না কেন, কালকে ভুলিয়ে দেবার যত চেষ্টাই করুক না কেন, আজকের বাঙালি সত্তার এই সারসত্যকে চেপে রাখা যাবে না আগামীকাল। সাফল্য-ব্যর্থতা সব মিলিয়ে এ ভূমির অসাধারণ প্রয়াস প্রেরণা যোগাতে থাকবে ভবিষ্যতকাল থেকে কালান্তরে, এদেশে শোষণহীণ কল্যাণময় সুখী সমাজ গড়বার সব মানুষী উদ্যোগে।

মনে হতে পারে আপাতদৃষ্টে অতিশয়োক্তি। কিন্তু সত্যিই কি তাই? একাত্তরে স্বাধীনতার পুণ্যলগ্নে প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিহাস অধ্যাপক প্রফেসর মাহমুদকে উচ্ছ্বসিত হতে দেখেছি। এ এক অনন্যসাধারণ মুহূর্ত। তিনি বলছিলেন, "উপমহাদেশের হাজার বছরের ইতিহাসেও এমনটি আর আসেনি, খুব কম দেশেই আসে। যেন এক অলৌকিক ঘটনা। তাক লাগিয়ে দিয়েছেন শেখ মুজিব।" সেই উজ্জ্বল অবিস্মরণীয় মুহূর্তে ভেবে দেখিনি তাঁর কথাগুলি। পরে আঘাতে আঘাতে বেদনায় বেদনায় যখন ইতিহাসের দর্পণে নিজেদের মুখ স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে তখন ধীরে ধীরে দুঃখ-দীর্ণ উপলব্ধির আলোকে বুঝে উঠতে পেরেছি, আতিশয্য ছিল না অধ্যাপকের সেদিনের উচ্ছ্বাসে। সত্যিই অসাধ্য সাধন করেছিলেন বঙ্গবন্ধু। অসাধারণ মহিমায় জেগে উঠেছিল এদেশের বাঙালিরা। কিন্তু এই জেগে ওঠা কি ছিল মাত্র মানুষের মতো? তা নইলে কেন আবার এই প্রত্যাবর্তন আপনার নিঃসঙ্গ অন্ধ কারাগারে? ঠিক ঠিক উত্তর এখনই মিলবে না। অপেক্ষা করতে হবে আগামী দিনের জন্য।

তবে বঙ্গবন্ধুর অবদান যে এদেশের ভাবীকালের মানুষের জন্যে এ যুগের শ্রেষ্ঠ অবদান, তা মেনে নিতে আর দ্বিধা জাগে না। স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার স্থির লক্ষ্য সামনে রেখে তিনি ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়েছেন। কোথাও মাথা নত করেননি। কোথাও আপোস করেননি। জেল-জুলুম, অত্যাচার কোনো কিছুতেই ভয় পাননি। তবে ব্যক্তিত্বই সব নয়। সাফল্য দিয়ে শেষ বিচার হয় না কৃতিত্বের। কোন লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্যে এত আয়োজন– সেইটেই বড় কথা। এই লক্ষ্য ছিল স্বাধীন বাংলাদেশ, যা শুধুই একটি ভূখণ্ড মাত্র নয়, বরং রাষ্ট্রসাধনায় শ্রেয়োবোধের তা এক মূর্ত অভিব্যক্তি। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে শিখর জয়ের সার্থকতা বাঙালির এখানেই। তুলনীয় কিছু ঘটেনি উনিশ শতকে, ঘটেনি এমনকি দূর অতীতেও।

আরো একটু বিশদ হবার চেষ্টা করি। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলাদেশ বলতে যে বোধ উদ্দীপিত করা হয়, তা জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র– এই নীতি চতুষ্টয়ের উত্তুঙ্গ সমন্বয়। বাস্তবতায় ধরতে চাই আকাঙ্ক্ষার উদার কল্যাণময় মানবিক বিস্তার। ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে দেখতে চাই নতুন প্রেক্ষাপট। বাংলাদেশ মানে দাঁড়ায় এই সামগ্রিক পরিবর্তন– জীবনকে উচ্চতর স্তরে প্রতিষ্ঠার পবিত্র অঙ্গীকার। সংকীর্ণ গণ্ডি থেকে, অন্ধ আবেষ্টনী থেকে জীবনকে সুস্থতায়, পূর্ণতায় মুক্তি দিতে চাওয়া– তারই নাম বাংলাদেশ। এই বাংলাদেশের স্বপ্ন ধীরে ধীরে জাগিয়ে তোলেন বঙ্গবন্ধু, তাকে স্পষ্ট করে তোলেন গণমানুষের আবেগে। স্বাধীনতা সংগ্রাম এই আবেগের চূড়ান্ত বিস্ফোরণ।

তবে অসাধারণ হলেও শুধু এই কারণেই অনন্য নয় বঙ্গবন্ধুর কৃতিত্ব। ফরাসি বিপ্লব, রুশ বিপ্লব পৃথিবীর বুকে ঘটে গেছে অনেক আগেই। কাজেই যে মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার জন্যে বাঙালির সংগ্রাম, দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় তার প্রকাশ চাপা থাকে না আরো অনেকখানেই। এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন পরাধীন অঞ্চলের স্বাধীনতা সংগ্রামে নিপীড়িত মানুষের সম্মিলিত আদর্শ হিসেবে তা উচ্চারিত হয়ে চলেছে বারবার। বাংলাদেশও যখন তাকে তার অস্তিত্বের কেন্দ্রে স্থাপন করায় উদ্যোগী হয়, তখন তাতে নতুনত্ব থাকে না অবশ্য, তবে উচ্চাশা থাকে নিশ্চয়। বঙ্গবন্ধুর অসাধ্য সাধন আরো একটু গভীরে। ঐতিহ্যে স্থিত হয়েই বাঙালি পরিচয়ে পূর্ণতা এনে তিনি তাকে সার্বিক মুক্তির লক্ষ্যে পরিচালিত করেছিলেন। এমন সামগ্রিক উজ্জীবন বিশ্ব-ইতিহাসেই দুর্লভ। এখানেই বঙ্গবন্ধু অনন্য।

বাঙালির উনিশ শতকের ঐতিহ্যে ছিল দুটি সুস্পষ্ট ধারা,

সমান্তরাল কিন্তু মূলত প্রতিদ্বন্দ্বী। একদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষা, নতুন জাগতিক মূল্যবোধ, উদার মানবতা– সব মিলে বাংলার রিনেসাঁস্; অন্যদিকে অধিকার-বঞ্চিত গ্রামীণ কৃষকের ক্রমাগত খণ্ড খণ্ড স্পর্ধিত প্রতিরোধ-প্রতিবাদ, যা অনেক সময় প্রত্যাখান করে উপনিবেশিকতা-লালিত নাগরিক মূল্যবোধকেই। দুই ধারার কোনো সুস্থিত সমন্বয় ঘটে না উনিশ শতকে। এই শতাব্দীর প্রথম অর্ধে তাদের মূল দ্বন্দ্ব সাম্প্রদায়িক বিভ্রান্তিতে আটকে গিয়ে বিপথে তাড়িত করে আমাদের সমগ্র সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনকে। ফলে বিপন্ন হয়ে পড়ে বাঙালির অস্তিত্বই। শুধুই অস্তিত্বের জন্যে অস্তিত্ব থাকা অথবা যাওয়া ভাল-মন্দনিরপেক্ষ। কিন্তু বাঙালির ক্ষেত্রে তার আত্মপরিচয় গড়ে উঠেছিল তার অর্জিত শ্রেয়োবোধের ওপর। কাজেই বাঙালির অস্তিত্ব বিপন্ন হলে মার খায় তার শ্রেয়োবোধই। জীবনবিধ্বংসী অন্ধবিশ্বাস ও প্রথার শাসন মেনে নেওয়ার অর্থ দাঁড়ায় আপন ভাগ্য জয় করার লক্ষ্য থেকে মানুষের পশ্চাদপসরণ।

উনিশ শ' সাতচল্লিশের দেশভাগ বাঙালিকে এই ধরনের হুমকির মুখে ঠেলে দেয়। কিন্তু তারপর শুরু হয় তার আত্মরক্ষার সংগ্রাম। তবে লক্ষণীয়, অনেকটা সকলের অজান্তেই তার কেন্দ্রবিন্দু স্থানান্তরিত হয় কলকাতা থেকে ঢাকায়। কলকাতা-কেন্দ্রিক জীবনের স্রোত যায় শুকিয়ে; তা নতুন করে নতুন বাঁকে বইতে শুরু করে পূর্ব বাংলায়। বাহান্নোর ভাষা আন্দোলনই বেঁধে দেয় তার নব উপলব্ধ, আত্মপরিচয়ের মূল সুর।

এই পরিচয় স্পষ্ট করে তোলার আপোসহীন সংগ্রামের অগ্রনায়ক বঙ্গবন্ধু। উনিশ শতকী ঐতিহ্য ছিল বিপ্রতীপ, কিন্তু পরস্পর-বিচ্ছিন্ন দুই ধারা, তাদের যে কোনো একটিতে খনিবত থাকে বাঙালির পরিচয়, অথচ তাদের মেলানো দুরূহ। এই দুরূহ কাজটিই সম্পাদিত হল বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে। কৃষক বিদ্রোহের আগুনকে ছড়িয়ে দিলেন বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে। ঔপনিবেশিক শোষণে পীড়িত ছিল সর্বস্তরের মানুষ। সেই শোষণের সার্বিকরূপ তিনি তুলে ধরলেন সবার কাছে। যে বিদ্রোহ আগে ছিল খণ্ড খণ্ড এবং সেই কারণেই বিক্ষিপ্ত, সঙ্কীর্ণ ও অগভীর তা এখন জমাট বেঁধে জন্ম দেয় যৌথ চেতনার, রূপ নেয় গণঅভ্যুত্থানের। বঞ্চিত কৃষকের ক্রোধ সঞ্চলিত হয় সব মানুষে। সে সহমর্মিতা ছিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃত্তে আবদ্ধ ও একে অন্যে সম্পর্কহীন, সব সে ভেঙ্গে ফেলে। তা একাকার হয়ে যায় গণজীবনের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। পরন্তু উনিশ শতকের যে রিনেসাঁস্ ছিল সমগ্র সমাজের এক ক্ষুদ্র অংশে লালিত তারই প্রবহমান ধারায় অর্জিত প্রাগ্রসর মূল্যবোধও প্রসারিত হয়ে স্পর্শ করে অন্তেবাসী অভাজনের উন্মুখ হৃদয়। নাগরিক বেষ্টনী ভেঙ্গে, স্বার্থান্ধের কব্জা ছাড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল হয়ে ওঠেন সমগ্রের প্রতিনিধি। 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' জাগিয়ে তোলে এক অভূতপূর্ব আকুতি। দূরে, কাছে, নিভৃতে, জনারণ্যে সব বাঙালিকে তা উদ্বোধিত করে একই প্রেমের আবেগে। এই হল জীবন্ত জাতীয়তা। তুচ্ছতায় দীন নয়, কিন্তু সবার ভিতরে ব্যাপ্ত, প্রগতি-প্রত্যাশী এবং সকলেই প্রত্যক্ষ সংযোগে স্পন্দিত। একই সূত্রে বাঁধা পড়ে বাঙালি জীবনের সমস্তটাই। যে লক্ষ্য সামনে রেখে বাঙালির এই সহযাত্রা, তা নিশ্চিতভাবে দূর করতে চায় তুচ্ছ জীবনের গ্লানি, প্রতিষ্ঠার আশা জাগায় উদার মুক্ত শোষণহীন ভবিষ্যতের। জাতীয় জীবনে একসঙ্গে এতগুলি ধাপ অতিক্রম করে যাওয়া এক অসাধারণ চমকপ্রদ ঘটনা। এই ঘটনাতেই জনগণকে টেনে আনলেন বঙ্গবন্ধু। সাহস, সততা ও একনিষ্ঠ ব্রতচারণার অনন্য ব্যক্তিগত দৃষ্টান্তই যে তিনি শুধু তুলে ধরলেন তা নয়, এক জ্বলন্ত প্রেরণাময় নেতৃত্বে যাদুকরের মতো জনগণকে অনুপ্রাণিত করে লক্ষ্য অর্জনের তুমুল সংগ্রামে তাদের সঙ্গীও তিনি করলেন। প্রায়-নিরস্ত্র এক জাতির এমন ব্যাপক গণঅভ্যুত্থান যে কোনো দেশের ইতিহাসেই বিরল। বাংলাদেশে আরো বিশিষ্ট, যেহেতু এই একতার মূল ছিল না তার ঐতিহ্যে, তাকে রচনা করতে হয়েছিল বলিষ্ঠ নেতৃত্বে। দুই প্রতিদ্বন্দ্বী ধারার অন্তর্নিহিত শুভকে সমন্বিত করে বঙ্গবন্ধু তাকে প্রবল বেগে একমুখে প্রবাহিত করলেন।

বাঙালির আত্মপরিচয়ের সাধনা সাময়িক হলেও সম্পূর্ণ হল। এখানে বঙ্গবন্ধু মাথা উঁচু করে দাঁড়ান সবার ওপরে। সুরেন্দ্রনাথ থেকে সুভাষ বোস পর্যন্ত সবার কৃতিত্ব ম্লান করে দেয় তাঁর একক সাফল্যের মহত্ত্ব। বাঙালি সত্তার এমন বিশাল সর্বব্যাপ্ত মুক্তিকে কল্পনাতেও পুরোপুরি ধরতে পারেননি তাঁর কোনো পূর্বসূরি। এক আঙ্গিনায় দাঁড়িয়ে থেকে প্রাচীর না ভেঙ্গেই ডাকতে চেয়েছেন সব আঙ্গিনার মানুষকে– যে ডাক প্রতিহত হত প্রাচীরেই। যথেষ্ট সাড়া তাই মেলেনি। বঙ্গবন্ধুই প্রথম কৃষক-সন্তানের আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে উদার জীবনের মূল্যবোধকে আত্মস্থ করার আহ্বান জানালেন। দুই প্রান্তের সত্য এসে মিলল এক বিন্দুতে। তারই বিস্ফোরণে জন্ম নিল বাংলাদেশ।

অতিরঞ্জন ছিল না তাই প্রফেসর মাহমুদের উচ্ছ্বাসে, ছিল না অন্নদাশঙ্করের বোধদীপ্ত উচ্চারণে– "যতদিন রবে পদ্মা যমুনা, গৌরী মেঘনা বহমান, ততদিন রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান।" এমনকি, মনীষী আঁদ্রে মালরোর সপ্রশংস মূল্যায়নে, "সমস্যা কণ্টকিত বর্তমান বিশ্বে একজন পথ-প্রদর্শক শেখ মুজিব।" জনগণকে সঙ্গে নিয়ে প্রতিরোধের দেয়াল

ভাঙতে অগ্রসর হয়েছেন বঙ্গবন্ধু। চূড়ান্ত পর্যায়ে বিশ্বসভায় মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠা পায় বাংলাদেশ। স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার মতো এ কাহিনী। বাঙালিকে তা প্রেরণা যোগাবে চিরকাল।

তবু– তবু কেন শেষ রক্ষা হয় না? কেন আমাদের ভাগ্যে জোটে ছেঁড়াখোঁড়া অস্তিত্বের বিড়ম্বনা? গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের যে ভাবমূর্তি গড়ে উঠেছিল একাত্তরে, তা কেন মিলিয়ে যায় অচিরাৎ? কেন আমাদের চোখের সামনে নেচে বেড়ায় ছিন্নমস্তা ভূতপ্রেতের দল? ভুল ছিল কি তবে আমাদের প্রতিজ্ঞায়? অথবা আয়োজনে? স্বর্ণ-শিখর প্রাঙ্গণে দীর্ঘস্থায়ী অবস্থান কী মানুষের সাধ্যে কুলোয় না জানি, কিন্তু সমূহ বিনষ্টি যে শেষ কথা, এটাও মেনে নিতে বাধে।

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে অল্পদিনেই উবে যায় সমষ্টি-চেতনা। প্রাথমিক লক্ষ্য হাতের মুঠোয় এসে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই দুঃখ বরণের প্রতিজ্ঞা শিথিল হয়ে পড়ে এবং সাধারণভাবে মানুষ এতটুকু সুযোগ পেলেই এতদিনের ব্যক্তিগত বুভুক্ষুবাসনা মেটাবার তাগিতে তার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে। যুদ্ধ-বিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠনে প্রয়োজন ছিল সংঘবদ্ধ উদ্যমের, প্রয়োজন ছিল ব্যক্তিগত সুখচিন্তার নির্বাসন। কিন্তু তা হয়নি। ফলে শোষিত নিঃশেষিত, কৃপণা প্রকৃতির রোষকবলিত বিপর্যস্ত অর্থনীতি শরশয্যায় প্রহর গোনে, জাতীয় চেতনায় তার উদ্ধারের কোনো যৌথ উদ্যোগ স্পষ্ট রূপ পায় না। এদিকে আঘাত হেনে চলে ক্রমাগত স্বাধীনতার শত্রুরা– কী ভিতরে কী বাইরে।

ভঙ্গুর প্রশাসনকে আরও বেকায়দায় ফেলে হঠকারী সন্ত্রাসবাদীদের আত্মঘাতী কার্যকলাপ। স্বাধীন বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক সরকার ক্রমশ তার বিশ্বাসযোগ্যতা হারায়।

কী আর করতে পারতেন বঙ্গবন্ধু? বারবার তিনি বলেছেন, দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোই তাঁর ব্রত। কিন্তু দেশ পুনর্গঠনের দুরূহ কাজে আন্তরিকতাই যথেষ্ট নয়। চাই উপযুক্ত সংগঠন। চাই সকলের সম্মিলিত উদ্যোগ, চাই দাঁতে দাঁত চেপে প্রতিটি মানুষের দুঃখ-কষ্ট সহ্য করার প্রস্তুতি। চাই সুদক্ষ সুশৃঙ্খল জনশক্তি। রাশিয়া অথবা চীন, কিউবা অথবা ভিয়েতনাম কোনো দেশেই অর্থনৈতিক নির্মাণের কাজ সহজলভ্য হয়নি। আবার শ্রম ও অশ্রুর বিনিময়ে আয়ত্তে আনা সম্ভব হয় কিঞ্চিৎ স্বাচ্ছন্দ্য। এবং এই কষ্ট স্বীকারের প্রয়োজন স্বল্পকালের জন্য মাত্র নয়, তাকে মেনে নিতে হয় বিরতিহীন বছরের পর বছর। বাংলাদেশে অবস্থা ছিল আরো কঠিন। যুদ্ধে উৎপাদন বিপর্যস্ত। কল-কারখানা অচল। কারিগরি জ্ঞান অল্প, পরিচালনা অনভিজ্ঞ। কোটি কোটি মানুষ গৃহহীন। অধিকাংশ মানুষ কর্মহীন। অবস্থার মুখোমুখি হবার মতো শিক্ষা, কর্তব্যবোধ ও প্রস্তুতি কোনোটিই যথেষ্ট গভীরে ছিল না নব নিযুক্ত প্রশাসনের।



বঙ্গবন্ধু আপোস করেননি।
বিপুল সমস্যার আবর্তে পড়ে
বিশ্বাস হারাননি নিজের উপর,
বিশ্বাস হারাননি মানুষের উপর।
কখনো সরে আসেননি সাম্রাজ্যবাদ-
বিরোধী ভূমিকা থেকে।

স্বাধীনতার আগে বহুকাল ধরে তিল তিল করে যে মানসিকতা গড়ে তোলা হয়েছিল রাজনৈতিক সংগঠনে, তা এক মুহূর্তে হয়ে পড়ল অকেজো, বাস্তব জীবনে সঙ্গতিহীন এবং অনেক সময়ে বিপজ্জনক। অথচ সংগঠন পাল্টানো যায় না মুহূর্তের ইচ্ছায়। অভ্যস্ত জীবনের আচরণ ও অধিকারবোধ বদলে ফেলা যায় না এক কথাতেই। অন্য সব দলের মতো আওয়ামী লীগও ছিল এই সমস্যায় আক্রান্ত। নতুন পরিস্থিতিতে কর্তব্য ও তার গুরুত্ব সম্পর্কে আদৌ অবহিত ছিলেন না অধিকাংশ সভ্যই। দলকে রাতারাতি ভেঙে দিতে চাইলে হঠাৎ করে নেমে আসবে শূন্যতা, না ভাঙতে চাইলে মেনে নিতে হবে অসততা ও অযোগ্যতা। বঙ্গবন্ধুর মতো নেতৃত্বও এই পরিস্থিতিতে অসহায়। আর একটা সমস্যার সৃষ্টি হয় স্বাধীনতার শত্রুদের নিয়ে। দেশের ভেতরেই অনেকে স্বেচ্ছায়, অনেকে বাধ্য হয়ে সহযোগিতা করেছিল দখলদার বাহিনীর সঙ্গে। দেশ স্বাধীন হলে লুপ্ত হয় তাদের বিক্রম, হতমান হতে হয় অনেককে। প্রসন্নচিত্তে অবস্থার এই পরিবর্তন তাদের অধিকাংশই মেনে নেয়নি। এদিকে হানাদারদের সহযোগিতা করায় দেশের মানুষের কাছে তারা অপরাধী। কী নীতি গ্রহণ করা যায় তাদের বিষয়ে? সম্প্রতি লক্ষ করছি, অনুরূপ অবস্থায় আপোসহীন নীতি নিয়ে শত্রু উৎখাত করতে করতে জনসমর্থন হারায় কম্পুচিয়ার পল্‌পট প্রশাসন। অন্যদিকে চিলিতে আলেন্দে নিহত হন যথেষ্ট কঠোর হতে না পারার ফলেই। সহজ সমাধান তাই এই বিষয়ে মেলে না। অথচ সমস্যা গুরুতর। পারস্পরিক ঘৃণা ও অবিশ্বাস ফাটল বাড়িয়ে চলে জনগণের গভীরে। বঙ্গবন্ধু গ্রহণ করলেন সবচেয়ে মানবিক পথ। অপরাধীদের ক্ষমা করলেন। আশা ছিল ক্ষমার প্রতিদানে কৃতজ্ঞ থাকবে দখলদার বাহিনীর ওইসব সহযোগী, আরোপিত বিশ্বাসের মূল্য দেবে তারা বাংলাদেশের মূল্যবোধ অকুণ্ঠচিত্তে মেনে নিয়ে। কিন্তু এই আশা পূরণ হয়নি। যে নীতির উপর দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম, তাকে তারা প্রত্যাখান করে প্রথম সুযোগেই। পূর্ণ সত্তায় উদ্ভাসিত বাঙালি শিকার হয় আবার আত্মখণ্ডণের আর আত্মবিকৃতির।

তবে বঙ্গবন্ধু আপোস করেননি। বিপুল সমস্যার আবর্তে পড়ে বিশ্বাস হারাননি তিনি নিজের উপর, বিশ্বাস হারাননি মানুষের উপর, কখনো সরে আসেননি তিনি সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ভূমিকা থেকে। তাঁর জীবন ছিল অভিযাত্রীর। পথ কণ্টকাকীর্ণ, দিকমণ্ডল ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ। তবু তিনি থেমে থাকেননি। অগ্রসর হয়েছেন অবিরাম। যত পথ চলেছেন, তত নিজেকে প্রসারিত করেছেন। বন্ধন চলার পথেই খসে খসে পড়েছে। এইখানে তাঁর তুলনীয় পুরুষ, যদিও ভিন্ন ক্ষেত্রে, রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের মতোই তিনি ক্রমাগত নিজেকে অতিক্রম করে চলেছেন। রাজনৈতিক নির্মাণ তাঁর এক স্তর থেকে অন্য স্তরে উত্তীর্ণ হয়ে চলেছে। তবে জাতীয় জীবনে নির্মাণ করার একক উত্তরণ নিষ্ফল। সব সময়ই চাই সঙ্গী জনগণ। অগ্রসর হবার চেতনা জনগণেও প্রবাহিত না হলে দেখা দেয় নেতৃত্বের নিঃসঙ্গতা। বিপদ লুকিয়ে থাকে সেখানেই।

স্বাধীন বাংলাদেশের চার বছরের অভিজ্ঞতা ছিল নিদারুণ। বঙ্গবন্ধু বুঝেছিলেন, নতুন পথ খুঁজে বের করতে না পারলে মুক্তি নেই। বুঝেছিলেন স্বনির্ভর হতে হলে, স্বাধীনতাকে অর্থবহ করতে হলে, প্রথমেই চাই ঔপনিবেশিক উৎপাদন ও প্রশাসন কাঠামোয় পরিবর্তন। অভ্যস্ত পরিবেশ থেকে বেরিয়ে আসতে মানুষ দ্বিধান্বিত হতে পারে। বিভিন্ন স্তরে মানুষের সঠিক উপলব্ধির অভাবে বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে। বিতৃষ্ণাও জাগতে পারে অনেক মানুষের মনে। সব বাধা হয়তো অতিক্রম করা যেত তাঁর নেতৃত্বের জোরে সমগ্র প্রয়াসকে সঠিক পথে পরিচালিত করে। তিনি স্বয়ং তাই হয়ে পড়লেন দেশি-বিদেশি কায়েমী স্বার্থের আঘাতের লক্ষ্যস্থল। ষড়যন্ত্রে যারা হাত মেলাল, তাদের কেউ কেউ ছিল তাঁর দীর্ঘদিনের সহকর্মী ও অনুচর। সাম্রাজ্যবাদীচক্র চায় না, কোনো অনুন্নত অঞ্চল তার নিজের পায়ে দাঁড়াক। কারণ সে নিজের পায়ে দাঁড়ালে ক্ষুণ্ন হবে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রভাব-প্রতিপত্তি– শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নয়, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও। গরিব দেশ নিজেদের জিনিস যদি নিজেরাই তৈরি করে ধনী দেশের দ্রব্যসামগ্রী প্রত্যাখান করতে পারে, আর নিজেদের কাঁচামালের উপর যদি নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারে, তবে টান পড়ে একেবারে ধনী

অর্থনৈতিক কাঠামোর গোড়াতেই। আশঙ্কা দেখা দেয় তা হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়ার।

বঙ্গবন্ধু তাঁর দ্বিতীয় বিপ্লবে চেয়েছিলেন গোটা অর্থনৈতিক-সামাজিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন। চেয়েছিলেন ঔপনিবেশিক নির্ভরতা থেকে মুক্তি– হয়তো একদিনে নয়, কিন্তু দুঃখ কষ্ট সহ্য করেও কাঠামোগত মৌলিক রূপান্তরের মাধ্যমে নিরাপদ ভবিষ্যতে নিশ্চিতভাবে। সাম্রাজ্যবাদী চক্র সহ্য করেনি গরিব বাংলাদেশের আত্মনির্ভর হয়ে ওঠার প্রাথমিক প্রস্তুতি।

পরিণতি কি হয়েছে, আমরা জানি। বীরের মৃত্যুবরণ করেছেন বঙ্গবন্ধু। যিশুখ্রিস্টের মতো। মহাত্মা গান্ধীর মতো। ঘাতক হরণ করতে পারেনি তাঁর আত্মমর্যাদা। হরণ করতে পারেনি তাঁর বাঙালি সত্তার পূর্ণতার। সৈন্যে-বর্মে বেষ্টিত কোনো দুর্গ যদি হত তাঁর বাসস্থল, তবে রক্ষা পেতেন হয়তো বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি, কিন্তু জীবিত থাকতেন না বঙ্গবন্ধু, যাঁর জীবনের আপোসহীন অহঙ্কারী কর্মে এই বাণী বারবার উচ্চারিত হয়েছে–"আমি তোমাদেরই লোক।" পতনে-উত্থানে এই বাংলাদেশে জীবিত থাকবেন বঙ্গবন্ধু আগামী শতকেও। একদা গোখলে বলেছিলেন, "বাংলা আজ যা চিন্তা করে, সারা ভারত চিন্তা করে তা আগামীকাল।" ক্ষত-লাঞ্ছিত এই বাংলাদেশে দাঁড়িয়েও অযৌক্তিক নয় আজ সে কথার পুনরাবৃত্তি। সাধারণ মানুষের কল্যাণ চাইলে ঔপনিবেশিক দংশনদুষ্ট অর্থনৈতিক-সামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের চেষ্টা ছাড়া এই উপমহাদেশের অন্য কোনো পথ খোলা নেই। মানুষ একথা যত বেশি বুঝবে, ততই স্মরণ করবে বঙ্গবন্ধুকে। কারণ তিনিই সবার অগ্রপথিক।

● মুজিবের আপোসহীন নেতৃত্বের জন্যই পাকিস্তানি হানাদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বাঙালিরা জয়ী হয়েছে। আবার দেশ স্বাধীন হওয়ার অব্যবহিত পর মুজিব যদি সদ্যস্বাধীন দেশটিতে ফিরে না আসতে পারতেন, কিংবা পাকিস্তানি কারাগারেই যদি তাঁর মৃত্যু ঘটানো হত, তাহলে বাংলাদেশে অবস্থানকারী ভারতের মিত্র সৈন্যরা সহসা স্বদেশে ফিরে যেত কিনা সন্দেহ।

ব্রিটেনের হাউস অব লর্ডস-এর সদস্য
মানবতাবাদী লর্ড ব্রকওয়ে

● বঙ্গবন্ধু শুধু বাঙালির বন্ধু ও অধিনায়ক ছিলেন না, তিনি ছিলেন মানব জাতির পথপ্রদর্শক ও মহান নেতা।

অমর্ত্য সেন
নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অর্থনীতিবিদ

● প্রেসিডেন্ট নাসের যেমন সেক্যুলার আরব জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা, তেমনি শেখ মুজিব প্রবক্তা ছিলেন সেক্যুলার বাঙালি জাতীয়তাবাদের। ..... গোটা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় তাঁর মতো রাজনৈতিক ভিশনের অধিকারী আরেকজন নেতা আমি দেখি না।

মোহাম্মদ হাইকেল
মিশরের 'আল-আহরাম' পত্রিকার সম্পাদক

● বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শুধুমাত্র বাংলাদেশের স্বাধীনতার আন্দোলনের প্রাণপুরুষ হিসাবেই প্রতিষ্ঠিত নন, এই উপমহাদেশ তাঁকে অনন্তকাল একজন সন্ত্রাসবাদ-বিরোধী প্রগতিবাদী ধর্মনিরপেক্ষ আন্দোলনের পথিকৃৎ হিসেবেই জেনে থাকে।

প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সি
ভারতের প্রাক্তন পানিসম্পদ মন্ত্রী

● বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, তাঁর মধ্যে ধীরে ধীরে উত্তরণ ঘটেছে। কোনো গোঁড়ামি বা হটকারিতাকে তিনি প্রশ্রয় দেননি। ইতিহাসের স্বাভাবিক গতিতে তিনি এগিয়ে গিয়েছেন।

বিচারপ্রতি সৈয়দ মোহাম্মদ হোসেন
প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি

● রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের পর বঙ্গবন্ধু অর্থনৈতিক স্বাধীনতা লাভের সংগ্রাম শুরু করেন। ১২ বছর তিনি জেলে কাটিয়েছেন, ১৮ বার কারারুদ্ধ হয়েছেন। ২৪টি মামলার আসামির কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছেন, দু'বার মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছেন। তিনি নির্দেশ না দিলে কারো সাধ্য ছিল না বাংলার মাটি থেকে ভারতীয় সৈন্য সরানোর।

সৈয়দ মোহাম্মদ হোসেন
প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি

আমার বন্ধু শেখ মুজিব

খান শামসুর রহমান

১৯৪৭ সালের শেষ দিক। আমি শেষবর্ষের ছাত্র। এসএম হলে থাকি। সামনে ছাত্র সংসদ নির্বাচন। তখন ছাত্রদের তিনটি সংগঠন ছিল– মধ্যপন্থী পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ, রক্ষণশীল নিখিল পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ এবং বামপন্থী ছাত্র ফেডারেশন। আমি ছাত্র ফেডারেশনের সঙ্গে যুক্ত। একদিন ছাত্রলীগ নেতা আবদুর রহমান চৌধুরী এসে বললেন, কলকাতা থেকে আমাদের নেতা এসেছেন। আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান। নির্ধারিত সময়ে হল গেটেই আমাদের দেখা হল, রহমান চৌধুরী পরিচয় করিয়ে দিলেন, শেখ মুজিবুর রহমান। বিড়ম্বনা এড়াতে তাঁরা আমার রুমে না গিয়ে হলের সামনের রাস্তা দিয়ে তিনজন হাঁটতে হাঁটতে কথা বলছিলেন। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছিল। উপরে সবুজ পাতায় ছাওয়া রেইনট্রি। শেখ মুজিব অনুরোধ করলেন আমরা যাতে প্রার্থী না দিই। আমি বললাম, প্রার্থী দেব না, প্রার্থী দেয়া মানে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের জিতে যাওয়া। ছাত্র ফেডারেশনের ছেলেরা শাহ আজিজের গ্রুপকে কখনও ভোট দেবে না।

শেখ মুজিবুর রহমান আমার থেকে ৭ বছর বড় হলেও পড়াশোনায় এক বছর নিচে ছিলেন। অসুস্থতার কারণে তাঁর পড়াশোনায় ছেদ পড়ে। কলকাতায় তিনি হলওয়েল-বিরোধী মুভমেন্টে সক্রিয় ছিলেন। ১৯৪৭ সালে তিনি বিএ পাস করেন। আমি অনার্স। পরে শেখ মুজিব ঢাকায় এসে মাস্টার্সে আইন বিভাগে ভর্তি হন। ইতিহাসে মাস্টার্সের পাশাপাশি আমি আইন বিভাগেও ক্লাস করি। বয়সের ব্যবধান সত্ত্বেও আমরা ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে গেলাম। সেই বন্ধুত্ব আজীবন ছিল। চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের আন্দোলনে যোগ দিয়ে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিস্কৃত হলেন। আমি পড়াশোনা চালিয়ে গেলাম।

এর মধ্যে ভাষা আন্দোলন শুরু হয়। জিন্নাহ সাহেব ঢাকায় এসে রেসকোর্স ময়দানে বক্তৃতা দিতে গিয়ে বললেন, Urdu, only Urdu will be state Language of Pakistan. রেসকোর্সে প্রতিবাদ হল। পরে এসএম হলে অনুষ্ঠিত কনভেনশনেও তিনি একই কথা বললেন, তবে এবার সুরটা নরম ছিল। বললেন, In My Opinion Urdu Should be the state Language of Pakistan. তার পরও প্রতিবাদ হল। নঈমউদ্দিনসহ অনেকেই প্রতিবাদ করেছিলেন। এরপরে জিন্নাহ সাহেব যতদিন বেঁচে ছিলেন, ভাষা সম্পর্কে একটি কথাও বলেননি।

১৯৫১-এ আমি পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসে যোগ দিই। প্রথম ৫ বছর আমার পোস্টিং ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। ১৯৫৬ সালে যখন পূর্ব পাকিস্তানে এলাম, তখন আওয়ামী লীগ ক্ষমতায়। আতাউর রহমান খান প্রাদেশিক সরকারের মুখ্যমন্ত্রী। সে সময় শেখ মুজিবুরের সঙ্গে দু'একবার দেখা হয়েছে। পরে যোগাযোগটা গাঢ় হয় আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার সময়। '৬৮ সালের এপ্রিলে আমি গ্রেফতার হই। ষড়যন্ত্রের ঘটনাটি ছিল অত্যন্ত infantile অবস্থায়। আমরা যারা বাঙালি অফিসার– কী সামরিক, কী সিভিল, সে সময়ে প্যাকিস্তানে ছিলাম, তাদের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ হত, আলোচনা হত। আমরা মনে মনে ঠিক করেছি, পাকিস্তানিদের সঙ্গে থাকা যাবে না। কিন্তু কীভাবে না থাকার ব্যবস্থাটি হবে তা কারও জানা ছিল না। এ নিয়ে করাচিতে কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের বাসায় বৈঠক হত। বৈঠক হত অন্যান্য কর্মকর্তার বাসায়ও। একদিনের বৈঠকে শেখ মুজিবও ছিলেন। তিনি বলেছেন, 'তোমরা করো, আমি তোমাদের সঙ্গে আছি।' পাকিস্তান সরকার আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার নামে যেসব অভিযোগ দায়ের করল তার প্রায় সবটাই সত্য ...। আমি একটু পেছনে যেতে চাই। বিশের দশকে আলীপুর বোমা হামলা মামলায় বিপ্লবী অরবিন্দসহ কয়েকজন গ্রেফতার হলেন। এ ঘটনা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সি আর দাস বলেছিলেন: Although it was infantile, it served its Purpose. আমাদের মধ্যে একবার একজন প্রস্তাব করলেন, ঢাকা সেনানিবাস থেকে শহরের পথে বোমা পুঁতে রাখলেই পাকিস্তানি সৈন্যরা খতম হবে। অস্ত্র আনার জন্য আলী রেজা ও স্টুয়ার্ড মুজিব একবার আগরতলা পর্যন্ত গিয়েছিলেন। সেখানে কথা বলেছেন মেজর

ও লেঃ কর্নেল র‍্যাংকের দুই কর্মকর্তার সঙ্গে। তাঁরা কীভাবে অস্ত্র দেবেন। ভারতের সেনাপ্রধানও চাইলে কাউকে অস্ত্র দিতে পারেন না। এ জন্য রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত প্রয়োজন। আমরা যে কাজটি করেছি তা হল জনগণের সাহস বাড়িয়ে দিয়েছি। ইতোমধ্যে বাঙালির মনে প্রত্যয় জন্মেছে যে, এটি এক দেশ নয়, দুই দেশ। প্রকাশ্যে কথাটি কেউ বলতে পারছিল না।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার পর কথাটি প্রকাশ্যে আসে। জনগণও ব্যাপকভাবে উজ্জীবিত হয়। মামলা শুরুর সময় আমি ছিলাম জাকার্তায়। বড় ভাইয়ের নামে টেলিগ্রাম পাঠানো হল। ইসলামাবাদ এলে ষড়যন্ত্র সম্পর্কে কয়েকদিন জিজ্ঞাসাবাদ করেও যখন ওরা কোনো তথ্য পেল না তখন ঢাকায় এনে গ্রেফতার করল।

মামলার এক নম্বর আসামি ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান, দুই নম্বর আসামি ছিলেন কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন। ঘটনাক্রমে ভারতীয় উপদূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারি মি. ওঝা আমার বাড়িতেই ভাড়া ছিলেন। আবার আলী রেজা ও স্টুয়ার্ড মুজিব গিয়েছিলেন আগরতলা। সব মিলিয়ে পাকিস্তানি শাসকরা ভারতীয় কানেকশন তৈরি করে ফেলে। গণআন্দোলনের মুখে ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে আইয়ুব খান আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার এবং সব আসামিকে নিঃশর্ত মুক্তি দিতে বাধ্য হন। জেলখানা থেকে বেরিয়ে শেখ মুজিব গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। সে সময় নিয়মিত কামাল হোসেনের বাসায় যেতাম। গোলটেবিল বৈঠকে কি প্রস্তাব দেওয়া হবে সে নিয়ে আলোচনা হত। জনগণ ইতোমধ্যে আইয়ুবকে প্রত্যাখ্যান করেছে। তার সংবিধানও কেউ মানবে না। সেক্ষেত্রে বিকল্প কি? কেউ বললেন, ১৯৫৬ সালের সংবিধানে ফিরে যাওয়া। শেখ মুজিব তাতে রাজি হলেন না। বললেন, আমি প্যারিটি চাই না। জনসংখ্যার ভিত্তিতে সবকিছু হতে হবে। তখন খসড়া সংবিধান তৈরির জন্য একটি কমিটি গঠন করে দেওয়া হল। ড. কামাল হোসেন, খান সারওয়ার মুরশিদ, খান শামসুর রহমান প্রমুখ এর সদস্য ছিলেন। পরবর্তীকালে সেই খসড়া সংবিধান তৈরি হয়েছিল।

খবর পেয়ে জামায়াত নেতা গোলাম আযম একদিন আমার বাসায় হাজির। প্রস্তাবিত সংবিধানে যাতে ইসলাম-বিরোধী কিছু না থাকে সেই ব্যাপারে সুপারিশ করতে বললেন। আমি বললাম, আমিতো ধর্মীয় আইন-কানুন সম্পর্কে ভালো জানি না। সাত দিনের মধ্যে আপনার প্রস্তাবগুলো সংক্ষেপে লিখে দিন। তিনি বললেন, তিন দিনের মধ্যে আমি দিয়ে যাব। আজ পর্যন্ত গোলাম আযম সেই প্রস্তাব দেননি। ১৯৮১ সালে বড়ভাই আতাউর রহমান খানকে দেখতে এলে আমি তাঁকে সেই প্রস্তাবের কথা স্মরণ করিয়ে দিই। তিনি কোনো উত্তর দেননি।

এ সময় শেখ মুজিব আমাকে আওয়ামী লীগে যোগদানের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। আমি বললাম, রাজনীতি করব না। তা সত্ত্বেও আমাদের বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ন ছিল।

১৯৬৯ সালে জেলখানা থেকে বেরিয়ে এসে আমি আর চাকরিতে ফিরে যাইনি। ব্যাবসা-বাণিজ্যের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হই।

শেখ মুজিব সম্পর্কে কিছু বলতে গেলে কিছুটা পক্ষপাতিত্ব হবে। তিনি ছিলেন আমার দীর্ঘদিনের বন্ধু। আমি তাঁর কাছ থেকে যে স্নেহ-ভালোবাসা পেয়েছি তা খুব কম লোকই পেয়েছেন। রাজনৈতিক নেতা বা শাসক হিসেবে তিনি কী রকম ছিলেন, সেটি আমার কাছে বিবেচ্য নয়, তাঁর মানবিক গুণাবলি ও বন্ধুত্বই আমাকে সবচেয়ে বেশি আলোড়িত করে।

এখানে দু'টি ছোট্ট ঘটনার কথা উল্লেখ না করে পারছি না।

১৯৭০ সালের নির্বাচনের ফলাফল যেদিন ঘোষিত হল সেদিন এক বন্ধুর বাসায় শেখ মুজিবের সঙ্গে দেখা। বললেন, কি মিয়া, তুমি আমার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছ?

বললাম, এ কথা বলছ কেন?

তিনি বললেন, দেখো, আমি ডায়েরি রাখি। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার পর আমাদের মধ্যে ১১ বার দেখা হয়েছে। ৪ বার আমার বাড়িতে, ৭ বার তোমার বাড়িতে।

আমি কৈফিয়তের সুরে বলি, তাতেতো তোমার স্বার্থ ছিল।

কি স্বার্থ?

তুমিতো আমাকে আওয়ামী লীগে নিতে চেয়েছিলে।

বললেন, তাওতো আসলা না।

আরেকদিনের ঘটনা। তাও ৭০-এর নির্বাচনের পর। আমাদের কমন বন্ধু জমিরুদ্দিনের মেয়ের বিয়েতে গিয়েছি। তিনি ছিলেন আওয়ামী লীগের নির্বাচনী দফতরের দায়িত্বে। আমরা সবাই খেতে বসেছি। এর মধ্যে শেখ মুজিব এলেন। লক্ষ করিনি। পেছন থেকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরার ভঙ্গিতে আমাকে আগলে বললেন, ঠিকমতো বসে খাও, নইলে পইড়া যাবা।

আমি বললাম, তোমাকেই ঠিকমতো বসতে হবে। আমি পড়ে গেলে একলাই পড়ে যাব। তুমি পড়ে গেলে অনেকেই পড়ে যাবে।

আরেকদিন এক সাংবাদিকের সামনে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নিয়ে আলাপ হচ্ছিল। একজন আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনাদের খুব নাজেহাল করেছে? আমি বললাম, শেখ মুজিব ও আমাদের তিন সিএসপিকে অপেক্ষাকৃত কম নাজেহাল করেছে। অন্যরা বেশি বেশি নির্যাতনের শিকার হয়েছে। পরদিন পাকিস্তান অবজারভার খবর প্রকাশ করল, Shamsur Rahman says, none suffer less than Sheikh Mujibur Rahman. পত্রিকার এই রিপোর্ট কিছুটা হলেও তাকে আহত করেছিল।

১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি শেখ মুজিব দেশে ফিরে এলেন। সেদিন আমি ৩২ নম্বরে গিয়ে ভাবির সঙ্গে গল্প করছি।

গোপালগঞ্জ থেকে তাঁর বাবা-মাও এসেছেন। ঘরভর্তি মানুষ। শেখ মুজিব বিমানবন্দর থেকে সরাসরি রেসকোর্সের জনসভায় গেলেন। বক্তৃতা দিলেন। আমাদের ধারণা ছিল, তিনি আগে বাসায় আসবেন। সবার কাছ থেকে শুনবেন। তারপর যাবেন জনসভায়। সন্ধ্যার দিকে শেখ মুজিব যখন বাসায় এলেন, প্রচণ্ড ভিড়। আত্মীয়-স্বজন, দলীয় নেতা-কর্মী ছাড়াও প্রচুর দেশি-বিদেশি সাংবাদিক। এক বিদেশি সাংবাদিক জিজ্ঞেস করলেন, Did you give order of independence? তিনি বললেন, Here is Tajuddin. I told them if I am arrested you will fight for independence. কথা বলতে বলতে আমার দিকে চোখ পড়ল। বললেন, শামসুর, এদিকে এসো। কাছে আসতে কোলাকুলি করলেন। নিচুস্বরে বললেন, মস্কো যাবা নাকি?

আমি জবাব দিলাম, এখন এসব চিন্তা করার দরকার নেই। চেহারা কি বানিয়েছ দেখেছো? ভেতরে যাও, বিশ্রাম নাও।

বললেন, কাল সন্ধ্যায় এসো। আমি বললাম, কাল পারব না। পরশু। পরদিন সকাল সাড়ে ৭টায় টেলিফোন এল। ওপার থেকে শেখ মুজিব জানতে চাইলেন, আইবা না? জানো আমি কে?

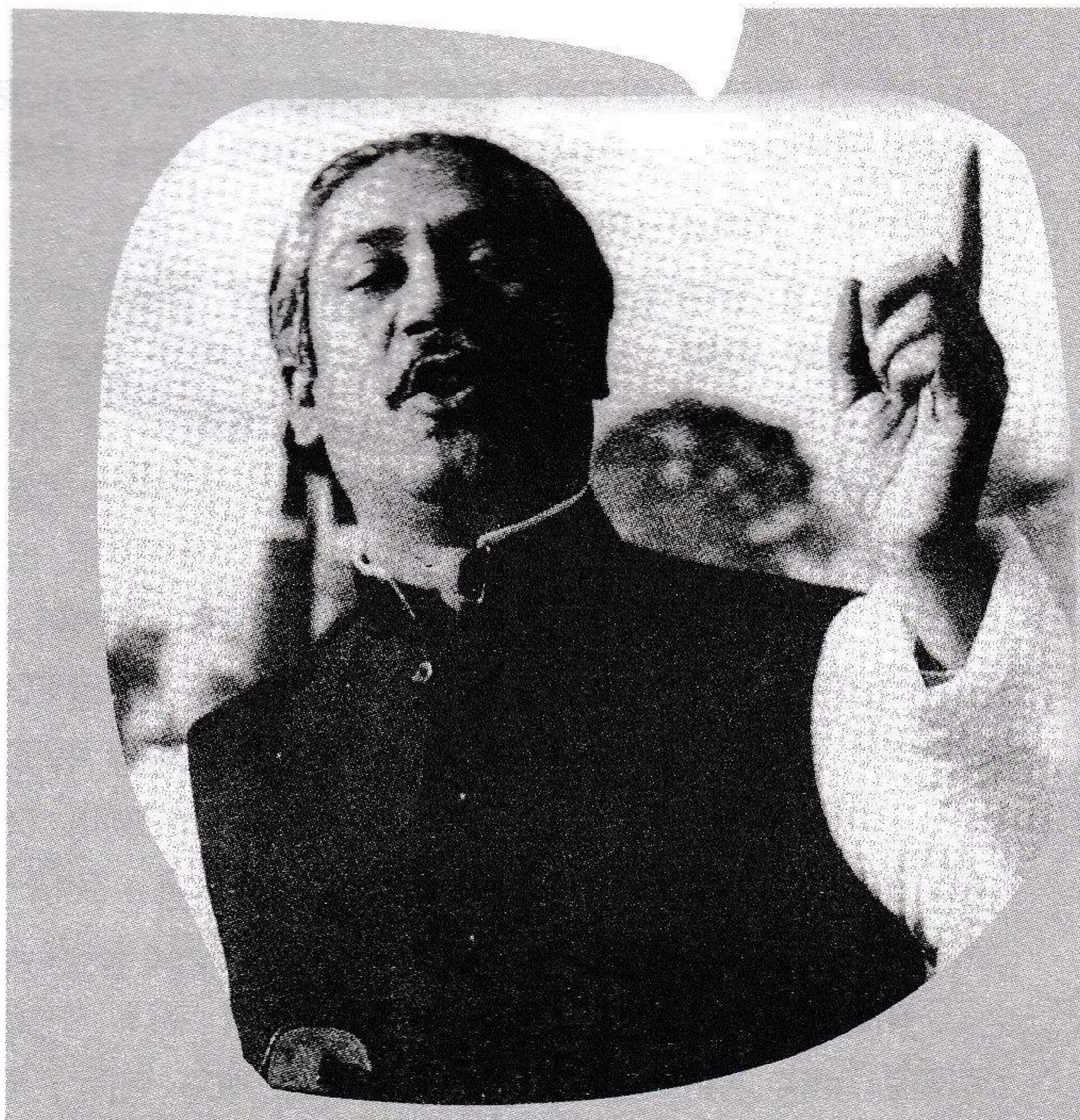
স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি। আমিও ঠাট্টা করে বললাম, টেলিফোনে স্যালুট জানাচ্ছি। তবে সন্ধ্যায় আসতে পারব না। আমি দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমন্ত্রণ জানিয়েছি। তিনি বললেন, 'বাংলাদেশ পাকিস্তান নয়। এদেশে রাষ্ট্রপতি শাসন চলবে না। দেশ শাসন করবেন প্রধানমন্ত্রী।'

৯টায় গিয়ে দেখি তিনি বারান্দায় বসে আছেন। দেখা হতে জিজ্ঞেস করলেন, কী ঠিক করলা?

বললাম, দেশ স্বাধীন হয়েছে। কিছুদিন থাকতে দাও। মস্কো এনায়েত করিমকে পাঠাও। তাছাড়া মস্কোতো এখনো আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেয়নি।

শেখ মুজিবের জবাব, আমি বললেও ওরা দেরি করবে? জানুয়ারির দিকে মস্কো আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেয়। এদিকে আমার যাওয়ারও প্রস্তুতি শুরু হল। ১২ ফেব্রুয়ারি আমি ঢাকা ত্যাগ করি। তখন মস্কোয় প্রচণ্ড শীত। মাইনাস ১৫ ডিগ্রি। এজন্য লন্ডন হয়ে শীতের পোশাক নিয়ে মস্কোয় পৌঁছি ১৮ ফেব্রুয়ারি।

যেখানেই গেছি বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে সবাই খাতির করেছে। প্রত্যেকটি স্থানে চিফ অব প্রোটোকল রিসিভ করেছেন। ফেব্রুয়ারির শেষে সোভিয়েত রাষ্ট্রপতি পোদগর্নির কাছে আমার ক্রেডেন্সিয়াল পেশ করি। আমিই প্রথম রাষ্ট্রদূত যাঁর ক্রেডেন্সিয়াল ইংরেজির পাশাপাশি বাংলায় লেখা হয়। এর আগে পাকিস্তান থেকে সপক্ষ ত্যাগ করে যারা বাংলাদেশের কূটনীতিক হয়েছেন, তাঁদের নতুন করে ক্রেডেন্সিয়াল জমা



১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে আইয়ুব খান আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার এবং সব আসামিকে নিঃশর্ত মুক্তি দিতে বাধ্য হন। জেলখানা থেকে বেরিয়ে শেখ মুজিব গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন।

দিতে হয়নি। মস্কোয় আমি তিন বছরের বেশি সময় ছিলাম।

১৯৭৫ সালের আগস্টে আমাকে দিল্লিতে বদলি করা হয়। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে বলা হল, আমি যেন দিল্লিতে হাইকমিশনে যোগ দেওয়ার আগে ঢাকায় আসি।

বছরে দু'তিনবার ঢাকায় আসতাম। শেখ মুজিব বলতেন, তুমি যতবার ইচ্ছা দেশে আসবে। এলেই তাঁর সঙ্গে দেখা করতাম। তিনি রাশিয়া সম্পর্কে জানতে চাইতেন। দেশের অবস্থা সম্পর্কে আমিও খোঁজখবর নিতাম।

একবার ঢাকায় তাজউদ্দীন আহমদের সঙ্গে দেখা হতেই বললেন, আপনি ওনাকে দু'একটি কথা বলবেন। আপনি তাঁর মুখের উপর বলতে পারবেন। আমরা বললে তিনি ভুল বুঝবেন। আপনাকে ভুল বুঝবেন না। একই কথা মনসুর আলীও বলেছেন, যখন তিনি প্রধানমন্ত্রী। তাজউদ্দীন আহমদ মন্ত্রিসভায় নেই। আমি নিজেও দেখেছি মাঝে-মধ্যে পরামর্শ চাইতেন। আমি কিছু বললে গ্রহণ না করলেও চিন্তা করতেন।

আরেকবার বঙ্গবন্ধু ঢাকা থেকে ফোন করে বললেন, তোমার বিরহ সহ্য হয় না। অনেক দূরে পড়ে আছ। কাছে আসো।

বললাম, আমাকে নিয়ে অন্য মতলব আছে নাকি?

জবাব দিলেন, না নেই।

ঢাকায় আসতেই খবর পাঠানো হল, গণভবনে ডাক পড়েছে। ভেতরে ঢুকতেই দরজার দিকে এগিয়ে এলেন। বললেন, মোটা হয়ে গেছ। এবার দিল্লি যাচ্ছ, বুঝতে পারবে।

তাঁর কথায় রহস্যের আভাস পেয়ে বললাম, অসুবিধা কোথায়? বন্ধুরাষ্ট্রে যাচ্ছি।

বঙ্গবন্ধুর জবাব, বন্ধুরাষ্ট্রতো বটেই। গিয়ে দেখো।

আজ দুঃখ হয়, এই মানুষটিকে ভারত ও রাশিয়ার এজেন্ট বলা হত।

তিনি ছিলেন সাচ্চা জাতীয়তাবাদী। সবার আগে দেশের স্বার্থ দেখতেন। মুক্তিযুদ্ধে সহায়তার জন্য ভারত ও রাশিয়ার চেয়ে চীনকে হয়তো বেশি অপছন্দ করতেন।

ঢাকা থেকে বিদায় নিয়ে দিল্লি পৌঁছলাম ১৩ই আগস্ট। রাষ্ট্রপতির কাছে ক্রেডেন্সিয়াল জমা দিলাম। ১৫ই আগস্ট ভারতের স্বাধীনতা দিবসে প্রতিবছর রেড ফোর্টে সামরিক কুচকাওয়াজ হয়। তার আগে প্রধানমন্ত্রী আসেন, বক্তৃতা দেন। মঞ্চের একদিকে সরকারের মন্ত্রী-আমলারা বসেন, অন্যদিকে বিদেশি কূটনীতিকরা। আমি কূটনীতিকদের শেষ সারিতে বসে আছি। নির্ধারিত সময়ের ২৫-৩০ মিনিট পর প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী এলেন। হাতে ধরা কাগজটি পড়লেন, যাতে দেশের উন্নতি-অগ্রতির কথা রয়েছে। কিন্তু পড়তে গিয়ে তাঁর কপালে ভাঁজ পড়ে গেছে, মুখে কোনো হাসি নেই। পাঠ শেষে নিঃশব্দে চলে গেলেন। অন্য কূটনীতিকরা বলছিলেন, মিসেস গান্ধী অনুষ্ঠানে আসতে কখনো দেরি করেন না। এবারই ব্যতিক্রম।

ইন্দিরা গান্ধী কিছুটা উচ্চৈঃস্বরে বললেন, What is this you done in Bangladesh? হত্যা করে ক্ষমতা দখলকে আমরা মানতে পারি না।

রেড ফোর্ট থেকে বাসায় গিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে যাই, এর মধ্যে দারোয়ান বলল, স্যার, আতাউস সামাদ সাব টেলিফোন করছিলেন, ঘরে ঢুকতে আবার টেলিফোন। ওপাশে আতাউস সামাদ। বললেন, খবর জানেন নাকি। বাংলাদেশে ক্যু হয়ে গেছে। খোন্দকার মোশতাক রাষ্ট্রপতি। শেখ সাহেবের কাছ থেকে ক্ষমতা নিয়ে গেছে। পিটিআই অফিসে শিলং রেডিও থেকে এ খবর জানা গেছে।

আমি টেলিফোন অপারেটারকে বললাম, সব কর্মকর্তাকে খবর দাও। সে সময়ে দিল্লির হাইকমিশনে ছিলেন ব্রিগেডিয়ার মঞ্জুর (পরে মেজর জেনারেল, ১৯৮১ সালের অভ্যুত্থানে নিহত), সিরাজুল ইসলাম ও কামরুল হুদা। ১০ দিন পর বাংলাদেশ সরকারের চিঠি নিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলাম। রুমে ঢুকতে তাঁর শীতল ব্যবহার লক্ষ করি। বাংলাদেশের সমস্যাবলিকে অভ্যন্তরীণ বিষয় বলে জানাই অর্থাৎ ভারতের ওপর এর কোনো প্রভাব পড়বে না।

এবারে ইন্দিরা গান্ধী কিছুটা উচ্চৈঃস্বরে বললেন, What is this you done in Bangladesh? একে আমি বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় বলে কৈফিয়ত দিতে চেষ্টা করলাম। তিনি উচ্চৈঃস্বরে বললেন, হত্যা করে ক্ষমতা দখলকে আমরা মানতে পারি না। আমি বললাম, শেখ মুজিবের প্রতি আপনার গভীর affection ছিল, এ কথা আমরা জানি। তিনি বললেন, এটি ব্যক্তিগত affection-এর বিষয় নয়। আমি বললাম, have lost not only my leader, but a very close friend of mine. এরপর তিনি কিছুটা স্বাভাবিক হলেন। অনেক কথা বললেন।

- বঙ্গবন্ধু শুধু একজন ব্যক্তি নন। একটি প্রতিষ্ঠান, একটি আন্দোলন। একটি বিপ্লব, একটি অভ্যুত্থান। জাতি নির্মাণের কারিগর। মহাকালের অমর গাথা এবং একটি ইতিহাস।

- বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধুর শ্রেষ্ঠ কীর্তি। তিনি আবহমান বাংলার চিরকালের প্রাণপ্রবাহ। বাংলার পাখির গানে, নদীর কলতানে, বাতাসের উচ্ছ্বাসে, আকাশের গরিমায়, সূর্যের শৌর্যে, চাঁদের কিরণে, নক্ষত্রের ছায়াপথে, ভোরের শিশিরে, মসজিদের আযানে, মন্দিরের কাঁসরধ্বনিতে, গির্জার ঘণ্টায়, জারি-সারি-ভাটিয়ালি সুরে, বসন্তের উল্লাসে, বর্ষার ক্রন্দনে, শরতের শ্যামলিমায়, বৈশাখের ভৈরবীতে, বাঙালির হাসি-কান্না, প্রেম-ভালোবাসা, মিলনে-বিরহে তিনি চিরদিনের জন্য, চিরকালের জন্য জাগ্রত, জীবন্ত। তাঁর মৃত্যু হয়নি। তিনি আরো বেশি জীবিত চিরকালের বাঙালির মনে ও মননে।

আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী
সাংবাদিক, সাহিত্যিক

- ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট নশ্বর মুজিব অবিনশ্বরতার পথে চলে গেলেন চিরতরে। তাঁর জীবনাবসানে উত্থান হল চিরন্তন মুজিবের। ইতিহাস তার অনিমগ্ন গতিতে মুজিবকে নিয়ে গেল ঊর্ধ্বে রূপকথার মহানায়কের আসনে– তাঁর যথাযোগ্য অবস্থানে। নশ্বর পৃথিবীর কোনো ষড়যন্ত্র আর কোনোদিন তাঁকে স্পর্শ করতে পারবে না।

মেজর রফিকুল ইসলাম
বীরউত্তম

বঙ্গবন্ধুর শেষ বিদেশ সফর

জাওয়াদুল করিম

মুজিব একটি নাম। একটি ইতিহাস। একটি মানচিত্র। ঠিকানাবিহীন একটি জাতিকে যিনি আত্মশক্তিতে বলীয়ান হতে উজ্জীবিত করেছিলেন। যিনি দিকনির্দেশনা দিয়েছিলেন একটি মহান মুক্তিযুদ্ধের, সর্বাধিক আত্মপ্রত্যয়ী বাঙালি হিসেবে যিনি অর্জন করেছিলেন বিশ্বাসযোগ্যতা তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

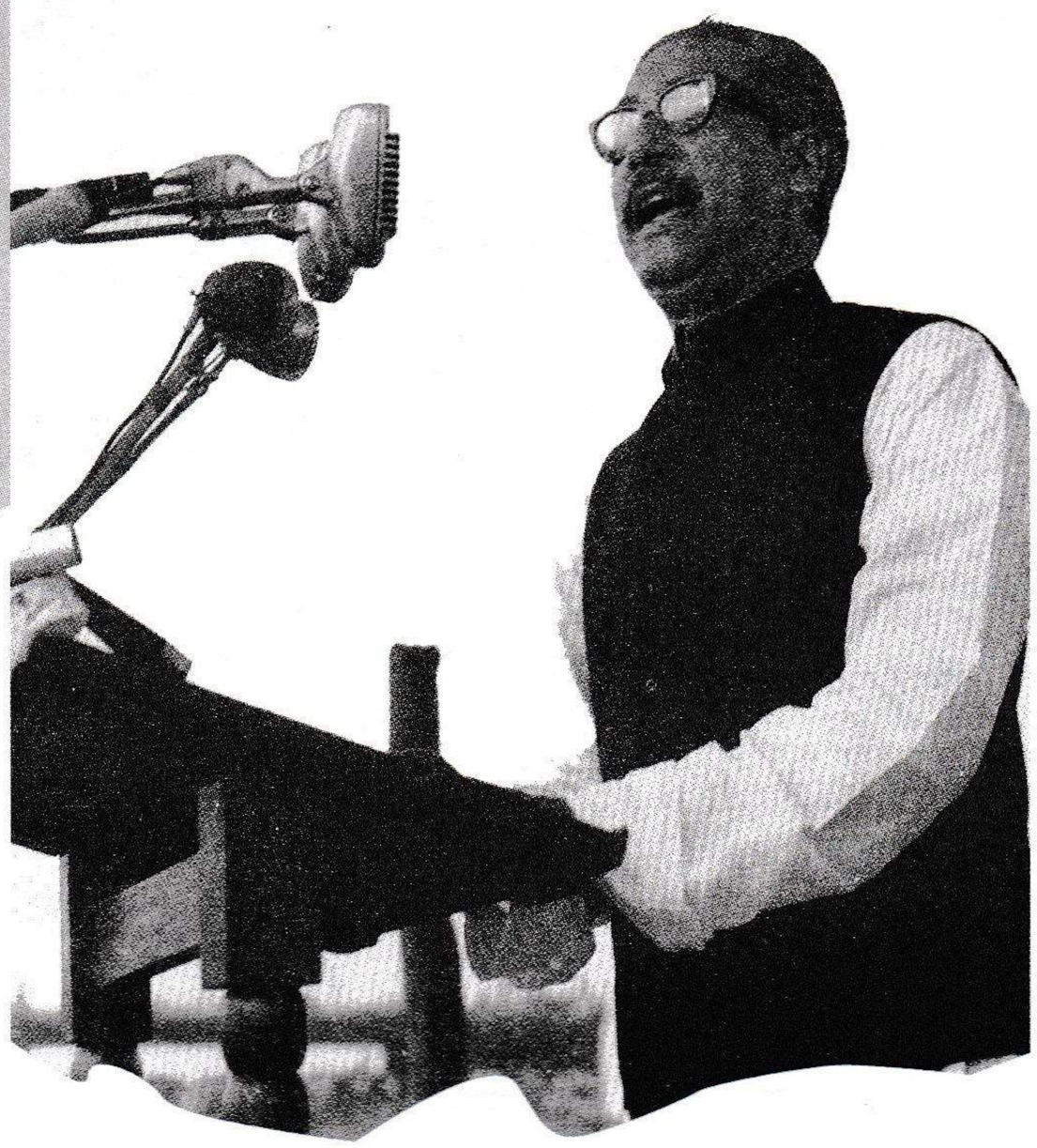
দীর্ঘদিন ধরে পরাধীনতার শৃঙ্খালাবদ্ধ একটি জাতির প্রাণে জাতীয়তাবাদ জাগ্রত করা নিঃসন্দেহে এক দুরূহ কাজ। সেই কাজটি বঙ্গবন্ধু করতে পেরেছিলেন। দীর্ঘ সংগ্রামী প্রক্রিয়ায় একদিকে যেমন ঔপনিবেশিক শক্তিকে তিনি অকুতোভয়ে মোকাবিলা করেছিলেন, তেমনি দেশীয় তাঁবেদার বর্ণচোরাদের বিরুদ্ধেও তাঁকে থাকতে হয়েছে সজাগ।

বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর ঘাতক এবং তাদের দোসরেরা অনেক চেষ্টা করেও তাঁকে জনগণের মন থেকে মুছে ফেলতে পারেনি। মুছে ফেলতে পারেনি ইতিহাস থেকে তাঁর নাম। যিনি ইতিহাস সৃষ্টি করেন তাঁর নাম মুছে ফেলা কি এত সহজ? তাইতো তাঁর স্মৃতি এত বছর পরও সামান্য ম্লান হয়নি। আসলে যারা বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে মেশার সুযোগ পেয়েছেন এবং নিজের বিবেককে ফাঁকি দিতে শেখেননি তাঁরা জানেন যে, এ মহান নেতাকে একবার চিনতে পারলে সারা জীবন তাঁকে ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়। আমার দীর্ঘ সাংবাদিকতার জীবনে এই অসামান্য মানুষটির কাছাকাছি আসার সুযোগ হয়েছিল। অনেক বছর ধরে আমি তাঁর স্নেহধন্য হবার সুযোগ পেয়েছিলাম। তাঁর সঙ্গে সাংবাদিক হিসেবে আমি দেশ-বিদেশে বহুবার ঘোরার সুযোগ পেয়েছি।

১৯৭৫ সালের এপ্রিল মাসে জ্যামাইকার রাজধানী কিংস্টনে কমনওয়েলথ রাষ্ট্রপ্রধানদের সম্মেলনে যোগ দেন বঙ্গবন্ধু। এটাই ছিল বঙ্গবন্ধুর শেষ বিদেশ সফর। সে সম্মেলনে আমি ও গোলাম রসুল মল্লিক তাঁর সফরসঙ্গী হয়েছিলাম। অন্যদের মধ্যে আরো ছিলেন বঙ্গবন্ধুর প্রেস সচিব তোয়াব খান (বর্তমানে জনকণ্ঠের উপদেষ্টা সম্পাদক)। সে সময়ের কিছু স্মৃতি আজ বিশেষভাবে মনে পড়ছে। তারিখটি আজ আর মনে নেই। প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকা থেকে দিল্লি ও ফ্রাংকফুর্টে স্বল্পকালীন বিরতির পর সুদীর্ঘ ৩৬ ঘণ্টার যাত্রা শেষে জ্যামাইকার রাজধানী কিংস্টনে উপস্থিত হলেন। আমরা কিংস্টন বিমানবন্দরে যখন বিমান থেকে নামলাম তখন সকলেই খুব ক্লান্ত। তবুও তখনি আমাদের প্রেস কার্ড সংগ্রহ করতে হল। ব্যবস্থা হল হোটেলের। প্রধানমন্ত্রীর হোটেল থেকে আমাদের হোটেলের দূরত্বও পাঁচ মাইল। কনফারেন্স হল ও মিডিয়া সেন্টার বঙ্গবন্ধু ও প্রতিনিধি দলের অন্যদের হোটেলের খুব কাছাকাছি। সেজন্য আমরা সাংবাদিকরা সকালে নাস্তা করেই হোটেল থেকে বের হয়ে মিডিয়া সেন্টারে এবং প্রধানমন্ত্রীর হোটেলে চলে আসতাম। সারাদিন কাজ করে একেবারে রাতে হোটেলে ফিরতাম। দিনে না হলে রাতে একবার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতাম।

কনফারেন্স চলাকালে একদিন রাতে আমি, গোলাম রসুল মল্লিক এবং বাংলাদেশ বেতারের সাইফুল বারী তাঁর হোটেল কক্ষে কিছু সময় উপস্থিত ছিলাম। আমরা কক্ষে প্রবেশ করে দেখলাম, তিনি গম্ভীর হয়ে অর্ধশায়িত অবস্থায় কি যেন চিন্তা করছেন। এমন সময়ে তাঁর খাবার এল। খাবার দেখেই মনে হল তাঁর ভালো লাগেনি। তিনি বিদেশি খাবার পছন্দ করতেন না। সামান্য খেয়ে একটু ফল খেলেন। আমাদেরও খেতে বললেন। আমাদের জন্য আইসক্রিমও এল। গোলাম রসুল মল্লিক কী যেন একটা কথা বলতেই তিনি গম্ভীর হয়ে বললেন, 'আমার বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র হচ্ছে। লন্ডন হয়ে অবৈধভাবে প্রচুর অর্থ আসছে, কিছু লোক আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে মেতেছে। আমার মনে হচ্ছে আমি ভলকানোর ওপর বসে আছি।' এ ধরনের কথা তিনি এক বছর আগেও একবার গণভবনে আমার ও অবজারভারের জোয়াদুর রহমানের (বর্তমানে বেক্সিমকো মিডিয়া গ্রুপে কর্মরত) সঙ্গে কথাচ্ছলে

“আমার বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র হচ্ছে।
লন্ডন হয়ে অবৈধভাবে
প্রচুর অর্থ আসছে, ...
মনে হচ্ছে আমি
ভলকানোর উপর বসে আছি।



বলেছিলেন। আমরা তাঁকে সিকিউরিটি জোরদার করার জন্য বললে তিনি বলেছিলেন ‘আল্লাহতায়ালা’ না বাঁচালে কোনো সিকিউরিটি জীবন রক্ষা করতে পারে না। আমি মুসলমান হিসেবে এটা বিশ্বাস করি।’

তাঁর আত্মীয় সাঈদ হোসেনের মেয়ের বিয়েতে বৌভাত অনুষ্ঠানের সময়ে তিনি প্রশান্ত নিয়োগীকে দেখিয়ে আমাদের সকলের সামনে বলেছিলেন, ‘নিয়োগী আমার সম্পর্কে নাকি কী সব ভবিষ্যদ্বাণী করেছে। কিন্তু আমি একজন মুসলমান হিসেবে ঐসব বিশ্বাস করি না। আমাদের ধর্মেও এটা নিষিদ্ধ।’ নিয়োগী সে সময়ে বঙ্গবন্ধুর কথার কোনো উত্তর দেননি। পরে নিয়োগী আমাকে বলেছিলেন, ‘আমি বঙ্গবন্ধুর সামনে খুব বিপদ দেখতে পাচ্ছি। আমি তাঁকে লোকজন দিয়ে সেকথা জানিয়েও দিয়েছি। কিন্তু উনি কিছুই বিশ্বাস করছেন না।’

বঙ্গবন্ধুকে হত্যার এক বছর আগে থেকে এমন নাকি অনেকেই তাঁকে সাবধান করে আসছিলেন। বিশেষ করে রাষ্ট্রপতির শাসন পদ্ধতি ও বাকশাল প্রথা প্রবর্তনের ঘোষণার পর তাঁর ও তাঁর পরিবারের নিরাপত্তার জন্য তাঁকে অনেকেই সাবধানতা অবলম্বন করতে বলেন। কেউ কেউ তাঁকে তাঁর ধানমণ্ডিস্থ ৩২ নং সড়কের বাড়ি ছেড়ে নতুন গণভবনে থাকতে অনুরোধ করেন। কিন্তু তিনি কারো কথাই শোনেননি। সে সময়ে তিনি একজন সহকর্মী রাজনীতিককে বলেছিলেন, ‘তোমরা তোমাদের নিরাপত্তা দেখো, আমাকে নিয়ে ব্যস্ত হতে হবে না। আমাকে কে হত্যা করবে? সবাইতো আমার সন্তানের মতো।’

কিংস্টন হোটেলে সেই রাতে বঙ্গবন্ধুর কক্ষে আমরা প্রায় এক ঘণ্টার মতো ছিলাম। কিছুক্ষণ পরে তোয়াব খানও সেখানে উপস্থিত হলেন। কথাবার্তার পর সাইফুল বারী বলেন, ‘বঙ্গবন্ধু, আমি টুঙ্গিপাড়ার ওপরে একটি কবিতা লিখেছি।’ বঙ্গবন্ধু তাঁর কথা শুনে একটু হাসলেন। কারণ কিছুদিনের মধ্যে সাইফুল বারীর পিআইও (প্রিন্সিপাল ইনফরমেশন অফিসার) হয়ে যোগদানের কথা ছিল। এরই মাঝে গোলাম রসুল মল্লিক আমাকে দেখিয়ে বললেন, ‘বঙ্গবন্ধু, করিম স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়ে আমেরিকা ও পরে মুজিবনগরে কাজ করেছে।’ উত্তরে বঙ্গবন্ধু বললেন, ‘ আমি জানি। আর সেজন্য ও আমার সঙ্গে আছে। আমি না থাকলে সেও থাকবে না। তখন সে কোথায় থাকবে আমিতো আর দেখতে আসব না।’ আমার বুকের মাঝে হঠাৎ মোচড় দিয়ে উঠল, ভাবতে লাগলাম, কেন উনি এ কথা বললেন, তবে কি তিনি কিছু আঁচ করতে পেরেছেন? এর কিছুক্ষণ পরে বিষণ্ন মনে আমরা আমাদের হোটেলে ফিরে এলাম। সেটাই ছিল বঙ্গবন্ধুর শেষ বিদেশ সফর।

এরপর যতবার বিদেশ গিয়েছি, অনুভব করেছি– মুজিব মানেই বাংলাদেশ। বাংলাদেশের পরিচিতি মুজিবের নামেই। একবার এক বিদেশি আমাকে বলেছিলেন, ‘তোমরা বাংলাদেশের লোকেরা এত নিষ্ঠুর যে, তোমরা তোমাদের স্রষ্টাকে হত্যা করতে পার। তাঁর কথার কোনো উত্তর দিতে পারিনি। বলতে পারিনি বাংলাদেশের মানুষ মুজিবকে কতটা ভালোবাসে। কারণ একজন বিদেশি হয়তো বিশ্বাসই করবে না যে, এটি হাতে গোণা গুটিকয়েক লোকের ষড়যন্ত্রের পরিণতি।

স্মৃতিগুলো : মহাপুরুষের ছবি

রামেন্দু মজুমদার

১৯৬৪ সাল। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কথা শুনেছি। কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতা কখনো হয়নি। আমরাও উদ্বেগ আর শঙ্কার মধ্যে দিয়ে রাত কাটালাম। পরদিন সকালে হঠাৎ দেখি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি জিপ গাড়িতে করে আমাদের খোঁজে এসেছেন।... বললেন, এক মিনিট সময়।... আমি, আমার বড় ভাই, তাঁর স্ত্রী, আমার ছোট বোন ও আমাদের পিতামহীকে নিয়ে সোজা তাঁর ৩২ নম্বরের বাড়িতে।... আরো অনেক পরিবারকে তিনি নিয়ে এসেছেন নিরাপদ আশ্রয় তাঁর বাড়িতে।

বঙ্গবন্ধুকে কাছাকাছি থেকে প্রথম দেখি ১৯৬৪ সালে। তখন আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। পাকিস্তান সরকারের মদদে ঢাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়েছে। আমরা তখন থাকতাম তেজগাঁও শিল্পাঞ্চলে পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের স্টাফ কোয়ার্টার্সে। আমাদের ফ্ল্যাটের পাশ দিয়ে চলে গেছে ঢাকা-চট্টগ্রাম রেলপথ, অদূরেই তেজগাঁও স্টেশন। রাতে চট্টগ্রামগামী মেল ট্রেন থামান হল। দাঙ্গাবাজরা খুঁজে বের করল কয়েকজন নিরাপরাধ হিন্দু যাত্রীকে। মৃত্যু-মুহূর্তে তাদের আর্তচিৎকার আমাদের প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত করেছিল। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কথা শুনেছি। কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতা কখনো হয়নি। আমরাও উদ্বেগ আর শঙ্কার মধ্যে দিয়ে রাত কাটালাম। পরদিন সকালে হঠাৎ দেখি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি জিপ গাড়িতে করে আমাদের খোঁজে এসেছেন। আমাদের আত্মীয় প্রয়াত অধ্যাপক অজিত গুহ বঙ্গবন্ধুকে জানিয়েছিলেন আমাদের নিরাপত্তাহীনতার কথা। তাই তিনি আমাদের নিতে এসেছেন। এসেই বললেন, 'এক মিনিট সময়। তৈরি হয়ে আমার সঙ্গে সবাই চলুন।' আমি, আমার বড় ভাই, তাঁর স্ত্রী, আমার ছোট বোন ও আমাদের পিতামহীকে নিয়ে তাঁর জিপে উঠালেন। ড্রাইভারকে বললেন, কোথাও না থামিয়ে সোজা তাঁর বাড়ির দিকে যেতে। তাঁর ৩২ নম্বরের বাড়িতে গিয়ে দেখি আরো অনেক পরিচিত পরিবারকে তিনি নিয়ে এসেছেন নিরাপদ আশ্রয় তাঁর বাড়িতে। অনেকেই তো অসাম্প্রদায়িকতার কথা বলেন, ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে বড় বড় বক্তৃতা-বিবৃতি দেন, কিন্তু আপন জীবনাচরণে তার প্রতিফলন কতটুকু? আমার ব্যক্তিগত এ অভিজ্ঞতা থেকেই তো দেখেছি– নিজের বিপদ জেনেও কী সাহসের সঙ্গে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েছেন দাঙ্গাবাজদের সামনে বিপন্ন মানুষকে বাঁচাতে। সেবার দাঙ্গার সময় তিনি দিনরাত পরিশ্রম করেছেন দাঙ্গাবাজদের প্রতিহত করতে। এ কেবল ঘরে বসে নির্দেশ দিয়ে নয়, সরাসরি মাঠে নেমে কাজ করা।

ব্যক্তিগত এ অভিজ্ঞতা থেকেই দেখেছি নিজের বিপদ জেনেও কী সাহসের সঙ্গে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েছেন দাঙ্গাবাজদের সামনে বিপন্ন মানুষকে বাঁচাতে।

সেদিনের বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি আমার নতুন করে মনে হয়েছিল ১৯৯০ সালের অক্টোবরে ঢাকার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকবলিত অঞ্চলে বঙ্গবন্ধু-কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনাকে দেখে। ধমনিতে তাঁর তো সেই অসাম্প্রদায়িক চেতনার শোণিতপ্রবাহ!

১৯৭২-এর জানুয়ারির শেষ সপ্তাহ। বঙ্গবন্ধু ফিরে এসেছেন পাকিস্তানি কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে। মুক্তিযুদ্ধের সময় কলকাতায় বসে আমি বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতা-বিবৃতির একটি সংকলন সম্পাদনা করেছিলাম ইংরেজিতে। আমার উদ্দেশ্য ছিল তাকে মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতির একটি ইতিহাস হিসেবে তুলে ধরা। 'বাংলাদেশ, মাই বাংলাদেশ' শীর্ষক সে বইটির কপি তাঁকে উপহার দিতে গিয়েছিলাম সেদিন সন্ধ্যায় পুরনো গণভবনে। আমি যখন তাঁর হাতে বইটি তুলে দিলাম তখন তাঁর পাশে বসা ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের আর এক নায়ক তাজউদ্দীন আহমদ। বঙ্গবন্ধু বইটি আগ্রহের সঙ্গে দেখলেন। এক জায়গায় ভুট্টোর নাম দেখে তাঁর সম্পর্কে একটি শাণিত মন্তব্য করলেন। আমাকে উপদেশ দিলেন বইটির একটি বাংলা সংস্করণ করার জন্য। আমার একটা অপরাধবোধ সবসময় কাজ করে– তাঁর জীবদ্দশায় আমি তা প্রকাশ করতে পারিনি। সেদিন এক কপি বইতে 'জয় বাংলা' লিখে তাঁর নাম সই করে দিয়েছিলেন– সেটি আমার অমূল্য সংগ্রহ হয়ে আছে।

১৯৭৪ সাল। বন্যায় ভেসে গেছে দেশ। আমরা আমাদের নাটকের দল থিয়েটারের প্রথম নিয়মিত নাটক 'সুবচন নির্বাসনে'র একটি বিশেষ প্রদর্শনী করে দুই হাজার টাকা নিয়ে গেছি বঙ্গবন্ধুর কাছে তাঁর ত্রাণ তহবিলে দান করার জন্যে। তিনি খুব খুশি হলেন আমাদের এ উদ্যোগে। জানতে চাইলেন, আমাদের অফিসের প্রয়োজন কিনা। তখন চারদিকে এত প্রয়োজনীয় জিনিসের অনটন যে, আমরা সবিনয়ে বললাম, এ মুহূর্তে তা না হলেও চলে।

যখনই সুযোগ পেতেন জানতে চাইতেন কার কি অসুবিধা। সাধ্যমতো সে অসুবিধা দূর করার চেষ্টা করতেন তিনি। আজ যখন আমাদের নাটকের দল বড় হয়েছে, কর্মকাণ্ড অনেক বেড়েছে, প্রতি মুহূর্তে যথোপযুক্ত অফিসের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি, তখন বারবার বঙ্গবন্ধুর সেদিনের কথা মনে হয়। দূরদৃষ্টি তাঁর ছিল, কিন্তু আমাদের ছিল না। আমাদের চেয়েও যাদের প্রয়োজন সেদিন বেশি ছিল তাদের কথা ভেবে আমরা তাঁকে বিব্রত করতে চাইনি।

১৯৭৫ সাল। বাংলাদেশ টেলিভিশনের নবনির্মিত ভবন পরিদর্শনে এলেন বঙ্গবন্ধু। যাবার পথে টিভি কর্মকর্তাদের মধ্যে আবদুল্লাহ আল মামুনকে দেখে জানতে চাইলেন, নাটক কেমন চলছে।

মামুন সুযোগ পেয়ে জবাব দিল, 'নাটক তো আপনি বন্ধ করে দিয়েছেন।' তিনি অবাক হয়ে জানলেন যে, গত কয়েক মাস ধরে অভিনয় নিয়ন্ত্রণ ও প্রমোদ কর আইন কড়াকড়িভাবে আরোপের ফলে নিয়মিত নাট্যচর্চা বন্ধ হয়ে গেছে। পরদিনই তিনি মামুনকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বললেন। মামুন আর আমি নতুন গণভবনে তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম। তাঁর সচিব আমাদের বন্ধু ফরাসউদ্দিনকে ডেকে নির্দেশ দিলেন রাষ্ট্রপতির আদেশ জারি করবার জন্যে। হেসে বললেন, 'মন্ত্রণালয়ে পাঠালে অনেক আইন দেখাবে।' এর পরদিনই রাষ্ট্রপতির আদেশ জারি হল সেন্সরপ্রথা সহজতর করা (পুলিশের বদলে সেন্সর কমিটি) ও প্রমোদ কর প্রত্যাহার করার বিধান প্রবর্তন করে। নিয়মিত নাট্যচর্চার পথে এক বিরাট বাধা দূর হল। আবার কল্লোলিত হয়ে উঠল নাটকের মঞ্চ।

বঙ্গবন্ধু সময় পেয়েছিলেন মাত্র সাড়ে তিন বছর। অথচ যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে সমস্যা ছিল পর্বত-সমান। তার ওপর চারদিকে দুর্নীতি। এই বিশাল হৃদয়ের মানুষটি আমাদের দেশের আপামর জনসাধারণের মুখে হাসি ফোটাতে চেয়েছিলেন। এ তাঁর কোনো বক্তৃতার কথা নয়, অন্তরের আকুতি। কিন্তু ঘাতক তাঁকে সে সুযোগ দেয়নি। বঙ্গবন্ধুর টুকরো টুকরো স্মৃতিগুলো জোড়া লাগালে এক মহাপুরুষের ছবি তৈরি হয়। যারা তাঁর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসার সুযোগ পেয়েছিলেন তাঁরা সাক্ষ্য দেবেন, বঙ্গবন্ধু সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি। বাঙালির অস্তিত্বের সঙ্গে একাকার হয়ে গেছেন তিনি। তিনি কি কোনো আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতির অপেক্ষা রাখেন?

লেখাটি 'বেতার বাংলা' সাময়িকী থেকে সংকলিত

কৃষি ও কৃষকের দেশ

মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন

দীর্ঘদিনের সংগ্রাম ও ত্যাগের পটভূমিতে এবং রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধের ফলে একাত্তরের ডিসেম্বরে বাঙালি জাতি স্বাধীনতার মুখ দেখতে পেল। পাকিস্তানি স্বৈরশাসকেরা বাংলার প্রাণ, বাঙালি জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমানকে কারাগারের মৃত্যুকূপ থেকে সসম্মানে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। গৌরবে দীপ্ত স্বাধীনতা সংগ্রামের সর্বজনস্বীকৃত অবিসংবাদিত নেতা দেশের নেতৃত্ব গ্রহণ করে যে সকল কাজে বেশি গুরুত্ব দেন তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে কৃষি খাতের উন্নয়ন।

বঙ্গবন্ধু বাংলার কৃষকদের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা পোষণ করতেন। রাজনীতির কারণে গ্রাম বাংলার আনাচে-কানাচে বহুবার ঘুরে ফিরেছেন শেখ মুজিব। পেয়েছেন কৃষক, শ্রমিক, মেহনতী মানুষের অকৃত্রিম প্রীতি, হৃদয়-নিংড়ানো স্নেহ, মমতা, ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা। এই উভয় দিকের ভালোবাসার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা বন্ধুত্বকে আজীবন মনে রেখেছেন জাতির জনক। বঙ্গবন্ধুর শাসন আমলে শতকরা ৮৫ ভাগ লোক গ্রামে বাস করতেন। জাতীয় আয়ের অর্ধেকেরও বেশি আসত কৃষিখাত থেকে। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সকাল-সন্ধ্যা অমানুষিক পরিশ্রম করে কৃষক ভাইয়েরা বাংলাদেশের সকল শ্রেণির মানুষের অন্ন যোগান দিচ্ছেন সেকথা কৃতজ্ঞতাভরে স্মরণ করতেন জাতির জনক।



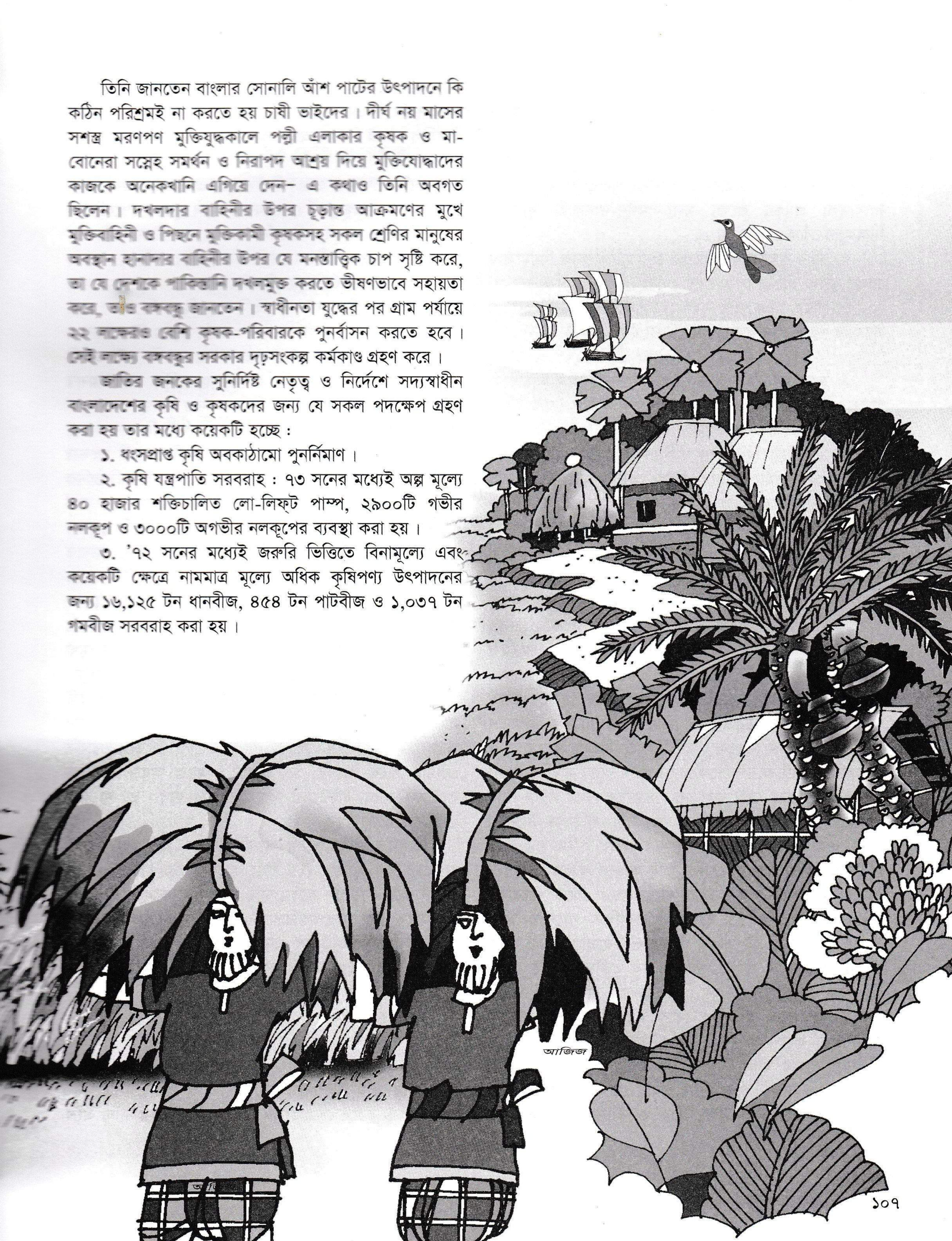
তিনি জানতেন বাংলার সোনালি আঁশ পাটের উৎপাদনে কি কঠিন পরিশ্রমই না করতে হয় চাষী ভাইদের। দীর্ঘ নয় মাসের সশস্ত্র মরণপণ মুক্তিযুদ্ধকালে পল্লী এলাকার কৃষক ও মা-বোনেরা সস্নেহ সমর্থন ও নিরাপদ আশ্রয় দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের কাজকে অনেকখানি এগিয়ে দেন- এ কথাও তিনি অবগত ছিলেন। দখলদার বাহিনীর উপর চূড়ান্ত আক্রমণের মুখে মুক্তিবাহিনী ও পিছনে মুক্তিকামী কৃষকসহ সকল শ্রেণির মানুষের অবস্থান হানাদার বাহিনীর উপর যে মনস্তাত্ত্বিক চাপ সৃষ্টি করে, তা যে দেশকে পাকিস্তানি দখলমুক্ত করতে ভীষণভাবে সহায়তা করে, তাও বঙ্গবন্ধু জানতেন। স্বাধীনতা যুদ্ধের পর গ্রাম পর্যায়ে ২২ লক্ষেরও বেশি কৃষক-পরিবারকে পুনর্বাসন করতে হবে। সেই লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর সরকার দৃঢ়সংকল্প কর্মকাণ্ড গ্রহণ করে।

জাতির জনকের সুনির্দিষ্ট নেতৃত্ব ও নির্দেশে সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশের কৃষি ও কৃষকদের জন্য যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় তার মধ্যে কয়েকটি হচ্ছে :

১. ধ্বংসপ্রাপ্ত কৃষি অবকাঠামো পুনর্নির্মাণ।

২. কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ : ৭৩ সনের মধ্যেই অল্প মূল্যে ৪০ হাজার শক্তিচালিত লো-লিফ্‌ট পাম্প, ২৯০০টি গভীর নলকূপ ও ৩০০০টি অগভীর নলকূপের ব্যবস্থা করা হয়।

৩. '৭২ সনের মধ্যেই জরুরি ভিত্তিতে বিনামূল্যে এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে নামমাত্র মূল্যে অধিক কৃষিপণ্য উৎপাদনের জন্য ১৬,১২৫ টন ধানবীজ, ৪৫৪ টন পাটবীজ ও ১,০৩৭ টন গমবীজ সরবরাহ করা হয়।



৪. দখলদার পাকিস্তানি শাসনকালে রুজু করা ১০ লক্ষ সার্টিফিকেট মামলা থেকে কৃষক ভাইদের মুক্তি দেওয়া হয় ও তাদের সকল বকেয়া ঋণ সুদসহ মাফ করে দেওয়া হয়।

৫. ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা চিরতরে রহিত করা হয়।

৬. ধান, পাট, তামাক ও আখসহ গুরুত্বপূর্ণ কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে মূল্য-সমর্থন-দানকারী ন্যূনতম ন্যায্যমূল্য বেঁধে দেওয়া হয়।

৭. গরিব কৃষকদের বাঁচানোর জন্য সুবিধাজনক নিম্নমূল্যের রেশন সুবিধা তাঁদের দেওয়া হয়। এবং

৮. গরিব কৃষক পরিবারের ছেলেমেয়েদের বিনা খরচে ও সরকারি খরচে লেখাপড়ার ব্যবস্থা করা হয়।

এ ছাড়া মধ্যবর্তী মেয়াদের জন্য দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের কাঠামোগত প্রেক্ষিতকে সামনে রেখে মুজিব সরকার প্রণীত প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৩) প্রণয়ন করা হয়। দারিদ্র্য নিবারণের তাগিদে কৃষি উন্নয়নকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের পর্যায়ে নিয়ে আসা হয়। আরও কয়েকটি পরিসংখ্যানের দিকে নজর দিলেও বঙ্গবন্ধুর সরকার যে কৃষি ও কৃষকদের কল্যাণ কামনায় নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ঐ সময় দেশে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা ছিল শতকরা ৩৫ ভাগ। ইতোমধ্যে খাসজমির সাথে ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিতরণযোগ্য জমি সরবরাহ বৃদ্ধির জন্য বঙ্গবন্ধু পরিবারপ্রতি জমির সিলিং ১০০ বিঘায় নির্ধারণ করে দেন। যুদ্ধবিধবস্ত সদ্যস্বাধীন দেশের খাদ্য ঘাটতি ছিল প্রাথমিক হিসাবে ৩০ লক্ষ টন বা শতকরা ৩০/৩৫ ভাগ। তাৎক্ষণিকভাবে আমদানির মাধ্যমে এবং স্বল্প মেয়াদে উন্নত পদ্ধতিতে চাষাবাদ, উন্নত বীজ, সেচ ও অন্যান্য কৃষি উপকরণ সরবরাহ, কৃষিঋণ মওকুফ, সার্টিফিকেট মামলা প্রত্যাহার ও খাসজমি বিরতণ করে কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা অর্জনের চেষ্টা করা হয়। ভারতের সাথে গঙ্গার পানি বণ্টনের নীতি নির্ধারণে বঙ্গবন্ধু জোরদার ব্যক্তিগত উদ্যোগ নেন। এর ফলে ভাটির দেশ হিসেবে গঙ্গার পানির ৪৪,০০০ কিউসেক হিস্যা পাবার সম্মতি তিনি আদায় করেন। পরবর্তী কোনো সরকারই লক্ষ মাত্রার ধারেকাছেও যেতে পারেনি। ১৯৬৮-৬৯ সালের ১১ হাজার শক্তিচালিত পাম্পের স্থলে ১৯৭৪-৭৫ সালে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৬ হাজারে। এর ফলে সেচের আওতাধীন জমির পরিমাণ এক-তৃতীয়াংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৬ লক্ষ একরে উন্নীত হয়। বিশ্ববাজারে রাসায়নিক সারের ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধির অভিশাপ থেকে বাংলার কৃষককে ভর্তুকি দিয়ে রক্ষা করেন বঙ্গবন্ধু। ১৯৭২ সালে ইউরিয়া, পটাশ ও টিএসপি সারের মণপ্রতি মূল্য ছিল যথাক্রমে ২০ টাকা, ১৫ টাকা ও ১০ টাকা। গঙ্গা নদীর প্রবাহ থেকে পানিপ্রাপ্তি, সেচ ব্যবস্থার প্রসার, উন্নত বীজ, সার ও কীটনাশকের ব্যবহার, অতিরিক্ত খাসজমি প্রাপ্তি এবং মূল্য সমর্থনমূলক সচেতন ও কৃষকদরদি নীতির ফলে কৃষিক্ষেত্রে অগ্রগতির যে ধারা সূচিত হয়েছিল তারই ফলে আজ কৃষিক্ষেত্রে শক্তিশালী ধারা সৃষ্টি হয়েছে।

জাতির জনক তাঁর দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা এবং চাষী ভাইদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ মেলামেশার ফলে বুঝতে পেরেছিলেন যে, কৃষিখাতে আমূল পরিবর্তন দরকার। গণচীনে স্বাধীনতা-উত্তরকালে এবং তদানীন্তন সোভিয়েত ইউনিয়নে ত্রিশের দশকে কৃষিখাতে জোরপূর্বক কালেক্টিভাইজেশনের ফলে লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণহানির ঘটনায় তিনি আতঙ্কিত ছিলেন। তাই রক্তাক্ত স্বাধীনতার সূচনায় খাদ্যের অভাবে মৃত্যুর ঘটনা যেন না ঘটে, সেজন্য তিনি উদ্যোগ নেন। স্বল্পমেয়াদি এই জরুরি কর্মকাণ্ডের পর মধ্যমেয়াদি প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মোটামুটি অগ্রগতি, উন্নয়ন ও স্থিতি আনার ব্যবস্থা করা হয়। অতঃপর বঙ্গবন্ধুর সরকার হাত দেন দীর্ঘমেয়াদি পদক্ষেপের কাজে। কৃষিবিপ্লব ও ভূমি ব্যবস্থাপনায় ব্যতিক্রমধর্মী সংস্কার এনে গ্রামের জনসাধারণের ভাগ্য উন্নয়নের টেকসই প্রাতিষ্ঠানিক চেষ্টা শুরু করেন শেখ মুজিব। ১৯৭৫ সালের ২৫ মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে তাঁর দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচি ঘোষণা করেন বঙ্গবন্ধু। তিনি দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন, আঘাত করতে চাই ঘুণে-ধরা সমাজব্যবস্থাকে। নতুন সিস্টেমে যেতে চাচ্ছি আমি। গ্রামে গ্রামে বহুমুখী কো-অপারেটিভ করা হবে। ভুল করবেন না। আমি আপনাদের জমি নেব না। পাঁচ বছরের প্ল্যানে বাংলাদেশের ৬৫ হাজার গ্রামের প্রত্যেকটিতে বহুমুখী কো-অপারেটিভ করা হবে। এই কো-অপারেটিভে জমির মালিকের জমি থাকবে। বেকার অথচ কর্মক্ষম প্রত্যেকটি ব্যক্তিকে কো-অপারটিভের সদস্য হতে হবে। পয়সা যাবে তাদের হাতে। টেস্ট রিলিফ যাবে তাদের হাতে। ওয়ার্কস প্রোগ্রাম যাবে তাদের আওতাধীনে। আস্তে আস্তে ইউনিয়ন কাউন্সিল থেকে টাউটদের বিদায় দেওয়া হবে। তা না হলে দেশকে বাঁচানো যাবে না।

আপনার জমির ফসল আপনি নেবেন, অংশ যাবে কো-অপারেটিভের হাতে, অংশ যাবে গভর্নমেন্টের হাতে। থানায় একটি করে কাউন্সিল হবে। আর মহকুমা থাকবে না। প্রতিটি মহকুমাকে জেলায় রূপান্তরিত করা হবে। নতুন জেলায় একটি করে প্রশাসনিক কাউন্সিল থাকবে। তার একজন চেয়ারম্যান থাকবে। সব কর্মচারী তার মধ্যে থাকবে। এর মধ্যে পিপলস রিপ্রেজেন্টেশন থাকবে।

উপরের রূপরেখা পরিষ্কারভাবে বলে দেয় যে, কৃষকের বন্ধু জাতির জনক স্থায়ীভিত্তিতে ভূমির মালিক ও শ্রমজীবী মানুষকে একত্র করে বহুমুখী ও উৎপাদনমুখী সমবায় সমিতি গঠন করে কৃষি উৎপাদনে দুর্বার গতি আনতে চেয়েছিলেন। আর নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন, এতে কৃষিশ্রমিকের ন্যায্য অংশ

বঙ্গবন্ধুর শাসন আমলে শতকরা ৮৫ ভাগ লোক গ্রামে বাস করতেন। জাতীয় আয়ের অর্ধেকের বেশি আসত কৃষিখাত থেকে। জাতির জনকের সুনির্দিষ্ট নেতৃত্বে ও নির্দেশে কৃষি ও কৃষকের জন্য যে সকল পদক্ষেপ নেওয়া হয়– তার কয়েকটি হল :

১. ধ্বংসপ্রাপ্ত কৃষি অবকাঠামো পুনর্নির্মাণ।
২. কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ : ৭৩ সনের মধ্যেই অল্প মূল্যে ৪০ হাজার শক্তিচালিত লো-লিফ্‌ট পাম্প, ২৯০০টি গভীর নলকূপ ও ৩০০০টি অগভীর নলকূপের ব্যবস্থা করা হয়।
৩. ৭২ সনের মধ্যেই জরুরি ভিত্তিতে বিনামূল্যে এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে নামমাত্র মূল্যে অধিক কৃষিপণ্য উৎপাদনের জন্য ১৬,১২৫ টন ধানবীজ, ৪৫৪ টন পাটবীজ ও ১,০৩৭ টন গমবীজ সরবরাহ করা হয়।
৪. দখলদার পাকিস্তানি শাসনকালে রুজু করা ১০ লক্ষ সার্টিফিকেট মামলা থেকে কৃষক ভাইদের মুক্তি দেওয়া হয় ও তাদের সকল বকেয়া ঋণ সুদসহ মাফ করে দেয়া হয়।
৫. ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা চিরতরে রহিত করা হয়।
৬. ধান, পাট, তামাক ও আখসহ গুরুত্বপূর্ণ কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে মূল্য-সমর্থনদানকারী ন্যূনতম ন্যায্যমূল্য বেঁধে দেওয়া হয়।
৭. গরিব কৃষকদের বাঁচানোর জন্য সুবিধাজনক নিম্নমূল্যের রেশন সুবিধা তাঁদের দেওয়া হয়। এবং
৮. গরিব কৃষক পরিবারের ছেলেমেয়েদের বিনা খরচে ও সরকারি খরচে লেখাপড়ার ব্যবস্থা করা হয়।

সরকারি কোষের জন্যও একটি অংশ যা থেকে জনহিতকর কার্যকলাপে অর্থ দেওয়া সম্ভব হতে পারত। থানা ও জেলা পর্যায়ে স্থানীয় সরকারের সাথে সাথে গ্রাম ও ইউনিয়নের কাঠামোও তাঁর চিন্তা-চেতনায় সুস্পষ্ট ছিল। অনেকে মনে করেন, শক্তিশালী স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠা ও ৬৫ হাজার গ্রামীণ বহুমুখী সমবায় সমিতি, কৃষিক্ষেত্রে টেকসই উন্নয়ন ও সমতাভিত্তিক বণ্টনের ন্যায়বিচারের যে নিশ্চয়তা শেখ মুজিব আনতে চেয়েছিলেন তার সফলতার সম্ভাবনায় ভীত হয়েই শোষকশ্রেণি বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে নির্মমভাবে।

আজকের এই গভীর শোকের দিনে জাতির জনকের শুরু করা কাজ সফলভাবে শেষ করে বাংলার কৃষকের ঘরে ঘরে স্বচ্ছলতা, আনন্দ, প্রীতি ও শান্তি আনতে হবে। আর তাতেই নিহিত থাকবে জাতির জনকের প্রতি বাঙালির সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধা নিবেদন।

আমার বন্ধু শেখ মুজিব

মমতাজ আহম্মেদ

১৯৪৬-এ আমি কলকাতায় ডিগ্রি পরীক্ষা দিতে যাই। যশোর কলেজের ছাত্র ছিলাম। তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল ডিগ্রি পরীক্ষা কেন্দ্র। কলকাতার নারকেলডাঙ্গায় চব্বিশ পরগণার ঐতিহাসিক হাকিমপুর গ্রামের খাঁ সাহেবদের চামড়ার আড়ৎ ছিল। এই হাকিমপুর গ্রাম ছিল আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তি মাওলানা আকরাম খাঁর আবাসভূমি। পশ্চিমবঙ্গের ত্রাণমন্ত্রী কমরেড আব্দুর রাজ্জাক খাঁ মাওলানা সাহেবের জামাতা। পশ্চিমবঙ্গ জমিয়াতুল আহলে হাদীছের সভাপতি মরহুম আব্দুল কাইয়ুম খাঁর বাড়ি। তাঁর সহোদর কমরেড আব্দুল হালিম আমাকে বললেন, 'তোমার দেশের একটা দামাল ছেলে ইসলামিয়া কলেজে পড়ে। থাকে ১ নং কাইজার স্ট্রিটে। তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে?' আমি ভাবলাম সারাবিশ্বে লন্ডন এবং কলকাতা দুটি নগর। সেই কলকাতা নগরে দামাল ছেলে হওয়া একটু অস্বাভাবিক। তার নাম শেখ মুজিবুর রহমান। তার পরিচয় শুনে আমি বিস্ময়ে অভিভূত হলাম। সঙ্গে সঙ্গে চলে গেলাম, সাক্ষাৎ হল। কালক্রমে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে তার সঙ্গে আলাপের পরিণতিতে আপনি থেকে তুমি, তুমি থেকে তুই। এ সম্পর্ক তাঁর শহীদ হওয়া পর্যন্ত বজায় ছিল। রাষ্ট্রপতি থাকাকালীন তার সাথে সাক্ষাতে আমাকে বলছে, 'এই বদমায়েশ, কি করতে আসছিস?' একটু দূরে পি.আর.ও তোয়াব খান দাঁড়িয়ে। আমি খুব শক্ত করে বললাম, 'আমি তো রাষ্ট্রপতির সঙ্গে কথা বলছি।' তার উত্তরে বলছে, 'তুই মমতাজ আর আমি মুজিবুর রহমান।' আমার আলাপের রাস্তা পরিষ্কার হয়ে গেল। গতানুগতিক আলাপ চলল।

আমরা দু'জনই বিএ পরীক্ষার্থী ১৯৪৬-এ, পাস ১৯৪৭-এ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ কাতারের ছাত্র। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের জন্ম। তারপুর মুজিব ঢাকা ল কলেজের ছাত্র। কখনও ছাত্রনেতা কখনও শ্রমিকনেতা। ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধু কখনও বাইরে কখনও জেলখানায়। আমি তখন বাগআঁচড়া ইউনাইটেড হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক। প্রেসিডেন্ট ইউনিয়ন পরিষদ, ডিবি খুলনার নির্বাচিত সদস্য। যুক্তফ্রন্টের মনোনয়নের জন্য ঢাকায় গেলাম। আবার ছাত্রজীবনের বন্ধুর সঙ্গে বিভিন্ন পর্যায়ে সাক্ষাৎ ও আলোচনা হল। উভয়ে মনোনয়ন পেলাম। উভয়ে জয়লাভ করলাম বিপুল ভোটে। যুক্তফ্রন্টের এমএলএ হলাম। আবু হোসেন সরকার মুখ্যমন্ত্রী। সে আমলে মুজিবের ডাকে ভুখা মিছিল সদরঘাটে পৌঁছলে গুলিতে একটা মানুষ মারা গেল। এলএমজি পাতানো, লাশ পাহারায়। তার মাঝ থেকে মুজিব এক দৌড়ে লাশ নিয়ে বেরিয়ে এল। কী দুরন্ত সাহস! জীবনের বিনিময়ে লাশ উদ্ধার, আবার সেই লাশ নিয়ে মিছিল!

'৭০-এর নির্বাচনে সাতক্ষীরা পিটিআইয়ের মাঠে আমি ৪টি উপহার তাঁকে দিলাম। পাক-কোরআন, নৌকা, হরিণমিশ্রিত মহিষ-সিং দিয়ে গড়া প্রতাপনগরের ছবি আর একটা ময়না পাখি। দেওয়ার সময় বললাম, 'বাংলা স্বাধীন হলে ময়না পাখিটা ছেড়ে দিও।' ময়না ঐখানে দিলাম না, পথে মারা যেতে পারে। আমি নিজেই ধানমণ্ডি ৩২ নম্বরের বাড়িতে (বাংলার ঠিকানা) নিয়ে গেলাম। বঙ্গবন্ধু তখন দোতালায় দাঁড়িয়ে। আমি সিঁড়ি বেয়ে উঠতেই আমাকে দেখে বলছে, 'এই মমতাজ, তোর হাতে ওটা কি?'

এটা পাখি! ময়না পাখি! দেখ কি আনছি! কি পাখি !! আমার হাত থেকে নিয়ে– এ যে ময়না পাখি! তখন মা হাসিনা সপ্তম কি অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী। ওপরে রান্নাঘরের ভেতরে দাঁড়ানো। 'মা হাসিনা, দেখ তোর চাচা কি আনছে। তুই এ পাখিটা পালবি, আর আমার ভাত রানবি।' সেই মেয়ে হাসিনা এখন সর্বজননন্দিত বিশ্বজয়ী মহীয়সী রমণী।

'৭০-এর নির্বাচনে মুজিব সর্বাধিনায়ক। ৩২ নম্বর রোডের বাড়িতে ভিড়। বঙ্গবন্ধু বলছেন, "আপনারা অফিসে যান, জেলাওয়ারি সাক্ষাৎ হবে।" সকলেই চলে গেল। আমি একা দাঁড়িয়ে। বঙ্গবন্ধু আমাকে বললেন, 'তুই গেলি না?' আমি বললাম, 'আমি যাব কি লোকের মাথায় উঠে?'

যুক্তফ্রন্টের এম এল এ হলাম। আবু হোসেন সরকার মুখ্যমন্ত্রী, সে আমলে মুজিবের ডাকে ভুখা মিছিল সদরঘাটে পৌঁছলে গুলিতে একটা মানুষ মারা গেল। এল এম জি পাতানো, লাশ পাহারায়।
তার মাঝ থেকে মুজিব এক দৌড়ে লাশ নিয়ে বেরিয়ে এল।
কী দুরন্ত সাহস!

'তুই আমার গাড়িতে চড়' পথে যেতে যেতে বললেন, 'তুই এখানে থাকবি, এখানে আমার কাজ আছে।'

করাচিতে সংসদ অধিবেশনে এমএলএদের অধিবেশন। আসার পথে সোহরাওয়ার্দী সাহেবের গাড়িতে হামলা। উনি অতি কৌশলে সিন্ধু হাইকোর্টে আশ্রয় নেন। অধিবেশনে আতাউর রহমান খান বক্তব্য রাখলেন। 'আগে জানতাম পশ্চিম পাকিস্তানিরা আমাদের ভাই। এখন দেখছি তারা আমাদের বিপরীত।'

বঙ্গবন্ধু বললেন, 'আমি করাচি ময়দানে বক্তৃতা করব। আপনারা সবাই আমন্ত্রিত।' করাচির জনসভায় লাইসেন্সবিহীন বহু অস্ত্রধারী থাকে। সেই জনসভায় বঙ্গবন্ধুর ভাষণ– 'আমার নেতা পরম শ্রদ্ধেয় শহীদ সোহরাওয়ার্দীর পশম স্পর্শ করার স্পর্ধা যদি কেউ রাখে, আমি তেজগাঁও বিমানবন্দরে পশ্চিম পাকিস্তানি নেতাদের কাউকে ল্যান্ড করতে দেব না।' সমস্ত অস্ত্রধারী নীরবে বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতা শুনে বিদায় নিল। এই তো তাঁর সাহসিকতার পরিচয়।

কোনো এক পর্বে আমি টুঙ্গিপাড়ায় গেলাম। বঙ্গবন্ধু তখন বাড়িতে। আমার পোশাকআশাকে পুলিশ কোনো গুরুত্ব দিচ্ছে না। বরিশালের মঞ্জু বললেন, 'নানা, আসুন, আপনাকে বঙ্গবন্ধুর কাছে পৌঁছে দিচ্ছি।' বঙ্গবন্ধুর ওখানে গেলে আমাকে আদর করে বসতে বলল। সেখানে খন্দকার মোশতাক আহমেদ, নাসের ও চিফ ইঞ্জিনিয়ার বসা। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ, গোপালগঞ্জ থেকে ঢাকার রাস্তা বিনা ব্রিজে যাবে। চিফ ইঞ্জিনিয়ার যে নকশা দিলেন তাতে বড় বড় ব্রিজ লাগবে। বঙ্গবন্ধু তা নাকচ করে দিলেন। চিফ ইঞ্জিনিয়ারকে নোট নিতে বললেন, 'কোন কোন বিলে কত পানি, কোথায় কোন খাল, কোন গ্রাম... বলতে বলতে যখন শীতলক্ষ্যা নদীর ধারে গেছেন তখন নাসের বলছে, 'ভাইজান, তাহলে শীতলক্ষ্যা কি বাম হাতে পড়ছে?' 'বেয়াদব, বেরিয়ে যা! আমি কি ঢাকা থেকে আসছি?' নকশা শেষ হয়ে গেল। রাস্তা ঢাকা পর্যন্ত হয়ে গেল। একটাও বড় ব্রিজ লাগল না। মীরজাফর মোশতাক বঙ্গবন্ধুর পায়ের গোড়ায় গিয়ে বলছে, 'নেতা, এটাই তো চাচ্ছিলাম।'

তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী আবু হোসেন সরকার ১৭ জন আওয়ামী এমএলএ-কে ত্রাণ দেওয়ার নামে ঢাকায় ডাকেন। আমাকেও ডাকেন। আমার ছোট্ট একটা উক্তিতে সে অধিবেশন ভেঙ্গে যায়। আমি বলেছিলাম, 'আপনি ষড়যন্ত্রমূলকভাবে ত্রাণ দেওয়ার উদ্দেশ্যে আমাকে ডেকেছিলেন। আপনি তো অ্যাসেম্বলি ডাকতে পারতেন। আমার অঞ্চলের মানুষ ঘাসের পাতা ও ঘাস খায় না। সাতক্ষীরার দক্ষিণ অঞ্চলের মানুষ ঘাসের পাতা খেয়ে বেঁচে থাকে। তাদের না ডেকে আমাকে ডাকলেন উদ্দেশ্যমূলক।' এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে কুমিল্লার হাজী রমিজউদ্দীন টেবিলের ওপর উঠে ঘুরে ঘুরে বলতে লাগলেন, 'মমতাজ ভাই যা বলেছেন ঠিক বলেছেন।' এই কথায় মুখ্যমন্ত্রী আওয়ামী লীগের যে ১৭ জনকে ঢাকায় মিটিংয়ে ডেকেছিলেন, তাঁরা চলে গেলেন। শেষ পর্বে আমাকে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে আটকে রেখে বলছে, What do you want? আমি বললাম, What does it mean? উত্তর: 'পদ না অর্থ?' আমি বললাম, 'আমি শহীদ সোহরাওয়ার্দীর শিষ্য, আমি অর্থলোভীও না, পদলোভীও না। আপনি আমাকে কৌশলগতভাবে আটকেছেন। ইতোমধ্যে বঙ্গবন্ধু আবু হোসেন সরকারকে বললেন, '৫ মিনিটের মধ্যে মমতাজকে ছেড়ে দাও, নতুবা বাড়ি ভেঙ্গে নিয়ে যাব।' তখন আমাকে মুক্তি দেয়। এখানে খুলনার সৈয়দ মুস্তাক ও গওছল হক উপস্থিত ছিলেন।

পরবর্তীতে সর্বাধিনায়ক সোহরাওয়ার্দী সাহেব যখন মন্ত্রিসভা গঠন করেন তখন বঙ্গবন্ধু নেতাকে বললেন, মমতাজকে সদস্য করতে হবে। তার জন্য আমরা এ সুযোগ পেয়েছি। নেতা বললেন, 'একটা ছোকরা আছে।' দ্বিতীয়বার বঙ্গবন্ধু প্রস্তাব দিলে আমি বললাম, 'এই বেয়াদব, এখান থেকে

চলে যা। নেতা যা করেন তাই হবে।' আমি ঠেলে সরিয়ে দিলাম।

বঙ্গবন্ধুর মা-বাপের খানায় টুঙ্গিপাড়ায় গেলাম। খানা শুরু। বঙ্গবন্ধু বলছে আমাকে, 'চল মমতাজ, দেখে আসি মজলিসে কত লোক আসছে খানায়।' আমি বলছি, 'তোর মা মৃত্যুকালে শেষ কথা কি বলেছিলেন, তুই জানিস'?

'না না মমতাজ, তুই বল?'

তুই তখন প্রধানমন্ত্রী। দুর্যোগে আসতে পারিসনি। হেলিকপ্টারে উঠে পথ থেকে ফিরে আসলি। তোর মা তখন বললেন, 'খোকা, তোর সঙ্গে আমার আর দেখা হবে না। তুই ভাল থাকিস।' বঙ্গবন্ধুর মা অনিবার্য কারণ ছাড়া জায়নামাজ থেকে উঠতেন না। যখন এই কথা বললাম তখন বঙ্গবন্ধু আমার কাঁধে মুখ লাগিয়ে শিশুর মতো কাঁদতে লাগল।

তাঁর হত্যার পর এনএসআই-এর ডাইরেক্টর এসএ মাহমুদ সাতক্ষীরা এসেছিলেন। সরকারি নির্দেশে সরকার পরিচালনার জন্য আমার সঙ্গে পরামর্শ করতেন। আলাপ প্রসঙ্গে আমি তাঁকে বলেছিলাম, 'আপনারা তাঁকে হত্যা না করে দেশ চালাতে পারতেন না?' তার উত্তরে তিনি বললেন, 'আমরা মারি নাই, তিনি নিজেই মরেছিলেন। পথে যেতে যেতে রাষ্ট্রপতি গাড়ি থামিয়ে ফকিরকে ভিক্ষা দেয়। আর থাকে একটা সাধারণ বাড়িতে। আমি তিনবার তাঁকে লিখেছি– বলেছি: 'স্যার, আপনাকে বাঁচাতে পারলাম না।' আমাকে ডাকেও না, উত্তরও দেয় না। তাই আমি নিজে গেলাম। বঙ্গবন্ধু আমার পিঠে থাবড়া দিয়ে বলেছে, 'যাও মাহমুদ, বাংলার মানুষ আমাকে মারবে না। এই আত্মবিশ্বাস যেখানে, সেখানে আমরা কী করতে পারি!'

আরও কত ঘটনা।

১৯৭০ সালে সাতক্ষীরা পিটিআই মিটিং শেষ করে যখন যায় আমি বললাম, 'ইফতার করে যা।' ও বলছে, 'এই দেখ আমার কাছে ইফতারি আছে।' এই বলে সাতক্ষীরা দক্ষিণাঞ্চলে চলে গেল।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে ফিরে এলে আমি ৩২ নম্বরের বাড়িতে গেলাম। বহু গাড়ি বাড়ির আশপাশে ভর্তি। আমি যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে দেখতে পেয়ে বলছে, 'আপনারা বসুন, সাতক্ষীরা থেকে আমার এক বন্ধু এসেছে, আমি তার সঙ্গে আলাপ করব।' ঘরে ঢুকতেই পাশে একটি ঠেসবেঞ্চি আছে, সেই বেঞ্চিতে দু'জন পাশাপাশি বসলাম। কুশলাদি জানবার পর আমি বলছি, 'রেডিও খুললেই বলে শেখ মুজিব ভার্সাস পাকিস্তান সরকার। তাহলে সারাবিশ্বে তোর নাম হচ্ছে। তুই তো এখন আন্তর্জাতিক নেতা।' উত্তরে বঙ্গবন্ধু বলছে, 'না রে মমতাজ, আমি নেতা না, আমি একজন বাঙালি।' এই কথায় আমি বুঝলাম সে কি বলতে চায়। সে বাংলাকে স্বাধীন করে ছাড়বেই। তাই হল। বাংলা স্বাধীন হল।

রাত তখন ১০টা। বঙ্গবন্ধু সাতক্ষীরা দক্ষিণ অঞ্চল থেকে ফিরে আসছে। সাতক্ষীরা দরবার হলের সামনে আমি গাড়ি থামিয়ে বলছি, 'চল কলারোয়া যাই।' বঙ্গবন্ধু বলছে, 'তুই কি আমাকে মেরে ফেলবি? খুলনা যাওয়ার পথে আমার মিটিং আছে। এই পর্যন্ত পথসভা, জনসভা দিয়ে ১৮টা মিটিং করলাম।' এবার তাকে বিদায় দিলাম।

বঙ্গবন্ধু তখন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রীর লনে আব্দুস সামাদ আজাদ পররাষ্ট্রমন্ত্রী, আর আব্দুর রব সেরনিয়াবাত ও বঙ্গবন্ধু নিজে। আমাকে দেখে আব্দুস সামাদ আজাদ বলছেন, 'মমতাজ ভাইয়ের সেই গোলাপ ফুলের মতো চেহারা কি হল।' সেরনিয়াবাত সাহেব বলছেন, 'মমতাজ ভাইয়ের কলকাতায় যে চেহারা দেখেছি সেটাই আছে।' ততক্ষণে বঙ্গবন্ধু নীরবে বসেছিলেন। আমি বলছি, 'মাঠে-ময়দানে, ডেলাবনে, গাছতলায়, তাঁবুতে থাকলে কি চেহারা থাকে?' এ কথা শোনামাত্রই বঙ্গবন্ধু নীরবে উঠে চলে গেল। বেশ কিছুক্ষণ পরে ভাবলাম প্রকৃতির ডাকে গিয়েছে। সে সময়ও পার হয়ে গেল। তখন আব্দুস সামাদ বললেন, 'মমতাজ ভাই, আপনি যান, দেখেন কি হচ্ছে।' আমি ঘরে গিয়ে দরজায় ধাক্কা দিলাম।

শাহেদ আলীকে স্পিকার করা তাঁর জীবনের আরেকটি অধ্যায়। স্পিকার আব্দুল হাকিম সাহেবকে অনাস্থা দিয়ে শাহেদ আলীকে স্পিকার করবেন এই তাঁর টার্গেট। আব্দুল হাকিম সাহেবের গাড়ি, বাড়ি Withdraw করা হল। বঙ্গবন্ধু শাহেদ আলী সাহেবকে নিয়ে হাজির। আব্দুল হাকিম সাহেব ইউসুফ আলী চৌধুরীর (মোহন মিয়া) প্রেরণায় উপস্থিত। প্রবেশদ্বারে একটা ঝামেলা। বঙ্গবন্ধু সেই মুহূর্তে কৌশলগতভাবে শাহেদ আলীকে বহিষ্কার-পথ দিয়ে স্পিকারের আসনে বসিয়ে দিলেন। তখন একটা ভীষণ গোলমালের সৃষ্টি হল। মারামারি শুরু হয়ে গেল। তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান তাঁর কক্ষে বসা। আমি গিয়ে বলছি, 'আপনি এখানে বসে আছেন? সংসদে মারামারি হচ্ছে।' 'মমতাজ, আমি কি করতে পারি? এখানে এসপি কি করবে? আইজি ডাকেন। তাকে হুকুম দেন যে-ই গোলামাল করবে তাকে অ্যারেস্ট করতে।' এই গোলমালের মাঝখানে শাহেদ আলী আহত হয়েছেন। আইজি সাহেব এসে এসপির পাওয়ার Withdraw করে অর্ডার দিলেন, যে গোলমাল করে তাকে অ্যারেস্ট করো। এই সুযোগে আমরা বঙ্গবন্ধুকে একপাশে নিয়ে গেলাম। তাতে বঙ্গবন্ধু ছাড়া অনেক লিডার বন্দি হল। এমনকি পুলিশের মারের চোটে কেউ কেউ আহত হল। ঐদিন বঙ্গবন্ধু অ্যারেস্ট হয় নাই। অথচ বঙ্গবন্ধু ষড়যন্ত্রমূলকভাবে আসামি হল। জীবনকে বাজি রেখে বঙ্গবন্ধু সারাজীবন সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন।

'দৈনিক জনকণ্ঠ' থেকে সংকলিত

বাংলা জুড়ে এক নাম

মমতাজউদ্দীন আহমদ

ডাক নাম খোকা। বড় সহজ নাম, আদরের খোকা। কোনো নাম নেই, তবু নাম খোকা। বাংলার সকল শিশুর প্রথম নাম খোকা। উঠতে খোকা, বসতে খোকা। খোকা খোকা, কোথায় আমার খোকা। কোথায় আমার খোকা। বলার শেষ নেই। সেই খোকাই মুজিব। মুজিবুর রহমান। শেখ মুজিবুর রহমান নামে সবখানে ছড়িয়ে গেল খোকা।

আমেরিকার এক পরিবার বলল, তোমরা বড় পাষণ্ড। শেখ মুজিবুর রহমানকে মেরে ফেললে কোন আনন্দে! বললাম, আমরা মারি নি, ওরা মেরেছে। সাহেব বলল, ওরা কারা? বললাম, যারা বাংলাদেশ চায়নি তারা।

সাহেব আমার দিকে অপলক চেয়ে বিস্মিত কণ্ঠে বলল, ওরা স্বাধীনতা চায় নি, ওরা কারা! ওরা কি তোমাদের মতো মানুষ? মানুষ যদি, কেমন মানুষ?

শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা চেয়েছিলেন। খোকা যেমন মাকে চায়, আকাশ যেমন নীল চায় আর বসন্ত যেমন গান চায়। মুজিব তেমনি স্বাধীনতা চেয়েছিলেন। মায়ের মতো স্নিগ্ধ যে দেশ সেই দেশের স্বাধীনতা চেয়েছিলেন সর্বক্ষণ।

কেন চাইল স্বাধীনতা! তাই বারবার কারাবাস। অনেকবার। সকালে ছাড়ে তো বিকেলে ধরে। চৌদ্দ বছরই কারাগারে কেটে গেল। দুবার নিশ্চিত মৃত্যু এসেছিল। ফাঁসি তৈরি। বাংলার ভালোবাসা মুজিবকে বাঁচালো। অথবা মুজিব এসে বাংলাকে মুক্ত করল।

মুজিব মানেই মুক্তি, অথবা মুজিব মানে স্বাধীনতা। যেমন খোকা শুনলেই পদ্মের কথা মনে পড়ে, খোকা বললেই নরম ঘাসের জমিন দু'বাহু বাড়িয়ে দেয়, তেমনি মুজিব মানে মুক্তি এগিয়ে আসে।

বাংলা মুজিবের জন্য সাধ্যসাধনা করেছে। অনেক কাল ধরে তপস্যা। কাহ্নপার কাল থেকে কায়কোবাদ আর সবরপার সময় থেকে শামসুর রাহমানের সময়। হাজার বছর ধরে হেঁটে হেঁটে অবশেষে গৌড় সমতট বঙ্গ এল পদ্মা যমুনা মেঘনার পাড়ে। এখানেই মুজিবুর রহমান বিদ্যমান। এখানেই মুজিবুর রহমান বহমান। সেদিনের যে খোকা, আজ সে মুজিবুর রহমান।

মিশন স্কুলের ছাত্র মুজিবুর রহমান পথরোধ করেছে শেরে বাংলা ফজলুল হকের। হয় দাবি মেনে নিন, না হয় ফিরে যান। শেরে বাংলা চিনলেন এক সিংহশাবককে।

তোমরা আমাকে মেরে ফেল, ফাঁসিতে ঝুলাও, তবু আমি আপোস করব না। সব দফা ছাড়ব একটি দফা ছাড়ব না, সে আমার বাংলার স্বাধীনতা। পাকিস্তানের ভিত কেঁপে গেল বাংলার শেখের ঐশ্বর্য দেখে। এমন শক্তিমান হয় নাকি বাঙালি! হ্যাঁ হয়, তিতুমীর হয়, ক্ষুদিরাম হয়, সূর্যসেন হয়, নজরুল হয়, বরকত হয়, সালাম হয়। থোকা থোকা আশ্চর্য এক জাতির নাম বাঙালি জাতি।

বাংলার দুশো ত্রিশটি নদীর নাম বাংলার নাম। বাংলার অরণ্যের সহস্র ফুলের নাম বাংলার নাম। সমস্ত নাম ছড়িয়ে আছে সবখানে, বাংলার হৃদয়ে। সেই হৃদয়ের আর এক নাম শেখ মুজিবুর রহমান। নদীর মতো, পাখির মতো, বর্ষার অশ্রুর মতো শরীর জুড়িয়ে দেবার মতো নাম শেখ মুজিবুর রহমান।

খোকার নাম ধরে হাজারবার ডাকে বাংলা। সেই খোকা মুজিবুর হয়। সেই মুজিবুর বঙ্গবন্ধু হয়।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭৭তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন ১৯৯৭ স্মরণিকা থেকে সংকলিত

মার্চ মাসের গল্প

রাহাত খান

মার্চ বাংলাদেশ স্বাধীনতার মাস। সারা বাংলাদেশ জুড়ে এই মাসে সংঘটিত হয়েছে রাজনীতির নানা উদ্দীপনামূলক ঘটনা। পাশাপাশি এই মাসে সূচিত হয়েছে গোটা বাঙালি জাতির ওপর হানাদার পাকিস্তান বাহিনীর নজিরহীন ও নৃশংস হত্যাকাণ্ড ও ধ্বংসযজ্ঞ। রক্ত দিয়ে লেখা এই মাসের গল্পটি। তবে রক্তপাত, হত্যাকাণ্ড ও ধ্বংসযজ্ঞের ভেতর দিয়ে হাজার বছরে বাঙালির স্বাধীনতা অর্জন ও মুক্তির ঐতিহাসিক ঘটনাটিও এই মাসেই ঘটেছিল। বলা যায় বাঙালি জাতির জীবনে একটি অনন্য মাস।

রাজনৈতিক উদ্দীপনামূলক ঘটনাবলীর কথা আগে। তদানীন্তন অবিভক্ত পাকিস্তানে ৭০-এর সাধারণ নির্বাচনের পর পার্লামেন্টের অধিবেশন বসা নিয়ে নানরকম ভাঁওতাবাজি করছিলেন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া। সময় ক্ষেপণ করছিলেন পার্লামেন্ট অধিবেশন বসা নিয়ে। এই ভাঁওতাবাজি এবং সময় ক্ষেপণের অর্থ অজানা ছিল না মানুষের কাছে। আসলে ৩০০ আসনে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল আওয়ামী লীগ এবং দলের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ক্ষমতা দিতে কোনোক্রমেই রাজি ছিলেন না পাকিস্তানের শোষণবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের হোতা পিপিপি প্রধান জুলফিকার আলী ভুট্টো এবং তাঁর পৃষ্ঠপোষক সরকার তথা প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান এবং তাঁর কমান্ডে থাকা, দুর্বুদ্ধিপূর্ণ জেনারেলরা এবং সেনাবাহিনী। পার্লামেন্ট অধিবেশনের দিন ধার্য করেন ৩রা মার্চ, ১৯৭১। স্থান: পাকিস্তানের দ্বিতীয় রাজধানী (নামে মাত্র)



ঢাকা। সবাই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে ভেবেছেন, যাক, পার্লামেন্ট বসা-না-বসা নিয়ে সংকট তাহলে কেটে যাচ্ছে।

কিন্তু এই স্বস্তি ছিল নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী। ১ মার্চ দুপুরে জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত এক বেতার ভাষণে পার্লামেন্ট বসার দিনক্ষণ স্থগিত করার ঘোষণা দেন ইয়াহিয়া খান। পাকিস্তানের সংহতি নাকি হুমকির মুখে। তাই তাঁর মতে পার্লামেন্টের অধিবেশন স্থগিত করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

ইয়াহিয়া খানের এই ঘোষণা শুনে গোটা বাঙালি জাতি রাগে-ক্ষোভে ফেটে পড়ল। তারা বুঝে গেল ইয়াহিয়া, ভুট্টো এবং পাক সেনাবাহিনী কোনোদিন বাঙালির হাতে পাকিস্তানের ক্ষমতা ছাড়বে না। সাধারণ নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলেও না। সেই সন্ধ্যাতেই ঢাকার নানা স্তরের ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ লোকজন ছুটল তাদের নেতার কাছে। এই পরিস্থিতিতে তিনি কি বলেন তা জানার জন্য।

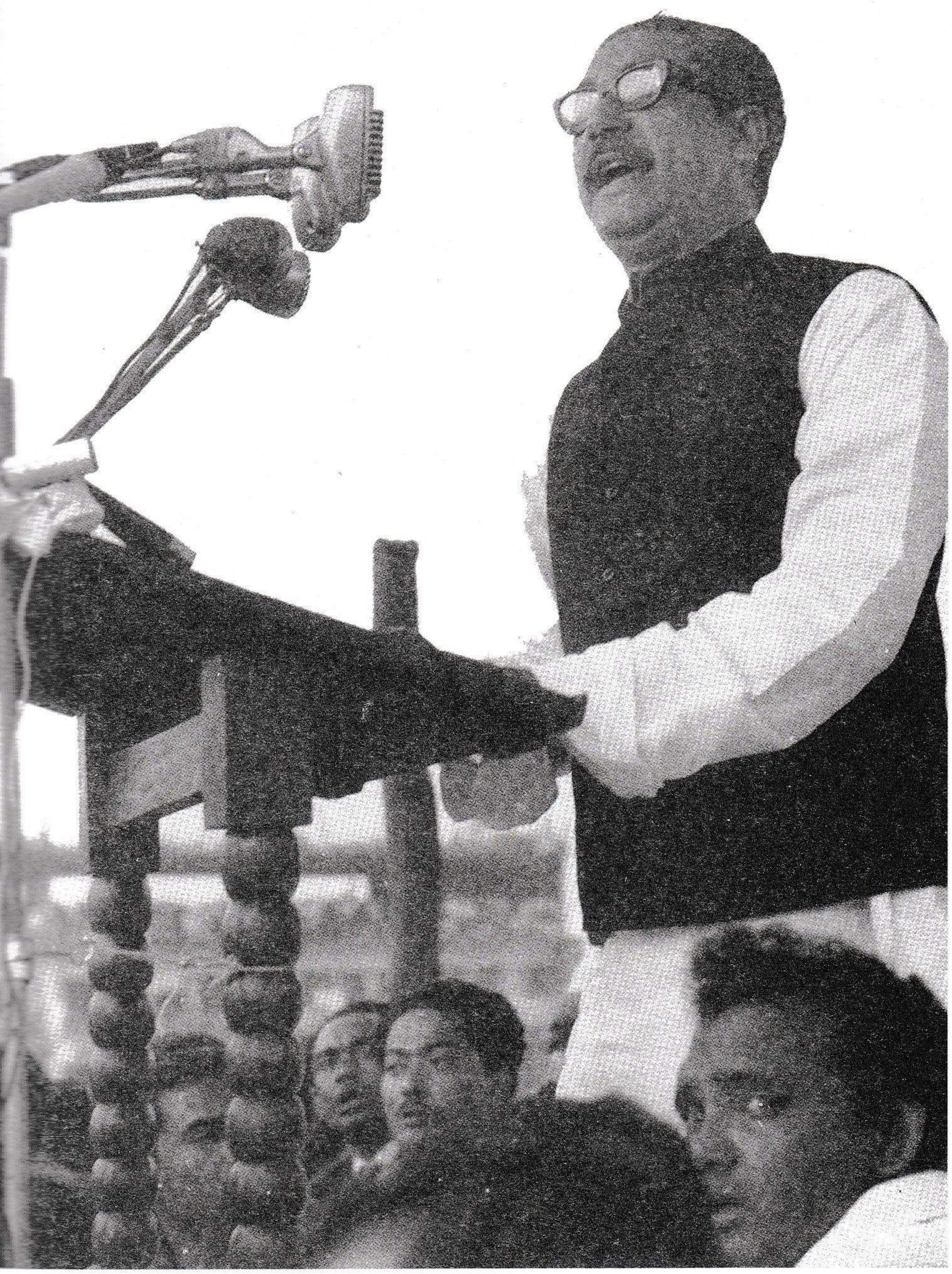
নেতা কে? নেতা তো একজনই। ১৯৬৬ সালে বাঙালির স্বায়ত্তশাসনসম্বলিত ছ'দফা দাবি এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিপক্ষে তথা আইয়ুবশাহীর বিপক্ষে গড়ে ওঠা প্রচণ্ড বিস্ফোরণের পর একজন রাজনীতিকই ছিলেন গোটা বাঙালি জাতির নেতা।

ছয়দফা আন্দোলন ও ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের সময় জনতার মিছিলে ও সমাবেশে বেশ কয়েকটি জনপ্রিয় স্লোগান বেশ শোনা যেত– যেমন: 'তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা, মেঘনা, যমুনা'; 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো', 'আমাদের সংগ্রাম, চলবেই চলবেই'– এইসব স্লোগানে মিছিল ও রাজনৈতিক সভা-সমাবেশ মুখরিত হয়ে উঠত। এইসব স্লোগানের সঙ্গে রাজনীতিতে প্রায় অভূতপূর্ব আর একটি স্লোগান শোনা যেত। স্লোগানটি ছিল: এক নেতা এক দেশ, বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ। রাজনীতিতে কোনো ব্যক্তিকে নিয়ে গোটা জাতির এমন স্লোগান কোনোকালে রচিত হয়েছে কিনা তা আমার জানা নেই।




DIT

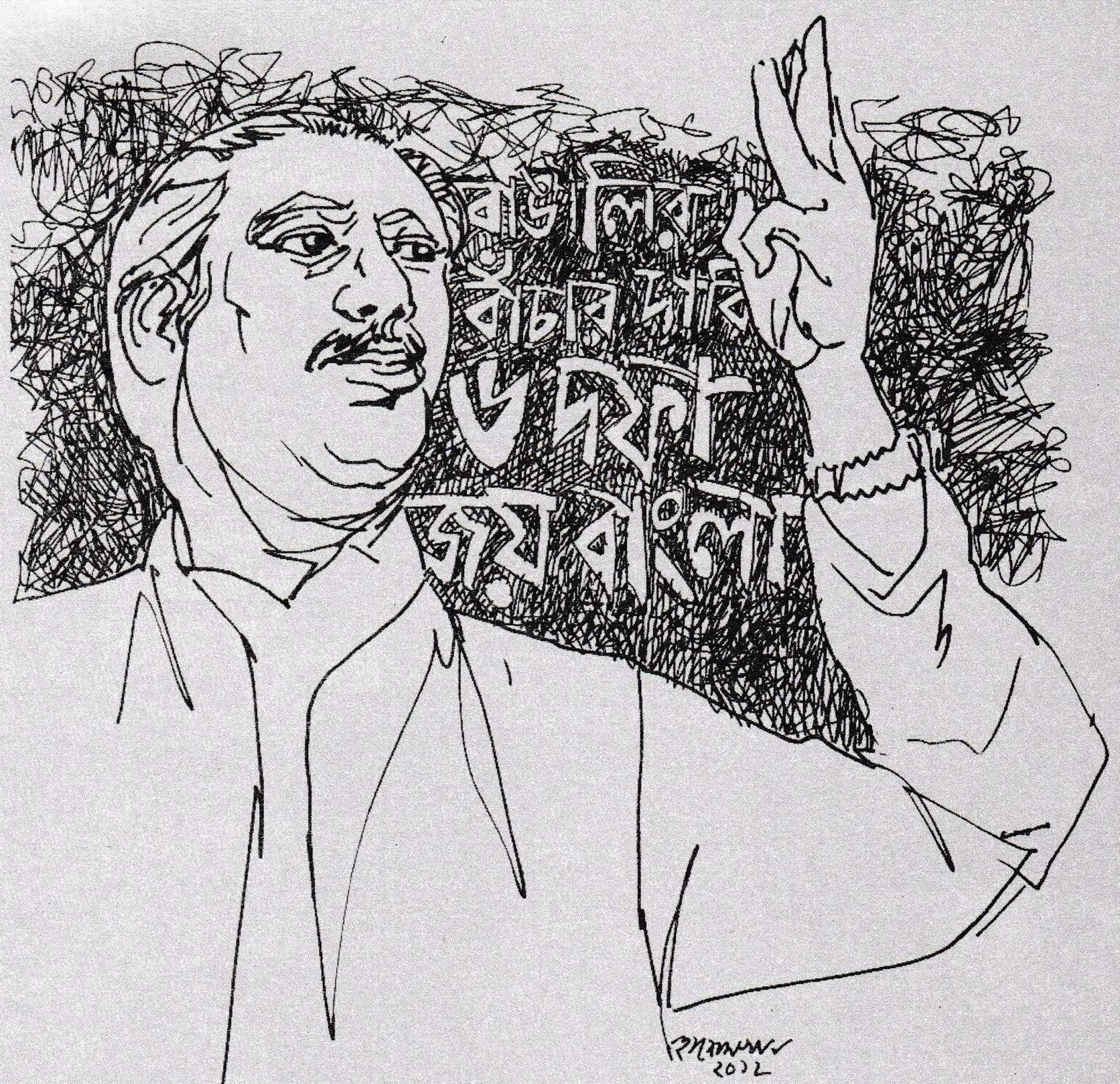
বঙ্গবন্ধুই নেতা। গোটা বাঙালি জাতির মুক্তি-দিশারী। ইয়াহিয়ার ভাষণের পর ঢাকার সর্বস্তরের জনগণ ছুটল তাদের নেতার খোঁজে। জানা গেল নেতা এ সময় তাঁর দলের সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপ্টেন মনসুর আলীসহ কয়েকজন ঘনিষ্ঠ সহকর্মীর সঙ্গে হোটেল পূর্বাণীর একটি রুদ্ধদ্বার কক্ষে বসে দেশের পরিস্থিতি এবং করণীয় বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা করছেন। দেখতে দেখতে হোটেল পূর্বাণীর চত্বর এবং আশপাশের কয়েকটি রাস্তা লোকে লোকারণ্য হয়ে উঠল। একটু আগে হওয়া ইয়াহিয়ার পার্লামেন্ট স্থগিত ঘোষণার ব্যাপারে নেতার কি মত, নেতার কি নির্দেশ তা তারা জানতে চায়।



হোটেলের বাইরে এসে বঙ্গবন্ধু একটু উঁচু জায়গায় দাঁড়ালেন। অবয়ব ও শরীরের ভাষাই জানিয়ে দিচ্ছিল তিনি সহজাত এক নেতা। একটি অগোছালো এবং নানা দ্বন্দ্বে আলোড়িত, অনৈক্যে দিশেহারা জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে তুলতে গিয়ে এবং স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের পত্তন ঘটাতেই যেন এই নেতার জন্ম। হাজার বছরে বাঙালির সেরা নেতা।

নেতাকে দেখে হোটেল পূর্বাণী চত্বরে এবং আশপাশের রাস্তায় সমবেত হওয়া হাজার হাজার মানুষ মুহূর্তেই তাদের কলরব থামিয়ে মৌন, স্তব্ধ হয়ে যায়। নেতা কি বলেন, তা শোনার আগ্রহ কেড়ে নেয় সব শব্দ, সব কলরব। নেতা দুঃখ-ভারাক্রান্ত চিত্তে জন-সমাবেশকে জানান– তিনি ও তাঁর সহকর্মীরাও একটু আগে বেতারে জেনারেল ইয়াহিয়া খানের ঘোষণা শুনেছেন। শুনে ব্যথিত হয়েছেন, তবে বিস্মিত হননি। পাকিস্তানি শোষকচক্র পূর্ব পাকিস্তানকে (পরে বাংলাদেশ) তাদের কলোনি বলে মনে করে। পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলেও বাঙালির হাতে কোনোদিন ক্ষমতা হস্তান্তর করবে না তারা– ইয়াহিয়ার ভাষণ বাঙালি জাতিকে সেই সত্যই জানিয়ে দিয়েছে। উচ্চকিত নেতার কণ্ঠ। বলেন, বাঙালি কোনো মতলবি ঘোষণার ধার ধারে না। ক্ষমতা কি করে অর্জন করতে হয় তারা তা জানে। এখন থেকে সামনের কঠিন দিনগুলির জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে। শুধু ক্ষমতার জন্য নয়, মুক্তির জন্য, স্বাধীনতার জন্য যা যা করা প্রয়োজন তা করা হবে, আমাদেরকে তাই করতে হবে। যত ত্যাগস্বীকার ও রক্ত লাগুক, অধিকার অর্জনে তা দিতে বাঙালি প্রস্তুত।

সকলকে শান্তভাবে, কোনো জ্বালাও, পোড়াও কর্মকাণ্ড না ঘটিয়ে ঘরে ফিরে যেতে বললেন নেতা। জনগণ সেদিন নেতার কথা শুনে শান্তচিত্তেই ঘরে ফিরলেন। এর কয়েক ঘণ্টা পরই বঙ্গবন্ধু সারাদেশে তাঁর ঐতিহাসিক অসহযোগ আন্দোলনের ঘোষণা দিলেন। জানালেন, কোনো বাঙালি এখন থেকে পাকিস্তান সরকারকে এক পয়সা ট্যাক্সও দেবে না। বাঙালি সরকারি আমলা ও কর্মচারীরা অফিসে যাবে, বেতন নেবে, কিন্তু কোনো কাজ করবে না। দরিদ্র শ্রমিক-কৃষক ও



৬-দফা আন্দোলনের মতো
বঙ্গবন্ধু-ঘোষিত অসহযোগ আন্দোলনকেও তাই স্বাধীনতা অর্জনের
বিশাল ও অত্যন্ত দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে গণ্য করা
হয়। এই স্বীকৃতি বিশ্বের
তাবৎ রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও বিজ্ঞজনের।

বস্তিবাসীদের দুঃখ-দুর্দশা লাঘবের জন্য বঙ্গবন্ধু দেশের প্রতিটি পাড়া-মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সর্বদলীয় কমিটি গঠনের নির্দেশ দিলেন। প্রতিদিনই লাখো মানুষ গিয়ে হাজির হত ধানমণ্ডি ৩২ নম্বরে। বঙ্গবন্ধুর সেই ঐতিহাসিক বাড়িটি ঘিরে চারদিকে এসে দাঁড়াত তারা। আর শালপ্রাংশু-দেহ বঙ্গবন্ধু তাঁর বাড়ির দক্ষিণের ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াতেন। চারদিক যেন পূর্ণ ও উজ্জ্বল হয়ে উঠত। ব্যালকনিতে তাঁর পাশে থাকতেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, কামরুজ্জামান, ক্যাপ্টেন মনসুর আলীসহ আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের কিছুসংখ্যক নেতা। সেদিন দেশবাসীর কি করতে হবে, বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা দিতেন বঙ্গবন্ধু। ১লা থেকে ২৫শে মার্চ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর আদেশ-নির্দেশই ছিল গোটা দেশ জুড়ে বাঙালিদের জন্য শেষ কথা।

বহু বিজ্ঞ ঐতিহাসিক বঙ্গবন্ধুর এই অসহযোগ আন্দোলনকে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন একটি রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে অভিহিত করেছেন। পাকিস্তানি চক্রকে বঙ্গবন্ধু এই আন্দোলন চালিয়ে একদিকে অসহায় করে তুলেছেন, অন্যদিকে বিশ্ববাসীর কাছে এই বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন যে, বাঙালি শান্তিপ্রিয় জাতি,

পাকিস্তানিদের যাবতীয় শোষণ, অত্যাচার, অবিচার এবং নির্যাতনের তারা জবাব দিচ্ছে রক্তপাতহীন, অহিংস অসহযোগ আন্দোলন দিয়ে। বঙ্গবন্ধু-ঘোষিত এই অসহযোগ আন্দোলন স্বাধীনতা অর্জনের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যায়। অসহযোগ আন্দোলনের কাছে অসহায় হয়ে পড়া পাকিস্তানি চক্র এবং তাদের নির্বোধ রাজনীতিবিদ ও জেনারেলরা শেষ পর্যন্ত 'বেয়াদব' বাঙালিকে শায়েস্তা করতে ২৫শে মার্চ রাতের দ্বিতীয় প্রহরে বাঙালির ওপর কামান, বন্দুক, স্টেনগান, মেশিনগান নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এবং বিশ্বে নজিরহীন নৃশংসতম হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞে মেতে উঠেছিল। অসহযোগ আন্দোলনের মধ্য দিয়েই বিশ্বের কাছে কারা আক্রমণকারী এবং কারা আক্রান্ত সেটা প্রমাণিত হয়েছিল। বিশ্ববাসীর কাছে অস্তিত্ব বাঁচানোর লড়াইয়ে সহানুভুতি ও সমর্থন পেয়েছিল বাংলাদেশই। আর পাকিস্তান ২৫শে মার্চ রাতে বাঙালিদের ওপর রক্তক্ষয়ী নৃশংস হামলা চালিয়ে গোটা দুনিয়ার কাছে প্রকাশিত করেছিল এই সত্য যে, হামলাকারী তারাই। হত্যাকারী তারাই। একটা গোটা জাতিকে হত্যা-ধ্বংস চালিয়ে নিশ্চিহ্ন করার হীন পরিকল্পনাকারী তারাই।

৬-দফা আন্দোলনের মতো বঙ্গবন্ধু-ঘোষিত অসহযোগ আন্দোলনও তাই স্বাধীনতা অর্জনের বিশাল ও অত্যন্ত দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে গণ্য করা হয়। এই স্বীকৃতি বিশ্বের তাবৎ রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও বিজ্ঞজনের।

এরপর ২৫শে মার্চ। বর্বর দখলদার পাকিস্তান বাহিনী বন্দুক-কামান, স্টেনগান, মেশিনগান নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে নিরস্ত্র এবং সেই মুহূর্তে অসহায় বাঙালি জাতির ওপর। ২৫শে মার্চের দ্বিতীয় প্রহরে 'অপারেশন সার্চলাইট' নামে বাঙালি জাতিকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার সশস্ত্র অভিযান শুরু হয়। বঙ্গবন্ধুকে তাঁর বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায় সশস্ত্র পাকিস্তান বাহিনীর লোকেরা। গ্রেফতার হওয়ার আগে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। বিশ্ববাসীর উদ্দেশে তিনি জানান, নিরস্ত্র ও বেসামরিক বাঙালির ওপর নৃশংস আক্রমণ শুরু করেছে পাকিস্তানিরা। আমি ঘোষণা করছি, এই মুহূর্ত থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন ও সার্বভৌম। যা-কিছু আছে তা-ই নিয়ে বাঙালিরা বর্বর পাকিস্তান বাহিনীর মোকাবেলা করবে। বিশ্ববাসীর উদ্দেশে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার এবং সমর্থন জানাবার ও সাহায্য করার আহ্বান জানান বঙ্গবন্ধু। তিনি বলেন, জয় আমাদের হবেই হবে, ইনশাল্লাহ্।

তাঁর স্বাধীনতার শেষ বাক্যটি ছিল: জয় বাংলা। স্বাধীনতার এই ঘোষণাপত্রটি যাতে বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে প্রচারিত হয় সেজন্যে বঙ্গবন্ধু তাঁর এক বিশ্বস্ত ওয়ারলেস অপারেটরকে নির্দেশ দেন। নানা বিপদ ও বিঘ্ন থাকা সত্ত্বেও ২৬শে মার্চ (২৫শে মার্চ দিবাগত রাত ১২টার পর) ওয়ারলেসে ঘোষণাটি প্রচারিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংগ্রহশালায় বঙ্গবন্ধুর এই স্বাধীনতার ঘোষণা সংরক্ষিত হয়েছে।

মার্চের পুরো গল্পটাই অসাধারণ। এরপর ১৪ এপ্রিল মুজিব নগরে বঙ্গবন্ধুকে প্রধান করে স্বাধীন বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার গঠিত হয়। এর আগে থেকেই বঙ্গবন্ধুকে নেতা হিসেবে সামনে রেখে গেরিলা ও সম্মুখযুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে শুরু করে দিয়েছিল মৃত্যুভয়হীন বাঙালি যুবকেরা। পাকিস্তান বাহিনী তবু ৩০ লাখ বাঙালিকে হত্যা করে। সম্ভ্রমহানি ঘটায় ২ লাখ বাঙালি নারীর। নিরস্ত্র ও অসহায় বাঙালিরা, সংখ্যায় তারা কোটিরও বেশি, আশ্রয় নেয় প্রতিবেশী ভারতে। স্বভাবতই ভারত বাংলাদেশকে মানবিক ও সামরিক উভয় দিকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। শুরু হয় ভারতে পালিয়ে যাওয়া বাঙালি তরুণ ও যুবকদের সামরিক ট্রেনিং নেওয়া। পাশাপাশি দেশের ভেতরে ঢুকে গেরিলা কায়দায় আক্রমণের পর আক্রমণ চালিয়ে বর্বর পিশাচ পাকিস্তান বাহিনীকে কতল করা এবং ব্যতিব্যস্ত করে তোলা। পাকিস্তানের হাতে বাঙালি নিধন এবং বাংলাদেশে পাকিস্তানিদের পোড়ামাটি অভিযান পরিচালনার বিপক্ষে বিশ্ব জুড়ে প্রতিবাদ ও ক্ষোভ ঘনিয়ে ওঠে। এই সময় শুধু চাপা হাসি ছিল পাকিস্তানের দোস্ত, মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন এবং তার পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরী কিসিঞ্জারের। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ মানুষ বাংলাদেশের পক্ষে ছিল ঠিকই। কিন্তু নিক্সন ও কিসিঞ্জার চাইছিলেন পাকিস্তানের হাতে একটা ভালোরকম পিটুনি খেয়ে বাঙালিরা শায়েস্তা হোক।

১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ সালের মধ্যে ঘটনা কিন্তু ঘটল বিপরীত। দেখা গেল, বাংলাদেশের সামরিক ট্রেনিং পাওয়া কিছু ছেলে-মেয়ে এবং বাংলাদেশ-ভারতের যৌথ বাহিনীর কাছে উল্টা পিটুনি খাচ্ছে 'মহা শক্তিশালী' বলে দম্ভ করা পাকিস্তান বাহিনীই। বাঙালির হাতে মার খেয়ে যুদ্ধবিদ্যাটা যে আয়ত্ত করা সহজ নয়, সহজ নয় ন্যায্যতার পক্ষে স্বাধীনতাকামী বাঙালিদের পরাস্ত করা সেটা পাকিস্তানিরা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিল। ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথ-বাহিনীর কাছে লজ্জাজনক আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে পাকিস্তান বাহিনীর বাঙালি শায়েস্তা করার সাধ ভালোভাবেই মেটে।

এসবই মার্চ থেকে শুরু হওয়া ইতিহাসের একটি স্মরণীয় ইতিবৃত্ত। স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় বিশ্বের বহু রাষ্ট্র। ১০ জানুয়ারি, ১৯৭২ পাকিস্তানের কারাগার থেকে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা তার পূর্ণতা লাভ করে।

মার্চ থেকেই স্বাধীনতার গল্পটি শুরু হয়েছিল। বাঙালির জীবনে মার্চ তাই অনন্য বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর একটি মাস। ১৬ ডিসেম্বর, মুক্ত স্বাধীন বাংলাদেশ, চারদিকে বেজে ওঠে জনতার কলস্বর : জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

লেখাটি 'মুক্তপ্রাণ' সংকলন থেকে সংকলিত

● আমি হিমালয় দেখিনি, কিন্তু শেখ মুজিবকে দেখেছি।

ফিদেল কাস্ট্রো

● মুজিবুর– সে তো কোনো মানুষের নাম মাত্র নয়। আমাদের আকাঙ্ক্ষার অদ্বয় প্রতিমূর্তি সুগন্ধ আলোর ধ্যান শাশ্বত বাঙালির হৃদয়পদ্মের: মনুষ্যত্ববোধে দীপ্ত নতুন জীবন রচনার দুর্জয় সম্পন্ন অঙ্গীকার।

নচিকেতা ভরদ্বাজ
কবি

বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমান
এই এক নাম এক করে দিলো হিন্দু-মুসলমান।
শেখালো মানুষে মানুষ বলেই মানুষের পরিচয়
ধর্মের নামে পশু-আচরণ ধর্মীয় কভু নয়।

দক্ষিণারঞ্জন বসু
কবি

● নানা পরিচয়ে আসে কত যুগ কত দেশ ভিন্ন নামে তবু শোনে তার একই কণ্ঠস্বর আজ শুধু আমাদেরই মাঝে মুগ্ধমন জানে নাম তার বন্ধু মুজিবুর।

প্রেমেন্দ্র মিত্র
কবি ও সাহিত্যিক

বাবাকে মনে পড়ে

শেখ রেহানা

বাবার স্মৃতি কি বলে শেষ করা যায়! বাবা সবাইকেই ভালোবাসতেন।

ভাইবোনদের মধ্যে আমি ছিলাম তাঁর খুব কাছের। প্রতি জন্মদিনের খুব ভোরে উঠে বাগানের প্রথম ফুলটা আমিই তাঁকে দিতাম। তিনি ভোরবেলায় নিয়মিত হাঁটতেন বত্রিশ নম্বর রোডে। আমি তাঁর সাথে অত জোরে জোরে হাঁটতে পারতাম না। কিন্তু গেটে দাঁড়িয়ে থাকতাম। বাড়ির কাছাকাছি এলে আমি দৌড়ে তাঁর কাছে চলে যেতাম।

আমাদের বাসায় বেলি ফুলের গাছ ছিল। আমি মালা গেঁথে বাবাকে দিতাম। কখনো কখনো বাবার উপর বিভিন্ন কারণে রাগও করেছি। হয়তো কোথাও যেতে চেয়েছি, তিনি যেতে অনুমতি দেননি। ফলে রাগ করে খাওয়াদাওয়াই বন্ধ করে দিয়েছি। বাবা নিজে আদর করে না সাধা পর্যন্ত খাইনি।

আবার তাঁর রাত করে ফেরাটা কিছুতেই মেনে নিতে পারতাম না। রাগ করে বলতাম, 'পলিটিক্স করো কেন?' বাবা বলতেন, 'তুই এমন কথা বলিস কেন, আমার কাছে তুইও যা, সাড়ে সাত কোটি মানুষও তা!' এতে আমার রাগ আরো বেড়ে যেত। বলতাম, 'আমি কারো সাথে ভাগাভাগি করে নিতে পারব না।'

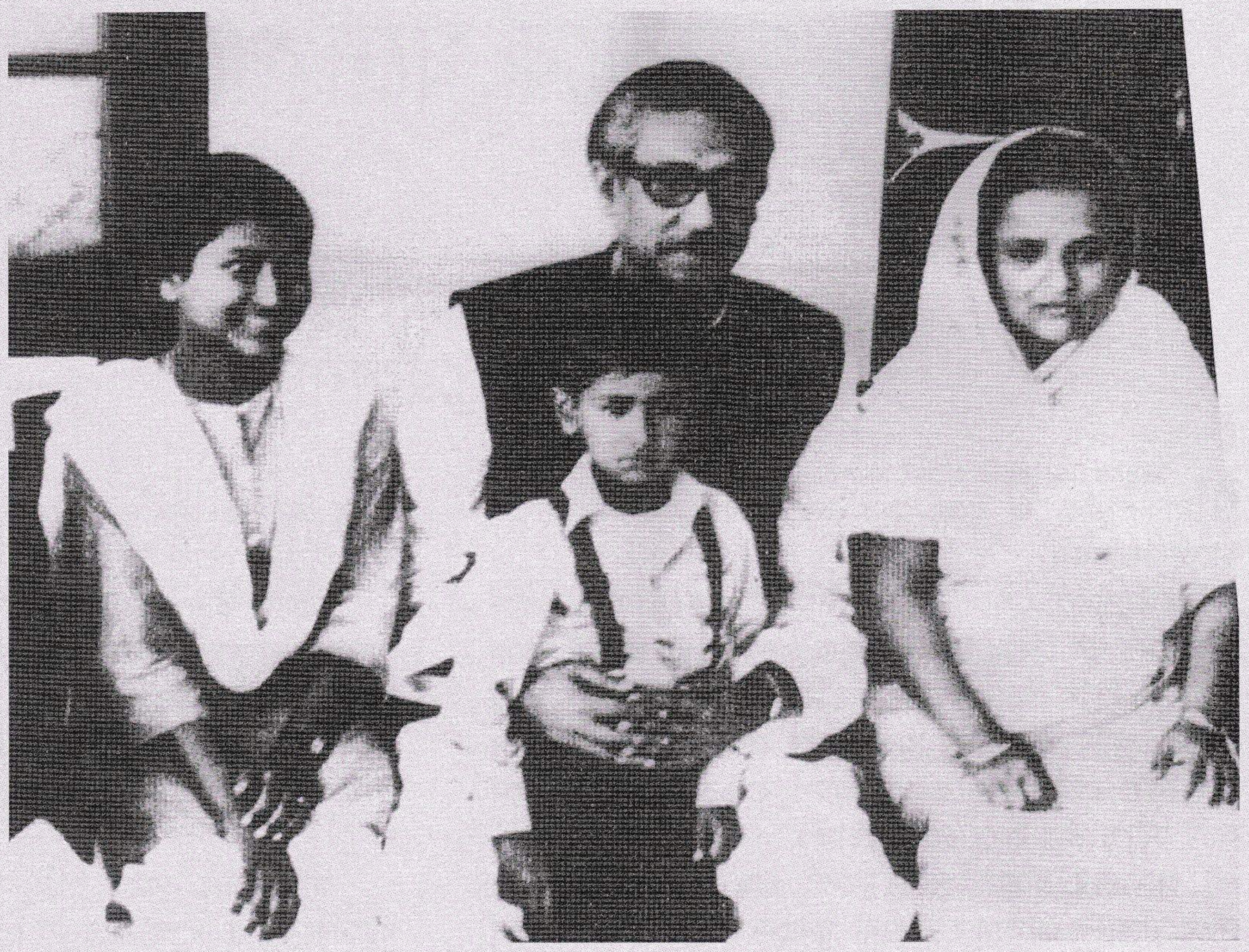
আমি আজ বুঝতে পারি, বাবা আমার কাছ থেকে ওই ধরনের বক্তব্য আশা করেননি। আমার এখনো বিশ্বাস হয় না আব্বা নেই। তাঁকে আর দেখব না, কথা বলব না, বিশ্বাস



জাপান সফরে বাবার সঙ্গে শেখ রেহানা ও শেখ রাসেল

করতে কষ্ট হয়।

আমি তখন স্কুলে পড়ি। ১৯৬৬-৬৭ সালে বাবা জেলে থাকতে প্রতি সপ্তাহে আমি চিঠি লিখতাম। সংসার, রাজনীতি সবকিছুর খবরই আমি তাঁকে দিতাম। সে-সময়ে পত্রিকার রাজনৈতিক খবরের কাটিং রাখতাম। কোনো সপ্তাহে চিঠি লিখতে না পারলে আব্বার চিঠির প্রথম লাইনটি থাকত, 'মা, তুই কি অসুস্থ, চিঠি লিখলি না?' তাঁর ইচ্ছা ছিল আমি অনেক পড়াশোনা করি। কিন্তু তা তো হল না।



মা-বাবার সঙ্গে রেহানা ও রাসেল

মনে পড়ে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাত ১২টার দিকে বাবা আমাদের বাসা থেকে চলে যেতে বলেন। আমরা যেতে চাইনি। আমি চিৎকার করে কান্নাকাটি করছি। বাবা পরে ফিরে এসে বলেছেন, পাকিস্তানের জেলে বসেও তাঁর কানে আমার কান্নার শব্দ বেজেছে।

আব্বা মানুষকে বিশ্বাস করতেন। পিতা হিসেবে খুবই স্নেহশীল ছিলেন। তিনি চাইতেন, আমরা সারাক্ষণ তাঁর পাশে পাশে থাকি। ঝড়-তুফান হলে সারারাত তিনি ঘুমাতেন না। তসবিহ নিয়ে ছোটাছুটি করতেন আর বলতেন, 'আল্লাহ্ আমার দেশ গরিব, তুমি রহমত করো।' আমরা তাঁকে একটু ঘুমাতে বললে বলতেন, 'তোরা বুঝিস না, আজ কেউ বাঁচবে না।' সবার জন্য তাঁর অফুরন্ত ভালোবাসা ছিল।

আব্বা দেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, কিন্তু ঘরে এসে আমাদের সাথে খেলার সময় শিশুর মতো হয়ে যেতেন। মাঝে মাঝে ছাদে বসে আব্বার মাথার পাকা চুল বেছে দিতাম। শেষের দিকে পাকা চুল বাছার সময় একটা কাটা দাগ দেখিয়ে বললেন, আমার লাশ তো তোরা পাবি না, পেলেও চিনতে পারবি না। এই কাটা দাগ দেখে যদি চিনতে পারিস। তাঁর ওই কথা শুনে বুকের ভিতর ধক করে উঠেছিল। ওই ধরনের কথা শুনতে আমার মোটেই ভালো লাগেনি। তাই এ নিয়ে আব্বাকে কোনোদিন কোনো প্রশ্ন করিনি। কেবল বলতাম, এসব কথা বলবেন না। কিন্তু তাঁর কথা এভাবেই সত্যি হয়ে গেল।

আব্বা চাননি আমি বিদেশ যাই। তিনি বলেছিলেন, বাইরে তোর ভালো লাগবে না, কান্নাকাটি করবি, গিয়ে কাজ নেই। তাঁর কথা শুনিনি। কিন্তু বিদেশে গিয়ে দেখলাম, আব্বার কথাই হুবহু সত্যি। একটুও ভালো লাগছে না। কিন্তু লজ্জায় তাঁকে বলার উপায় নেই। তবু কয়েকদিন পর ১৩ আগস্ট টেলিফোনে আব্বাকে বললাম, 'আমি দেশে আসতে চাই, আমার একদম ভালো লাগছে না।' আমার কথা শুনেই তিনি হো হো করে হেসে উঠলেন। সান্ত্বনার স্বরে বললেন, 'কি রে, আগে বলিনি, ঠিক আছে টিকিট পাঠাবার ব্যবস্থা করছি, মন খারাপ করিস না।' এই তাঁর সাথে আমার শেষ কথা।

তখন কেন যে আব্বার কথা শুনলাম না! কপালে দুঃখ ছিল। তা না হলে এক সাথেই তো চলে যেতে পারতাম।

আমরা দু'বোন বেঁচে থেকে কী অসহনীয় যন্ত্রণা সহ্য করে চলেছি তা কেউ বুঝবে না।

লেখাটি 'জনসমুদ্রে এক মানব' বই থেকে সংকলিত।

পারুল ফুল

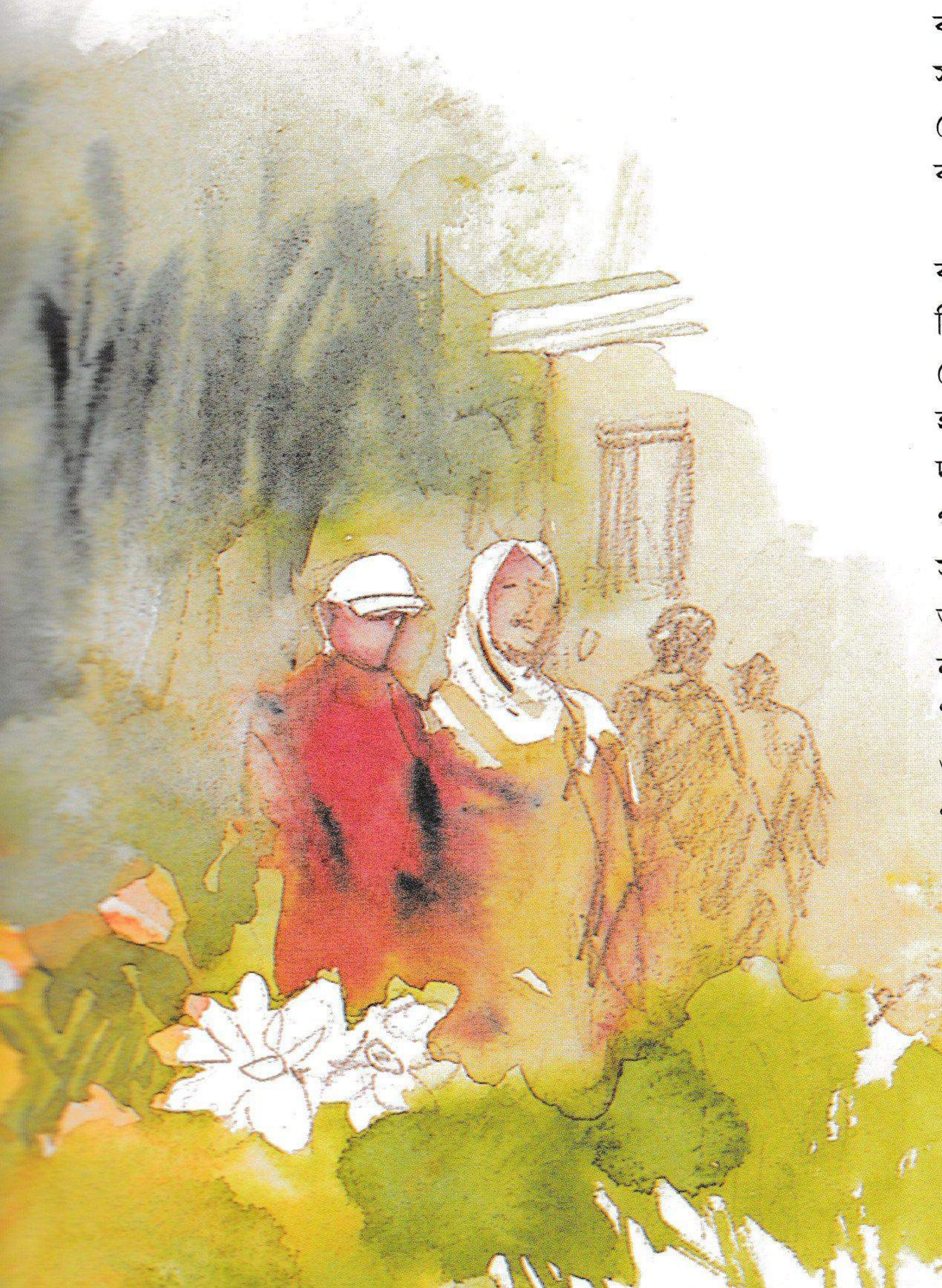
বিপ্রদাশ বড়ুয়া

পারুল ফুল ফোটার সময় খুব ভোরে তাজউদ্দীন বিছানা ছেড়ে উঠলেন। সারা রাত তিনি চোখের পাতা ভালো করে এক করতে পারেননি। তবুও রমনা পার্কে যেতে যেতে মনে হল তাঁর শরীর ঝরঝরে, শরীরের কোথাও অবসাদ নেই। হাঁটতে হাঁটতে তিনি ভাবলেন, ঢাকায় নেমে বঙ্গবন্ধুর মুখখানা কি প্রসন্ন নাকি অপ্রসন্ন থাকবে? দু'লক্ষ নারীর স্বপ্নহারা হওয়ার লজ্জায় তিনি কি হাত দিয়ে মুখ ঢেকে রাখবেন? কাঁদবেন?

হাঁটতে হাঁটতে তাজউদ্দীন ইন্টারকন হোটেলের পিছনের ফটক দিয়ে রমনা পার্কে ঢুকে পড়লেন। পার্ক থেকে তিনি পারুল ফুল তুলবেন। বঙ্গবন্ধুকে ফুলের মালা দেবেন।

দোকানে গোলাপ, চন্দ্রমল্লিকা বা ডালিয়ার মালা কিনতে পাওয়া যায়। তিনি সেসব বঙ্গবন্ধুকে দিতে চান না। রমনার পারুল গাছে পারুল ফুটেছে কিনা এর মধ্যে তা দেখার সময় তিনি করতে পারেননি। রমনা পার্কে যে দুটি পারুল গাছ আছে তা পার্কের মালী বা তাঁর ব্যক্তিগত সহকারীও জানে না। তাই নিজেই ছুটলেন পারুল খুঁজতে।

পার্কে ঢুকে তিনি সোজা দক্ষিণ দিকে হাঁটতে শুরু করলেন। অনেক দিন পরে পার্কে ঢুকেছেন। কুয়াশা ও গাছের তীব্র গন্ধ নাকে-মুখে পেলেন। মাথার উপর কৃষ্ণচূড়া গাছ। ওদিকে বকুল, মহুয়া। সামনে দু'সারি বড় বড় কুসুম গাছ আছে। দুটি দাঁড়কাক আনন্দে ডেকে উঠল। ফাঁকা ফাঁকা গাছপালা বলে আকাশ দেখা যাচ্ছে। ঘাসের উপর শিশির জমে আছে। ভোরের প্রথম আলো স্পষ্ট হয়েছে। চাদর দিয়ে মাথাটা ঢেকে নিলেন, কেউ যাতে চিনতে না পারে। এজন্যই চাদর নিয়ে আসা। দু'-তিন জন প্রাতঃর্ভ্রমণ-বিলাসী জোরে পা চালিয়ে হেঁটে চলে গেল। ওরা তাঁকে চেনার চেষ্টা করেনি। মাঝে মাঝে গাছের সঙ্গে স্বচ্ছ কুয়াশা জমে আছে টুকরো মেঘের মতো। উত্তরের মৃদু অদৃশ্য হাল্কা হাওয়া আরো কুয়াশা
নিয়ে আসছে। পারুল ফুটেছে তো?
এর মধ্যে একবারও তিনি পার্কে আসার সময় পাননি।
মাত্র সেদিন মন্ত্রিসভার সকলকে
নিয়ে দেশে ফিরেছেন।
মাত্র ২৬ দিন আগে ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনী



আত্মসমর্পণ করেছে। পারুল বা স্বর্ণ অশোক ফুটেছে কিনা দেখার সময় কোথায়। তবুও জানা আছে পারুল ফুটেছে। পারুল দিয়ে মালা করা যায়। বঙ্গবন্ধুকে তিনি দুর্লভ পারুলের মালা দেবেন। বঙ্গবন্ধুর কথা ভাবতেই বুকের মধ্যে একটা ঢেউ দলা পেকে গলা পর্যন্ত চলে আসে। গভীর নিঃশ্বাস নিতে নিতে তিনি হাঁটছেন। স্বচ্ছ মুক্ত ঝাঁঝালো একটা গন্ধ নাকে এল। কেউ হয়তো কিছুক্ষণ আগে কোনো গাছের ডাল নেড়ে দিয়ে গেছে বা ঘাসের উপর দিয়ে হেঁটে গেছে। তারই গন্ধ। কত দিন এরকম সজীব নিঃশ্বাস বুক ভরে নিতে পারেননি। বঙ্গবন্ধু ফিরে আসছেন এই খুশিতে সারা দেশ কুয়াশার আড়মোড়া ভেঙে সটান হয়ে জেগে উঠছে। ঘরে ঘরে সাড়া পড়ে গেছে। সবার মুখে মুখে, পত্রপত্রিকায়, রেডিও-টিভিতে, নৌকোর মাঝির মুখে এক কথা– সকাল ১০টায় বঙ্গবন্ধু আসছেন। ১০ই জানুয়ারির সকাল ১০টায়।

একটা কোকিলের পিক পিক ডাক শুনতে শুনতে তিনি চারটি ভূর্জপত্রের গাছ পেছনে ফেলে পৌঁছে গেলেন পারুলগাছের দিকে। পাশাপাশি দুটি গাছ। একটিতে ফুল ফুটেছে, একটিতে ফোটেনি। আহা কী সুন্দর! পাটল রঙের কী বাহার! একটি গাছ ছোট, দ্বিতীয় গাছটি একটু বড় ও বেশি সজীব। বড় বড় পাতা, ঘন সবুজ রং, সে গাছের ডালের আগা থেকে পুষ্পদণ্ড বেরিয়েছে। একটি থেকে ফুল ফুটতে শুরু করে।

গাছে ফোটা ফুল একটিও নেই। গাছতলায় মাত্র কয়েকটি ঝরে পড়ে আছে। তাজউদ্দীন পরম যত্নে সেগুলো কুড়িয়ে নিলেন। সব মিলে নয়টি হয়েছে। তিনি আবার ভালো করে দেখলেন পাটল রং ও সাদা-হলদে বৃন্তের দিকে।
হাল্কা মিষ্টি গন্ধ শুঁকে নিলেন।
দু'বছর পর তিনি পারুল দেখলেন।
গত বছর আন্দোলন এবং স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য পারুল দেখার সময় পাননি।
আবার তিনি গাছের দিকে মুখ তুলে তাকালেন।
না, ডালগুলো ফুল নিয়ে তুর তুর করে উপরে উঠে যায়নি।
'দেব না, দেব না' বলে সাত ভাই ও এক বোন চম্পা চেঁচিয়ে ওঠেনি।
গাছে তো ফুল নেই!

তাজউদ্দীন মুষড়ে পড়লেন। আরো ভোরে কেন তিনি এলেন না! আর এত ভোরে কেই-বা ফুল তুলে নিয়ে গেল! গতকাল রাতে কেন সাবধান হলেন না, কেন পাহারা নিয়োগ করলেন না? দারোয়ান বা মালীকে নির্দেশ দিয়ে রাখলেও হত। এখন কী হবে?

কী করবেন ভেবে তাজউদ্দীন অস্থির হয়ে পড়লেন। স্বচ্ছ কুয়াশার আর একটি ঝাঁক এসে পড়ল মেঘের মতো। স্বচ্ছ গুঁড়ো গুঁড়ো কুয়াশা। দানাগুলো পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। ঘিয়ের পরিষ্কার দানার মতো, সুন্দর কোমল ত্বকের নিচের স্পষ্ট মিহি দানার মতো।

তাজউদ্দীন ভাবলেন, ঢাকা শহরে আর কোথাও পারুলগাছ নেই যে তুলতে যাবেন। শীতের আর কোনো বিখ্যাত ফুল নেই যে, বঙ্গবন্ধুকে দেওয়া যায়। না, গোলাপ বড় সস্তা। স্বর্ণ অশোক দিয়ে মালা হয় না।

এমন সময় একটি ছেলে শার্টের কোঁচড়ে অনেকগুলো পারুল নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল। ওর খালি পায়ে কুয়াশা-ভেজা শুকনো খড়কুটোর ময়লা আটকে আছে। নাকের নিচে এক ফোঁটা শিশির জমে আছে। চুলে কুয়াশার বিন্দু লেগে ভারি সুন্দর হয়ে আছে। মুখে অমলিন হাসি। পারুল ফুলের মতো সে হাসি মিষ্টি আর রঙিন।

তাজউদ্দীন বললেন, ফুলগুলো আমার কাছে বেচবে?

ছেলেটি অমনি বলল, বেচব।

কত নেবে?

ছেলেটি বেশ ভারিক্কি গলায় বলল, পঞ্চাশ টাকা।

পঞ্চাশ টাকা বড্ড বেশি।

সত্যি বলতে কি পঞ্চাশ টাকা বেশিই। গাছে উঠে ঝাঁকি দিয়ে ফুলগুলো প্রথমে সে ফেলেছে। তারপর তলা থেকে কুড়িয়ে নিয়েছে। পরিশ্রমও বেশি হয়নি।

ছেলেটি বলল, ঠিক আছে, তিরিশ টাকা দিন।

তাজউদ্দীন বললেন, তিরিশ টাকাও বেশি হয়।

তাছাড়া তাঁর পকেটে অত টাকা নেই। হাত দিয়ে দেখলেন মাত্র দুটি টাকা আছে।

তাই তিনি বললেন, দু'টাকায় দেবে?

ছেলেটি চিৎকার করে বলল, মাত্র দু'টাকা?

তাজউদ্দীন তাড়াতাড়ি ঘড়িটা খুলে নিয়ে বললেন, এই ঘড়িটা নাও।

ছেলেটি হাতে নিয়ে বলল, বেশ, চমৎকার!

এই বলে সে খুশি হয়ে উঠল এবং ঘড়িটা নিয়ে বলল,

অনেক বেশি হয়ে গেল। আপনি মনে কিছু নেবেন না তো?

ফুলগুলো তাজউদ্দীনের চাদরে দিতে দিতে সে বলল, এই ফুল দিয়ে আপনি কী করবেন?

ফুল নিয়ে চাদরের প্রান্ত গুছিয়ে এক হাতে ধরে তিনি বললেন, বঙ্গবন্ধুকে দেব। আজ দশটায় তিনি আসবেন। আমি তাঁর জন্য ফুল কুড়োতে এসেছি। তুমি আমার আগে এসে সব দখল করে নিয়েছ।

ছেলেটি সঙ্গে সঙ্গে বলল, তাহলে এই ফুল আপনাকে দেব না। এই বলে সে ঘড়িটা ঘাসের উপর ফেলে দিয়ে ফুলগুলো ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য শার্টের সামনের প্রান্ত কোঁচড়ের মতো করে বাড়িয়ে ধরল।

তাজউদ্দীন বললেন, কেন দেবে না? বঙ্গবন্ধুকে দিতে তোমার আপত্তি কিসে?

ছেলেটি সঙ্গে সঙ্গে তাড়াতাড়ি বলল, বঙ্গবন্ধুকে আমি নিজেই দেব ভাবছি।

এবার তাজউদ্দীন অবাক হয়ে গেলেন। তিনি বললেন, সত্যি তুমি দেবে? তাহলে তোমাকে ফিরিয়ে দিচ্ছি। এই নাও।

ছেলেটি বলল, ঠিক আছে আপনিই দিন তাহলে। ঘড়িটাও নিন। আমি তো তাঁর কাছেই যেতে পারব না! আপনি যেতে পারবেন। আপনিই দিন।

আমি দেব? তুমি বড় ভালো ছেলে। বঙ্গবন্ধু আজ দশটায় আসবেন। তুমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাও? আমি প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন।

তাজউদ্দীনের নাম শুনে ছেলেটি ভড়কে গেল। তারপর সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, আপনি আমাদের প্রধানমন্ত্রী? আপনি যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছেন? আমি ঢাকা শহরে পাকিস্তানি সৈন্য দেখেছি। আমিও ওদের ঘৃণা করি। আপনি স্বাধীন বাংলার প্রধানমন্ত্রী?

সন্দেহ? আমাকে বিশ্বাস করতে পার।

অমনি ছেলেটি খুশি হয়ে, কী করবে-না-করবে ভেবে পেল না। শুধু বলল, আপনিই দিন, আপনি দিলে ভাল হয়। বঙ্গবন্ধু খুশি হবেন।

তাজউদ্দীনও খুশি হয়ে বললেন, তুমি দিলে আরো বেশি খুশি হবেন তিনি। তিনি ছোট ছেলেদের খুব ভালোবাসেন। তোমার বয়সী তাঁর একটি ছেলে আছে। তার নাম রাসেল।

ছেলেটি জোরে মাথা নেড়ে নেড়ে বলল, আপনিই দিন। দেখি আমি স্বর্ণ অশোক পাই কিনা। বলদায় স্বর্ণ অশোক পাওয়া যাবে।

তাজউদ্দীন বললেন, তাহলে শোনো বকুল, তুমি রেসকোর্সের সভায় এসো। একেবারে মঞ্চে চলে আসবে। আমি সেখানে থাকব। আমি তোমাকে তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব।

কী করে যাব আমি? আপনার কাছেই-বা কী করে পৌঁছব?

তিনি তাড়াতাড়ি পকেট হাতড়ে এক টুকরো সাদা কাগজ বের করলেন। কলম নিলেন। কাগজে লিখে দিলেন, বকুল ছেলেটিকে বঙ্গবন্ধুর কাছে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হল। তারপর নিচে স্বাক্ষর দিলেন।

ছেলেটি বলল, আমি এক্ষুণি বলদা গার্ডেনে যাচ্ছি। সেখানে স্বর্ণ অশোক ও রাজ অশোক ফুটেছে। আমি বঙ্গবন্ধুর জন্য সে ফুল নিয়ে যাব।

তারপর ছেলেটি আর এক মুহূর্তও দাঁড়াল না। এক দৌড়ে পার্কের ঝোপঝাড় ও কুয়াশায় অদৃশ্য হয়ে গেল। ওদিকে তখন একটি কুটুম পাখি ডাকছে। তাজউদ্দীন আর সময় নষ্ট না করে সোজা বাসায় ফিরলেন। অনেক কাজ পড়ে আছে। পুলিশের আইজিকে আরো কিছু নির্দেশ দিতে হবে। পৌরসভার চেয়ারম্যান থেকে জেনে নিতে হবে রাস্তাঘাট পরিচ্ছন্ন হয়েছে কিনা। মন্ত্রীদের সঙ্গে জরুরি কিছু আলোচনা আছে। তেজগাঁও বিমান বন্দরে খোঁজ করে সব ব্যবস্থা ঠিক আছে কিনা জেনে নিতে হবে। অনেকগুলো ফোন করলেন। সৈয়দ নজরুল, কামরুজ্জামান, মনসুর আলী, শেখ মণি ও তোফায়েলের সঙ্গে কথা বললেন। ঝড়ের মতো কেটে গেল একটা ঘণ্টা। টেলিফোন, সাক্ষাৎকার, আবার অত্যন্ত জরুরি কিছু ফাইল দেখতে হবে ও সিদ্ধান্ত দিতে হবে। একের পর এক। ঢেউয়ের পর ঢেউ। বঙ্গবন্ধু আসছেন, সাত কোটি মানুষের নয়নমণি বঙ্গবন্ধু। জয় বাংলার স্বপ্নদ্রষ্টা, স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি।

বঙ্গবন্ধু অবাক হয়ে গেলেন পারুল ফুলের মালা পেয়ে। গলা থেকে সেটি আর খুললেন না। তেজগাঁও বিমানবন্দর থেকে রেসকোর্সে আসতে চার ঘণ্টা লাগল। রাস্তায় জনসমুদ্র, গাড়ির সামনে মানুষের ঢল। ঢেউয়ের পর ঢেউ। সবাই চায় বঙ্গবন্ধুকে এক নজর দেখতে.... একবার যদি তাঁকে ছুঁয়ে দেখা যায়... স্বপ্নের মানুষটির একটু স্পর্শ যদি মেলে! রেসকোর্সের মঞ্চে দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধু সব কথা গুছিয়ে বলতে পারেননি। কবিতার মতো আভাসে ও ইঙ্গিতে, অশ্রু আর আবেগে কণ্ঠস্বর এক সময় ভেসে গেল। মিনিট দশেকও বলতে পারেননি। থেমে থেমে, কেঁদে, রুদ্ধ গলায় কোনোমতে কথা শেষ করলেন। তিনি বিপর্যস্ত, ক্লান্ত, শোকাতুর। সোনার বাংলার স্বপ্ন চোখের সামনে।

হঠাৎ সেই ছেলেটি জনসমুদ্রের ভেতর থেকে বাঁ হাতে কাগজটি পতাকার মতো উড়িয়ে, ডান হাতে ডালসহ এক গুচ্ছ স্বর্ণ অশোক নিয়ে মঞ্চের কাছাকাছি চলে এল। বঙ্গবন্ধু তখন মঞ্চ থেকে নেমে যাচ্ছেন। পাশে তাজউদ্দীন। দু'জনেই একসঙ্গে ছেলেটিকে দেখতে পেলেন। তাজউদ্দীন তাঁর দেহরক্ষীকে বললেন ওকে নিয়ে আসতে। উত্তাল জনসমুদ্রে ছেলেটি এবার ডুবে গেল। ছেলেটি একবার ডাক দিল বঙ্গবন্ধু বলে, আবার

১০ই জানুয়ারি ১৯৭২
বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের
জেলখানা থেকে মুক্তি
পেয়ে দেশে ফিরে এসেছেন





১০ই জানুয়ারি ১৯৭২– নয় মাস পাকিস্তানের জেলে
বন্দিজীবন কাটিয়ে দেশে ফেরার পর
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তাজউদ্দীন আহমদ
ও সৈয়দ নজরুল ইসলাম



ডাকল প্রধানমন্ত্রীকে। বলল, আমি পারুল ফুলওয়ালা, আমি বকুল। ছেলেটি আবার জনসমুদ্রে ডুবে গেল। মানুষের কলস্বর আর জয় বাংলার গর্জনে ছেলেটির চিৎকার আবার ডুবে গেল। পর মুহূর্তে আবার ছেলেটির ডাক ভেসে উঠল।

তাজউদ্দীন তাঁর সচিবকে বললেন, ছেলেটিকে এখানে নিয়ে আসুন। তারপর একজন নিরাপত্তা রক্ষীকে বললেন, ওকে এখনো নিয়ে এলে না কেন! পেছনে ডি. আই. জি. দাঁড়িয়ে সব দেখছিলেন। তাঁকে বললেন, ছেলেটিকে নিয়ে আসুন, আমি ওকে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করিয়ে দেব বলে কথা দিয়েছি।

ছেলেটি ততক্ষণে ভিড়ের চাপে এবং মানুষের ধাক্কায় ভাসতে ভাসতে অনেক দূরে চলে গেছে। সেখান থেকে সে চিৎকার করে উঠল, প্রধানমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী, আমি বকুল, আমি বঙ্গবন্ধুর কাছে যাব।

বঙ্গবন্ধু বললেন, কে ওই ছেলেটি? ও চিৎকার করছে কেন?

তাজউদ্দীন বললেন, ওর নাম বকুল, সকালে ও আমাকে পারুল ফুল দিয়েছিল। ওর জন্যই আমি আপনাকে পারুলের মালা দিতে পেরেছি।

বঙ্গবন্ধু বললেন, ওকে ডাকো, ওকে আসতে বলো।

ছেলেটি ততক্ষণে মানুষের ভিড়ে ভাসতে ভাসতে আরো দূরে চলে গেল।

ছেলেটি সেই দূর থেকে ডাকতে লাগল, বঙ্গবন্ধু.....

প্রধানমন্ত্রী.....।

তাজউদ্দীন বঙ্গবন্ধুকে দেখিয়ে বললেন, অনেক দূরে চলে গেছে। ওই যে....।

বঙ্গবন্ধু মঞ্চ থেকে নামতে নামতে বললেন, ওর ঠিকানা আছে?

তাজউদ্দীন বললেন, কাল ভোরে রমনা পার্কে গিয়ে যদি পাই। সেই পারুল গাছের নিচে।

বঙ্গবন্ধু বললেন, গাছটি আমাকে দেখিও। ছেলেটিকেও দেখতে চাই, আমাকে নিয়ে যেও।

তাজউদ্দীন বললেন, আচ্ছা।

এমন সময় বকুলের হাত থেকে লোকের হাতে ঘুরে ঘুরে স্বর্ণ অশোকের ডালটি বঙ্গবন্ধুর হাতে চলে এল।

লেখাটি 'মুক্তিযুদ্ধের গল্পসমগ্র' বই থেকে সংকলিত

লন্ডনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব

সুলতান মাহমুদ শরীফ

১৯৬৩ সালের নভেম্বর মাস। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী তখন লন্ডনে। ১৯৬২ সালে শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট-বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মুখে পাকিস্তানের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের উপর থেকে আইয়ুব খান নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে নিয়েছেন। পাকিস্তানের অনেক রাজনীতিবিদ নিজ নিজ দল পুনরুজ্জীবনের সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধাগ্রস্ত। অনেকেই সম্মিলিতভাবে আইয়ুব-বিরোধী মোর্চা গঠন করার চিন্তা-ভাবনা করছেন। আওয়ামী লীগকে পুনরুজ্জীবিত করার কথা ভাবছেন শেখ মুজিব। নেতার অনুমতি ও সমর্থন তাঁর প্রয়োজন– প্রয়োজন বাংলার মানুষের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির উপায় উদ্ভাবন নিয়ে নেতার সাথে মত বিনিময়ের। তাই লন্ডনে শেখ মুজিবের এবারের যাত্রা। লন্ডনে নেতার সাথে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের কথোপকথনের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে সে সময় লন্ডনে অবস্থানকারী সিলেট প্রবাসী ছাত্রনেতা নুরুল ইসলাম সাহেব লিখেছেন, লন্ডনে 'আর্লস কোট' এলাকার বাঙালিদের রাজনৈতিক আড্ডার কেন্দ্রস্থল 'গ্রীনমাসক' রেস্টুরেন্টের বেইজমেন্টে মধ্যাহ্ন ভোজনে সোহরাওয়ার্দী সাহেবের সাথে শেখ সাহেব– খাবার তদারক করছেন রেস্টুরেন্টের মালিক প্রয়াত প্রাক্তন এম.পি আব্দুল মান্নান সানু মিঞা। শেখ সাহেব বললেন, "স্যার, আপনিই হউন আর মাওলানা সাহেবই (মওলানা ভাসানী) হউন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রী, আপনারা কোনো অবস্থায়ই ইস্ট পাকিস্তানকে বাঁচাতে পারবেন না। কারণ ওয়েস্ট পাকিস্তান ইস্ট পাকিস্তানকে গিলতে বসেছে। ইস্ট পাকিস্তানকে একদিন না একদিন আলাদা হতে হবে। স্বাধীনতা ছাড়া আমাদের উপায় নেই।" সাথে সাথে সোহরাওয়ার্দী সাহেব রেগে গিয়ে বললেন, 'Don't talk nonsense'. বঙ্গবন্ধু চুপ করে গেলেন। একটু সামলে নিয়ে সোহরাওয়ার্দী সাহেব বললেন, তোমাদের কী আছে যে আলাদা হয়ে যাবে? পারবে ওদের সাথে যুদ্ধ করে আলাদা হতে? সে প্রশ্নের উত্তর যখন সত্য সত্যই পাওয়া গেল সেটা অনেক পরের কথা। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর। তার আগে ১৯৬৯ সালের নভেম্বর মাসে বঙ্গবন্ধু আবার লন্ডনে এলেন।

১৯৬৬ সালের প্রথম দিকে বঙ্গবন্ধু তাঁর ঐতিহাসিক ছয়দফা দাবি পাকিস্তানের জনগণের কাছে পেশ করেন। এই ছয় দফা'র বিস্তারিত বিবরণ লম্বা হবে, তাই মূল দফাগুলো নিম্নে দেওয়া গেল :

১. পার্লামেন্টারি পদ্ধতির সরকার, সর্বজনীন ভোটে সরাসরি নির্বাচন ও আইনসভার সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে।

২. ফেডারেল সরকারের এখতিয়ারে কেবলমাত্র দেশরক্ষা থাকবে।

৩. পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দুটি পৃথক অথচ বিনিময়যোগ্য মুদ্রার প্রচলন করতে হবে। অথবা পূর্ব পাকিস্তানের উপার্জিত বৈদেশিক মুদ্রার আলাদা হিসাব রাখা ও খরচের হিসাব রাখার ব্যবস্থা।

৪. আঞ্চলিক সরকারের হাতে সকল প্রকার ট্যাক্স, খাজনা, কর ধার্য ও আদায়ের ব্যবস্থা থাকবে, ফেডারেল সরকারের সে ক্ষমতা থাকবে না।

৫. দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রার পৃথক পৃথক হিসাব থাকবে। প্রত্যেক ইউনিট বিদেশের সাথে চুক্তি সম্পাদন ও ট্রেড মিশন ঐ সব দেশে খুলতে পারবে।

৬. পূর্ব পাকিস্তানে মিলিশিয়া বা প্যারামিলিটারি সৈন্যবাহিনী গঠন করতে হবে।

ছয়দফা দেওয়ার সাথে সাথে পাকিস্তানপন্থিরা এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হল। বাংলার জনগণ একে আখ্যা দিল 'বাঙালির বাঁচার দাবি'। পাকিস্তানি শাসক আইয়ুব আর তার বাঙালি দোসর মোনায়েম খাঁর লোকেরা জেল, জুলুম ও অত্যাচার শুরু করল শেখ মুজিব ও ছয় দফার সমর্থকদের উপর। ইত্তেফাক সম্পাদক প্রবীণ রাজনীতিবিদ তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার পত্রিকা বন্ধ করে দেওয়া হল ও তাঁকে জেলে নিক্ষেপ করা হল। বাঙালির 'বাঁচার দাবির' গতি স্তব্ধ করতে না পেরে সরকার পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সকল নেতা ও হাজার হাজার কর্মীকে জেলে পাঠাল। ছয়দফা'র দাবিতে জীবন দিলেন টংগির

শ্রমিক মনু মিয়া ১৯৬৬-এর ৭ জুনে। এরপরও যখন আন্দোলনের গতিবেগ বন্ধ করা গেল না তখনই আবিষ্কার করা হল তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা– রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য।

পাকিস্তানি শাসকরা যখন 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' সাজাচ্ছিল তখন প্রধান আসামি হিসেবে যার নাম লন্ডন থেকে বারবার শুনতাম তিনি লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন। মোয়াজ্জেম ভাই '৬৪ সালে একটা স্বয়ংক্রিয় রেডিও স্টেশন পাঠানোর জন্য আমাকে খবর পাঠিয়েছিলেন। তাঁর সাথে জড়ানো হয়েছিল আর্মি, নেভি ও এয়ার ফোর্সের বাঙালির স্বার্থে সোচ্চার অফিসার ও জোয়ানদের একটি অংশকে। প্রথম প্রথম আমরা খবর পাচ্ছিলাম যে, এই মামলা করে কোর্ট মার্শাল করে দেশরক্ষা বাহিনীর বাঙালিদের শাস্তি দেওয়া হবে ও চাকরিচ্যুত করা হবে।

তিন চার সপ্তাহ পরে লন্ডনে নতুন খবর এল যে, বাঙালি উচ্চপদস্থ আমলাদেরও এতে যোগসাজশ আছে তা তারা প্রমাণ করে কিছু C.S.P. অফিসারকে চাকরিচ্যুত করবে ও শাস্তি দেবে। এ ধরনের কানাঘুষা যখন চলছে তখনই সবচেয়ে তাজ্জবের খবর এল যে, শেখ মুজিবকে এ মামলায় না জড়ালে শেখ জেল থেকে বেরিয়ে এসে এদের পক্ষে আন্দোলন করবে, আর এ মামলায় কাউকে শাস্তি দেওয়া সম্ভব হবে না, বরং হিতে বিপরীত হবে। সুতরাং তাঁকেও এ মামলায় জড়াতে হবে।

মামলাটা সাজানোর দু'বছর আগে থেকেই ছয়দফা আন্দোলনের নেতা হিসেবে শেখ সাহেব জেলে, কিন্তু মামলা যেদিন দায়ের করা হল তখন জানলাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মূল আসামি।

ঢাকা থেকে খবর পেলাম স্পেশাল কোর্ট করে তাঁর বিচারের ব্যবস্থা হচ্ছে ও বঙ্গবন্ধুকে ঢাকা সেন্ট্রাল জেল থেকে ছেড়ে দিয়ে জেল গেটেই আবার অ্যারেস্ট করে ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখানেই আর্মির লোকেরা তাঁকে ইনটারোগেট করছে তাঁর স্বীকারোক্তি আদায় করার জন্য। বর্তমান বি.এন.পির এককালের বিদেশমন্ত্রী তৎকালীন Pakistan Army Intelligence-এর বাঙালি মেজর প্রয়াত কর্নেল (অব:) মোস্তাফিজুর রহমান বঙ্গবন্ধুকে ইনটারোগেট করছে। কোনো ভয়ভীতি দিয়ে কোনো অত্যাচারেই যখন বঙ্গবন্ধুর কাছ থেকে কোনো স্বীকারোক্তি আদায় করা গেল না তখন ষড়যন্ত্র করা হল আর্মি কাস্টডিতে থাকাকালে তাঁকে হত্যা করার। এ কথা লন্ডনেই বঙ্গবন্ধুর কাছ থেকে আমার শোনা।

তথাকথিত 'আগরতলা ষড়যন্ত্র' মামলার খবর পেয়ে আমরা ঢাকার সাথে যোগাযোগ স্থাপন করি। ঢাকা থেকে আমাদের কাছে মামলার কাগজপত্র পাঠানো হয় ও বলা হয়, আমরা যেন বঙ্গবন্ধুর পক্ষ সমর্থন করতে ব্রিটেন থেকে আইনজীবী পাঠানোর ব্যবস্থা করি। আমরা 'শেখ মুজিব ডিফেন্স ফান্ড' বলে একটি তহবিল খুলি ও অর্থসংগ্রহ করে স্যার থমাস উইলিয়ামসকে উকিল হিসেবে ঢাকায় পাঠাই বঙ্গবন্ধুকে সমর্থন করতে।

১৯৬৯ সালের নভেম্বরের শীতে দেশের কাজ থেকে একটু ছুটি নিয়ে আমাদের ধন্যবাদ জানাতে বঙ্গবন্ধু লন্ডনে এলেন। লন্ডন শহরের প্রাণকেন্দ্র হাইড পার্কের এক পাশে অক্সফোর্ড স্ট্রিটের গা ঘেঁষেই মাউন্ট রয়াল হোটেল। লন্ডনে গিয়ে বঙ্গবন্ধু এই হোটেলে উঠলেন। এখানে এক সকালে এক পাকিস্তানি ভদ্রলোক বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করতে এলেন। তাঁদের আলাপ আলোচনার এক পর্যায়ে ভদ্রলোক বললেন SK Sb, do you know that Lt. Naser is dead? বঙ্গবন্ধু খুবই অবাক ও বিমর্ষ হয়ে পড়লেন। ভদ্রলোকের বর্ণনা থেকে জানলাম, Lt Naser-কে ছুটি দিয়ে করাচি পাঠিয়ে তাঁকে শিকার করার প্রলোভন দেখিয়ে জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে তাঁরই বন্দুক দিয়ে হত্যা করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর কাছ থেকে পরে জেনেছি– শত চেষ্টা, অত্যাচার ও ভয় দেখিয়েও যখন কোনো স্বীকারোক্তি তাঁর কাছ থেকে আদায় করা গেল না তখন তাঁর নিয়মিত বিকালে হাঁটার সময় পিছন থেকে গুলি করে তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করা হল। হত্যা করে বলা হবে বঙ্গবন্ধু পালিয়ে যেতে চেষ্টা করলে তাঁকে গুলি করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর সার্বক্ষণিক দায়িত্বে নিয়োজিত আর্মি অফিসার নাসের সাহেবকে এ কাজটির দায়িত্ব দেওয়া হল। নাসের সাহেব এক সুযোগে বঙ্গবন্ধুকে কথাটা জানিয়ে দিলেন ও বৈকালিক ভ্রমণে ঘরের বের না হতে অনুরোধ করলেন। বঙ্গবন্ধু আর্মির হাজতে থাকাকালে আর বাইরে হাওয়া খেতে এলেন না। এই অপরাধের শাস্তি হিসেবে পাঠান নাসের সাহেবকে জীবন দিতে হল। এই হত্যা ষড়যন্ত্রের নায়করা 'আগরতলা মামলা'র শেষ পর্যায়ে বঙ্গবন্ধু ও আগরতলা মামলার অন্যান্য আসামিদের বহনকারী প্রিজন ভ্যানে একদিন আক্রমণ করল বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার জন্য। বঙ্গবন্ধুকে প্রাণে বাঁচাতে গিয়ে জীবন দিলেন সার্জেন্ট জহুরুল হক ও গুরুতরভাবে আহত হলেন ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুল হক।

পূর্বকথায় ফিরে যাই। বঙ্গবন্ধু লন্ডন আসবেন শুনে আমাদের মধ্যে খুবই উত্তেজনা। আমরা তাঁকে কত ভালো করে সংবর্ধনা জানাতে পারি তারই প্রচেষ্টা চলছে। ইটালির ট্রিয়স্ট থেকে লন্ডনে এসে পৌঁছেছেন বঙ্গবন্ধুর কন্যা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তাঁর পরমাণু-বিজ্ঞানী স্বামী ড. ওয়াজেদ মিঞা। আমার স্ত্রী ও আমি তাঁদের ও অন্যদের সাথে মিলে সকল আয়োজন করছি। জনমতের আনিস আহ্মদ, ছাত্র ফেডারেশনের সুবিধ আলী টিপু, এস. কে. আই. এম সালাহউদ্দিন, মিনহাজউদ্দিন, মতিউর রহমান চৌধুরী, জাকারিয়া চৌধুরী, বি.এইচ. তালুকদার, এম. এ রকীব; প্রবীণ নেতাদের মধ্যে আব্দুল মান্নান সানু মিঞা, হাজী নেসার আলী, গৌছ খান, মিম্বার আলী, সামসুর রহমান, মোহাম্মদ জুনায়েদ,

বঙ্গবন্ধুর কাছ থেকে পরে জেনেছি, শত চেষ্টা, অত্যাচার ও ভয় দেখিয়েও যখন কোনো স্বীকারোক্তি তাঁর কাছ থেকে আদায় করা গেল না তখন নিয়মিত বিকালে হাঁটার সময় পেছন থেকে গুলি করে তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করা হল। .... নাসের সাহেব এক সুযোগে বঙ্গবন্ধুকে কথাটা জানিয়ে দিলেন ও বৈকালিক ভ্রমণে ঘরের বের না হতে অনুরোধ করলেন।

আব্দুল আজীজ বাগমার, আবদুর রউফ; বার্মিংহামের আবদুল হক, জমশেদ মিঞা; ম্যাঞ্চেস্টারের আব্দুল মতিন, পোর্টস মাউথের আবদুর রাজ্জাক চৌধুরী; লুটনের আব্দুল আহাদসহ অনেকেই নেতাকে যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে লন্ডনে স্বাগত জানানোর জন্য কাজ করেছিলেন। নির্ধারিত দিনে বঙ্গবন্ধুর সুট-টাই-পরা একটি ছবি বুকে এঁটে শত শত ছাত্র, যুবক ও স্থানীয় সমাজকর্মী উপস্থিত হলেন বিমানবন্দরে নেতাকে স্বাগত জানাতে। আমাদের সাথে ছিল পশ্চিম পাকিস্তানবাসী ও লন্ডনে অবস্থানকারী অনেক ছাত্রনেতা ও সমাজকর্মী। বঙ্গবন্ধু লন্ডন ও বার্মিংহামে জনসভা করে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে বাংলার মানুষের ন্যায্য দাবির পক্ষে অবিচল থাকার পরামর্শ দিলেন। এই বছরই 'এমনেস্টি ইনটারন্যাশনাল' বঙ্গবন্ধুকে 'প্রিজনার অফ কনশেন্স অফ দি ইয়ার' হিসেবে এডোপ্ট করে।

তিন চার দিন লন্ডনে থাকার পর লন্ডন থেকে বেশ দূরে সমুদ্রের পারে টর্কি শহরের একটি রেস্টুরেন্ট মালিক ও আওয়ামী লীগের সেকালের একনিষ্ঠ সমর্থক সিলেটের ফারুক চৌধুরীর বিশেষ আমন্ত্রণে বঙ্গবন্ধু তাঁর সাথে ঢাকা থেকে আসা সাংবাদিক '৭১-এর শহীদ বুদ্ধিজীবী নাজমুল হক, শেখ হাসিনা ও ড. ওয়াজেদের সাথে আমি ও আমার স্ত্রী দু-একদিন সমুদ্রপারে কাটাতে টর্কিতে যাই। লন্ডন থেকে টর্কির পথে তখনও মোটরওয়ে হয়নি। কিন্তু অনেক চওড়া রাস্তা আছে। কোথাও তা আঁকাবাঁকা– বঙ্গবন্ধুকে খুবই আনন্দিত ও মুক্ত মনে হল। তিনি আমাদেরকে ধীরে ধীরে তাঁর স্বপ্নের বাংলার কথা বলছিলেন। ওখানকার জীবন ও জীবনযাত্রার শৃঙ্খলা, রাস্তাঘাট বাড়িঘরের পরিপাটিত্ব, লোকজনের পোশাক-আশাক, চলাফেরা মিলে যে একটা প্রাণচাঞ্চল্য আছে তার সাথে বাংলার মানুষের অবস্থা তুলনা করছিলেন। তাঁর স্বপ্ন, বাংলাদেশেও এমন সুন্দর রাস্তাঘাট হবে, বাংলার মানুষও হাসি ও আনন্দে কাটাবে, তার জন্য কাজ করার কথা বললেন। দেশের মানুষের মুক্তির চিন্তায় বিভোর বঙ্গবন্ধু তাদের বেদনা উপশমের জন্য কাজ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বাংলার মানুষের প্রাথমিক প্রয়োজন অন্ন, বস্ত্র, আবাস, শিক্ষা, চিকিৎসা ও জীবিকার নিশ্চয়তা বিধানের জন্য কি করবেন তাই আমাদের বলছিলেন আর আমরা তন্ময় হয়ে তাঁর কথা শুনছিলাম। আমার মনে হল বঙ্গবন্ধু যেন এখানে এসেছিলেন অনেক বড় সংগ্রামের প্রস্তুতির পূর্বক্ষণে নিজেকে প্রস্তুত করে নিতে, নিজের সাথে বোঝাপড়া করে নিতে– যাদের সাহায্য-সহযোগিতা তিনি নিবেন তাদের সকলকে প্রস্তুত করতে, সবচেয়ে বড় ঝড়ের জন্য সকলকে সাবধান করতে। টর্কিতে ছিল না বঙ্গবন্ধুর জন্য জীবন-যৌবনকে আচ্ছন্ন করা কারাজীবনের দুঃসহ যন্ত্রণা, ছিল না প্রতিনিয়ত লক্ষ লক্ষ কর্মীর ভিড়। হঠাৎ যেন তিনি চিন্তার সমুদ্রে ডুবে আছেন। সভামঞ্চে যাওয়ার তাগিদ, পাকিস্তানিদের ষড়যন্ত্র ছিন্ন করার কৌশল কোনোটা আজ তাঁর নেই। তিনি মুক্তভাবে কাটানোর জন্য ক'টা দণ্ড পেলেন। তাঁর ঘরের ব্যালকনি এসে শেষ হয়েছে আটলান্টিক মহাসাগরে। তিনিও চিন্তার সমুদ্রে ডুবে আছেন।

তিন চার দিন টর্কিতে থেকে আমরা লন্ডনে ফিরে এলাম। টর্কিতে থাকাকালে একদিন মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত আলাপের এক পর্যায়ে বঙ্গবন্ধুর কাছে জানতে চেয়েছিলাম, দেশকে পাকিস্তানিদের হাত থেকে মুক্ত করার পর পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থানরত বাঙালিদের কী হবে? বঙ্গবন্ধু স্মিতহাস্যে বললেন, 'আমার ব্যবস্থা করা আছে, আমাদের লোককে তারা ক্ষতি করতে পারবে না। প্রিজনার অফ ওয়ার এক্সচেঞ্জ ও আটকে-পড়া বাঙালিদের যখন ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হল ৭৩-৭৪ সালে, তখন বুঝতে পারলাম বঙ্গবন্ধু আগেই পদক্ষেপ নিয়ে রেখেছিলেন।

লন্ডন ও বার্মিংহামে বঙ্গবন্ধু দুটি জনসভা করলেন। এ ছাড়াও তিনি প্রবাসী বাঙালি নেতাদের সাথে দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলাপ-আলোচনা করলেন ও সংগ্রামের ডাক এলে আমাদের করণীয় কি হবে তারও নির্দেশনা দিলেন। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য, বিভিন্ন ব্রিটিশ পত্রিকার লোকজন ও



ইংল্যান্ডের রাজপ্রাসাদ বাকিংহাম প্যালেসে রানী এলিজাবথ ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পরস্পরকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন।
রানীর বাম পাশে প্রিন্স ফিলিপ

বঙ্গবন্ধু সে সময় হয়তো আরো দু'চার দিন লন্ডনে থাকতেন। কিন্তু ঢাকা থেকে খবর পেলেন যে, সেখানে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার প্রস্তুতি চলছে।

নেতৃস্থানীয় ব্রিটিশ নাগরিকদের কাছে তিনি পূর্ব বাংলার মানুষের উপর পাকিস্তানিদের শোষণ ও নির্যাতনের চিত্র তুলে ধরলেন। আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়ে আমাদের সংগ্রামে তাঁদের সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করলেন। কেন তিনি ছয়দফা দাবি দিয়েছেন এবং এই ছয়দফা দাবি পূরণ না হলে বাংলার মানুষের মুক্তি আসবে না তাও তাদের ব্যাখ্যা করে বুঝালেন। বিভিন্ন দেশের লোকদের হাজার মাইলের দূরত্বে দুটি প্রদেশ নিয়ে একটি অবাস্তব পাকিস্তানে বাংলার মানুষের উপর যে অর্থনৈতিক নিষ্পেষণ ও বাংলার সম্পদ কীভাবে পাকিস্তানে পাচার হচ্ছে তার চিত্র তুলে ধরলেন। এ সময় তিনি এমনেস্টি ইনটারন্যাশনালসহ বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থার লোকদের জানালেন যে, মূলত বাংলার মানুষ একটি পাকিস্তানি কারাগারে আছে, অর্থনৈতিক স্বাধীনতাসহ তাদের সকল স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হয়েছে। ব্রিটিশ টেলিভিশন ও অন্যান্য গণমাধ্যমে তিনি বাংলার মানুষের অবস্থার চিত্র তুলে ধরেন ও বাঙালির স্বার্থরক্ষার জন্য আমাদের মরণপণ সংগ্রামের মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দিলেন।

৬৯-এ বঙ্গবন্ধু লন্ডনে থাকা অবস্থায় যাদের সাথে নিজে যোগাযোগ করে আমাদের পরে যোগাযোগ রক্ষা করতে বলে গিয়েছিলেন, তাঁরাই '৭১-এর অসহযোগ আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধে সর্বাত্মক সহযোগিতা করে পাকিস্তানি হানাদারদের সম্ভাব্য আক্রমণ ও পরে অত্যাচার সম্পর্কে বিশ্ববাসীকে অবহিত করেছিলেন। এদের মধ্যে যাঁরা বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন তাঁরা আমাদের হয়ে অন্যান্য বন্ধু দেশকে মুক্তিযুদ্ধের আরম্ভেই আমাদের পক্ষে নিয়ে এসেছিলেন। এ প্রস্তুতি থাকার কারণেই '৭১-এর ২৬ মার্চ সকালে লন্ডনের Evening News পত্রিকায় খবর এল, "Radio Pakistan announced that Sheikh Mujibur Rahman was arrested only hours after he proclaimed independence for East Pakistan." ২৭ মার্চের The Times পত্রিকার হেডলাইন ছিল: "Heavy Fighting as Sheikh Mujibur Declares East Pakistan Independent." '৭১ সালের ২৬ মার্চের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে ব্রিটেনের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী স্যার এডওয়ার্ড হিথ কে.জি.এম.বি.ই. এম.পি বলেছেন, ... "On 26th March 1971, Sheikh Mujibur Rahman proclaimed the Sovereign Independent People's Republic of Bangladesh."

বঙ্গবন্ধু সে সময় হয়তো আরো দু'চার দিন লন্ডনে থাকতেন। কিন্তু ঢাকা থেকে খবর পেলেন যে, সেখানে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার প্রস্তুতি চলছে ঢাকার হিন্দুদের এলাকায় আওয়ামী লীগ কর্মীদের তিনি পাহারা দেওয়ার নির্দেশ দিলেন এবং অবস্থার অবনতি হওয়ার আগেই ঢাকায় ফিরে গেলেন। তাঁর ইচ্ছামতো তাঁর দেশে ফিরে আসার কিছু দিনের মধ্যেই যুক্তরাজ্যে পাকিস্তান আওয়ামী লীগের শাখা গঠন করা হল।

মুক্তিযুদ্ধ শেষে পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে বঙ্গবন্ধু প্রথম এলেন ইংল্যান্ডে– পাকিস্তানিরা যখন তাঁর মতামত চেয়েছিল তাঁকে কোথায় পাঠানো যায়। তিনি বলেছিলেন লন্ডনে। তাই মুক্ত বঙ্গবন্ধু প্রথম এলেন মুক্ত ব্রিটেনে আর ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী তাঁর ছুটি বন্ধ করে ফিরে এলেন লন্ডনে বিশ্বনন্দিত বিপ্লবী নেতা শেখ মুজিবের সাথে দেখা করতে। সে ছিল প্রবাসী বাঙালিদের বড় গর্বের দিন। ৮ জানুয়ারি ১৯৭২ বঙ্গবন্ধুকে বহনকারী উড়োজাহাজ যখন হিথরো বিমানবন্দরে পৌছল তখনই আমরা জানলাম, বাংলাদেশের মানুষ জানল, বিশ্ববাসী জানল, শেখ মুজিব স্বাধীন ও মুক্ত। সারা বৃটেনের বাঙালিদের মাঝে বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের বন্ধুদের মাঝে এল আনন্দের জোয়ার। হিথরো বিমানবন্দর থেকে বঙ্গবন্ধু যখন লন্ডনের অভিজাত হোটেল ক্লারিজেস-এ এসে পৌছেছেন তার মধ্যেই ব্রিটেনবাসী জেনে গেছেন নেতা মুক্ত। তাঁরা ছুটলেন প্রিয় নেতাকে একপলক দেখার জন্য। সাংবাদিক পাড়া ফ্লিট স্ট্রিটে খবর পৌছলে সাংবাদিকরা ছুটলেন হোটেলে। বিবিসি ওয়ার্লড সার্ভিসের লোকেরা এলেন, এলেন হাজার হাজার ব্রিটেনবাসী। ক্লারিজেস হোটেলের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধু তাঁদের স্বাগত জানালেন– ক্ষণে ক্ষণে আনন্দে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ছেন নেতা– সামনের বিশাল জনসমুদ্রে সকলের চোখে আনন্দ-অশ্রু। নেতার যেন তাঁর প্রিয় মানুষদের দেখা আর ফুরায় না– জনস্রোতেরও প্রিয় নেতাকে দেখার স্বাদ যেন মেটে না; কেউ হোটেলের সামনের রাস্তা যেন ছাড়তে চায় না। সে দৃশ্য কোনো দিনই ভুলবে না প্রবাসী বাঙালি ভাইবোনেরা।

লেখাটি 'ধানশালিকের দেশ' পত্রিকা থেকে সংকলিত

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব : যেভাবে বেড়ে উঠলেন

সিরাজ উদদীন আহমেদ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৯১ বছর পূর্বে গঙ্গানদীর পলল দ্বারা সৃষ্ট বঙ্গভূমিতে জন্মগ্রহণ করেন। ১৭ মার্চ তাঁর জন্ম দিবস। তাঁর জন্মদিবসটি বাংলাদেশে জাতীয় শিশু দিবস হিসেবে পালন করা হচ্ছে। তাঁর জন্মদিবসে জাতি তাঁকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছে। শিশুরা আনন্দ-উৎসবের মাধ্যমে জাতির জনককে স্মরণ করবে। বাঙালি জাতির মহানায়ক পৃথিবীর ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। তিনি সর্বযুগের, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি।

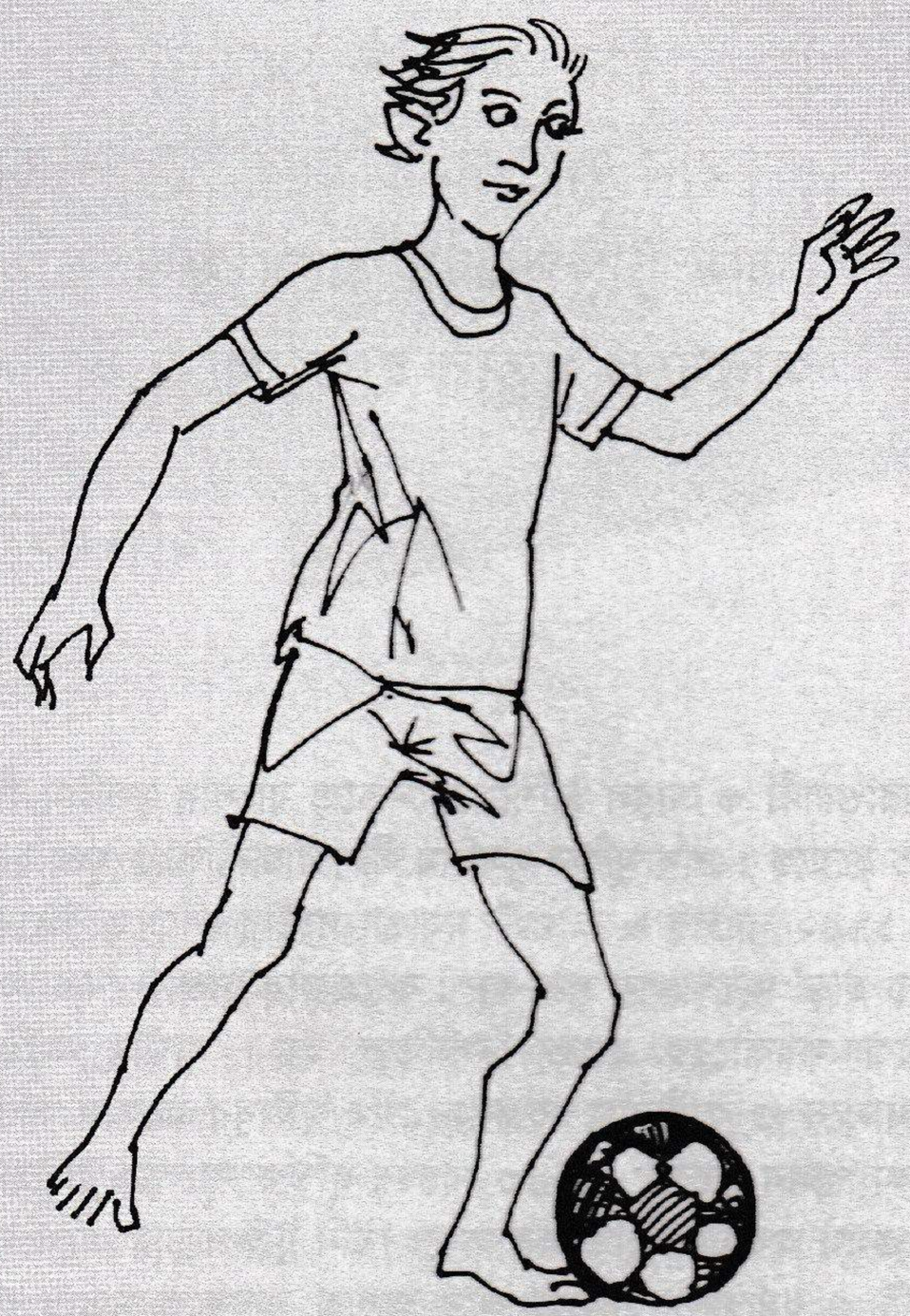
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পূর্বপুরুষ শেখ আউয়াল বাগদাদ থেকে ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য প্রথমে চট্টগ্রাম আগমন করেন। তিনি ঢাকার সোনারগাঁয়ে ধর্মপ্রচার করতে এসে বিয়ে করে বসতি স্থাপন করেন। শেখ আউয়ালের পুত্র শেখ জহিরুদ্দিন কলকাতায় ব্যবসা করতেন। তাঁর পুত্র শেখ তেকড়ি কলকাতা থেকে টুঙ্গিপাড়া গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। তাঁর পুত্র শেখ জাহের, তাঁর পুত্র কাসেম আলী, তাঁর পুত্র শেখ হামিদ। শেখ হামিদের পুত্র শেখ লুৎফর রহমান। তিনি দেওয়ানি আদালতের সেরেস্তাদার ছিলেন। শেখ লুৎফর রহমান বিয়ে করেন চাচাত বোন শেখ আবদুল মজিদের কন্যা সায়েরা খাতুনকে। শেখ লুৎফর রহমান ও সায়েরা খাতুনের দুই পুত্র হলেন শেখ মুজিবুর রহমান ও শেখ নাসের। কন্যারা হলেন ফাতেমা বেগম, আছিয়া বেগম, আমেনা বেগম এবং খোদেজা বেগম লিলি। প্রথম পুত্র শেখ মুজিবুর রহমান ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ, বাংলা ১৩২৭ সালের ২০ চৈত্র মঙ্গলবার রাত ৮ ঘটিকায় টুঙ্গিপাড়ার শেখ বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নানা শেখ আবদুল মজিদ নাতির নাম রাখেন মুজিবুর রহমান।

শেখ মুজিবুর রহমান টুঙ্গিপাড়া গিমাডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। গিমাডাঙ্গা বিদ্যালয়ে তিনি তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত পড়েন। তাঁর পিতা গোপালগঞ্জে চাকরি করতেন। গোপালগঞ্জে তাঁর বাসভবন ছিল। শেখ লুৎফর রহমান পুত্রকে গোপালগঞ্জে ভর্তি করেন। শেখ লুৎফর রহমান মাদারীপুর বদলি হন। শেখ মুজিবুর রহমানকে মাদারীপুর ইসলামিয়া হাইস্কুলে চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তি করেন এবং মাদারীপুরে থাকাকালে শেখ মুজিব বেরিবেরি রোগে আক্রান্ত হন এবং চোখে ছানি পড়ে। শেখ লুৎফর রহমান ১৯৩৫ সালে গোপালগঞ্জে বদলি হন। শেখ মুজিবুর রহমান গোপালগঞ্জ পাবলিক স্কুলে পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তি হন। চোখের অসুখের জন্য পিতা তাঁকে কলকাতায় নিয়ে যান। ডা. টি আহমেদ তাঁর চোখের অস্ত্রোপচার করেন এবং তাঁকে চশমা দেন। তখন থেকে তিনি চশমা ব্যবহার করতেন। চোখের অসুখের জন্য তাঁর লেখাপড়া তিন বছর বন্ধ থাকে। এ সময় তাঁর গৃহশিক্ষক ছিলেন হামিদ মাস্টার। তিনি ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের কর্মী ছিলেন। তিনি অনেক বছর বন্দি ছিলেন। শেখ মুজিব হামিদ মাস্টারের নিকট রাজনীতির কথা শুনতেন। বিপ্লবের গল্প শুনতেন। রাজনীতির কথা শুনে অনুপ্রাণিত হতেন। শেখ মুজিব হামিদ মাস্টারের কথায় প্রভাবিত হয়েছেন, সমাজসেবায়ও তিনি মাস্টারের নিকট শিক্ষা লাভ করেন। তিনি গরিব মানুষকে ভালোবাসতেন।

১৯৩৮ সালের ১৬ জানুয়ারি বাংলার প্রধানমন্ত্রী শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক এবং তাঁর বাণিজ্য ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী গোপালগঞ্জ পরিদর্শনে আসেন। তাঁরা মিশন স্কুলও পরিদর্শন করেন। শেরে বাংলা ফেরার পথে শেখ মুজিবুর রহমান স্কুল সংস্কারের দাবি নিয়ে সামনে দাঁড়ান। শেরেবাংলা স্কুল মেরামত করার জন্য ১২ শ' টাকা বরাদ্দ করেন। বাংলার দুই মহান নেতার সাথে তাঁর প্রথম পরিচয় হয়। শেখ মুজিবের সাহস দেখে তাঁরা মুগ্ধ হন। পরবর্তী জীবনে শেরে বাংলা ও সোহরাওর্দীর সাথে তাঁর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়।

১৯৩৯ সালে গোপালগঞ্জে মেলা বসে। মেলাকে কেন্দ্র করে দাঙ্গা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু তরুণ শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বগুণে দাঙ্গা হতে পারেনি। তা সত্ত্বেও দাঙ্গার

শেখ মুজিবুর রহমান একজন
কৃতী ফুটবল খেলোয়াড় ছিলেন। তিনি
গোপালগঞ্জ ওয়ান্ডারার্স ফুটবল
টিমে খেলতেন। তিনি গোপালগঞ্জসহ
পার্শ্ববর্তী অঞ্চলেও খেলতে যেতেন।
তাঁর দলের সাথে ১৯৪০ সালের
ছবি আছে। তিনি স্কুলের ছাত্র ও
প্রতিবেশী ছেলেদের নিয়ে ব্রতচারী
নাচগান করতেন। তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত
হত 'ও আমার দেশের মাটি,
তোমায় রাখব পরিপাটি'।



মদদদাতারা শেখ মুজিবুরের নামে মামলা করে। মামলায় তাঁকে গ্রেফতার করে এক সপ্তাহ জেলে আটকে রাখা হয়। গোপালগঞ্জে তখনই শেখ মুজিব নেতা হিসেবে পরিচিত হন।

১৯৪০ সালে শেখ মুজিবুর রহমান নবম শ্রেণির ছাত্র। স্কুল-মাঠে ছাত্রদের সভা হবে। তখন গোপালগঞ্জের রাজনৈতিক নেতা ছিলেন খন্দকার শামসুদ্দিন আহমেদ ও অহিদুজ্জামানের পিতা আব্দুল কাদের মোক্তার। তাঁরা স্কুল-মাঠে ছাত্রদের সভা হতে দিবেন না। তাঁরা এসডিওকে দিয়ে সভা বন্ধ করে দেন। পাশে মসজিদে ছাত্রদের সভা হয়। শেখ মুজিবুর রহমান ভাষণ দিচ্ছেন। এ সময় পুলিশে এসে শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করে। ছাত্রদের দাবির প্রেক্ষিতে তিনি কোর্ট থেকে মুক্তি লাভ করেন।

একবার হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও মুসলিম লীগের সম্পাদক আবুল হাশিম গোপালগঞ্জে সভা করেন। তখন সভা নিয়ে বিরোধ হয়। কাদের মোক্তারের অভিযোগে পুলিশ শেখ মুজিব ও আরও কয়েকজন ছাত্রকে গ্রেফতার করে। এক সপ্তাহ কারাবরণের পর তাঁরা মুক্তি লাভ করেন।

শেখ মুজিবুর রহমান একজন কৃতী ফুটবল খেলোয়াড় ছিলেন। তিনি গোপালগঞ্জে ওয়ান্ডারার্স ফুটবল টীমে খেলতেন। তিনি গোপালগঞ্জসহ পাশ্ববর্তী অঞ্চলে খেলতেন। তাঁর দলের সাথে ১৯৪০ সালের ছবি আছে। তিনি স্কুলের ছাত্র ও প্রতিবেশী ছেলেদের নিয়ে ব্রতচারী নাচগান করতেন। তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হত

ও আমার দেশের মাটি,
তোমায় রাখব পরিপাটি।

তিনি গরিব ছাত্রদের জন্য মুষ্টি সংগ্রহ করতেন। তাঁর দাদা শেখ আব্দুল হামিদ ও চাচা ইউনিয়ন পরিষদের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তাঁদের সেবামূলক কাজের দ্বারা তিনি অনুপ্রাণিত হয়েছেন। ১৯৪২ সালে ম্যাট্রিক পাশ করে পিতার নির্দেশে কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হয়ে বেকার হোস্টেলে থাকতেন। তখন তিনি রাজনীতিতে সরাসরি প্রবেশ করেন। এ সময় শেখ মুজিবুর রহমান মুসলিম লীগের নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশিমের সংস্পর্শে আসার সুযোগ পান।

গান্ধীর অহিংস আন্দোলনে ও স্বাধীনতা সংগ্রামে শেখ মুজিবুর রহমান সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। ১৯৪৩ সালে দুর্ভিক্ষের সময় তিনি টুঙ্গিপাড়ায় এসে ফুড কমিটি ও ধর্মগোলা প্রতিষ্ঠা করে ক্ষুধার্ত মানুষকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচান।

সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশিমের নেতৃত্বে বাংলায় মুসলিম লীগ গঠিত হয়েছে। শেখ মুজিব মুসলিম লীগ রাজনীতিতে যুক্ত হন।

১৯৪২ সালের ৮ আগস্ট মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে 'ইংরেজ ভারত ছাড়' আন্দোলন শুরু হয়। কংগ্রেসের হাজার নেতা-কর্মী ইংরেজ সরকারের হাতে নির্যাতিত হয়। গান্ধীর অহিংস আন্দোলনে ও স্বাধীনতা সংগ্রামে শেখ মুজিবুর রহমান সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ বাংলার ইতিহাসে কলংকময় অধ্যায়। দুর্ভিক্ষের সময় তিনি টুঙ্গিপাড়ায় এসে ফুড কমিটি ও ধর্মগোলা প্রতিষ্ঠা করে ক্ষুধার্ত মানুষকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচান। তিনি নিজের গোলার ধান দুর্ভিক্ষপীড়িতদের মধ্যে বণ্টন করেন।

শেখ মুজিবুর রহমান মুসলিম লীগ নেতা ও খাদ্যমন্ত্রী শহীদ সোহরাওয়ার্দীর বাসভবনে নিয়মিত যাতায়াত করতেন। এ সময় তিনি তরুণ ছাত্র ও মুসলিম লীগ নেতা হিসেবে সুপরিচিতি ছিলেন। তিনি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সাথে বিভিন্ন জেলায় জনসভা করেন। কলকাতার ছাত্রজীবনে তিনি ফরিদপুর জেলার নেতৃত্ব দিতেন। ১৯৪৪ সালের ১৭ নভেম্বর বঙ্গীয় মুসলিম লীগের কাউন্সিল সভা কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়। দলের সম্পাদক নির্বাচিত হবে। যুবকদের নিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান আবুল হাশিমকে বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সম্পাদক নির্বাচন করেন। শেখ মুজিবুর রহমান আবুল হাশিমকে শ্রদ্ধা ও অনুসরণ করতেন।

শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন অসাম্প্রদায়িক ও মানবতাবাদী। তিনি হিন্দু-মুসলমানের প্রাণ রক্ষায় এগিয়ে আসেন। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ'র নেতৃত্বে মুসলিম লীগের দাবিতে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান সৃষ্টি হয়। শেখ মুজিব পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় খুশি হননি। তিনি সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে স্বাধীন বাংলার সমর্থক ছিলেন। ১৯৪৬ সালে তিনি বি. এ. পরীক্ষা দিতে পারেননি। তাই তিনি ১৯৪৭ সালে বি. এ. পাশ করেন এবং ঢাকায় ফিরে আসেন। তাঁর নেতৃত্বে ১৯৪৮ সালে মুসলিম ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ ভাষা আন্দোলনে তিনি গ্রেফতার হন। ১৯৪৮ সালের ২৩ জানুয়ারি আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি আওয়ামী লীগের যুগ্মসম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৫০ সালে তিনি কারাবন্দি ছিলেন। তিনি জেল থেকে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সমর্থন ও উৎসাহ দেন। ১৯৫৩ সালে তিনি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনে তিনি পূর্ব পাকিস্তান আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হন ও পরে মন্ত্রী নিযুক্ত হন।

শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৬৬ সালে ছয়দফা আন্দোলন চলে। তাঁকে কারাবন্দি করা হয়। ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানে আইয়ুব খানের পতন হয়। উল্লেখ্য যে, ঐতিহাসিক ছয়দফা আন্দোলন ও ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানসহ শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্ব ও ব্যক্তিত্বের বিকাশে দৈনিক ইত্তেফাক ও তার প্রতিষ্ঠাতা মরহুম তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার অবদান অবিস্মরণীয়। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জয়লাভ করে। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পাকিস্তান বাহিনী বাঙালিদের আক্রমণ করে। তারা গণহত্যা চালায়। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। নয় মাস যুদ্ধ চলে। ৩০ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

বঙ্গবন্ধু পশ্চিম পাকিস্তানে কারাবন্দি ছিলেন। ১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি তিনি মুক্তি লাভ করেন। ১০ জানুয়ারি বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

জাতির জনক
কর্মময় জীবনের শেষ সপ্তাহ

শাহরিয়ার ইকবাল

পৃথিবীতে মাঝে মাঝে এমন এক একজন ব্যক্তির জন্ম হয় যাঁদের দূরদর্শিতা, সাংগঠনিক ক্ষমতা ও অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ইতিহাসের চলমান ধারাকে পরিবর্তিত করে দেয়। এমন ব্যক্তি ছিলেন সম্রাট অশোক, সম্রাট আকবর, কন্স্টেনটাইন, কামাল আতাতুর্ক, আহম্মেদ সুকার্নো, জামাল নাসের, লেনিন, মাও সে তুঙ, মহাত্মা গান্ধী ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

কোনো কোনো ইতিহাসবিদ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে যুগান্ত সৃষ্টিকারী নেতা বলে আখ্যায়িত করেছেন। এই মহৎ হৃদয়ের মানুষটি বাঙালির হাজার বছরের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিয়েছিলেন। তিনি বাঙালি জাতিকে এনে দিয়েছিলেন একটি স্বাধীন ভূখণ্ড, একটি জাতীয় পতাকা। একটি সংবিধান উপহার দিয়েছিলেন পাকিস্তানি বন্দিশিবির থেকে ফিরে এসে। ১৯৭২ সালের ১২ জানুয়ারি তিনি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব নেন। একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের পুনর্গঠনে যখন তিনি ব্যস্ত, ঠিক সে সময়ে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ভোররাতে একদল ঘাতক কর্তৃক সপরিবারে নিহত হন। বাংলার রবিকে অস্তাচলে পাঠানোর অপচেষ্টা হল। কিন্তু তা কি সম্ভব?

প্রথমে প্রধানমন্ত্রী ও পরবর্তীকালে রাষ্ট্রপতিরূপে তিনি ছিলেন বাংলাদেশের শাসনযন্ত্রের কেন্দ্রবিন্দু। বাংলাদেশের জনজীবনের তিনি ছিলেন অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই কারণেই প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতির সরকারি অবস্থানকেন্দ্র গণভবনে প্রতিদিন ভিড় জমাত বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত শত শত মানুষ। কেউ তাঁর কাছে যেত সাহায্যের জন্য, কেউ বা তাঁর দোয়া চাইতে। মন্ত্রীরা যেতেন পরামর্শের জন্য, আমলারা নির্দেশ গ্রহণের জন্য। কখনও আবার বিদেশি রাষ্ট্রদূতেরা বঙ্গবন্ধুর সাক্ষাৎপ্রার্থী হতেন স্বীয় দেশের সরকারপ্রধান বা রাষ্ট্রপ্রধানের কোনো শুভেচ্ছা বাণী নিয়ে।

একবার মধ্যরাত্রিতে প্রটোকলের সকল নিয়ম ভঙ্গ করে মিশর ও আলজেরিয়ার দুই রাষ্ট্রপ্রধান আনোয়ার সা'দাত ও হুয়ারি বুমেদীন ঢাকার তেজগাঁও বিমানবন্দরে এসে উপস্থিত হলেন। উদ্দেশ্য, স্বাধীন বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে কয়েক ঘণ্টার জন্য পরামর্শ করা। আরো এসেছিলেন যুগোশ্লাভিয়ার মহানায়ক জোসেফ ব্রজ টিটো। উদ্দেশ্য একই– এই নতুন নেতা শেখ মুজিবুরকে একবার নিজ চোখে দেখা ও পরামর্শ করা। সব শেষে সকল প্রকার সহায়তার আশ্বাস প্রদান। এমনি আরও অনেক নেতা এসেছিলেন সে সময়ের বাংলাদেশে। যেমন অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী গাউ হুইটলাম, আফগানিস্তানের রাষ্ট্রপ্রধান মোহাম্মদ দাউদ। পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টোও লোভ সামলাতে না পেরে একদিন সদলবলে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন তাঁর অতি সাধের মুসলিম 'বেঙ্গলের' মাটিতে। উল্কার বেগে এসে ভুট্টো সাহেব দেখলেন তাঁর কল্পনার মুসলিম বেঙ্গল সত্যি সত্যিই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে পরিণত হয়েছে, যার অবিসংবাদিত নেতা তাঁর সেই চেনা মুখ শেখ মুজিবুর রহমান।

মহান ব্যক্তিত্ব ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। স্বাধীনতার পর তাই গণভবনে ছিল অসংখ্য লোকের ভিড়। বঙ্গবন্ধু সবার সাথে অবাধে দেখা করতেন। মানুষের ধারণা হয়েছিল যে, বঙ্গবন্ধু সকল সমস্যার সমাধান দিতে পারবেন। কিন্তু ধীরে ধীরে দেশের প্রয়োজনে গণভবনে সাক্ষাৎপ্রার্থীদের নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হল। গণভবনের পশ্চিম গেটে নিরাপত্তার ব্যবস্থা হল। তখনও এসএসএফ-এর জন্ম হয়নি।

এ সময়ে প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাৎপ্রার্থীদের একটি তালিকা প্রস্তুত করা হত। বঙ্গবন্ধুর কাছে দিনের কোনো এক সময় সেই



গণভবনে (বর্তমানে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়) বঙ্গবন্ধুর রাষ্ট্রপতি থাকাকালীন অফিসকক্ষ



বঙ্গবন্ধু গণভবনে মন্ত্রিপরিষদের সভা করছেন

তালিকা উপস্থাপন করা হত। তালিকাটি তাঁর অনুমোদন লাভের পর সাক্ষাৎপ্রার্থীর প্রয়োজনের গুরুত্ব অনুযায়ী সাক্ষাতের তারিখ ও সময় দেওয়া হত। আজ এ কথা অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে, কিন্তু বঙ্গবন্ধু প্রায় প্রত্যেক সাক্ষাৎপ্রার্থীর নাম পড়ে শোনানোর সময়ে তাঁদের সমস্যাগুলি সম্পর্কে আলোচনা করতেন, অনেকের সাথে সাক্ষাৎ না করেও সমস্যা সমাধানের নির্দেশ দিতেন। সমগ্র বাংলাদেশের এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্তের মানুষ বঙ্গবন্ধুর দর্শনপ্রার্থী হত। তিনি তাদের অধিকাংশের নাম জানতেন। এমন স্মৃতিশক্তি পৃথিবীর কম মানুষের থাকে। প্রত্যন্ত অঞ্চলের কোনো সাক্ষাৎপ্রার্থী তাঁর সামনে আসার পর তিনি তাদের গ্রামে সাংগঠনিক সফরে গিয়েছিলেন, সেই গ্রামের কোনো ব্যক্তি তাঁকে ক্লান্ত অবস্থায় আপ্যায়ন করেছিলেন– একথা শোনার পর অনেক দর্শনপ্রার্থী অভিভূত হয়ে যেতেন।

যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের তখন নানা সমস্যা। গণভবনে যে সকল নিবেদিতপ্রাণ কর্মকর্তা ও কর্মচারী ছিলেন, তাঁরা বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে সমস্যাগুলি সমাধান করার চেষ্টা করতেন।

বঙ্গবন্ধু সরকারি বাসস্থানে বাস করতেন না। তিনি নিজ বেসরকারি বাসস্থান থেকে গণভবনে আসতেন প্রতিদিন সকাল নয়টায়। সকালে একটি ছোট সুসজ্জিত হাউস গার্ড দল তাঁকে অভ্যর্থনা জানাত। সে সময়ের গণভবনের (বর্তমান প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়) পেছনের প্রশস্ত দরজা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী উপরে যেতেন। তারপর সেই দরজাটি বন্ধ করে দেওয়া হত। হাউস গার্ডদের অভিবাদন গ্রহণের পর প্রধানমন্ত্রী দোতলায় তাঁর অফিসে কাজ আরম্ভ করতেন। সে সময়ে প্রায় প্রত্যেকদিন সকালে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন পররাষ্ট্র সচিব ফখরুদ্দিন আহমদ। অতঃপর আসতেন ডিআইজি স্পেশাল ব্রাঞ্চ। এরপর আরম্ভ হত দিনের কাজ। তাঁর জীবনের শেষ সপ্তাহের দৈনিক কর্মসূচি এখানে তুলে ধরলাম। এ থেকে তাঁর কর্মময় জীবন সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যাবে আশা করি।

১। বৃহস্পতিবার ৭ আগস্ট ১৯৭৫-এর রাষ্ট্রপতির কর্মসূচি ছিল এ রকম :

সকাল ৯.৩০ মি. মি. এটিনি সতার, সুইজারল্যান্ডের মাননীয় রাষ্ট্রদূত কর্তৃক পরিচয়পত্র পেশ
সকাল ১০.৩০ মি. মাননীয় প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী
সকাল ১১.০০ মি. মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী
দুপুর ১২.০০ মি. মাননীয় বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী
বিকাল ৫.৩০ মি. শ্রী সমর সেন, ভারতের মাননীয় হাইকমিশনার
সন্ধ্যা ৬.০০ মি. জনাব আবদুল আউয়াল, সদস্য, কৃষকলীগ কেন্দ্রীয় কমিটি
সন্ধ্যা ৬.১০ মি. কাজী মোজাম্মেল হক, এম.পি

১.৩০ মিনিটে বঙ্গবন্ধু প্রতিদিন গণভবন কমপ্লেক্সের বাসভবন (বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন) অংশে যেতেন। সেখানে স্নানের পর দুপুরের খাবার খেতেন। বাড়ি থেকে তাঁর দুপুরের খাবার পাঠানো হত। দুপুরের খাওয়া অতি সাধারণ। তিনি কৈ মাছ পছন্দ করতেন। দুপুরে খাওয়ার পর কিছুটা বিশ্রাম নিতেন। এ সময়ে ব্যক্তিগত কর্মচারীদের সাথে আলাপ করতেন। তাদের পারিবারিক সমস্যা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার মধ্য দিয়ে তিনি দেশের হালহকিকত সম্পর্কেও একটি স্বচ্ছ ধারণা পেতেন। বিকেল চারটায় তিনি হাঁটতেন গণভবন প্রাঙ্গণে। লেকের ধারে যে ঘাট ছিল সেখানে বড় কালো চেয়ারগুলির একটিতে বসতেন। এ সময়ে গণভবনের লেকে প্রচুর মাছ ছাড়া হয়েছিল। মাছকে খাবার দেওয়া হত। কখনো কখনো তিনি নিজ হাতে মাছের খাবার ছিটিয়ে দিতেন। সিঁড়ির কাছে মাছের ভিড় জমত।

মাছের খেলা দেখতে বঙ্গবন্ধু খুব আনন্দ পেতেন। বিকেলে এই লেকের ধারেই কোনো কোনো সময়ে মন্ত্রী ও রাজনৈতিক নেতারাও আসতেন। এ সময়টায় যেহেতু বঙ্গবন্ধু অনেকটা রিল্যাক্সড মুডে থাকতেন, সে জন্য অনেক রাজনৈতিক ব্যক্তিই অনির্ধারিতভাবে আসতেন তাঁর সাথে নানা রাষ্ট্রীয় সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য। আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারি জিল্লুর রহমান ও পানিসম্পদ মন্ত্রী আবদুর রব সেরনিয়াবাত মাঝে মাঝে এ সময়ে আসতেন। বঙ্গবন্ধু সাধারণত রাত ৯টা পর্যন্ত গণভবনে থাকতেন। তারপর কোনো পূর্বনির্দিষ্ট সাক্ষাৎপ্রার্থী না থাকলে ব্যক্তিগত বাসস্থানে যেতেন। সে সময়ে প্রতি সোমবার বিটিভিতে একটি বাংলা ছায়াছবি দেখানো হত। তখনও দেশে ভিসিআর আসেনি। সেজন্য সোমবার বাংলা ছায়াছবিটি দর্শকরা আগ্রহভরে দেখতেন। গণভবনের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা যেন ঐ ছবিটি দেখার সুযোগ পায় সেজন্য বঙ্গবন্ধু সোমবার আটটার আগেই বাসায় চলে যেতেন। তিনি প্রধানমন্ত্রী হয়েও একটি ছোট নীল রঙের টয়োটা গাড়ি ব্যবহার করতেন জ্বালানি তেল সাশ্রয়ের জন্য। এই ছোট গাড়িটি বিমানের ট্রান্সপোর্ট পুল থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল।

২। ৮ আগস্ট ১৯৭৫-এর কর্মসূচি ছিল এ রকম:

সকাল ১০.০০ মি. প্রথম ও দ্বিতীয় কর্মকমিশনের চেয়ারম্যানদ্বয়
সকাল ১০.৩০ মি. মাননীয় রেলওয়ে প্রতিমন্ত্রী
সকাল ১১.৩০ মি. মাননীয় বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানিসম্পদ ও বিদ্যুৎ মন্ত্রী

বিকেল ৫.৩০ মি. শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান– আমার যতদূর মনে পড়ে, সেদিন বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান ছিল। তিনি বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রিসভার শেষ বন্দর, নৌ ও জাহাজ চলাচল মন্ত্রী ছিলেন।

দিনের কর্মসূচিতে উল্লেখ না থাকলেও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিবরা আসতেন। তাঁরা একান্ত সচিবদের সাথে টেলিফোনে কথা বলে প্রধানমন্ত্রী/ রাষ্ট্রপতির কর্মব্যস্ততা সম্পর্কে জেনে নেওয়ার পরই কোনো জরুরি নথি নিয়ে আসতেন। ড. সৈয়দ

আবদুস সামাদ ছিলেন উপ-সচিব (নথি)। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় থেকে যে নথিগুলি রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য আসত সেগুলি ড. আবদুস সামাদ রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষর ও নির্দেশের জন্য উপস্থাপন করতেন।

৩। শনিবার, ৯ আগস্ট ১৯৭৫-এর সাক্ষাৎপ্রার্থী ছিলেন :
সকাল ১০.০০ মি. ড. স্যামস্ট্রীট, বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থার স্থানীয় প্রতিনিধি
সকাল ১১.০০ মি. প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী ও সেনাবাহিনী প্রধান
বিকেল ৬.০০ মি. জনাব জিল্লুর রহমান এম.পি, বাকশালের সম্পাদক ও
সন্ধ্যা ৬.১৫ মি. অ্যাটর্নি জেনারেল

৪। সোমবার, ১১ আগস্ট ১৯৭৫-এর সাক্ষাৎপ্রার্থী ছিলেন:
সকাল ১১.০০ মি. জনাব গিয়াস উদ্দিন
বিকেল ৬.৩০ মি. জনাব আযহারুল ইসলাম

৫। মঙ্গলবার, ১২ আগস্ট ১৯৭৫-এর সাক্ষাৎপ্রার্থী খুব কম ছিলেন:
সকাল ১০.০০ মি. মাননীয় অর্থমন্ত্রী
বিকেল ৬.০০ মি. অধ্যাপক এ.এফ.এ হোসেন, কমনওয়েলথ সেক্রেটারিয়েট

৬। বুধবার, ১৩ আগস্ট ১৯৭৫-এ দিনের কর্মসূচি ছিল এ রকম:
সকাল ১১.০০ মি. জনাব এম. আর. সিদ্দিকী, যুক্তরাষ্ট্রে নবনিযুক্ত রাষ্ট্রদূত
বিকেল ৬.০০ মি. জনাব মওদুদ আহমদ, বার এ্যাট-ল'
বিকেল ৬.৩০ মি. জনাব এ এ রব (চাঁদপুর)

৭। বৃহস্পতিবার, ১৪ আগস্ট ১৯৭৫। এ দিনের কর্মসূচিতে দেখা যায় তিনি বেশ ব্যস্ত ছিলেন।
সকাল ৯.৪৫ মি. প্রজাতন্ত্রী কোরিয়ার (দক্ষিণ কোরিয়া) মহামান্য রাষ্ট্রপতি পার্ক চুং হির মাননীয় বিশেষ দূত
সকাল ১০.০০ মি. নৌবাহিনী প্রধান
সকাল ১০.৩০ মি. মাননীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রী
সকাল ১১.০০ মি. মাননীয় প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী ও বিমান বাহিনী প্রধান
সকাল ১১.৩০ মি. জনাব আতাউর রহমান খানের দুই কন্যা
বিকেল ৫.৪৫ মি. মাননীয় উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
বিকেল ৬.০০ মি. মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব

বঙ্গবন্ধু সকাল এগারটায় আমাকে বলেন যে, আতাউর রহমান খান চিকিৎসার জন্য লন্ডন গিয়েছেন। তিনি কেমন আছেন জানার জন্য তাঁর কন্যাদের যেন আসতে বলা হয়। আমি টেলিফোনে জনাব আতাউর রহমান খানের বাসায় যোগাযোগ করি। তাঁর দুই কন্যা বেলা ১১.৩০ মিনিটে রাষ্ট্রপতির কক্ষে প্রবেশ করেন। বঙ্গবন্ধু নিজ কন্যার মতোই তাদের সাথে প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট কথা বলেছিলেন।

এইদিন বিকালে বঙ্গবন্ধু যখন লেকের ধারে বসেছিলেন, যখন মাছের জন্য খাবার ছড়ানো হচ্ছিল সে সময় (প্রায় ৪.৩০ মি.) অনির্ধারিতভাবে এসে উপস্থিত হলেন তথ্য ও বেতার প্রতিমন্ত্রী তাহেরউদ্দিন ঠাকুর। তাঁকে একটি চেয়ারে বসতে বলেন বঙ্গবন্ধু। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। এ সময় বালক রাসেল লেকে সাঁতার শিখছিল। কিছুক্ষণ পর রাসেল ভিজে কাপড়ে এসে দাঁড়াল। তার সাথে ছিলেন সাঁতার প্রশিক্ষক একজন নায়েক সুবাদার। বঙ্গবন্ধু রাসেলকে উদ্দেশ করে বললেন, 'ইনি তোমাকে সাঁতার শেখাচ্ছেন, সেজন্য তাঁকে তোমার কিছু উপহার দেয়া উচিত।' কিছুক্ষণ পর তাহেরউদ্দিন ঠাকুর চলে যান। শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ চৌধুরী ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব মোকাম্মেল হক আসেন। এরপর এসেছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আবদুল মতিন চৌধুরী। পরের দিন বঙ্গবন্ধুর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যাওয়ার কথা। শিক্ষা সচিব বঙ্গবন্ধুকে একটি মানপত্র দেখান। এটি পরের দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা তাঁর সম্মানে পাঠ করবে। কিছুক্ষণ পর পানিসম্পদ মন্ত্রী আব্দুর রব সেরনিয়াবাতও এসেছিলেন। পরের দিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা দেওয়ার সময়ে যে সকল বক্তৃতা হবে সে বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ড. মোজাফফর আহমদ চৌধুরী ও উপাচার্য অধ্যাপক আবদুল মতিন চৌধুরী।

এ সময় রাষ্ট্রপতির অত্যন্ত স্নেহভাজন দু'জন কর্মকর্তা উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে যাচ্ছিলেন। এরা হলেন মনোয়ারুল ইসলাম ও মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন। আর একজন স্নেহভাজন কর্মকর্তা কর্নেল জামিল অন্যত্র বদলি হয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁদের সম্মানে সেদিন রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ের কর্মকর্তারা একটি নৈশভোজের ব্যবস্থা করেছিল। বঙ্গবন্ধু রাত্রি প্রায় আটটা ত্রিশ মিনিটের সময় বাসায় চলে গেলেন। যাওয়ার সময় একান্ত সচিব রেজাউল হায়াৎ ও আমাকে নির্দেশ দিলেন যে, ১৫ আগস্ট সকালে আমরা যেন তাঁর বাসস্থানে সরাসরি যাই। সেখান থেকে তাঁর সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে হবে আমাদের। এ দিন রাতে আমরা গণভবনে রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিগত কর্মকর্তারা অনেক রাত পর্যন্ত নৈশভোজের আনন্দ উপভোগ করেছিলাম। আমরা রাত্রি প্রায় এগারটায় গণভবন ত্যাগ করি। পরে শুনেছি, সেদিন রাতে গণভবনের সামনের লেক অ্যাভিনিউতে অন্ধকারে বসেছিলেন মেজর (পরে লেঃ কর্নেল অবঃ) আবদুর রশিদ। তিনি ভাবছিলেন, কেন এই কর্মকর্তারা গণভবন থেকে বেরুচ্ছে না। আমরা সবাই নিজ নিজ বাসস্থানে যাওয়ার পর কর্নেল (অবঃ) রশিদ নিশ্চিত হয়ে তাঁর দোসরদের জানিয়েছিলেন গণভবনের কর্মকর্তারা বাসায় ফিরেছে।

আমি এ সময়ে সোবহানবাগ মসজিদের উল্টো দিকে



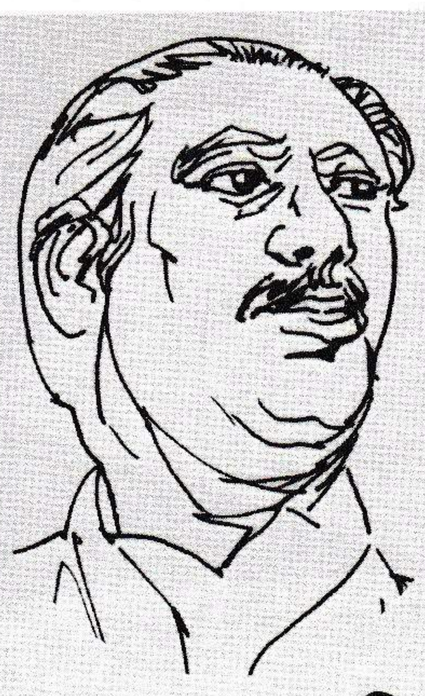
বাড়িতে নিজের কার্যালয়ে নিভৃতে জাতির জনক

সরকারি কোয়ার্টারের একটি ফ্ল্যাটে থাকতাম। ১৫ আগস্ট শুক্রবার সকাল প্রায় পৌনে পাঁচটায় আমার ঘুম ভেঙে যায়। আমার ফ্ল্যাটের বারান্দায় গিয়ে দেখি রাস্তায় (মিরপুর সড়ক) দুটি সাঁজোয়া ট্যাঙ্ক দাঁড়িয়ে আছে মসজিদের সামনে। এ সময়ে আমি একটি টেলিফোন পাই। অপর প্রান্ত থেকে কর্নেল জামিল আমাকে জিজ্ঞেস করেন, মসজিদের সামনে তুমি কি দেখছ? আমি বেশ ভীত হয়ে বলি, 'জামিল ভাই, আমি মসজিদের সামনে ট্যাঙ্ক দেখছি। আমার ভালো মনে হচ্ছে না। আপনি জেনারেল শফিউল্লাহকে বলুন।' (কর্নেল) জামিল ভাই তখনই ফোন রেখে দিলেন। এর পাঁচ মিনিট পর আমি ফরাসউদ্দিনের ফোন পাই। তিনি জানতে চান জামিল ভাই আমাকে ফোন করেছিলেন কিনা এবং কী কথা হয়েছে। টেলিফোনে কথা বলার পর (কর্নেল) জামিল ভাই তাঁর লাল রঙের প্রিন্স গাড়িটি নিজেই চালিয়ে ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু ভবনের দিকে গেছেন। ফোন রাখার পর আমি আবার বারান্দায় গিয়ে দেখি জামিল ভাইয়ের লাল প্রিন্স গাড়িটি সোবহানবাগ মসজিদের সামনে থামিয়েছেন সবুজ বেরেট পরা একজন অফিসার। পরে জানতে পেরেছিলাম এই অফিসারই সেই মেজর নূর...।

লেখাটি 'শেখ মুজিব একটি লাল গোলাপ' বই থেকে সংকলিত

বঙ্গবন্ধুর ৬-দফা: বাঙালির মুক্তিসনদ

মুহম্মদ শফিকুর রহমান



বঙ্গবন্ধুর ৬-দফা যা বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ হিসেবে বিশ্ব-ইতিহাসে স্বীকৃত। সারাজীবনের সংগ্রামের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। তিনি তারুণ্যেই ..... মানুষের মুক্তির স্বপ্ন দেখেন এবং এ লক্ষ্যে মানুষকে ধাপে ধাপে প্রস্তুত করেন।

স্বাধীনতা একটি জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন। সবচে' বড় ঘটনা। তা যদি আসে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে তবে আর দেশের ঘটনায় সীমাবদ্ধ থাকে না, দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে হয়ে ওঠে বিশ্ব-মানুষের ঘটনা, ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। বাঙালি জাতির সেই ইতিহাসের স্রষ্টা টুঙ্গিপাড়ার শেখ মুজিবুর রহমান, আমাদের জাতির জনক, বঙ্গবন্ধু, ইতিহাসের রাখাল রাজা। এ বাংলায় অনেক নেতা, অনেক মনীষীর জন্ম হয়েছে, কিন্তু সেই ব্রিটিশ আমল থেকে শুরু করে পাকিস্তানি শাসক-শোষকদের বিরুদ্ধে তাঁর মতো সাহসী পুরুষ, দূরদর্শী নেতা, অকৃত্রিম দেশপ্রেমিক এ বাংলায় আর কেউ জন্ম নেননি। পাকিস্তানের ২৪ বছরের ১১ বছরই তাঁকে কারাগারে কাটাতে হয়েছে, অন্তত দুইবার ফাঁসির মঞ্চ থেকে ফিরে আসেন। এইভাবে তিনি বাঙালির হাজার বছরের স্বপ্নসাধ নিজস্ব জাতি-রাষ্ট্র এনে দিয়েছিলেন। সেজন্যেই তিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি।

বঙ্গবন্ধুর ৬-দফা, যা বাঙালি জাতির মুক্তিসনদ হিসেবে বিশ্ব-ইতিহাসে স্বীকৃত। সারাজীবনের সংগ্রামের এক গুরুত্বপর্ণ অধ্যায়। তিনি তারুণ্যেই বাংলার মানুষের মুক্তির স্বপ্ন দেখেন এবং এ লক্ষ্যে মানুষকে ধাপে ধাপে প্রস্তুত করেন। মানুষের মধ্যে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার জন্ম দেন। যখন তিনি নিশ্চিত হলেন বাংলার মানুষ স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় প্রস্তুত, ঠিক তখনই ১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি লাহোরে সর্বদলীয় শীর্ষ বৈঠকে তাঁর ঐতিহাসিক ৬-দফা উপস্থাপন করেন এবং অতি অল্প দিনেই তা মানুষের হৃদয়ে মুক্তিসনদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। পাকিস্তানি সামরিক জান্তা-প্রধান ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খাঁ বুঝতে পেরে লাহোর থেকে দেশে ফেরার সাথে সাথে তাঁকে গ্রেফতার করে

৬-দফার ভিত্তিতে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১-দফা। শুরু হয় ঊনসত্তরের ছাত্র-গণঅভ্যুত্থান। ৬-দফা এমন অপ্রতিরোধ্য ছিল যে, আইয়ুব খাঁ ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে বঙ্গবন্ধুসহ নেতৃবৃন্দকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং নিজেও পদত্যাগ করেছিলেন।

কারাগারে নিক্ষেপ করেন। শুরু হয় বেপরোয়া গ্রেফতার। সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদসহ বঙ্গবন্ধুর সহকর্মী প্রায় সব কেন্দ্রীয় নেতাকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে দেওয়া হয় আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, অর্থাৎ রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা– যা ছিল তাঁকে ফাঁসিতে ঝুলাবার গভীর চক্রান্ত। এর প্রতিবাদে ছেষট্টির ৭ই জুন হরতাল ডাকা হয়। রচিত হয় ৬-দফার ভিত্তিতে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১ দফা। শুরু হয় ঊনসত্তরের ছাত্র-গণঅভ্যুত্থান।

৬-দফা এমন অপ্রতিরোধ্য ছিল যে, আইয়ুব খাঁ ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে বঙ্গবন্ধুসহ নেতৃবৃন্দকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং নিজেও পদত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু পদত্যাগ করলেও চক্রান্ত জিইয়ে রাখার জন্য আরেক সামরিক স্বৈরাচার জেনারেল ইয়াহিয়া খাঁর হাতে ক্ষমতা দিয়ে যান। এই বর্বর জেনারেলই একাত্তরে ইতিহাসের জঘন্যতম গণহত্যা, বুদ্ধিজীবী নিধন এবং নারী নির্যাতনের মতো ধর্ম-ন্যায়-মানবতাবিরোধী অপরাধ করে।

কিন্তু ততদিনে ঐতিহাসিক ৬-দফা ও বঙ্গবন্ধুর আপোসহীন নেতৃত্ব বাঙালি জাতিকে এক ইস্পাতকঠিন শপথের বন্ধনে ঐক্যবদ্ধ করে এবং বঙ্গবন্ধু হয়ে ওঠেন জাতির অবিসংবাদিত নেতা। ৬-দফার ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ পাকিস্তান জাতীয় সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ এবং পাকিস্তানের কেন্দ্রে সরকার গঠনের সাংবিধানিক এখতিয়ার অর্জন করে। সত্তরের ৭ই ডিসেম্বরের এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পাকিস্তান জাতীয় সংসদের ৩০০ আসনের মধ্যে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান বা আজকের বাংলাদেশের ১৬২ + মহিলা ৭ = ১৬৯ আসনের মধ্যে ১৬৭ আসন লাভ করে। (পূর্ব পাকিস্তানের ২টি আসন হাতছাড়া হয়। একটি ময়মনসিংহের নুরুল আমিন, অপরটি চাকমা রাজা ত্রিদির রায়– এরা দুজনই শেষদিন পর্যন্ত পাকিস্তানের পক্ষে ছিলেন)। একই সঙ্গে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের ৩০০ আসনের মধ্যে ২৮৮ আসনে জয় লাভ করে (কয়েকটি আসনে দক্ষিণ বাংলায় জলোচ্ছ্বাসের ক্ষয়ক্ষতির কারণে মনোনয়ন দেওয়া হয়নি)। প্রাদেশিক সরকার গঠনেরও সাংবিধানিক ক্ষমতা অর্জন হয়। কিন্তু জেরারেল ইয়াহিয়া পাকিস্তানের দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টোর সাথে চক্রান্ত করে ক্ষমতা হস্তান্তরে রাজি না হওয়ায় এবং জাতীয় সংসদের অধিবেশন না ডাকায় গোটা বাংলাদেশ প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। এই নির্বাচন হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর ৬-দফা ও ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১ দফার ভিত্তিতে। ক্ষমতা হস্তান্তরে এটাই ছিল পাকিস্তানি সামরিক জান্তার ভয়।

এই পরিস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু একাত্তরের মার্চ মাসব্যাপী বাংলাদেশে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন, যা ছিল নজিরবিহীন। দুনিয়া কাঁপানো। বঙ্গবন্ধুর ধানমণ্ডির ৩২ নম্বর রোডের বাড়ি থেকে যে নির্দেশ আসত বাংলার মানুষ তা-ই পালন করতেন। অসহযোগের মধ্যে ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে (তৎকালীন রেসকোর্স) দশ লক্ষ জনতার এক উত্তাল সমুদ্রে তাঁর কালজয়ী ভাষণটি দেন, যা বিশ্বের দুই তিনটি শ্রেষ্ঠ ভাষণের একটি– কেবল আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকনের 'গেটিসবার্গ অ্যাডরেস'-এর সাথে তুলনীয়। সে ক্ষেত্রেও একটি কথা থেকে যায়, আব্রাহাম লিংকন ভাষণটি দিয়েছিলেন আমেরিকার গৃহযুদ্ধের পর শান্ত

সোনার বাঙলা শ্মশান কেন?

বৈষম্য বিষয়	বাঙলাদেশ	পশ্চিমপাকিস্তান
রাজস্ব খাতে ব্যয়	১৫০০ কোটি টাকা	৫০০০ কোটি টাকা
উন্নয়ন খাতে ব্যয়	৩০০০ কোটি টাকা	৬০০০ কোটি টাকা
বৈদেশিক সাহায্য	শতকরা ২০ ভাগ	শতকরা ৮০ ভাগ
বৈদেশিক দ্রব্য আমদানী	শতকরা ২৫ ভাগ	শতকরা ৭৫ ভাগ
কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরী	শতকরা ১৫ জন	শতকরা ৮৫ জন
সামরিক বিভাগে চাকরী	শতকরা ১০জন	শতকরা ৯০ জন
চাউল মণ প্রতি	৫০ টাকা	২৫ টাকা
আটা মণ প্রতি	৩০ টাকা	১৫ টাকা
সরিষার তৈল সের প্রতি	৫ টাকা	২.৫০ পয়সা
স্বর্ণ প্রতি ভরি	১৭০ টাকা	১৩৫ টাকা

১৯৭০-এ নির্বাচন কাজে ব্যবহারের জন্য ঐতিহাসিক পোস্টারটি তৎকালীন আওয়ামী লীগের প্রচারকর্মী নূরুল ইসলাম তৈরি করলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দ্রুত লক্ষ লক্ষ কপি ছেপে সারা পূর্ব পাকিস্তানে ছড়িয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। পাকিস্তানের সেনা শাসকেরা পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের কীভাবে সর্বক্ষেত্রেই ঠকিয়েছে তার একটা জ্বলন্ত চিত্র ফুটে উঠেছে এই পোস্টারের বিষয়গুলিতে।
পোস্টারটি এঁকেছিলেন শিল্পী হাশেম খান।

পরিবেশে। আর বঙ্গবন্ধু ভাষণ দেওয়ার সময় রেসকোর্সের চারপাশের রাস্তায় তাক-করা গান-ক্যারেজের বহর এবং ওপরে হেভি মেশিনগান তাক-করা আর্মি হেলিকপ্টার ঘুরছিল। এর মধ্যেই বঙ্গবন্ধু কীভাবে গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন করতে হবে, কীভাবে ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তুলে শত্রুকে পরাজিত করতে হবে, অর্থাৎ একটি সশস্ত্র গেরিলা যুদ্ধের সামরিক, রাজনৈতিক, সাংগঠনিক, প্রশাসনিক ও অর্থ-ব্যবস্থাপনার দিকনির্দেশনা দেন। ভাষণের পর বাঙালি কবি নির্মলেন্দু গুণ বঙ্গবন্ধুকে মহাকাব্যের কবি অভিহিত করে লিখলেন, "সেই থেকে স্বাধীনতা শব্দটি আমাদের"।

১৯ মিনিটের ১০৯৫ শব্দের এই ভাষণটি বিশ্ববাসীকে অবাক করে দিয়েছিল। সম্পূর্ণ অলিখিত (Extempore) একটি ভাষণ। আর তখনই ৬-দফা, ১১-দফা এক দফায় রূপান্তরিত হল। অর্থাৎ বাঙালি জাতির হাজার বছরের স্বপ্ন-সাধ নিজস্ব জাতিরাষ্ট্র তথা স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি নিরীহ-নিরস্ত্র জাতি এক মুহূর্তে সাহসী সশস্ত্র জাতিতে রূপান্তরিত হল। রাজপথে 'জয় বাংলা'র সাথে যুক্ত হল নতুন নতুন স্লোগান– 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো– বাংলাদেশ স্বাধীন করো', 'জিন্নাহ মিয়ার পাকিস্তান– আজিমপুরের গোরস্থান' (আজিমপুর গোরস্থানের পাশ দিয়ে একটি ছাত্রমিছিল থেকে স্লোগানটি ওঠে)।

২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে (অর্থাৎ ২৫ মার্চ দিবাগত মধ্যরাতের পরে) ইয়াহিয়ার সামরিক জান্তা রাতের অন্ধকারে গণহত্যা শুরু করে এবং বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে। তার আগেই বঙ্গবন্ধু তৎকালীন ইপিআর-এর ওয়্যারলেসের মাধ্যমে স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিলে (যা আগেই তৈরি করা ছিল) জাতি মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লাখ শহীদ ও পৌনে ৩ লাখ নির্যাতিত মা-বোনের সম্ভ্রম ও আত্মবলিদানের বিনিময়ে দেশ শত্রুমুক্ত হয়। আমরা নিজস্ব স্বাধীন জাতিরাষ্ট্র পেলাম।

বঙ্গবন্ধুর ৬-দফার মূল কথা

এক. শাসনতান্ত্রিক কাঠামো ও রাষ্ট্রপ্রকৃতি

দেশের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো এমন হতে হবে যাতে পাকিস্তান হবে একটি ফেডারেশনভিত্তিক রাষ্ট্রসংঘ, যার ভিত্তি হবে লাহোর প্রস্তাব (লাহোর প্রস্তাবটি দিয়েছিলেন শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক ১৯৪০ সালে এবং তাতেও ফেডারেশনের কথা ছিল, যা তৎকালীন পাকিস্তানি নেতাদের পছন্দ হয়নি)। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা ও এখতিয়ার আর সীমাহীন থাকবে না, সামরিক জান্তার ক্ষমতা দখলের রাজনীতিও শেষ হয়ে যাবে। বরং ফেডারেশনের অঙ্গরাষ্ট্র বা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান বা আজকের বাংলাদেশসহ প্রদেশগুলি হবে শক্তিশালী।

দুই. কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা

কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা কেবল দেশরক্ষা ও বৈদেশিক নীতিতে সীমাবদ্ধ থাকবে। আর সব থাকবে প্রদেশ অথবা অঙ্গরাষ্ট্রগুলির হাতে।

তিন. মুদ্রা বা অর্থ সম্বন্ধীয় ক্ষমতা

(ক) সমগ্র দেশের জন্যে দুটি পৃথক অথচ অবাধে বিনিময়যোগ্য মুদ্রা চালু থাকবে। অথবা (খ) কেবল একটি মুদ্রা চালু থাকলেও শাসনতন্ত্রে এমন ব্যবস্থা থাকবে যাতে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে মূলধন পাচারের পথ রুদ্ধ হয়। পূর্ব পাকিস্তানের জন্য অর্থবিষয়ক নীতি প্রবর্তন এবং ব্যাংকিং রিজার্ভেরও পত্তন করতে হবে।

চার. রাজস্ব কর বা শুল্ক সম্বন্ধীয় ক্ষমতা

অঙ্গরাষ্ট্রগুলির কর বা শুল্ক ধার্য করার ব্যাপারে সার্বভৌম ক্ষমতা থাকবে। কেন্দ্রীয় সরকারের কোনোরূপ কর ধার্য করার ক্ষমতা থাকবে না। তবে অঙ্গরাষ্ট্রগুলি আদায়কৃত রাজস্বের একটি অংশ কেন্দ্রীয় সরকারকে দেবে।

পাঁচ. বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ক ক্ষমতা

ক. অঙ্গরাষ্ট্রগুলোর বহির্বাণিজ্যের পৃথক হিসেব রাখতে হবে।

খ. বহির্বাণিজ্যের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা অঙ্গরাষ্ট্রের এখতিয়ারে থাকবে।

গ. কেন্দ্রের জন্যে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা অঙ্গরাষ্ট্রগুলো সর্বসম্মত হারে মেটাবে।

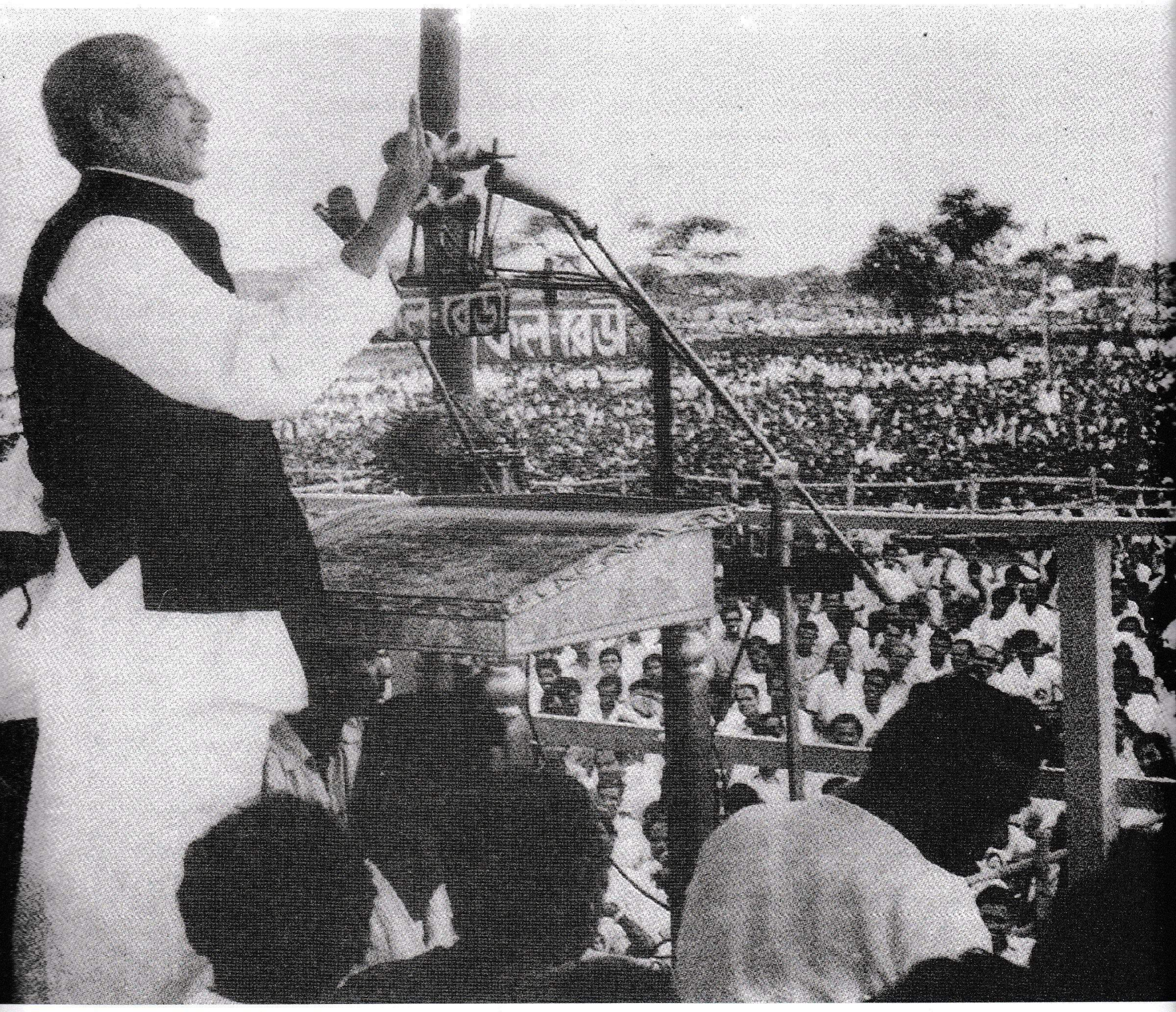
ঘ. অঙ্গরাষ্ট্রগুলোর মধ্যে দেশজ পণ্য চলাচলে শুল্ক বা কর জাতীয় কোনো বাধা-নিষেধ থাকবে না।

ঙ. শাসনতন্ত্রে অঙ্গরাষ্ট্রগুলিকে নিজ নিজ বাণিজ্যিক প্রতিনিধি প্রেরণ এবং স্ব স্ব স্বার্থে বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদনের ক্ষমতা দিতে হবে।

ছয়. আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠনের ক্ষমতা

আঞ্চলিক সংহতি ও শাসনতন্ত্র রক্ষার জন্যে শাসনতন্ত্রে অঙ্গরাষ্ট্রগুলিকে তার নিজস্ব আধা-সামরিক বা আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠন ও রাখার ক্ষমতা দিতে হবে।

এই ৬-দফা'র চার ও ছয়– এই দুই দফা আলোচনা করলে যে ব্যাপারটি সামনে আসবে তা হল, কর ধার্য ও আদায় করার ক্ষমতা এবং আধা-সামরিক বা আঞ্চলিক সেনাবাহিনী রাখা– (demonstration) এবং ২৬ মার্চ আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়ে



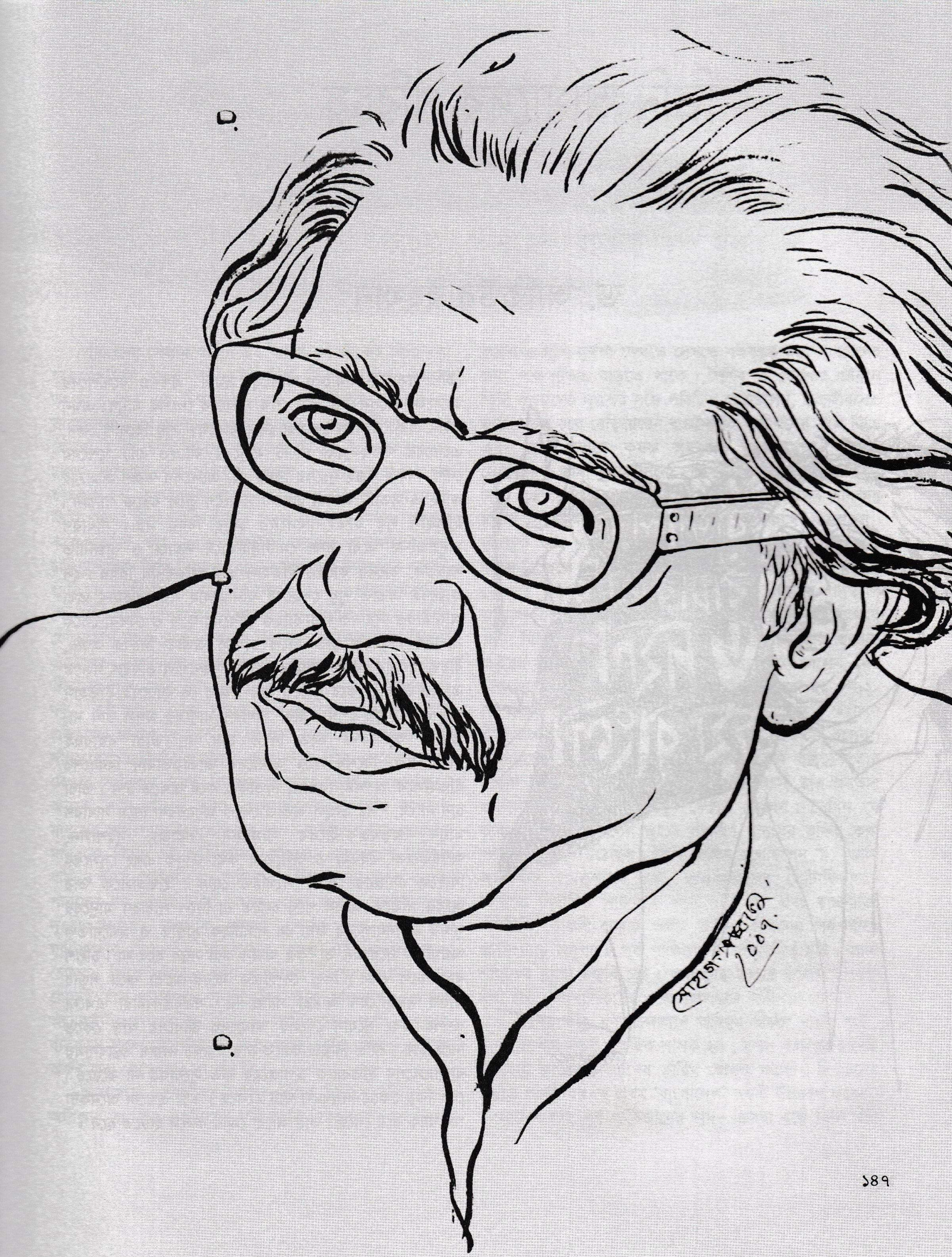
৭ জুন ১৯৬৯: রমনার রেসকোর্স ময়দানে ৬-দফা'র ব্যাখ্যা করেন বঙ্গবন্ধু

জাতিকে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে নিয়ে যান। ৬-দফা হয়ে ওঠে বাঙালির মুক্তিসনদ বা magna-carta.

আমাদের স্বাধীনতা কারো দয়ার দান নয়। অনেক দাম দিয়ে কিনতে হয়েছে। যেমন আমাদের প্রধান কবি (প্রয়াত) শামসুর রাহমান লেখেন :

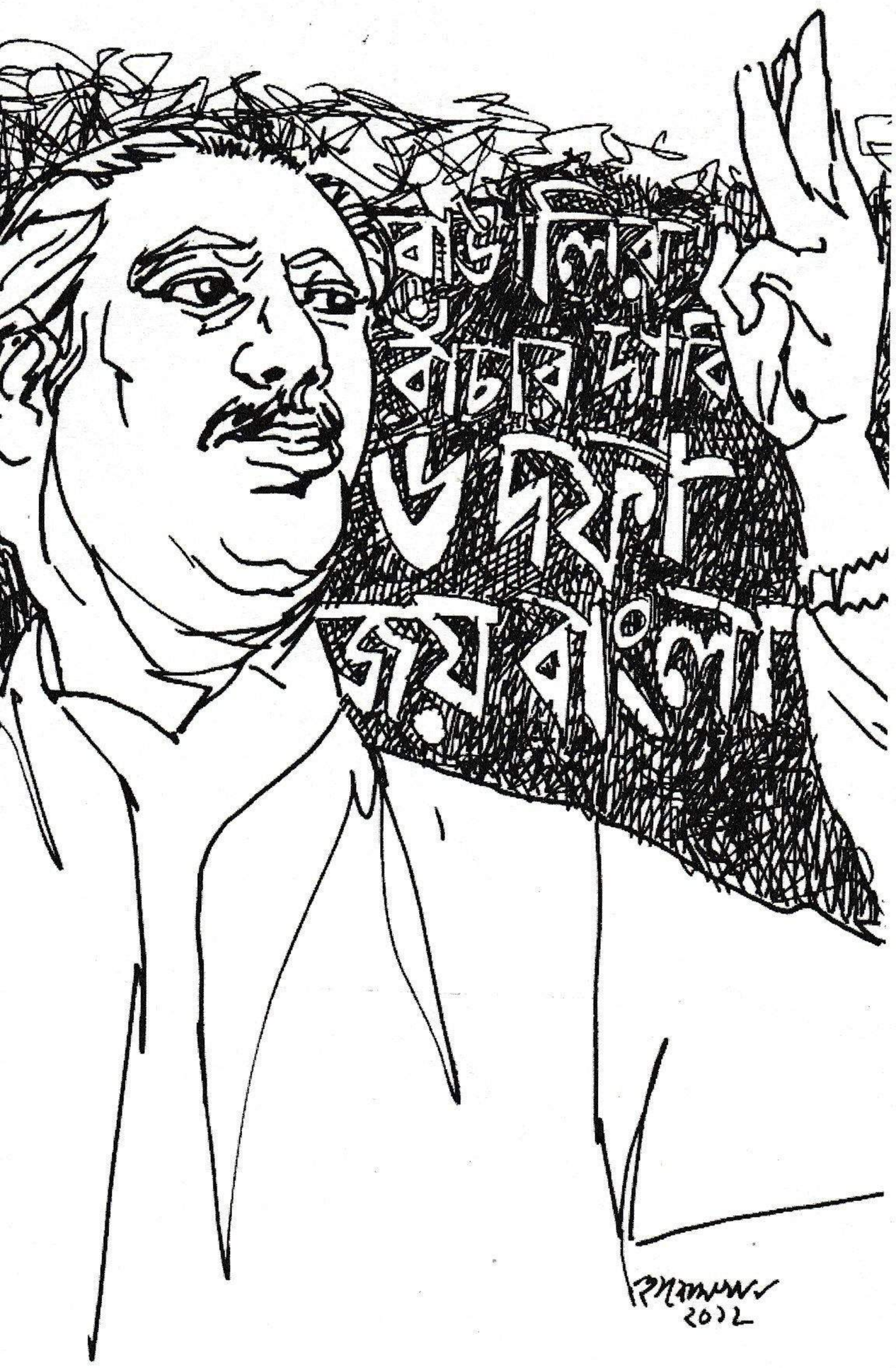
" তুমি আসবে বলে, হে স্বাধীনতা,
সখিনা বিবির কপাল ভাঙলো,
সিঁথির সিঁদুর মুছে গেল হরিদাসীর।
তুমি আসবে বলে, হে স্বাধীনতা,
শহরের বুকে জলপাই রঙের ট্যাংক এলো
দানবের মত চিৎকার করতে করতে ..... "

(তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা)



তিনি আমাদের পরিচয়

ড. আতিউর রহমান



তিনি আসলেই আমাদের অস্তিত্বের সমান। এখনও বিদেশিদের অনেকেই বলেন, 'ও তুমি শেখ মুজিবের দেশের মানুষ! এমন মহান এক নেতাকে তোমরা কেন মারলে?' শুধু বিদেশি কেন, এদেশের গরিব-দুঃখী কোটি মানুষের কাছেও এটি 'শেখের দেশ'। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, এদেশের তরুণ প্রজন্মের কাছে এ সত্যটি আমরা এখনো সর্বাংশে তুলে ধরতে পারিনি। ইতিহাস শুধু ইতিহাসবিদদের চর্চার বিষয় নয়। সাধারণ মানুষজনের মধ্যে যারা মোটামুটিভাবে সমাজ ও রাজনীতি সচেতন, তাদের কাছেও ইতিহাস এক আকর্ষণীয় বিষয়। সে কারণেই অতীত শুধু পেছনের ঘটনাপ্রবাহ নয়, বর্তমান তথা আগামীরও নিয়ামক। প্রাত্যহিক জীবনের দুঃখ ও বেদনা থেকে সাধারণ মানুষকে মুক্তি দিতে চাইলে অতীত দিনের অর্জন, বীরত্ব, গৌরব থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে সৃজনশীল ভবিষ্যৎ গড়তে তাদের উৎসাহী করে তুলতে হবে। আর সে কারণেই ইতিহাস চর্চা এতটা গুরুত্বপূর্ণ। যাঁরা সাধারণ মানুষের মঙ্গল চান না, তাদের আশাবাদী হতে দিতে চান না, তাঁরা বরাবরই ইতিহাসকে, বিশেষ করে আমাদের জাতীয়তাবাদ বিকাশের ইতিহাসকে অস্পষ্ট, বিভ্রান্ত, বিতর্কিত করে রাখতে চান। তাঁরা চান না যে, স্পষ্ট উজ্জ্বল অতীত থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে সাধারণ মানুষ, ষড়যন্ত্রকারীদের সীমাহীন নৈরাজ্য, দুঃশাসন, অনৈতিকতা, বৈষম্য ও অসত্যের কথা জানুক এবং সেসবের বিরুদ্ধে সোচ্চার হোক, সংগঠিত হোক। ইতিহাসকে তার আপন গতিতে আপন পথে চলতে না দিলে সাধারণ মানুষের সুন্দর জীবনযাপনের জন্য যে সামাজিক সুস্থিতি ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির প্রয়োজন তা কিন্তু অর্জন করা সম্ভব হবে না। চল্লিশ বছর চলে গেল। কিন্তু দেশটাকে মনের মতো করে গড়ার স্বস্তির সময় যেন আমরা পাচ্ছি না। ষড়যন্ত্রকারীরা এখনো তৎপর এবং সুযোগ গেলেই আমাদের জীবনের স্বস্তি কেড়ে নিতে চায়। শান্তি বিঘ্নিত করতে চায়। অথচ দারুণ সম্ভাবনাময় বাংলাদেশের ইতিবাচক রূপান্তরের কত সুযোগই না রয়েছে। বেশ কিছু ক্ষেত্রে দিনবদল ঘটে চলেছে। তবে এখনো অনেকটা পথ বাকি রয়ে গেছে। তাই আরো জোর কদমে হাঁটতে হবে।

এই মহান নেতা কৃষকের কল্যাণের কথা এক দণ্ডের জন্যেও ভোলেননি। প্রশাসক হিসেবেও সর্বক্ষণ তিনি সাধারণের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্যে কাজ করে গেছেন। তাঁর দেওয়া সংবিধান মূলত সাধারণ মানুষের স্বার্থের রক্ষাকবচ।

যাঁর জন্য পেলাম স্বাধীন এই বাংলাদেশ তাঁকেই কিনা বলা হয়েছে তিনি কেউ নন। ইতহাসে বিকৃতকারীরা এখনো তৎপর। কেন এই মিথ্যাচার! কেন এই দীনতা ? তিনি যে সাধারণের উর্ধ্বে অসাধারণ এক ব্যক্তিত্ব। এটা অস্বীকার করার কোনো উপায় আছে কি যে, আমাদের জাতীয় ইতিহাসের অমর চালক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ? নিঃসন্দেহে এ কে ফজলুল হক, সোহরাওয়ার্দী, ভাসানীর মতো মহান নেতাদের তিনি যোগ্য উত্তরসূরি। তাঁদের সবার অর্জনের নির্যাস আত্মস্থ করে তিনিই হয়ে ওঠেন বাঙালি জাতির অভ্যুদয়ের মূল চালিকাশক্তি। তিনি নিজেও বেড়ে ওঠেন আর উদীয়মান বাঙালি জাতিকে স্বমহিমায় জাগিয়ে তোলেন। এমন একটা সময় ছিল যে, তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রাখলেই সব বাঙালি সমাজের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা যেত। কেননা তাঁর সব ভাবনার মূলে ছিলেন এদেশের উপেক্ষিত, অপমানিত, বঞ্চিত সাধারণ মানুষ। জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি ছিলেন এসব সাধারণের বন্ধু। এই মহান নেতা কৃষকের ও শ্রমিকের কল্যাণের কথা একদণ্ডের জন্যও ভোলেননি। প্রশাসক হিসেবেও সর্বক্ষণ তিনি সাধারণের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য কাজ করে গেছেন। তাঁর দেওয়া সংবিধান মূলত সাধারণ মানুষের স্বার্থের রক্ষাকবচ। অনেক কাটা-ছেঁড়ার পরও বাংলাদেশের সংবিধান সাধারণ মানুষের আর্থ-সামাজিক অধিকার রক্ষায় অঙ্গীকারাবদ্ধ। সাধারণ মানুষকে তিনি ওই সংবিধানের মাধ্যমে প্রজাতন্ত্রের মালিক বানিয়ে দিয়ে গেছেন। সে মালিকানা তাঁরা কতটা ভোগ করতে পারছেন সে বিষয়ে নানা সংশয় থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশের দুঃখী মানুষের নাগরিক চেতনা এখনও বেশ প্রখর ওই মালিকানার জোরেই। মুক্তিযুদ্ধের ফসল এই দলিলের মূল চেতনায় ফিরে যাওয়ার জন্য আমাদের নিরন্তর সংগ্রাম করে যেতেই হবে। সর্বশেষ সংশোধনীর ফলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা অনেকটাই পুনঃস্থাপিত হয়েছে সংবিধানে। তবে সময়ের ব্যবধানে সকল আবর্জনা দূর করা সম্ভব হয়নি। তবুও যতটুকু অর্জন করা গেছে তাও বা কম কি?

জনগণকে প্রজাতন্ত্রের মালিক করার এই যে রাজনৈতিক অঙ্গীকার তা কিন্তু একদিনেই সৃষ্টি হয়নি। চারপাশের জনগণের বঞ্চনা ও দুঃখ-দুর্দশা দেখতে দেখতে বঙ্গবন্ধুর মনে সাধারণের জন্য পক্ষপাতিত্ব বাড়তে থাকে। শৈশব ও কৈশোর জীবনে তিনি কৃষকদের দুঃখের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন, ছাত্রজীবনেও সারা বাংলা চষে বেড়িয়েছেন রাজনৈতিক সতীর্থদের সঙ্গে নিয়ে এবং সেই সুবাদে কৃষক সমাজের দুঃখ-দুর্দশা স্বচোখে দেখেছেন। ভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয়-চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের অধিকার রক্ষার সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং জেলে গিয়েছেন। যুক্তফ্রন্ট গঠন এবং বাঙালির স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তি তৈরি করার কাজে নিজেকে উজাড় করে দেন। সাংগঠনিক কাজে মনোযোগ দেওয়ার কারণে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা থেকে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন। এর পরের ইতিহাস সবারই জানা। বাঙালির স্বার্থরক্ষার জন্যে তিনি কীভাবে পাকিস্তানের গণপরিষদে সোচ্চার ছিলেন, আইয়ুব খানের সামরিক আইনের আওতায় জেলে গেলেন, বের হয়ে এলেও তাঁর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করা হয়। '৬২-তে আবার জেলে গেলেন। '৬৬ সালে ৬-দফা ঘোষণা করলেন এবং একই বছর আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেফতার হলেন। ঊনসত্তরের উত্তাল গণআন্দোলনের মুখে তিনি রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা থেকে মুক্তি পেলেন এবং ২৩ ফেব্রুয়ারি ছাত্র-জনতার ভালোবাসার উপহার 'বঙ্গবন্ধু' খেতাব পেলেন। সেদিন যে ভাষণ তিনি দিয়েছিলেন তাতে সাধারণ মানুষের মুক্তির কথা স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছিল। তিনি সেদিন বলেছিলেন "... আমি আঞ্চলিক স্বায়ত্ত্বশাসন চাই, প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত সার্বভৌম পার্লামেন্ট চাই এবং রাজনীতি, অর্থনীতি, চাকরি-বাকরি অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় জীবনের সর্বপর্যায়ে জনসংখ্যার অনুপাতে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব চাই। আমি শ্রমিকের ন্যায্য মজুরি চাই। কৃষকদের উৎপন্ন দ্রব্যের উপযুক্ত মূল্য চাই। সাংবাদিকদের ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা চাই।"

এরপর তীব্র গণআন্দোলনে আইয়ুব খানের পতন ঘটে। ইয়াহিয়া খান নতুন সামরিক শাসক হন। মূলত বঙ্গবন্ধুর চাপেই ইয়াহিয়া জাতীয় নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেন। নির্বাচনের প্রস্তুতি পর্বেই বঙ্গবন্ধু প্রথম 'বাংলাদেশ' শব্দটি উচ্চারণ করেন। বাংলাদেশ হবে পূর্ব পাকিস্তানের নাম– একথা বলে তিনি তাঁর

আমাদের একান্ত প্রচেষ্টা হওয়া উচিত কী করে আমাদের উন্নয়ন-ভাবনা সাধারণের মঙ্গলাশ্রয়ী করা যায়। কী করে আমাদের সমাজ ও অর্থনীতিতে চলমান বৈষম্যের ধারাকে পাল্টানো যায়।

মনের গহীনে রেখে দেওয়া বাংলা মায়ের প্রতি ভালোবাসার এক অনন্য প্রকাশ ঘটান। এর পরের ঘটনাপ্রবাহ দ্রুতই বাংলাদেশ নামের একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশের অভ্যুদয়ের দিকে ধাবিত হতে থাকে। একাত্তরের মতো শ্রেষ্ঠ সময়ের পরিপ্রেক্ষিত তৈরির ক্ষেত্রে তাঁর অবদান যে কেউ ইচ্ছে করলেই আমাদের ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে ফেলতে পারবে না।

ইতিহাসের পর্যবেক্ষকদের এ কথাটিও মনে রাখা চাই যে, স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতিটি পর্বে বঙ্গবন্ধুর ছিল একচ্ছত্র রাজনৈতিক ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব। কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী এবং পরবর্তী সময়ে রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবের পক্ষে একইভাবে তাঁর ক্ষমতা প্রয়োগ সহজ ছিল না। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী তরুণদের আকাশচুম্বী প্রত্যাশা, দেশের অর্থনীতির ওপর তেল সঙ্কটের চাপ, ভগ্ন অবকাঠামো, পাকিস্তান-ফেরত সামরিক বাহিনী ও মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেওয়া সৈনিকদের দ্বন্দ্ব, সচিবালয়েও অনুরূপ দ্বন্দ্ব, স্বাধীনতাবিরোধী রাজনীতিকদের ষড়যন্ত্র, দলের ভেতরে মুশতাক গংদের ষড়যন্ত্র, তাজউদ্দীনকে তাঁর হাতের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্র রোধ না করতে পারা, খাদ্য সঙ্কট, চরমপন্থীদের বাড়াবাড়িসহ নানা সঙ্কট দেশটির উষালগ্নেই বঙ্গবন্ধুর দেশগড়ার উদ্যমকে ব্যাহত করতে থাকে। তা সত্ত্বেও স্বল্পতম সময়ে দেশের অবকাঠামো ঠিকঠাক করা, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলাদেশের স্বীকৃতি আদায়, মিত্রবাহিনীর সৈন্যদের স্বদেশে ফেরত পাঠানোসহ নানা সাফল্য তাঁর স্বল্পকালীন প্রশাসনিক জীবনকে মহিমান্বিত করেছিল। কিন্তু নিজের নিরাপত্তা প্রশ্নে বরাবরই উদাসীন, নিজের জীবন ছাড়া আর সবকিছুকেই মহামূল্যবান মনে করা, দেশবাসীর প্রতি ভালোবাসায় অন্ধ, রাতদিন পরিশ্রমে ক্লান্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্ট কালো রাতে হঠাৎ করেই শত্রুর আক্রমণে শহীদ হলেন। একই সঙ্গে কক্ষচ্যুত হল মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ। এরপর শুরু হল ইতিহাসের উল্টোপথে চলা। আজও সেই কালো রাত যেন শেষ হতে চায় না। তবে এতদিনে সেই ছোপ ছোপ অন্ধকার ভেদ করে উজ্জ্বল আলো ফুটে উঠতে শুরু করেছে। যে মানুষটি এক মুহূর্তের জন্যেও নিজের কথা ভাবেননি, সর্বক্ষণ ভেবেছেন বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থের বিষয়– সেই অবিসংবাদিত নেতা, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এখন নাগরিক জীবনের কোলাহল, স্বেচ্ছাচারিতা, স্বার্থের কামড়াকামড়ি থেকে অনেক দূরে ছায়াঘেরা শান্ত-শীতল গ্রামীণ এক পরিবেশে টুঙ্গিপাড়ায় শায়িত। যাদের জন্য আজীবন সংগ্রাম করেছেন তাঁরাই তাঁকে সাধারণের বেশে পরম আদরে শুইয়ে রেখেছেন। সর্বক্ষণ তাঁরাই তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন।

তাই শুধু মুখে স্তুতিবাক্য নয়, অযথা বড় কথা নয়, আজ আমাদের একান্ত প্রচেষ্টা হওয়া উচিত কী করে আমাদের নীতিতে ও কর্মে তাঁর আজীবনের স্বপ্ন সাধারণের কল্যাণ-ভাবনায় যুক্ত করা যায়। কী করে আমাদের উন্নয়ন-ভাবনা সাধারণের মঙ্গলাশ্রয়ী করা যায়। কী করে আমাদের সমাজ ও অর্থনীতিতে উন্নয়নের ধারাকে বেগবান করা যায়। সেজন্য আমাদের অবশ্য ফিরে যেতে হবে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলোতে। অনুসন্ধান করে দেখতে হবে তিনি তাঁর ভাষণে সর্বক্ষণ কাদের কথা বেশি বেশি বলতেন। খুঁজে বের করতে হবে প্রশাসনিক সিদ্ধান্তগুলো দেওয়ার সময় তিনি কী ধরনের 'মন্তব্য' করতেন। সোনার বাংলা শ্মাশান কেন? এ প্রশ্নটি তিনি অন্তরের গভীরতম পর্যায় থেকে তুলে এনেছিলেন। তাই আজকে বহুকাল পরে ইতিহাসের সোজা পথের দিনে আমাদের অনুসরণ করতে হবে তাঁরই দেওয়া উন্নয়ন নীতিমালার মূল স্পিরিটকে। সামনে আমাদের এখনো অনেক পথ পেরুতে হবে। এখন তাঁরই নির্দেশিত সাংবিধানিক অঙ্গীকার-নির্ভর জনকল্যাণময়ী, কৃষক ও শ্রমিক মঙ্গলাশ্রয়ী উন্নয়নের পথে আমাদের ফিরে আসার নিরন্তর চেষ্টা করতে হবে। মুষ্টিমেয় মানুষের কল্যাণের ঘোর বিরোধী ছিলেন বঙ্গবন্ধু। তাই আজ আমরা যদি সত্যি সত্যি তাঁর আদর্শের রূপায়ণ চাই, তাহলে আমাদের স্বতন্ত্র স্বদেশচিন্তায় উদ্ভাসিত গণমুখী উন্নয়ন কৌশল অবলম্বন করতেই হবে। বিদেশি সাহায্যদাতাদের বেড়াজাল থেকে আমাদের নীতি নির্ধারকগণ অনেকটাই বেরিয়ে আসতে পেরেছেন। এদেশে পরিশ্রমী মানুষদের নিয়ে তাঁরা নানা প্রকার সম্ভাবনাময় সৃজনশীল উদ্যোগ গ্রহণ করে অপরিণামদর্শী দুর্নীতিপ্রিয় নীতি-নির্ধারকদের সমুচিত জবাব দিয়ে চলেছেন। সকল অমানিশা দূর করে স্বদেশি উন্নয়ন ধারায় বাংলাদেশকে এগিয়ে নিতে বঙ্গবন্ধুর গণহিতৈষী চেতনা যে বাঙালি জাতির সারাজীবনের সঙ্গী তা নিশ্চয় করে বলা যায়। তাঁর সেই ভাবনার আলোকেই তৈরি হয়েছে ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং সুদূরপ্রসারী (পারস্পেক্টিভ) পরিকল্পনা। এসব পরিকল্পনাকে এখন যথাযথভাবে রূপায়ণই এই সময়ের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। সকলে মিলেই আমাদের এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে। জয় হোক বঙ্গবন্ধুর। চিরজীবী হোক তাঁর প্রিয় বাংলাদেশ।

কবিতার সেই খোকা

শফিউল আলম

রবীন্দ্রনাথের 'বীরপুরুষ' কবিতার সেই খোকাটির কথা আমাদের অনেকেরই জানা আছে।

মা যাচ্ছে তেপান্তরের মাঠ দিয়ে। এমন সময় পথে পড়ল ভয়ানক ডাকাতের দল।

হাতে তাদের লাঠি, বল্লম, অস্ত্রশস্ত্র, মাথায় ঝাঁকড়া চুল
মায়ের সঙ্গে ছিল ছোট্ট খোকা।
সে বলল, 'ভয়, কেন মা করো।'
খোকা এগিয়ে এল বুক ফুলিয়ে।
ডাকাতদের বলল–
'দাঁড়া খবরদার!
এক পা কাছে আসিস যদি আর–
এই চেয়ে দেখ আমার তলোয়ার,
টুকরো করে দেব তোদের সেরে
শুনে তারা লম্ফ দিয়ে ওঠে

চেঁচিয়ে উঠল, হা রে,রে রে রে রে।'
মা উদ্বিগ্ন হয়ে বলে উঠলেন–
যাসনে 'খোকা ওরে'

খোকা কারো কথা শোনে না। খোকা কী করল?
'ছুটিয়ে ঘোড়া গেলাম তাদের মাঝে,
ঢাল তলোয়ার ঝনঝনিয়ে বাজে,
কী ভয়ানক লড়াই হল মা যে,
শুনে তোমার গায়ে দেবে কাঁটা।
কত লোক যে পালিয়ে গেল ভয়ে,
কত লোকের মাথা পড়ল কাটা।'

প্রচণ্ড লড়াইয়ে অনেকে ভেবেছিল খোকা বুঝি আর নেই। কিন্তু যুদ্ধ শেষে খোকা বীরদর্পে ফিরে এল।

মা বললেন, 'ভাগ্যি খোকা সঙ্গে ছিল।'

পাড়াপড়শি গ্রামগঞ্জের লোক সবাই অবাক হল। খোকার এত সাহস! সবাই একবাক্যে বলল– 'ভাগ্যি খোকা ছিল মায়ের সঙ্গে।'

এ তো গেল কাব্যের খোকা। কবিতার খোকা। তেমনি ছিল গ্রামবাংলার এক আদুরে খোকা। ভালোবাসার খোকা। খোকাটি মধুমতীর পাড় বেয়ে হাঁটে, নদীতে ঝাঁপ দিয়ে সাঁতার কাটে। মাছ ধরে। গাছে চড়ে। পাখি দেখে। মাঠের সবুজ ধানের ক্ষেত দেখে তাঁর চোখ জুড়ায়। ফুটবল খেলে। নামকরা খেলোয়াড়। খেলতে যায় অন্য গাঁয়েও। ছিপছিপে লম্বা, দোহারা গড়ন, শ্যামল গায়ের রং। চোখ দুটি বড় বড়। মনটা খুব নরম। ফুটবল খেলতে গিয়ে যে পয়সা পায়, তা ফেরার পথে বিলিয়ে দেয়। কখনো গরিব-দুঃখীকে। কখনো গরিব সহপাঠীকে। শীতে গায়ের চাদর খুলে দেয়। কখনো খুলে দেয় গায়ের জামা। সেই ছেলেবেলাতেই একবার দুর্ভিক্ষের ছায়া পড়ল গ্রামে। খোকা কাউকে না বলে ধানের গোলা থেকে ধামাভর্তি ধান বিলিয়ে দিল গ্রামের না-খাওয়া গরিব মানুষদের।

এই খোকাটির জন্ম আমাদের গ্রামবাংলার ছোট্ট এক গ্রামে। গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায়। ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ। মা-বাবার প্রথম পুত্রসন্তান। তাই এই আদুরে নাম খোকা। এই প্রিয় 'খোকা' নামটি আমাদের গল্প-কবিতা-ছড়ায়ও ছড়িয়ে আছে। যেমন সেই ছড়াটির কথাই বলি:

খোকা ঘুমাল
পাড়া জুড়াল
বর্গি এল দেশে
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে
খাজনা দেব কিসে?

ছড়ার খোকা বর্গির ভয়ে ঘুমিয়ে যায়, কারণ তখন ব্রিটিশদের রাজত্ব। তারা জোর করে খাজনা আদায় করে। ভয় দেখায়। আমাদের এ খোকাটি ভয় পায় না, ভয়ে ঘুমিয়ে থাকে না। দেশের মানুষকে একদিন পাকিস্তানি বর্গির ভয় আর ডাকাতদের হাত থেকে বাঁচিয়ে তোলার জন্য লড়াই করে।

বাঙালি জাতিকে স্বপ্ন দেখায়। বুকে আশা জাগায়। নিজের জীবনকে মরণের পাঁজায় তুলে দেয়। এই খোকা বড় হয়ে যুদ্ধ করে বাংলা ভাষার জন্য। ১৯৫২ সালে। সংগ্রাম করে এদেশের মানুষের মুক্তির জন্য।

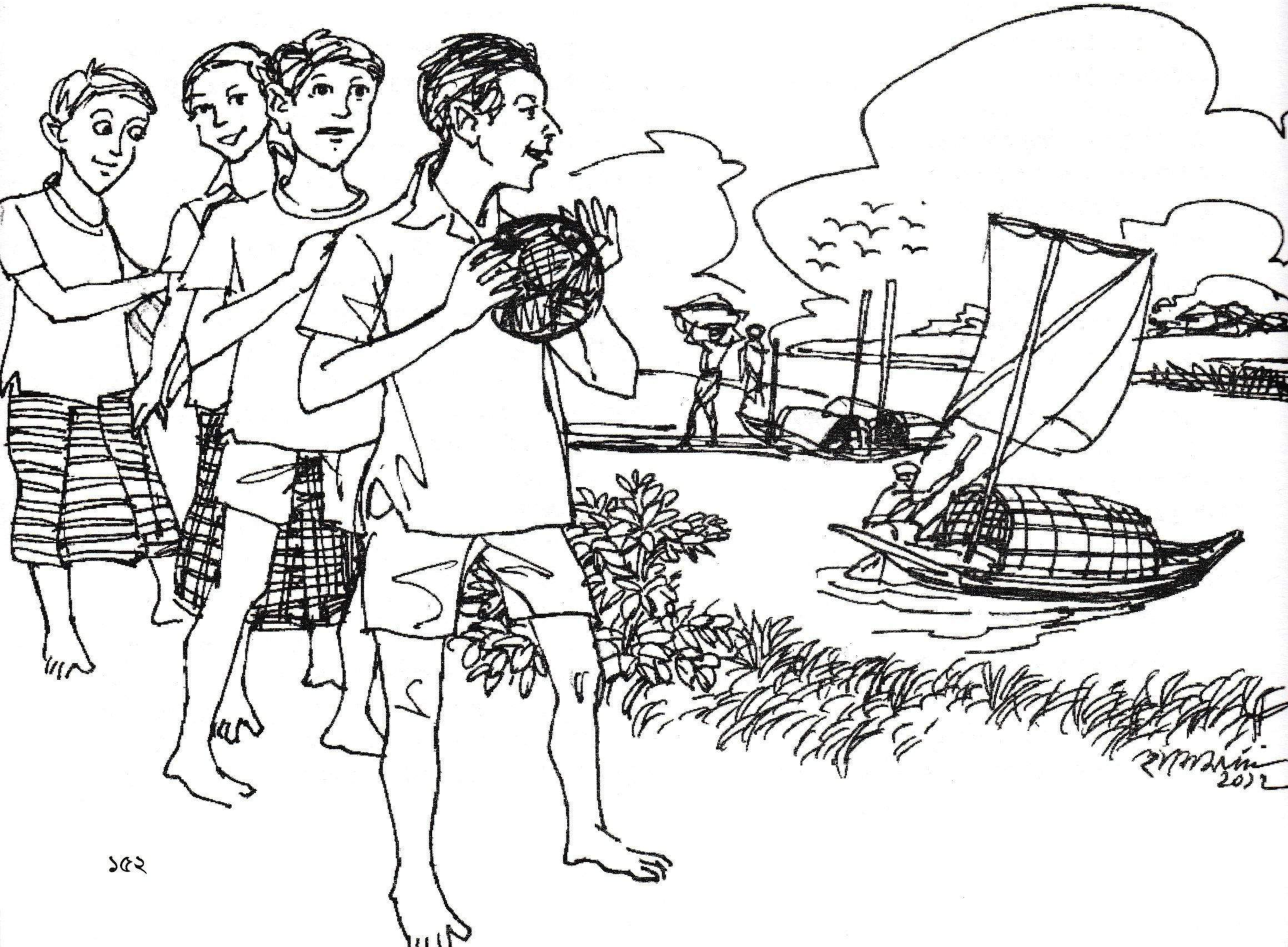
১৯৪৮ থেকে ১৯৭১– দীর্ঘ প্রায় তেইশ বছর ধরে চলে তাঁর যুদ্ধ, তাঁর সংগ্রাম। জীবনের অনেকখানি সময় কেটে যায় জেলে-কারাগারে। ১৯৫২, ১৯৫৮, ১৯৬২, ১৯৬৬, ১৯৬৯, ১৯৭০। অবশেষে ১৯৭১। পাকিস্তানি ডাকাতরা তাঁকে ধরে নিয়ে যায় পাকিস্তানের কারাগারে।

পড়ে থাকে তাঁর দেশ। তিনিই তো ১৯৭১-এর ৭ মার্চ ঘোষণা করেছেন: এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জেলখানায় তাঁর বন্দি সেলের কাছে প্রতিদিন মহড়া চলে কবর খোঁড়ার, কবর খোঁড়ার শব্দ হয়। খোকা তো ভয় পায় না। ন'মাস যুদ্ধের পর, তাঁর নির্দেশমতো তাঁর স্বপ্নের ছবি নিয়ে লড়াই করে বাঙালিরা ছিনিয়ে আনে বাংলার স্বাধীনতা। খোকাকে পাকিস্তানি ডাকাতরা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। খোকা ফিরে আসে ১০ জানুয়ারি ১৯৭২। বাংলার মাটিতে মুক্ত স্বদেশে।

আনন্দ আর বেদনার আরেক নতুন কাব্য রচিত হয় সেদিন।

এই খোকাটি কে– তোমাদের আর বুঝতে বাকি নেই। বাবা শেখ লুৎফর রহমান, মা সায়েরা খাতুনের আদরের ছেলে শেখ মুজিবুর রহমান।

খোকাটি তো অনেক আগে থেকেই বাঙালির আপনজন। ১৯৬৯-এ বঙ্গবন্ধু। এবার হলেন জাতির জনক। মধুমতী-পাড়ের গ্রামবাংলার এই ছেলেটি গ্রামের গিমাডাঙ্গা প্রাইমারি স্কুল, গোপালগঞ্জ পাবলিক স্কুল, গোপালগঞ্জ মিশন স্কুল, মাদারীপুর স্কুলে লেখাপড়া করেছে, ম্যাট্রিক পাস করেছে ১৯৪২-এ ২২ বছর বয়সে গ্রামের স্কুল থেকেই। তারপর আইএ, বিএ। কলকাতা ইসলামিয়া কলেজ থেকে বি. এ পাস করেন তিনি। তখনই তাঁর দেশজোড়ে নাম। যুবনেতা। স্কুলে অষ্টম শ্রেণিতে পড়তেই জেলে গিয়ে সবার চোখে পড়েন। এ সময় তাঁকে পছন্দ করেন অনেক বড় নেতা হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী। তারপর শেরে বাংলা, ভাসানী সবাই ভালোবাসেন। তাঁকে কাছে টেনে নেন তাঁরা।



পাকিস্তানের সংসদে শেখ মুজিব বক্তৃতা দিতেন বাংলায়। তিনি বলতেন, বাংলা ছাড়া আমি কিছু বুঝি না। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বললেন, দেশকে নিরক্ষরতামুক্ত করতে হবে। ..... বাংলা ভাষায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই লিখতে হবে।

১৯৫২-র ভাষা আন্দোলন। মুজিব তখন জেলে। জেলে বসেই সব নির্দেশ দেন। ১৯৫৮-এর সামরিক শাসন। ৬২'র সব আন্দোলন। ছয়দফা। ৬৯-এর গণআন্দোলন। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা। মুজিব তো ছড়িয়ে আছেন সবখানে। বাংলার আলোহাওয়ার মতো সব আন্দোলনের পুরোধা মুজিব সবার আগে, সবার নেতা তিনি।

তোমার আমার ঠিকানা
পদ্মা মেঘনা যমুনা।
তোমার নেতা আমার নেতা
শেখ মুজিব শেখ মুজিব।

শেখ মুজিব মানে বাংলাদেশ। বাংলাদেশ মানে শেখ মুজিব।

দুই

পাকিস্তানের সংসদে শেখ মুজিব বক্তৃতা দিতেন বাংলায়। তিনি বলতেন বাংলা ছাড়া আমি কিছু বুঝি না। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বললেন, দেশকে নিরক্ষরতামুক্ত করতে হবে। তিনি বললেন, বাংলা ভাষায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই লিখতে হবে। পণ্ডিতেরা বললেন, আমাদের বাংলা ভাষায় তো উপযোগী পরিভাষা নেই। বই লিখব কি করে? তিনি বললেন, যা আছে তা দিয়েই লিখতে হবে। বঙ্গবন্ধু জাতিসংঘে গিয়ে ভাষণ দিলেন বাংলায়। রবীন্দ্রনাথের পর বিশ্ববাসীর কাছে বাংলাকে ছড়িয়ে দিলেন তিনিই। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তাঁর মনে হল একটি কথা, শিক্ষা ছাড়া জাতিকে এগিয়ে নেওয়া যাবে না। এজন্য চাই একটা শিক্ষানীতি, স্বাধীন দেশের উপযোগী একটি শিক্ষাব্যবস্থা। ১৯৭২-এর জুনে গঠন করলেন শিক্ষা কমিশন। প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞানী ও কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ কুদরাত-এ-খুদাকে প্রধান করে গঠন করলেন কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন। ১৯৭৪-এর ৩রা মে তাঁরা বঙ্গবন্ধুর কাছে পেশ করলেন শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট। তাঁরা রিপোর্টে লিখলেন– 'প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আগ্রহ, উৎসাহ ও সাহায্য ব্যতিরেকে কমিশনের পক্ষে এ দুরূহ কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হত না। আমরা তাঁর কাছে বিশেষভাবে ঋণী ও কৃতজ্ঞ।'

এ রিপোর্টে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা পরিবর্তনের অনেক যুগান্তকারী নির্দেশনা ও সুপারিশ ছিল। বঙ্গবন্ধুর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর এ সব সুপারিশ আর বাস্তবায়িত হয়নি।

বঙ্গবন্ধু এদেশের শিক্ষার জন্য একটি যুগান্তকারী কাজ করেছিলেন সে বছরই। পাকিস্তান আমলে এদেশের প্রাথমিক শিক্ষা ও শিক্ষকদের ছিল চরম দুরবস্থা। আমাদের দেশের শিক্ষার হার ছিল ২০%-এর নিচে। শিক্ষকরা তাঁদের সামান্য বেতনটুকুও ঠিক সময়ে পেতেন না। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু ঘোষণা দিলেন, এখন থেকে প্রাথমিক শিক্ষকরা সরকারি কোষাগার থেকে বেতন পাবেন। তাঁরা গণ্য হবেন সরকারি শিক্ষক হিসেবে। প্রাথমিক বিদ্যালয় হবে সরকারি। সদ্যস্বাধীন দেশে তখন টাকা-পয়সার টানাটানি। কিন্তু বঙ্গবন্ধু শিক্ষার মূল ভিতের যাঁরা কারিগর তাঁদের বুকের কাছে টেনে নিলেন এভাবে। মেয়েরা যেন লেখাপড়ায় এগিয়ে আসে সে কথাও বললেন তিনি। বঙ্গবন্ধু দেশের চলমান সাধারণ শিক্ষা ছাড়া এদেশের ধর্মপ্রাণ মানুষের কথাও চিন্তা করলেন। এদেশের প্রাচীন মাদরাসা শিক্ষাকে ঢেলে সাজানোর জন্য তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড। তিনি ১৯৫৪ সালে



ড. মুহাম্মদ কুদরাত-এ-খুদাকে প্রধান করে গঠন করলেন কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন। ১৯৭৪-এর ৩ মে তাঁরা বঙ্গবন্ধুর কাছে পেশ করলেন শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট

প্রতিষ্ঠিত স্কুল টেক্সট বুক বোর্ডকে দেশের শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে কোনোরূপ প্রভাবের মধ্যে ফেললেন না। তাদের কাজ করতে বললেন স্বাধীনভাবে।

তিন

টুঙ্গিপাড়ার সেই ছিপছিপে লম্বা মায়াবি চোখের নরম মনের খোকাটি জানতেন বাংলার মানুষকে। তিনি জানতেন বাঙালির মনের খবর, বাঙালির জীবনের খবর। তাদের সুখ-দুঃখের খবর। তিনি চেয়েছিলেন বাঙালিরা শিক্ষা-দীক্ষায় একদিন বড় হবে। লেখাপড়া শিখে নাম করবে। তিনি পুরো স্কুল জীবনটাই কাটিয়েছেন গ্রামে। গ্রামের মানুষের লেখাপড়ার কথা, আবহমান বাংলার মানুষের শিক্ষার কথা তাই তিনি ভেবেছিলেন। তাদের সুখ, আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা ভেবেছিলেন। তিনি ছিলেন সমগ্র বাংলাদেশের এক মানচিত্র। নদী-পাহাড়, সমুদ্র, মাঠ-অরণ্য প্রকৃতির প্রতিকৃতি। কবির কথায়–

তুমি পিতৃবীজ সবুজ মাঠের
তোমার ফসল আজ বাংলাদেশের
তুমি আর বাংলাদেশ একে একাকার
স্বদেশভূমিতে পাই তোমার আকার।

সোনার বাংলার স্বপ্ন

শাহ্‌জাহান কিবরিয়া



বাংলাদেশের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছোটবেলার খবর নিয়ে আমরা জানতে পারি তাঁর জীবনের অনেক চমকপ্রদ ঘটনার কথা। শেখ মুজিবের ডাক নাম ছিল খোকা। চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ার সময় খোকা একদিন বাড়ি ফিরছিলেন। পথে দেখেন শীতের মধ্যে এক বৃদ্ধ খালিগায়ে কাঁপছে আর 'আল্লাহ্ আল্লাহ্' বলে ডাকছে। বৃদ্ধের জন্য খোকার মনে দয়ার সঞ্চার হল। নিজের গায়ের চাদরখানা বৃদ্ধের গায়ে জড়িয়ে দিয়ে বাড়ি ফিরে আসে খোকা।

আরেক দিনের ঘটনা, বৃষ্টির দিনে ছাতা মাথায় দিয়ে বাড়ি ফেরার সময় খোকা দেখে তাঁর এক সহপাঠী বৃষ্টিতে ভিজে বাড়ি ফিরছে। ছাতাটি সহপাঠীকে দিয়ে নিজে ভিজে ভিজে বাড়ি ফেরে।

গোপালগঞ্জের মিশন স্কুলে নবম শ্রেণিতে পড়ার সময় স্কুলের শিক্ষক রসরঞ্জন সেনগুপ্তের বাড়িতে প্রাইভেট পড়ত খোকা। পড়া শেষ করে বাড়ি ফেরার পথে একটি ছেলেকে খালিগায়ে চলতে দেখে খোকা তাঁর গায়ের গেঞ্জি ছেলেটির গায়ে পরিয়ে দিয়ে নিজে শুধু চাদর গায়ে বাড়ি ফেরে।

আরেকটি ঘটনায়ও মুজিবের সংবেদনশীল মনের পরিচয় মেলে। বাবা গোপালগঞ্জ শহরে তাঁর কর্মস্থলে ছিলেন। মুজিব টুঙ্গিপাড়ায় তাঁদের বাড়িতে। সে সময় প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ফসল ভালো না হওয়ায় দেশে দুর্ভিক্ষাবস্থা বিরাজ করছিল। বহু লোক খেতে না পেয়ে কষ্ট পাচ্ছে। মুজিব কাউকে কিছু না বলে দরিদ্র মানুষের মাঝে নিজেদের গোলার ধান বিলিয়ে দেন। বাবা বাড়ি ফিরে এলে মুজিব বাবাকে অকপটে বলেন, অভাবী মানুষের কষ্ট সহ্য করতে না পেরে তিনি তাদের মাঝে ধান বিলিয়ে দিয়েছেন। বাবা ছেলেকে চিনতেন। কিছুই বললেন না।

ছেলেবেলায় খেতে বসে তিনি খোঁজ নিতেন, বাড়ির সবার খাওয়া হয়েছে কিনা। বড় হবার পরও তিনি এ অভ্যাস ছাড়তে

পারেননি। বাড়ির কাউকে ক্ষুধার্ত রেখে তিনি খাবেন, এ কথা ভাবতে পারতেন না।

কিন্তু মানুষের প্রতি শুধু দয়া-দাক্ষিণ্য দেখালেই একজন মানুষ বড় হয় না, সেজন্য তার মধ্যে যুক্ত হতে হয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী চেতনা। প্রতিবাদী চেতনাকে সমুন্নত রাখতে হলে মানুষকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। এই ত্যাগ মানুষকে অনেক বড় করে।

১৯৩৮ সালের ১৬ জানুয়ারি বাংলার প্রধানমন্ত্রী শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক এবং তাঁর বাণিজ্যমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী গোপালগঞ্জ মিশন স্কুল পরির্দশনে গেছেন। ছেলেদের অনেক অভাব-অভিযোগ। হোস্টেলের ছাদ নষ্ট। বৃষ্টি হলে বিছানা, বইপত্র সব ভিজে যায়। অর্থাভাবে স্কুল কর্তৃপক্ষ তা মেরামত করতে পারে না। অথচ স্কুল কর্তৃপক্ষ এসব সংস্কারের জন্য মন্ত্রীকে কোনো অনুরোধ করল না। মুজিব কয়েকজন ছাত্রকে সঙ্গে নিয়ে শেরে বাংলা এবং সোহরাওয়াদীর পথ আগলে তাদের অভিযোগের কথা জানালেন। সে সময় মুজিব সপ্তম শ্রেণির ছাত্র। শেরে বাংলা ও সোহ্‌রাওয়ার্দী মুজিবের সাহসের প্রশংসা করলেন। শেরে বাংলা তাঁর ঐচ্ছিক তহবিল থেকে বার শ' টাকা মঞ্জুর করলেন হোস্টেল মেরামতের জন্য।

শৈশব থেকে মুজিব সকল ধর্মের প্রতি অনুরাগী হন। গৃহশিক্ষক সাখাওয়াতউল্লাহ তাঁকে বিভিন্ন ধর্মের কাহিনী শোনাতেন। সকল ধর্মের মূল বাণী যে এক, তিনি এ কথা বলতেন। সকল ধর্মের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবোধও জাগে তাঁর শৈশবকালে, যা তাঁকে পরবর্তী জীবনে ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতিতে বিশ্বাসী করে তোলে।

আরেকজন গৃহশিক্ষক হামিদ কাজী ছিলেন একজন রাজনীতি-সচেতন ব্যক্তি। তিনি ইংরেজবিরোধী আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন। তাঁর কাছে মুজিব নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের কথা শুনেছেন। এদেশে ইংরেজের আগমন, মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতা, তিতুমীরের বাঁশের কেল্লার যুদ্ধ, ফকির মজনু শাহ্'র বিদ্রোহ, স্বদেশের জন্য কিশোর ক্ষুদিরামের আত্মত্যাগ প্রভৃতি কিশোর মুজিবকে ইংরেজবিরোধী আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

পড়ালেখার পাশাপাশি মুজিব রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গেও জড়িয়ে পড়েন। ১৯৪০ সালে তিনি নিখিল ভারত মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনে যোগদান করেন। ১৯৪২ সালে মুসলিম লীগের ফরিদপুর জেলা প্রতিনিধি হিসেবে তিনি সিরাজগঞ্জে বাংলা প্রাদেশিক সম্মেলনে যোগ দেন। এ বছরই তিনি পাকিস্তান আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়ে পড়েন। ১৯৪৩ সালে মুসলিম লীগের কাউন্সিলর নির্বাচিত হন। ১৯৪৫ সালে শেখ মুজিব ইসলামিয়া কলেজ ছাত্র সংসদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৪৬ সালে তিনি দিল্লিতে মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শাখা কনভেনশনে যোগদান করেন। ১৯৪৭ সালে ইসলামিয়া কলেজ থেকে বি.এ পাশ করেন এবং পাকিস্তান সৃষ্টি হবার পর ঢাকায় চলে আসেন। ১৯৪৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে ভর্তি হন এবং ৪ জানুয়ারি মুসলিম ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠা করেন। ২৩ ফেব্রুয়ারি মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন আইন পরিষদে 'পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মেনে নেবে' ঘোষণা দিলে বঙ্গবন্ধু এর প্রতিবাদে সোচ্চার হন। ২ মার্চ ফজলুল হক মুসলিম হলে অনুষ্ঠিত বৈঠকে বঙ্গবন্ধুর প্রস্তাবক্রমে 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়। সংগ্রাম পরিষদ বাংলা ভাষা নিয়ে মুসলিম লীগের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে ১১ মার্চ সাধারণ ধর্মঘট আহ্বান করে। ১১ মার্চ সচিবালয়ের সামনে বিক্ষোভরত অবস্থায় বঙ্গবন্ধু গ্রেফতার হন।

১৫ মার্চ মুক্তিলাভের পর ১৬ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমতলায় বঙ্গবন্ধুর সভাপতিত্বে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৪৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীরা তাঁদের বিভিন্ন দাবিদাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আন্দোলন শুরু করেন। কর্মচারীদের এ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার অভিযোগে বঙ্গবন্ধুসহ পাঁচজন ছাত্রকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অর্থ জরিমানা করে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে জরিমানা প্রদানে অস্বীকার করায় বঙ্গবন্ধুকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়। অন্যেরা মুচলেকা দিয়ে শাস্তি থেকে রক্ষা পায়। এই আপোসহীন চরিত্র বঙ্গবন্ধুর জীবনের প্রতি ক্ষেত্রেই আমরা দেখতে পাই। ভুখা মিছিলে নেতৃত্ব দেওয়ার অভিযোগে ১৪ অক্টোবর বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়। এমনি করে দেশের প্রতিটি গণতান্ত্রিক আন্দোলন, স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন এবং বিভিন্ন সমাবেশে স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুকে আমরা দেখতে পাই। যে পুলিশের হাতে বঙ্গবন্ধু অনেকবার নির্যাতিত হয়েছিলেন সেই পুলিশের দাবিদাওয়া পূরণের আন্দোলনেও তিনি সক্রিয় ভূমিকা রেখেছিলেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকে তিনি সুপরিকল্পিতভাবে ধাপে ধাপে এগিয়ে নিয়ে ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ রমনা রেসকোর্স (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) ময়দানে ঘোষণা করেছিলেন, "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।" নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও গ্রেফতারের পূর্বক্ষণে ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে গিয়েছিলেন।

বঙ্গবন্ধুর চরিত্রে দু'টি বড় গুণের সমাবেশ ঘটেছিল– একটি হচ্ছে, মানুষের প্রতি ছিল তাঁর গভীর মমত্ববোধ। অপরটি মানুষের দুঃখ-কষ্ট দূর করার জন্য তিনি সব সময় সক্রিয় এবং সোচ্চার ছিলেন। সকল প্রকার অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে উচ্চারিত হত তাঁর প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর। বিদ্যাসাগরের মতো



সাধারণ শ্রমিক ও মজুরদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করছেন বঙ্গবন্ধু

তিনি একদিকে যেমন ছিলেন অতি দয়ালু, আবার কর্তব্য পালনে ছিলেন একরোখা বা আপোসহীন।

১৭ মার্চ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন। ১৯২০ সালের এই দিনে তিনি গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বাংলার প্রকৃতির ন্যায় তিনি কখনো অনুকূল পরিবেশে, কখনো প্রতিকূল পরিবেশে বেড়ে উঠেছিলেন। কোমলতা এবং কঠোরতার সমন্বয় ঘটেছিল তাঁর চরিত্রে। শৈশবে পথের ধারে দরিদ্র বৃদ্ধকে দেখে যে শিশুর একদিন প্রাণ কেঁদেছিল, সেই শিশুই বড় হয়ে বজ্রের মতো কঠোর হতে পেরেছিলেন দেশের স্বাধীনতার জন্য। পাকিস্তানি কারাগারে তাঁর কবর খোড়া হয়েছিল, মৃত্যু আসন্ন জেনেও তিনি দেশের স্বাধীনতার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেননি।

ব্রিটিশ আমলে বঙ্গবন্ধু ভেবেছিলেন, এদেশ থেকে ইংরেজ জাতি বিতাড়িত হলেই বুঝি দেশবাসী শোষণের হাত থেকে মুক্তি পাবে। কিন্তু পাকিস্তান হবার পর তিনি দেখলেন, শোষণের সেই পুরাতন প্রক্রিয়া স্বাধীন পাকিস্তানেও চলছে। এবার ইংরেজের জায়গায় বসেছে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী। দেশের সম্পদ লুণ্ঠিত হয়ে জমা হচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানে। বাংলাদেশের মানুষ কেবল দরিদ্র থেকে আরো দরিদ্র হচ্ছে। বাংলাদেশের মানুষকে শোষণ করা হচ্ছে ইসলাম ধর্মের নামে। এই ধর্ম রক্ষার দোহাই দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী তাদের এদেশীয় দালালদের সহযোগিতায় দেশের ৩০ লাখ লোককে হত্যা করে। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পরও শোষণের এই প্রক্রিয়া ষড়যন্ত্রকারীরা অব্যাহত রাখে। একটি শোষণহীন ও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু যখন সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করেন, তখনই তাঁকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।

বঙ্গবন্ধু ছিলেন মানবতাবাদী শোষণহীন সমাজের আদর্শের প্রতীক। হত্যার মাধ্যমে নশ্বর দেহের ধ্বংস হয়, আদর্শের মৃত্যু নেই। দৈহিক মৃত্যুর পর মহামানবদের প্রবর্তিত ও প্রচারিত আদর্শ অনেক শক্তিশালী ও ব্যাপকতা লাভ করে। যিশুখ্রিস্ট, সক্রেটিস ও মহাত্মা গান্ধীকেও হত্যা করা হয়েছিল। কিন্তু তাঁদের আদর্শ চির-অম্লান। জীবিত বঙ্গবন্ধুর চেয়ে মৃত বঙ্গবন্ধু অনেক বেশি শক্তিশালী। দেশে শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা পেলেই একদিন বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে।

ভিন্ন কিছু অভিজ্ঞতা

রফিকুন নবী



চুয়াত্তর সনের সেপ্টেম্বর মাস। গ্রিসদেশে তখন কেবল হেমন্ত শুরু হয়েছে। সারাদিন গা জুড়ানো দমকা হাওয়া। হঠাৎ ঝাপটা দিয়ে যায়। সকাল-সন্ধ্যা একটু শিরশিরে ঠাণ্ডা গায়ে এসে লাগে। এমনি এক সকালে গিয়ে হাজির হলাম এথেন্সের আর্ট কলেজে। পুরানো আমলের অট্টালিকা। গ্রিক স্থাপত্যের একটি নিদর্শনও বটে। খুব সকাল বলেই হয়তো কিংবা অট্টালিকার বিশালত্বের কারণে, খুবই সুনসান মনে হচ্ছিল। কোনো লোকজনই চোখে পড়ছিল না।

ধাপে ধাপে সিঁড়ি উঠে গেছে খিলানে। তারই এক ধাপে দাঁড়িয়ে হাতের কাগজপত্র ঠিক-ঠাক আছে কিনা দেখে নিলাম। কাগজ বলতে গ্রিক সরকারের বৃত্তি প্রাপ্তির কাগজ, এক বছর সালোনিকিতে যে গ্রিক ভাষা শিখেছি এবং পাস দিয়েছি তার কাগজ, এবং দেশ থেকে যে ছাড়পত্র পেয়েছি সেই কাগজই মুখ্য। একে একে সবগুলোই দেখলাম। ছাড়পত্রের কাগজটি কলেজে দরকার ছিল না তবুও হাতে রাখলাম– যদি প্রয়োজন হয় সেই জন্য। একমাত্র এই কাগজটি নিভাঁজ রেখেছিলাম। কারণ কাগজটি দেখতে সুন্দর। ওপরে বাংলাদেশ সরকারের রঙিন মনোগ্রাম, নিচে সুন্দর একটি সই– 'শেখ মুজিবুর রহমান'। তখন বৃত্তিপ্রাপ্তদের কাগজে তিনি নিজেই সই করতেন।

সব কাগজ হাতে নিয়ে পায়ে পায়ে এগুলাম বারান্দা ধরে। নিরিবিলি বারান্দা। নিজের জুতোর শব্দ ছাড়া অন্য কোনো শব্দ কানে আসে না। সারি সারি করে রাখা পৌরাণিক ভাস্কর্যের রিপ্লিকাগুলোকে একের পর এক পরখ করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। একে একে আর্টেমিস, অ্যাথিনা, জিউস, ইরাক্লিউস, এসব ভাস্কর্য পেরিয়ে এক সময় বারান্দার বাঁকে পৌঁছলাম। মনে শঙ্কা– এত বড় দালানে কোথায়, কী করে খুঁজে পাব আমার সংশ্লিষ্ট বিভাগ, দফতর এবং অধ্যাপককে।

কিন্তু শঙ্কা দূর হল। মোড় নিতেই দরজার পাশে রাখা ঘোড়ায় উপবিষ্ট আলেকজান্ডারের ভাস্কর্য চোখে পড়ল। তাতে

কী বললে? বাংলাদেশ? শেখ মুজিবুর রহমানের দেশ? তুমি বাংলাদেশের লোক? কী দারুণ! কী দারুণ! আমার সারাটা দিন আজ ভালো যাবেই। .... পৃথিবীর মহান একজন নেতা, আমার সবচাইতে প্রিয় ব্যক্তিত্ব শেখ মুজিবরের দেশের একজনের সাথে এই সাত-সকালে দেখা,..... জীবনে এই প্রথম একজন বাংলাদেশের লোক দেখলাম।

রেলিং দিয়ে দাঁড়িয়ে মুখ নিচু করে পত্রিকা পড়ছে একজন অত্যন্ত মনোযোগের সাথে। তাকে দেখে যেন হাতে চাঁদ পেলাম। এগিয়ে গিয়ে 'কালি মেরা' জানালাম। গ্রিক ভাষায় এই বাক্যটির অর্থ 'সুপ্রভাত'। লোকটি পত্রিকা থেকে মুখ তুলতেই চমৎকৃত হলাম। ঘোড়ায় উপবিষ্ট তলোয়ার হাতে আলেকজান্ডার যেন ঘোড়া থেকে নেমে ওখানে দাঁড়িয়েছে।

'কি চাই' জিজ্ঞেস করার আগেই নিজেই আমার প্রয়োজনের কথা বলে ফেললাম। সব কথার উত্তর দেবার আগে লোকটি প্রথমেই জিজ্ঞেস করল আমার দেশটি কোথায়। উত্তর শুনেই সোজা হয়ে দাঁড়াল চল্লিশ বছর বয়সী শরীরটি। তারপরেই বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে বলল: 'কি বললে? বাংলাদেশ? শেখ মুজিবুর রহমানের দেশ? তুমি বাংলাদেশের লোক? কী দারুণ! কী দারুণ! আমার সারাটা দিন আজ ভালো যাবেই। বিজয়ীর দেশ, বীরের দেশ, পৃথিবীর মহান একজন নেতা, আমার সবচাইতে প্রিয় ব্যক্তিত্ব শেখ মুজিবরের দেশের একজনের সাথে এই সাত-সকালে দেখা, কী সাংঘাতিক ব্যাপার! জানো, জীবনে এই প্রথম একজন বাংলাদেশের লোক দেখলাম।' এইসব বলেই আমাকে অপ্রস্তুত করে দিয়ে ঝপ করে উপুড় হয়ে পা ধরে সালাম করে ফেলল। ভীষণ অস্বস্তিতে পড়লাম, এই সাত-সকালে সে তো বাংলাদেশি দেখে আহ্লাদে আহ্লাদে, আমি কোনো পাগলের পাল্লায় পড়লাম কিনা।

দেশে যেমন কেউ পা ধরে সালাম করতে গেলে 'আরে আরে, করো কি-করো কি-করো কি' বলি অপ্রস্তুত হয়ে, ঠিক তেমনি করেই বলতে থাকি কথাটা। কিন্তু কে কার কথা শোনে! সে কাজটি করেই বসে। জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'এটা কোথায় শিখলে?' উত্তরে বলেছিল, 'আমি জানি। বিভিন্ন দেশের মানুষ এবং আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কে লেখা একটি বইতে পড়েছি, ভারতবর্ষের লোকেরা শ্রদ্ধা জানাতে এমনটা করে।' লোকটি ছিল আসলে খুব মিশুক। আমুদে। কলেজের একজন কর্মচারী। সবার সাথেই তার এ স্বভাবের জন্য হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। সবাইকে আপন করে নেওয়ার এক ধরনের ক্ষমতা ছিল তার। তা ছাড়া বিশ্বের তাবৎ দেশ সম্বন্ধে খবরাখবর রাখা ছিল তার অভ্যেস। বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক উঠতি-পড়তির খবর খুব মনোযোগের সাথে পড়ত। বাংলাদেশ সম্বন্ধে তার ছিল অগাধ ভালোবাসা। আর শ্রেষ্ঠ নেতা হিসেবে তার সবচাইতে প্রিয় ছিল শেখ মুজিবুর রহমান, আলেন্দে এবং ইন্দিরা গান্ধী।

যাই হোক, সেদিন তার উচ্ছ্বাসে খুব সহজেই আমার বাকি কাজগুলো সমাধা হয়ে গিয়েছিল। মজার ব্যাপার যে, সেদিন কলেজে যেখানে যার কাছেই যেতে হয়েছে, সবাই বাংলাদেশের লোক জেনে খুব শ্রদ্ধা-সম্মান করে কাজ করে দিয়েছে। সহায়তা করেছে। আর প্রায় প্রত্যেকেই জিজ্ঞেস করেছে আমি শেখ মুজিবুর রহমানকে স্বচক্ষে দেখেছি কিনা। আমি তাঁদের সবাইকে শেখ সাহেবের সই দেখিয়েছি। তাঁরা প্রত্যেকেই হাতে নিয়ে নিয়ে তা দেখেছেন এমনভাবে, যেন অত্যন্ত দুর্লভ একটি অটোগ্রাফ তাঁরা স্বচক্ষে দেখার সুযোগ পেয়েছেন। আমি যে তাঁকে অত্যন্ত কাছ থেকে দেখেছি, সেকথা বলেছি; সেসব শুনে তো কলেজের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষকবৃন্দ এবং কর্মচারী সবাই অবাক।

বাংলাদেশের একজন নেতা যে আন্তর্জাতিক পর্যায়েও এত প্রিয় হয়ে গেছেন সবার কাছে, তা' জানার সৌভাগ্য আমার জীবনে এই প্রথম। নেতা মহান হলে যে দেশের একজন সাধারণ লোকও সম্মান পায় সর্বত্র তা বুঝতে পেরেছিলাম। দেশে বসে নয়, বিদেশে গিয়ে।

সেদিন আমি প্রায় দর্শনীয় হয়ে উঠেছিলাম। সেই সাথে নিজের দেশ এবং দেশের নেতার কথা ভেবে গর্বও হয়েছিল খুব। বলাবাহুল্য যে, বাংলাদেশ হওয়ার পর গ্রিসে আমারই প্রথম ছাত্র হয়ে সেখানে যাওয়ার সুযোগ এবং সৌভাগ্য হয়েছিল। অতএব নতুন একটি দেশের, সদ্যোজাত একটি

দেশের একজন নাগরিক হিসেবে আদর-আহ্লাদ পেয়েছিলাম অঢেল। সেই আদর-আহ্লাদ আর শ্রদ্ধা-সম্মানের সবটাই ছিল বঙ্গবন্ধুর ভাবমূর্তির কারণে।

শুধু আর্ট কলেজেই এরকম ঘটেছিল তা নয়। তিয়াত্তরের অক্টোবরের যেদিন প্রথম গ্রিসে পৌঁছেছিলাম, সেদিন এয়ারপোর্টে আমার সবুজ রঙের বাংলাদেশি পাসপোর্টটি দেখে অত্যন্ত সম্মানের সাথে ইমিগ্রেশান এবং কাস্টমসের কর্মকর্তারা আচার-ব্যবহার করেছিলেন। যেখানেই গিয়েছি, সেখানেই বাংলাদেশ এবং শেখ মুজিবুর রহমান কথা দুটি পাশাপাশি উচ্চারিত হয়েছে এমনভাবে, যেন একের সাথে অন্যটি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ইতোমধ্যে গ্রিস থেকে কাছাকাছি দেশগুলোতেও বেড়াতে গিয়েছি। এসব দেশেও সাধারণ লোকের মুখে একই ধরনের কথা শুনেছি। সেসব দেশে ঢুকতে এবং বের হতে বাংলাদেশের সবুজ পাসপোর্টটিকে খুবই সম্মানের চোখে দেখেছেন কর্মকর্তারা।

গ্রিকদের এই শ্রদ্ধা-ভক্তির একটি কারণ ছিল তা বুঝতে পেরেছিলাম পরে। গ্রিকদের অবস্থা চুয়াত্তরের আগ পর্যন্ত আমাদের দেশের মতোই ছিল। অর্থাৎ সামরিক জান্তার কবলে পড়েছিল। বহুকাল ধরে সেনানায়ক পাপদোপুলসের একনায়কতন্ত্রের দাপটে এবং তার সুবিধা অনুযায়ী তৈরি করা তথাকথিত গণতন্ত্র নামের ভাঁওতায় তখন গোটা দেশটা রাজনৈতিক এবং সামাজিকভাবে প্রায় পঙ্গু। এরকমটা হলে যা হয় অর্থাৎ অসন্তোষের চাপা আগুন সবার বুকে ধিকি ধিকি জ্বলে, ক্ষণে ক্ষণে আন্দোলন হয়ে সে আগুন প্রচণ্ড আকার ধারণ করে। আবার অস্ত্রের সামনে অবদমিত হয়ে যায় কিছুকালের জন্য। এমনিভাবে চলছিল। মুক্তিকামী দেশের মানুষ স্বৈরাচারী সামরিক বজ্রআঁটুনি থেকে বাঁচতে সঠিক এবং সফল নেতৃত্বের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল দিনের পর দিন।

অবশেষে তারা চুয়াত্তরের আগস্ট মাসে সামরিক সরকারকে উৎখাত করতে সক্ষম হয়েছিল গণআন্দোলনের মাধ্যমে, তেমন কোনো বড় নেতৃত্ব ছাড়াই। রাজার আমলের মন্ত্রী দেশ থেকে বহুকাল বহিষ্কৃত কারামানলিস নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর নেতৃত্বে পাওয়া মুক্তি সম্পূর্ণতা তেমন পায়নি বলে জনগণের মনে হয়েছিল। তারা চাচ্ছিল আরো বিশাল কোনো নেতৃত্ব। দেশের মাটিতে আর সাধারণ মানুষের কাছাকাছি থেকে যে-নেতৃত্ব উৎসারিত হয়, তেমন। এই জন্যই তাদের মুখে শোনা যেত শেখ মুজিবুর রহমান, আলেন্দে প্রমুখ নেতার নাম। তারা বলত, তাদের প্রয়োজন এই রকমের বিশাল ব্যক্তিত্বের অধিকারী নেতার।

যাই হোক, শ্রদ্ধা-সম্মানে আমার দিনগুলো ভালোই কাটছিল। কিন্তু হঠাৎ একদিন তা ধসে গেল। পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট সেই প্রথম দিনের মতোই খুব সকালে কলেজে গিয়েছি। গ্রীষ্মের সকাল বলে দিনটি বেশ উজ্জ্বলই ছিল। বেশ আনন্দেই গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলাম। গিয়ে গেটেই দেখা সেই বাংলাদেশের পরম শুভানুধ্যায়ী শেখ সাহেবের একনিষ্ঠ ভক্ত বাঙ্গেলিসের সাথে। আগে বলা হয়নি যে, সেই গ্রিক ভদ্রলোকের নাম ছিল বাঙ্গেলিস। আর সেই কারণে আমি তাকে ঠাট্টা করে বাঙালি বলে ডাকতাম। তো, সেই বাঙ্গেলিসের সাথে দেখা। মুখ থমথমে। হাতে ভাঁজ করা খবরের কাগজ একটি। আমি কাছে যেতেই কোনো সু-প্রভাত নয়, কোনো সম্ভাষণ নয়, আস্তে করে বলল, 'কী সাংঘাতিক পাষণ্ড তোমরা! ছিঃ! মেরে ফেললে বেচারাকে?'

আমিতো তার কথা এবং আচার-আচরণে হতবাক। কী বলছে আমি কিছুই শুনিনি। কিছু বলার আগেই বাঙ্গেলিস তার হাতের খবরের কাজটির প্রথম পৃষ্ঠা খুলে ধরল আমার চোখের সামনে। কাগজের দিকে তাকিয়েই দেখি ভয়াবহ, অপ্রত্যাশিত আর অবিশ্বাস্য খবরের আট কলামে বড় বড় হরফে হেডিং 'শেখ মুজিবুর রহমান স্কতোত্তথিকে ইকোভোনিকস।'

অর্থাৎ শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নিহত। চমকে উঠলাম হেডিং দেখে। লুফে নিলাম কাগজটা। হেডিং ছাড়া তেমন ডিটেইল কিছু খবর নেই। শুধু বিদেশি কোনো রেডিওকে কোট করে কয়েক লাইন লেখা। সম্ভবত অস্ট্রেলিয়ান রেডিওর খবরকে কোট করা ছিল। হতভম্বের মতো নিষ্পলক চেয়ে রইলাম কাগজের দিকে। তারপর এক সময় তাকালাম মি. বাঙ্গেলিসের দিকে। দেখলাম গভীর এক বিষাদ তাঁর সারা মুখে ছেয়ে আছে। বললেন, 'তোমরা আবার আমাদের মতো দুঃখী হয়ে গেলে। তোমাদের না হলেও মানুষটা আমার বড় প্রিয় ছিল।' সে কথার সেদিন কোনো উত্তর দিতে পারিনি।

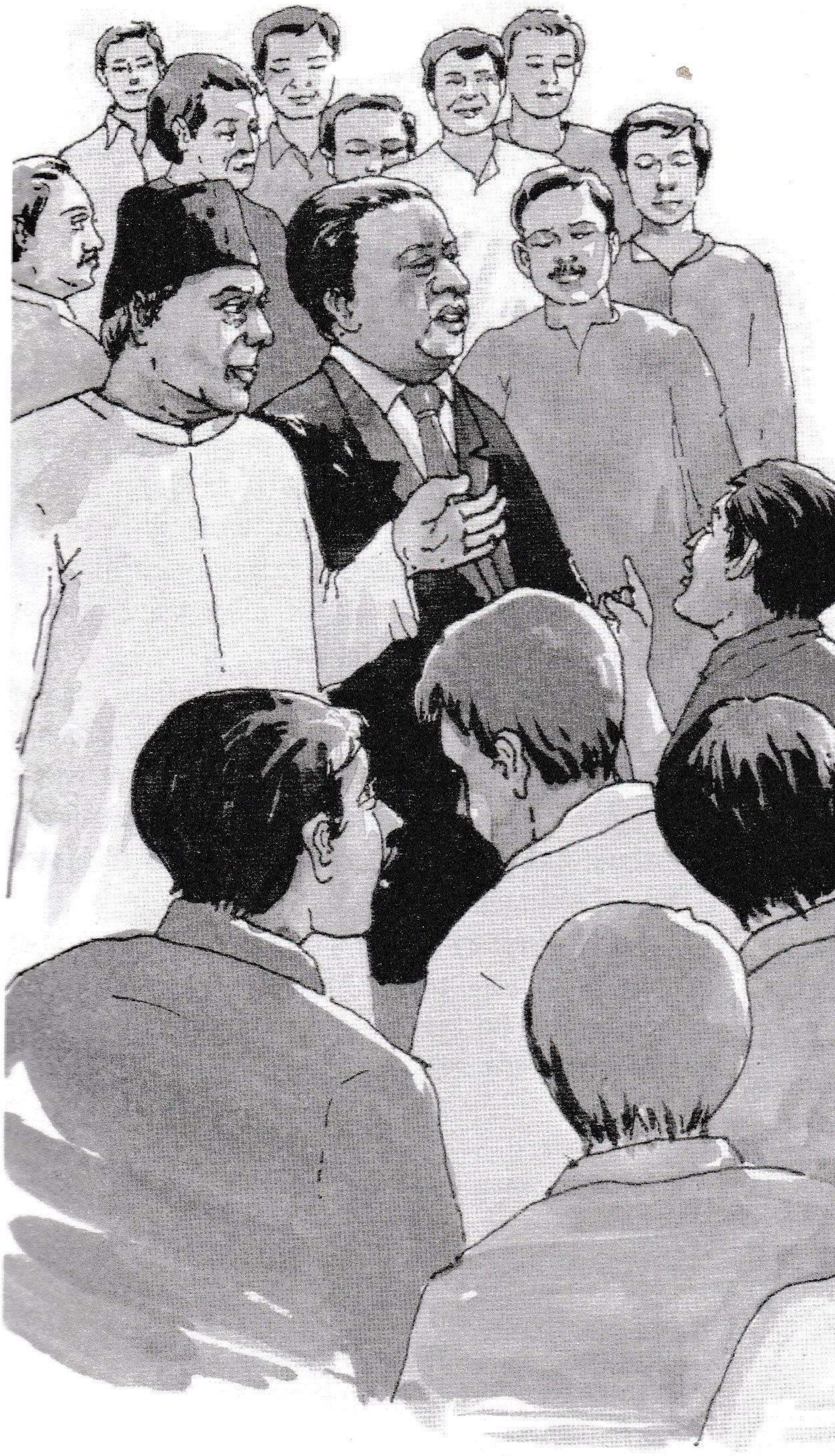
তারপর আরো কিছুদিন কাটল। এল ছিয়াত্তর। দেশে ফিরতে হবে শীতে। ভাবলাম, তার আগে ইউরোপের আরো কয়েকটি দেশ ঘুরে আসি। যেই কথা সেই কাজ। একদিন বেরিয়ে পড়লাম ইতালি, সুইজারল্যান্ড এবং ফ্রান্সের পথে। কিন্তু আগে ভাবিনি এই ক'দিনে বাংলাদেশি বলে এমন সব দুর্ভোগ পোহাতে হতে পারে। আগের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী তেমন ভাবার কোনো কারণও ছিল না। প্রায় সব ক'টি দেশের বর্ডারে আমার সবুজ পাসপোর্টটি রীতিমতো যেন একটি বিরক্তির জিনিস, তাচ্ছিল্যের বস্তু। টেবিলে ঠেলে সরিয়ে রাখা, সবার শেষে সেটি দেখা, সেটি হাতে সন্দেহের দৃষ্টিতে আমাকে দেখা, সবকিছু মিলিয়ে এক অপমানকর অবস্থা সবখানে।

হঠাৎ কেন অমন হল জানি না। ক'দিনেই কেন সব বিশ্বাস পাল্টে অবিশ্বাসে রূপান্তরিত হল জানা নেই। অবশ্য মনে মনে একটা ধারণা জন্মেছিল, 'তবে কি একটা মানুষের অসম্মানে দেশটারও সম্মান হারিয়েছে?'

'শেখ মুজিব একটি লাল গোলাপ' বই থেকে সংকলিত

এক দুঃসাহসী কিশোরের কথা

ওবায়দুল কাদের



শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক তখন অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী বাণিজ্য ও পল্লী উন্নয়নমন্ত্রী। সে তিরিশের দশকের ঘটনা। ফজলুল হক, সোহরাওয়ার্দী একবার এসেছিলেন গোপালগঞ্জ সফরে। সফরসূচির মধ্যে শহরের মিশন স্কুল পরিদর্শনও অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

স্কুল পরিদর্শন শেষে বাঙালির দুই প্রিয় নেতা যখন ডাক বাংলোতে ফিরছিলেন ঠিক তখনই ঘটল এক অবাক করা কাণ্ড। হালকা ছিপছিপে গড়নের এক কিশোর শেরে বাংলা-সোহরাওয়ার্দীর পথরোধ করে দাঁড়ায়। স্কুলের হেডমাস্টার ভয়ে তটস্থ। একী করছে ছেলেটা! তিনি ধমকের সুরে বললেন : সর তো সরে যা, পথ ছাড়। জেদি কিশোর নাছোড়বান্দা। তার সাফ কথা : না স্যার, তা হবে না।

গোপালগঞ্জের মিশন স্কুলের দুঃসাহসী কিশোর মুজিব পরবর্তীকালে হাজার বছরের ঘুমঘোর থেকে বাঙালি জাতিকে জাগিয়ে তুলেছিলেন।

'বাংলার বাঘ' অবাক। ছাত্রটির সাহস দেখে সিংহপুরুষ সোহরাওয়ার্দী বিস্ময়ভরা চোখে তাকান। শেরে বাংলার প্রশ্ন: কী চাও তুমি?

আমাদের হোস্টেলের ছাদ দিয়ে পানি পড়ে। তা মেরামতের ব্যবস্থা না করলে পথ ছাড়ব না– নির্ভীক বালকের দৃঢ় উচ্চারণ।

সোহরাওয়ার্দী জানতে চান, কাজ সারতে কত টাকার দরকার।

বালক বলল: বার শ' টাকা হলে চলবে। শেরে বাংলা-সোহরাওয়ার্দী ছেলেটির সৎ সাহসের পরিচয় পেয়ে খুবই খুশি।

মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হক তাঁর স্বেচ্ছাধীন তহবিল থেকে তৎক্ষণাৎ মিশন স্কুলের হোস্টেল মেরামতের জন্য ১২ শ' টাকা মঞ্জুর করে দেন।

কিন্তু মিশন স্কুলের ঐ ছেলেটি কে? কী তার পরিচয়? কোথায় তার জন্ম?

না, শহুরে কোনো ধনী পরিবারে রুপোর চামচ মুখে নিয়ে জন্ম নেয়নি সে। আদর করে বাবা-মা জন্মের পর 'খোকা' নামে ডাকতে শুরু করেন। আসল নাম রাখা হয় শেখ মুজিবুর রহমান। বাবা শেখ লুৎফর রহমান। মা সায়েরা খাতুন। গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া গ্রামের এক মধ্যবিত্ত পরিবারে শেখ মুজিবের জন্ম। ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ। মধুমতীর শাখানদী বাইগারের তীরে ঘন বাঁশঝাড়, খেজুর গাছের শ্যামল শোভা। ঘন গাছ-গাছড়ার সারি দিনের সূর্যকেও আড়াল করে রাখে। দিনে-দুপুরেও ঝিঁঝিঁরা গান ধরে, শেয়ালেরা কাছের বন থেকে ডেকে ওঠে। রাতের জোনাকিরা আম-কাঁঠালের পাতায় পাতায় জ্বলে আর নেভে। ঘরে ঘরে জ্বলে মাটির প্রদীপ।

বাঁশবাগানের মাথার উপর চাঁদ অপরূপ হাসি মেলে ধরে। মেলা বসে তারাদের। সার বেঁধে বেঁধে পালতোলা কত নৌকা চলে মধুমতী-বাইগারের পুষ্ট বুকের ওপর দিয়ে। উদাস মাঝিদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় ভাটিয়ালি গানের সুর। মাঠে মাঠে রাখালের মেঠোসুর ভেসে বেড়ায়। ওখানকার পাটগাতি বন্দরে দূর-দূরান্তের কত জাহাজ এসে নোঙর করত। পাট নিয়ে যায়। ধান নিয়ে যায়। বারে-বারে নিঃশেষ করে দিয়ে যেত কৃষকের ভরা গোলা। বড় সুফলা মাটি টুঙ্গিপাড়ার। সুজলা সেই গাঁ অবিকল রবীন্দ্রনাথের সোনার বাংলার মতো। যেন জীবনানন্দ দাশের রূপসী বাংলা। অথচ সবুজ শ্যামলিমার মধ্যে সুকান্তের ক্ষুধার জ্বালায় পৃথিবীর গদ্যময় রূপও ঢেকে রাখবার মতো নয়। দারিদ্র্যের দুঃসহ যন্ত্রণা অধিকাংশ ঘরে। অশিক্ষা-কুশিক্ষার অভিশাপ। সর্বত্র যুগ যুগের নিঃসীম বঞ্চনা। জামিদার-জোতদারের শোষণের যাঁতাকলে পিষ্ট হত টুঙ্গিপাড়ার সহজ সরল অভাবী মানুষগুলো।

শেখ মুজিবুর রহমান জন্মেই দেখেন ক্ষুব্ধ স্বদেশভূমি। কিশোর মুজিবের মনে জ্বলে বিদ্রোহের আগুন। কারা লুটেপুটে খায় সোনার বাংলার সম্পদ? কারা কেড়ে নিয়ে যায় বাংলা মায়ের সুখ আর শান্তি? দেশ তখন পলাশীর যুদ্ধে বাংলার স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার রক্তাক্ত পরাজয়ের কলঙ্ক বয়ে চলছিল। শৃঙ্খলিত সেই স্বদেশভূমিকে পরাধীনতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করার দুর্জয় শপথ নিলেন শেখ মুজিব।

গোপালগঞ্জের মিশন স্কুলের দুঃসাহসী কিশোর মুজিব পরবর্তীকালে হাজার বছরের ঘুমঘোর থেকে বাঙালি জাতিকে জাগিয়ে তুলেছিলেন। যৌবনের পুরো একটা যুগ কারাগারে থেকেছেন তিনি। দেশদ্রোহিতার অভিযোগে ঔপনিবেশিক পাকিস্তানি জামানায় মুজিবকে ফাঁসিতে চড়িয়ে মারতে চেয়েছিল সামরিক শাসক আইয়ুব-ইয়াহিয়া চক্র।

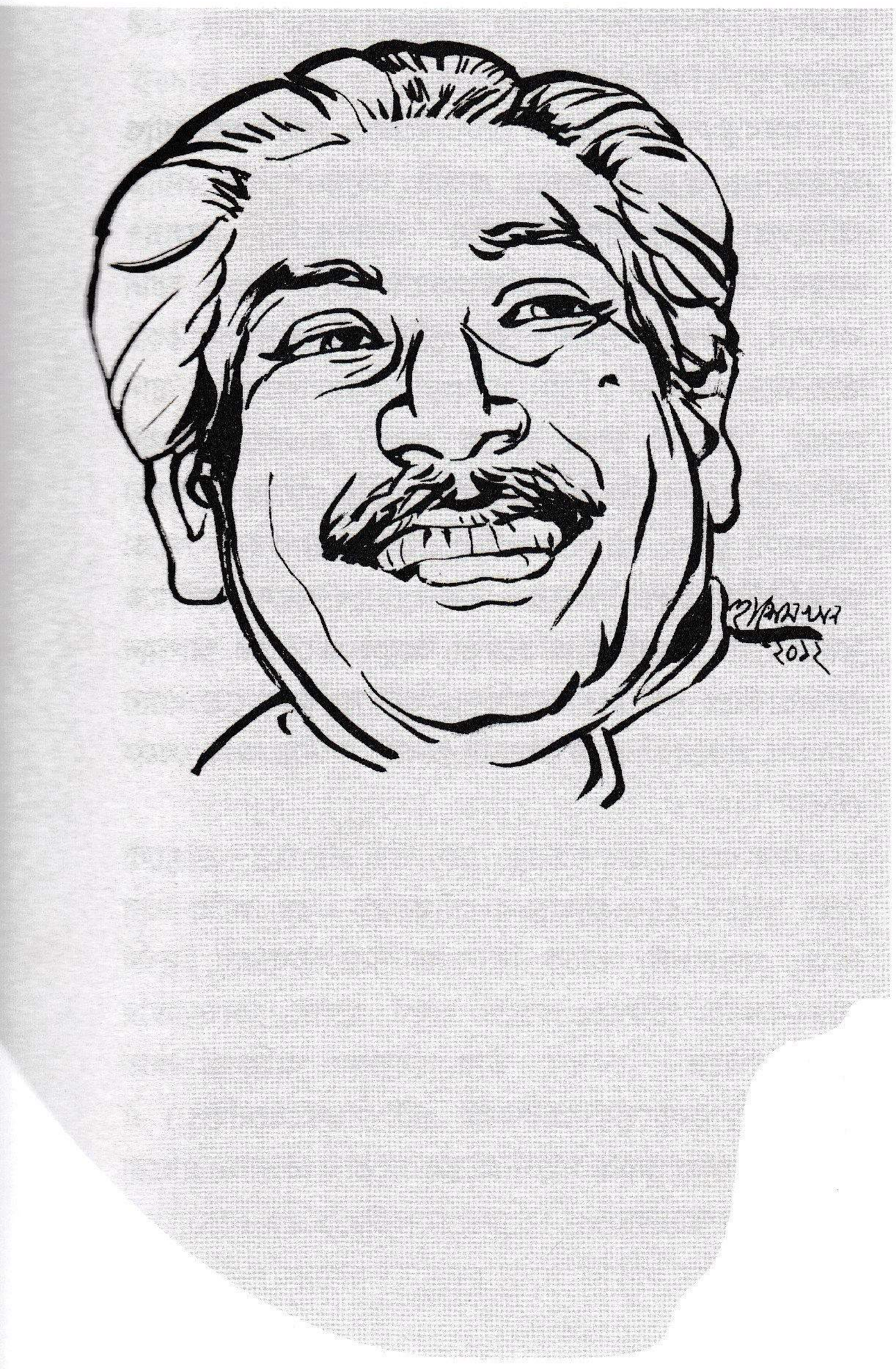
বঙ্গবন্ধু তবু আপোস করেননি, মাথা নত করেননি। বাঙালি জাতির স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেননি। মাথা নত না করার অপরাধে পঁচাত্তর সালের পনেরই আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে জীবন দিতে হয়েছিল। সেদিনের ঘাতকেরা বঙ্গবন্ধুর শিশুপুত্র রাসেলকেও রেহাই দেয়নি। হত্যা করেছিল অবলা নারীদেরও।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান চিরদিনের মতো ঘুমিয়ে আছেন তাঁর জন্মস্থান টুঙ্গিপাড়া গ্রামে। সারা দুনিয়ার মানুষ তাঁকে স্বাধীন বাংলাদেশের জনক বলেই জানে এবং তাঁর নামে বাংলাদেশকে চেনে।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন ১৯৯৭ স্মরণিকা থেকে সংকলিত

বঙ্গবন্ধু স্মরণে

রাজিয়া খান



বঙ্গবন্ধু-হত্যার আগের ঈদ। অগ্রজপ্রতিম চলচ্চিত্র নির্মাতা এহতেশাম রহমান সপরিবারে এলেন। বল্লেন: আজ এমন একজনের সঙ্গে দেখা করতে যাব– যাকে দূর থেকে দেখলেও মন কানায় কানায় ভরে যায়। সাগ্রহে এদের সঙ্গী হলাম। বঙ্গবন্ধুর সরকারি বাসভবনে অভ্যাগতদের অরণ্যে আমি ভিড়ের মধ্যে চ্যাপটা হয়ে দাঁড়িয়ে, হঠাৎ বজ্রকণ্ঠ ধ্বনিত হল: রাজিয়া না?

বিস্ময়ে অভিভূত আমি কোনোমতে বিড় বিড় করে বল্লাম: আমাকে মনে রেখেছেন? তিনি যখন পাকিস্তানি কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে ক্ল্যারিজেস্ হোটেলে, আমি তখন লন্ডনে। তারপর কিছুদিন হয় দেশে ফিরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজে যোগদান করেছি– স্বাধীনতার স্বাদ গ্রহণ করে হৃদয় পরিপূর্ণ। দেশ থেকে ত্রাসে পালিয়ে গিয়েছিলাম একাত্তরের জুন মাসে। মুক্তির নিঃশ্বাস, মনে হল বড় মধুর। আর দেশনেতা যখন আমার মতো অকিঞ্চন মানুষকে মনে করেন তখন তৃপ্তির সীমা থাকে না।

পাকিস্তানি বর্বরদের হত্যাযজ্ঞের মধ্যে দাঁত-কামড়ে পড়ে ছিলাম। এক অপরিচিত বালক আমার স্বামীর অফিসে একটি নীল খাম দিয়ে গেল– আপনার স্ত্রীকে সরিয়ে দিন। ওরা তার ওপর নজর রাখছে। আর যায় কোথা! আজিজ মোহাম্মদ ভাইয়ের সাহায্যে একদিনে দুটি শিশুর হাত ধরে লন্ডনের পথে বিমানে চড়লাম। ফিরে এসে দেশে বঙ্গবন্ধুর উপস্থিতি জীবনে নতুন মাত্রা এনে দিল। এত ভাঙ্গন, দুঃখ– সবকিছুর মধ্যে যেন আনন্দধারা বইছে, সে আনন্দ বিনষ্ট হল অতি দ্রুত; আমাদের প্রিয় নেতার অন্তর্ধানে।

যে জাতি ছিল ভীরু, পশ্চাৎপদ, তাকে তিনি জাগিয়ে তুললেন, দুর্ধর্ষ মুক্তিযোদ্ধায় পরিণত করতে সমর্থ হলেন, তাও তাঁর অনুপস্থিতিতে। তাঁর বিশাল ব্যক্তিত্ব আর যুগান্তকারী নেতৃত্বের প্রেরণায়ই এটা সম্ভব হয়েছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস শেষ। হাতে চকের গুঁড়ো। হঠাৎ মনে পড়ল সেদিন বঙ্গবন্ধুর জন্মতিথি। কেমন একটা অনিরুদ্ধ তাগিদ আমাকে অস্থির করে তুলল। রিকশায় উঠে গণভবনের দরজায় উপস্থিত হলাম, কোনো Appoint-ment নেই। গেটে নাম বলতেই পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমাকে দোতলায় আনা হল। বঙ্গবন্ধুর ঘরে অর্থমন্ত্রী ড. আজিজুর রহমান মল্লিক। রাজশাহীতে যখন আমি প্রভাষক, ড. মল্লিক ও তাঁর স্ত্রী ছায়ার মতো আমাকে আগলে রাখতেন।

বিদেশি কায়দায় বঙ্গবন্ধু উঠে দাঁড়ালেন। জানতাম তিনি মহাব্যস্ত, তাই জন্মদিনের অভিবাদন জানিয়েই বিদায় নেব– উনি দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন। সেই শেষ সাক্ষাৎ। এতখানি বদান্যতা ও উষ্ণ ব্যবহার, তাও রাষ্ট্রপ্রধানের তরফ থেকে একজন সামান্য নাগরিকের প্রতি– অবিশ্বাস্য ব্যাপার। তাঁর চাইতে কত নগণ্য লোক অবহেলা, অপমান করে। দেখেও দেখে না। সেই আশ্চর্য সাক্ষাৎ আমি কখনো ভুলব না। এতবড় একজন মানুষের কাছ থেকে এই সদ্ব্যবহার প্রত্যাশার অতীত। তিনি তাই এখনো জীবন্ত আমার চৈতন্যে। তাঁকে আমি এপার থেকে গভীর শ্রদ্ধা জানাই– আমার দরিদ্র দেশবাসীকে একত্রিত করে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখানোর জন্য। তাঁর নেতৃত্বের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নানা বয়সের নানা শ্রেণির মানুষ মুক্তিযুদ্ধে আত্মদান করেছে; আর সেই নেতাকে আমরা ধরে রাখতে পারিনি। এ যে কতবড় লজ্জা আর ব্যর্থতা তা বর্ণনাতীত।

আজ যারা অস্ট্রিয়ার ভিয়েনা শহর থেকে বঙ্গবন্ধুকে স্মরণ করার জন্য বই প্রকাশ করার উদ্যোগ নিয়েছেন, তাঁদের আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই– তাঁদের মহৎ উদ্যোগ সৌন্দর্যমণ্ডিত হোক, প্রজ্ঞায় সমৃদ্ধ হোক, এই আমার শুভকামনা ও প্রার্থনা।

বঙ্গবন্ধু সম্বন্ধে খুব কম লেখা হয়েছে; গভীর গবেষণাও প্রয়োজন। তাঁর তারুণ্যের একটি ঘটনা শুনেছি প্রয়াত অভিনেতা আবুল খায়েরের মুখে। একদিন তিনি এলেন– আমরা তাঁকে এমন আকস্মিকভাবে পেয়ে ধন্য। তিনি বললেন, বঙ্গবন্ধুর গৃহশিক্ষকের গুটিবসন্ত হবার পর কেউ তাঁর ঘরে যেত না। তিনি গরমপানি করে শিক্ষককে স্নান করান, বিছানার চাদর বদলে দেন। কতবড় হৃদয়ের অধিকারী হলে নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে একজন অল্পবয়সী যুবক, ছোঁয়াচে রুগীর এমন সেবা করতে পারে! সেই নির্ভীক তরুণ শিক্ষকের নিরাশ চোখে আলো ফোটাতে সমর্থ হলেন। সেদিন অভিনেতা আবুল খায়েরের আগমন আমার কাছে শুভ মনে হয়েছিল; তিনি না এলে তো এমন অনবদ্য চরিত্রের একটি অজানা অধ্যায় সম্বন্ধে অজ্ঞ থেকে যেতাম।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। জয় তাঁর সব স্বপ্ন– যেগুলো পূরণ করতে হবে আমাদের যৌথভাবে। যে জাতি ছিল ভীরু, পশ্চাৎপদ, তাকে তিনি জাগিয়ে তুললেন, দুর্ধর্ষ মুক্তিযোদ্ধায় পরিণত করতে সমর্থ হলেন, তাও তাঁর অনুপস্থিতিতে। কেবল তাঁর বিশাল ব্যক্তিত্ব আর যুগান্তকারী নেতৃত্বের প্রেরণায়ই এটা সম্ভব হয়েছিল। ঐ এক নাম কাজ করত মহার্ঘ মন্ত্রের মতো। ঐ নাম এখনো আমাদের রক্ষাকবচ।

জাতীয় সঙ্গীত নির্বাচন

বেলাল মোহাম্মদ

নভেম্বর '৭১-এর প্রথম সপ্তাহের কথা। এম-এন-এ ইনচার্জ আবদুল মান্নান প্রস্তাবটা দিয়েছিলেন অধিবেশনের সমাপ্তিতে 'জয় বাংলা বাংলার জয়' গানটি না বাজানোর জন্যে; তার বদলে জাতীয় সঙ্গীত সংযোজনের জন্যে। 'আমার সোনার বাংলা' রবীন্দ্রসঙ্গীতটি বঙ্গবন্ধুর খুব প্রিয় গান। আবদুল মান্নান বলেছিলেন: বঙ্গবন্ধু এই গানটিকে জাতীয় সঙ্গীত করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন।

সহকর্মী শামসুল হুদা চৌধুরী ও আশফাকুর রহমান খানের সঙ্গে এ বিষয়ে আমার আলাপ হয়নি। আমার একটা ব্যক্তিগত মতামত ছিল অধিবেশনের সমাপ্তিতে 'জয় বাংলা বাংলার জয়' গানটি প্রচারই অব্যাহত রাখা। সমাপ্তিতে জাতীয় সঙ্গীত বাজানো বিশ্বজনীন কোনো ব্যাপার নয়। একমাত্র রেডিও পাকিস্তানের এই ব্যবস্থা প্রচলিত, আকাশবাণীও আগে তাদের জাতীয় সঙ্গীত প্রচার করত। সম্প্রতি অনুরূপ প্রচার বন্ধ করে দিয়েছিল।

আবদুল মান্নানের কথায় একটা আভাস পাওয়া গিয়েছিল। জাতীয় সঙ্গীতের প্রচার প্রবর্তনের জন্যে বন্ধু ও প্রভাবশীল মহল থেকে চাপ এসেছিল। এ ছাড়া তিনি বলেই ফেলেছিলেন: 'জয় বাংলা' গানটির শেষ অংশে একটা কথা আছে, 'ভুখা আর বেকারের মিছিল'– এটা এখন প্রচার না-করাই ভালো।

সে গানটির প্রচার সম্পূর্ণ রহিত হয়েছিল। এবং স্বভাবত 'আমার সোনার বাংলা' রবীন্দ্রসঙ্গীত হিসেবে বাজানোও বন্ধ হয়েছিল নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকে

১৯৭৭ সালের ডিসেম্বর মাসে জাতীয় সঙ্গীতের ওপর আমি কিছু বক্তব্য রেখেছিলাম। সিলেটের সাপ্তাহিক 'দেশ-বার্তা'য় প্রকাশিত হয়েছিল আমার নিবন্ধটি। পরে 'ঢাকা ডাইজেস্ট'-এ সঙ্কলিত হয়েছিল। শিরোনাম 'অনুষঙ্গ: জাতীয় সঙ্গীত'। ১৪ ডিসেম্বর শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মরণে সভা ডেকেছিলেন কবি দিলওয়ার। আমাকে সভাপতির দায়িত্ব দিয়েছিলেন। সিলেট শহরের ভার্থখলার একটি হোটেলের হলঘর। সীমিত বোদ্ধা ব্যক্তিদের সমাবেশ। তখন জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সঙ্গীত পাল্টানো হবে বলে রটনা ছিল।

তারই সূত্র ধরে বক্তারা বিষোদ্‌গার করেছিলেন। 'পতাকা' ও 'সঙ্গীত'কে বর্ণনা করেছিলেন 'আমাদের ঐতিহ্য' বলে। আমার ভাষণে আমি ঐতিহ্যের অন্যতম ব্যাখ্যা দিয়েছিলাম। আমাদের আদিবৃত্তি হচ্ছে অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান ইত্যাদি। হা-ভাতের দেশে এক টুকরো কাপড়ের সদ্ব্যবহার হয়, রাস্তার উলঙ্গ বালকটির লেংগুট হিসেবে কাজে লাগলেই। সেই মুহূর্তে ভাবাবেগের কারণেই বিপ্লবী অভ্যাগতরা কেউ কেউ কানাকানি করেছিলেন: সরকারি কর্মচারী তো! তাই এমন প্রতিক্রিয়াশীল কথা বলেছেন। সভাশেষে একজন তরুণ আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। সরাসরি প্রশ্ন করেছিলেন: আপনি যেসব কথা বললেন, মনে হয়, আপনি জাতীয় পতাকা আর জাতীয় সঙ্গীত যারা বদলাতে চায়, তাদের দলে।

উত্তরে আমি বলেছিলাম: আপনি যা বলছেন, তা নিশ্চয় নয়। তবে আমি কোনো ভাবাবেগের বশীভূত নই। হ্যাঁ, জাতীয় সঙ্গীত সম্পর্কে আমার কিছু বক্তব্য হয়তো আছে। পত্রিকাতে দেখতে পাবেন।

মুক্তিযুদ্ধের সিংহভাগ অনুপ্রেরণা এই গানটিই সেদিন জুগিয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' গানটি আমাদের মাতৃসঙ্গীত। এই কথাগুলো আমাদের আকাঙ্ক্ষিত জাতীয়তাবোধ।

সেই রাতে আমি নিবন্ধটি লিখেছিলাম। নিবন্ধটি এখানে হুবহু উদ্ধৃত করা হচ্ছে :

বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত সম্পর্কে আমার কিছু ব্যক্তিগত মতামত আপনমনে দীর্ঘদিন ধরে আমি লালন করে আসছি। আমার বক্তব্যটি রাজধানী শহরের কোনো জনসংযোগ বা প্রচার মাধ্যমকে আশ্রয় করলেই ভালো ছিল। তবু সূচনায় আমি আমার কর্মব্যপদেশে অধিষ্ঠানলব্ধ নিজের শহর সিলেট থেকেই কথাগুলো উচ্চারণ করছি, অর্থাৎ একটু অনুচ্চ কণ্ঠে।

কবিগুরুর 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' গানটি বাংলাদেশে জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে কার্যত গৃহীত হয় ১৯৭১ সালের নভেম্বরের কোনো এক সময়। এর প্রামাণিকতা এবং মর্যাদাপূর্ণ ব্যবহারের নিদর্শন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ঐ সময়কার প্রোগ্রাম ম্যাটেরিয়েলস্ ফাইলে (দৈনন্দিন অনুষ্ঠান সম্ভার) সন্ধান করা হলে পাওয়া যাবে। লক্ষ করা যাবে, ঐ বেতার কেন্দ্রের প্রতিদিনের অধিবেশনগুলোতে সূচনাকাল থেকে প্রারম্ভিক ও সমাপ্তিক সিগনেচার টিউন (প্রতীক সুর) হিসেবে যথাক্রমে যে "জয় বাংলার জয়" গ্রামোফোন রেকর্ডের গানটির 'প্রথম পিঠ' ও 'দ্বিতীয় পিঠ' বাজানো হয়ে আসছিল, নভেম্বর মাসের কোনো একটি দিন থেকে সহসা তার ব্যতিক্রম সাধিত হয়। তখন থেকে অধিবেশনের সমাপ্তিক প্রতীক সুর হিসেবে 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' জাতীয় সঙ্গীত প্রচার প্রবর্তন করা হয়। বস্তুত গানটি রবীন্দ্রসঙ্গীতের অনুষ্ঠানে বারবারই স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের বিভিন্ন অধিবেশনে সেযাবৎ বেজে আসছিল এবং ঐ দিনটি থেকে এর যত্রতত্র ব্যবহার স্বভাবত সুনিয়ন্ত্রিত হয়ে যায়।

'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' গানটি রচনার জন্যে কবিগুরু শিলাইদহের গগন হরকরার প্রতি অকপট ঋণ স্বীকার করেছেন যথাস্থানে। গগন হরকরা পাড়ার অন্য সব পত্র-প্রাপকের বাড়ি ঘুরে-ফিরে শেষ করে এসে কবিগুরুর পায়ের কাছে বসতেন এবং এই অনন্য কর্তাঠাকুরকে স্বরচিত বাউল গান শোনাতেন। তাঁর রচিত বা মুখোচ্চারিত একটিমাত্র গান সংরক্ষিত বা বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষিত পাওয়া যায়। সেটির কথা এবং সুরের কাছেই রবীন্দ্রনাথ ঋণী তাঁর 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' গানটি রচনার জন্যে। উল্লেখ্য, গগন হরকরার বাউল গানটির কথায় 'মরি হায় হায়রে' কথাটিও রয়েছে।

কবিগুরুর গানটি মূলত একক কণ্ঠের উপযোগী। গানের ভাষাভঙ্গিতেই তা বুঝতে পারা যায়। বাংলাদেশের গণআন্দোলনের বিকাশলগ্নে আবেদন ব্যাপকতর বোধ হওয়ায় এটি সভামণ্ডপে বা মিছিলে সমবেত কণ্ঠে গীত হতে থাকে। উল্লেখ্য, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের এটি ছিল খুব প্রিয় গান। বস্তুত 'ঢাকা রেকর্ড'-এর পরিবেশনায় সমবেত কণ্ঠে গীত এই গানটিই স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে নিয়মিত প্রচার করা হত। এ কথা যে কোনো সচেতন ব্যক্তিই অস্বীকার করতে পারবেন না যে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সিংহভাগ অনুপ্রেরণা এই গানটিই সেদিন যুগিয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' গানটি আমাদের মাতৃসঙ্গীত। এই গানের কথাগুলো আমাদের বহু আকাঙ্ক্ষিত জাতীয়তাবোধ ও দেশাত্মবেধের নির্মল সঞ্জীবনী-রস।

বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলাপ

শামসুজ্জামান খান

১৯৭৪ সাল। হঠাৎ করেই সুযোগ হয়ে গেল বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাতের। তারিখ মনে আছে, লেখাও আছে ডাইরিতে। ৩ ফেব্রুয়ারির সকাল ন'টা। তাঁর ধানমণ্ডির বাড়িতে সাক্ষাতের সময় নির্ধারিত হয়েছে। আমরা ঠিক সময়ে গিয়ে হাজির হলাম। বাংলা একাডেমীর তৎকালীন মহাপরিচালক ড. মাযহারুল ইসলাম, লেখক-সাংবাদিক ও আমাদের বন্ধু রাহাত খান, আমি আর বাংলা একাডেমীরই সংস্কৃতি বিভাগের জিল্লুর রহমান।

তাঁর নিচের বৈঠকখানায় তখন অনেক লোক। বঙ্গবন্ধু লুঙ্গি পরা, পাঞ্জাবি গায়ে, তার ওপরে বাদামি রঙের একটা শাল চড়ানো, হাতে পাইপ আর তাঁর প্রিয় এরিনমোর তামাকের কৌটা। আমাদের দেখে প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বিশাল মানুষটির মুখটা উজ্জ্বল হাসিতে ভরে গেল। অন্যদের বললেন, 'না, আজ আর কোনো কথা নয়, তোমরা আসো এখন, আমি এদের জন্য সময় দিয়ে রেখেছি। এদের সঙ্গে নিরিবিলিতে কিছু জরুরি আলাপ করব।' বৈঠকখানা ভর্তি লোক ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় নিষ্ক্রান্ত হতে থাকলেন। তিনি বললেন, না, এখানে বসব না। তাহলে কেউ না কেউ আসবেই। আমি মন খুলে কিছু কথা বলতে চাই।

তাঁকে খুব সুন্দর আর প্রাণবন্ত লাগছিল। তিনি উঠলেন। ধীরে এগোলেন তাঁর পাঠকক্ষের দিকে। আমরা তাঁকে অনুরসণ করছি সম্মোহিতের মতো। পাঠকক্ষের ভেতরে এসে একটা আলমিরার সামনে দাঁড়ালেন। এবং অভ্যস্ত হাতে বের করলেন মাও সে তুংয়ের একটা বই। তারপর ঘুরে দাঁড়ালেন ড. ইসলামের দিকে। মুচকি-মুচকি হাসতে হাসতে বললেন, 'শুধু রবীন্দ্রনাথ না, আমি নজরুল, সুকান্ত এমন কি মাও সে তুংয়ের রচনাও মনোযোগ দিয়ে পড়ি।' আমাদের মধ্যে কেউ একজন বললেন, 'আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে চীনের ভূমিকা তো.....' তিনি সে কথা শেষ করতে দিলেন না। বললেন, 'দুটো বিষয় তো আলাদা। মাও একজন খুব বড় নেতা। জীবনে বহু সংগ্রাম করেছেন। তাঁর জীবন ও চিন্তাটাও বোঝা দরকার। একটা অনুন্নত বিশাল দেশকে তিনি স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন। সে দেশটায় এত মানুষ হওয়া সত্ত্বেও কত উন্নত হয়েছে। এই ব্যাপারটা কীভাবে ঘটেছে তা উপলব্ধি করার চেষ্টা করছি।'

হঠাৎ তাঁর মুখটায় একটু বেদনার ছায়া পড়ল। কিছুক্ষণ চুপ থাকলেন। তারপর বললেন, 'রাজনীতি বড় জটিল, নিষ্ঠুর। এর ফলে কত অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটে। তা না হলে চীনের আমাদের সমর্থন না করার কোনো যুক্তিই নেই। চীন খুব অন্যায় কাজ করেছে। থাকগে, আসুন প্রফেসর সাহেব, বসে বসে কথা বলি।'

বঙ্গবন্ধু বসলেন, প্রফেসর ইসলাম এবং আমরাও বসলাম। তিনি বললেন, 'বলুন, প্রফেসর, কী মনে করে এসেছেন।' ড. ইসলাম বললেন, 'বঙ্গবন্ধু, আমরা বাংলা একাডেমী থেকে একটি আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজন করছি। বিভিন্ন দেশ থেকে বিখ্যাত সাহিত্যিকরা আসবেন। আপনাকে সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে পেতে চাই।'

তিনি যেন আকাশ থেকে পড়লেন। তাঁর প্রত্যুত্তর: 'আমি সাহিত্যের কী বুঝি! আমি কী বলব। একজন প্রবীণ ও সর্বজনশ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক বা পণ্ডিতকে দিয়ে এ কাজ করান– সম্মেলনের মর্যাদা বাড়বে। আগে তো তাই হত। ছাত্রজীবনে দু'একবার সাহিত্য সম্মেলনে যোগ দিয়েছি। কই, রাজনৈতিক নেতারা তার উদ্বোধন করেছেন বলে তো মনে পড়ে না– এই বলে তিনি হাসলেন, পরিস্থিতিকে একটু সহজ করার জন্য বললেন, 'আমি রবীন্দ্রনাথ পড়ি, ভালোবাসি তাঁকে– সাহিত্যে আমার পুঁজি তো এইটুকুই। এই পুঁজি নিয়ে দেশ-বিদেশের বড়-বড় পণ্ডিত-সাহিত্যিক-শিল্পীদের মধ্যে যেতে আমি সঙ্কোচ বোধ করছি।'

তাঁকে বলা হল, এটা স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সাহিত্য সম্মেলন। এর একটা ভিন্ন তাৎপর্য রয়েছে। আপনি সম্মেলন উদ্বোধন করলে তা আন্তর্জাতিক মর্যাদা লাভ করবে। তাছাড়া গণতন্ত্র, মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও মানবিকতার প্রশ্নে আপনার ও আপনার সরকারের দৃষ্টিভঙ্গিরও প্রতিফলন ঘটবে।

তিনি একটু ভাবলেন, বললেন, 'ঠিক আছে, যাব। আমার বন্ধু জসীমউদ্‌দীন ও শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনকেও বিশেষ

মর্যাদায় আমন্ত্রণ জানাবেন। আর একটি ছোট ভাষণ প্রস্তুত করে আমাকে দেখিয়ে নেবেন।

ড. ইসলাম, খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস, সন্তোষ গুপ্ত, রাহাত খান ও আমি সেই ভাষণটি প্রস্তুত করি। যা হোক, সম্মেলনপ্রসঙ্গ স্বল্প সময়ে শেষ করে তিনি বললেন, 'আপনারা সাহিত্যিক, সাংবাদিক, সাংস্কৃতিক কর্মী ও গবেষক। ভবিষ্যতে আপনারা হয়তো মুক্তিযুদ্ধ বা বাংলাদেশ নিয়ে লিখবেন, তাই আমি আজ কিছু কথা বলতে চাই। তিনি 'বাংলাদেশ' নাম কীভাবে ঠিক করেছিলেন, দেশকে স্বাধীন করার চিন্তা তিনি যে সেই পঞ্চাশের দশক থেকেই করেন, সে কথাও বললেন। 'সোনার বাংলা'কে জাতীয় সঙ্গীত করবেন– এ স্বপ্ন তাঁর বুকের ভেতরে আলোর মতো জ্বলত। এ গান শুনলে তিনি রোমাঞ্চিত হতেন, তাও জানালেন। ঠিক মনে পড়ছে না, রাহাত খান অথবা আমি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার কথা তুললাম। তিনি আবার হাসলেন। বললেন, 'কিসের ষড়যন্ত্র। বলুন, আমাদের স্বাধীনতার প্রয়াস।' এরপর এ-প্রসঙ্গে বিস্তৃত বিবরণ ও ব্যাখ্যা তুলে ধরেন। ১৯৭১-এর স্বাধীনতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, '২৫ মার্চ (১৯৭১) রাতে আমি স্বাধীনতার ঘোষণা দেই। পুলিশ হেড কোয়ার্টারের মাধ্যমে ওয়্যারলেসে সে ঘোষণা সব জেলা সদরে পাঠানো হয়। আমি বিভিন্ন চ্যানেলে ভারতের সঙ্গেও যোগাযোগ করে যাই। তা না হলে তোমরা অত সহজে অস্ত্র ও সাহায্য-সহযোগিতা পেতে না।'

আমরা প্রশ্ন করলাম, 'কিন্তু আপনি কেন ওদের হাতে ধরা দিলেন।'

তিনি বললেন, 'এ-ব্যাপারে বেশ ক'টি চিন্তা কাজ করেছে। এক. আমাকে ধরতে না পারলে ওরা আরও বেশি লোককে খুন করত; দুই. আন্তর্জাতিকভাবে আমরা বিচ্ছিন্নতাবাদী ও ভারতের ক্রীড়নক বলে প্রমাণিত হতাম এবং এতে আন্তর্জাতিক সহমর্মিতা কমত এবং আরও বেশি দেশ আমাদের আন্দোলন সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করত। আর একটা কথা বলি, তোমরা কীভাবে নেবে জানি না, প্রফেসর সাহেব আমার সঙ্গে একমত হবেন কি না তাও বলতে পারি না, তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমি পাকিস্তানিদের হাতে বন্দি থাকায় আমার দুঃখী বাঙালিদের মধ্যে দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ যেমন বেড়েছে, তেমনি মানুষ আমার অনুপস্থিতিতে আমার একটা বিশাল প্রতীক মনে মনে তৈরি করে নিয়েছে। এটা ছিল মুক্তিযুদ্ধের খুব বড় একটা শক্তি। আমি প্রবাসী সরকারে থাকলে শুধু প্রমাণ সাইজের মুজিবই থাকতাম। ওদের হাতে বন্দি থাকায় আমি এক মহাশক্তিধর ও বাংলাদেশের সকল মানুষের প্রাণপ্রিয় নেতার ভূমিকায় স্থান পাই। মানুষ আমার নাম নিয়ে হেলায় হেসে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। কী অমোঘ অস্ত্র ছিল 'জয় বাংলা' স্লোগান! ওরা যদি আমাকে মেরে ফেলত, তাহলে আমি আরো বড় প্রতীকে পরিণত হতাম। বাংলার মানুষ আরও লড়াকু হয়ে যুদ্ধ করত। তাছাড়া আমার জাতি আমাকে যে মর্যাদা দিয়েছে তার প্রতি সম্মান রেখেই আমি আমার বুঝমতো ব্যবস্থা নিয়েছি, আর আমার দেশবাসী ও যোগ্য সহকর্মীরা মুক্তিযুদ্ধ চালিয়েছে।'

আলাপের এ পর্যায়ে এসে আমি জিজ্ঞেস করি, আরো খোলামেলা কথা বলার সুযোগ আমাদের কাছে আছে কিনা। তিনি বললেন, 'সবাইকে বিদায় করে তোমাদের নিয়ে বসেছি। আমার অন্তর খোলাসা করেই বসেছি। তোমরা বাংলা একাডেমীর লোক, তোমরা লেখ, গবেষণা কর, আমি তো তোমাদের কাছেই প্রাণ খুলে কথা বলতে পারি। ভবিষ্যতে তোমরা ইতিহাস লিখলে এইসব খুব কাজে লাগবে। তোমরা সত্য ইতিহাস লিখতে পারবে।'

আমরা বললাম, 'সমাজের মূল্যবোধ ও বাঁধন তো ভেঙ্গে পড়েছে। নৈরাজ্য, হতাশা দেখা দিচ্ছে। সাম্প্রদায়িকতা বাড়ছে। ছিনতাই রাহাজানি মানুষকে আতঙ্কিত করছে।'

তিনি একটু চুপ করে থাকলেন, মনে হল গভীরভাবে ভাবছেন। তারপর উজ্জ্বল হাসি হেসে মুখে নিলেন পাইপ। ঘন ঘন ক'টা টান দিলেন তাতে। তারপর মুখ খুললেন, 'তোমরা অনেক পড়াশোনা করেছ– অনেক কিছু বোঝো। কিন্তু নিজ দেশের কতগুলি বাস্তব ব্যাপার তোমরা যেন দেখতে পাও না। দেশে এত বড় একটা যুদ্ধ হয়ে গেল। যুদ্ধ মানুষের মূল্যবোধ আমূল বদলে দেয়। মানুষকে বেপরোয়া, লাগামহীন করে। আমাদের দেশেও সেটা হয়েছে। হাইজ্যাক-ডাকাতি বেড়েছে– 'চাটার দল' বেড়েছে। এইসব একদিনে দমন করা যাবে না। এটা একটা নতুন পরিস্থিতি। অনেকে অস্ত্র জমা দেয় নাই। ইসলামি দলগুলি আগাগোড়া আমার বিরুদ্ধে গোপন প্রচার করছে– বেনামা পুস্তিকা ছাপছে। জাসদ-এর বিভ্রান্ত অংশ বিপ্লবের নামে কী না করছে! দুস্কৃতকারীরা পাটের গুদামগুলি পুড়িয়ে দিয়ে অর্থনীতিকে কাবু করছে। থানা আক্রমণ করে অস্ত্র লুটে নিচ্ছে। অথচ তিন বছরে আমরা যা করেছি, আমাদের মতো বিধ্বস্ত অন্য কোনো দেশ তা পারত না। এ জন্য আমাদেরও প্রশংসা করে না। কী অবস্থা করে রেখে গেছে পাকিস্তানি হানাদাররা? দেশটা ছিল ভাঙাচুরা একটা শ্মশান যেন। কী আর বলব, হুজুর (মওলানা ভাসানী) মুরুব্বী মানুষ, তিনি যে সব বক্তৃতা-বিবৃতি দিচ্ছেন তাকে লুফে নিচ্ছে সাম্প্রদায়িক দল ও ব্যক্তিরা। তাঁরা তাকে শিল্ড হিসেবে ব্যবহার করে শয়তানের হাসি হাসছে। এইসব দেখেশুনে মনে হয় তাজউদ্দীনের হাতে ক্ষমতা দিয়ে ভোলা বা মনপুরায় গিয়ে ছোট্ট ঘর বানিয়ে থাকি।' তাঁর কণ্ঠে তখন মৃদু ক্ষোভ ও হতাশার সুর।

নেতার এই আকস্মিক বেদনা ও হতাশায় আমরাও কিছুক্ষণের জন্য বিমূঢ় হয়ে যাই। ড. ইসলাম বলেন, বঙ্গবন্ধু, আমরা তো আছি, সারাদেশে আপনার হাজার-হাজার কর্মী ও সমর্থক আছে, আপনি হতাশ হচ্ছেন কেন? কঠোর হোন

নির্দেশ দিন।' তিনি বললেন, 'ডাক্তার সাহেব, বাংলাদেশ কঠিন জায়গা। মনে হয় যেন বাঘের পিঠে চড়ে বসেছি। পারি, পারি, সব ঠিক করে দিতে পারি। কিন্তু কী করব, কার গায়ে হাত দেব, সবারই পরিবার-পরিজন আছে। তখন আপনারাই আসবেন আবার তদবির নিয়ে। কিন্তু বেশিদিন তো সহ্য করা যাবে না। শক্ত একটা কিছু করতে হবে। আমি 'লালঘোড়া' দাবড়াইয়া দিতে চেয়েছিলাম। তা দিতে চেয়েছিলাম চাটার দলের ওপর। কেউ-কেউ তা পছন্দ করল না। আমার সমালোচনা করল। এখন আমি যাই কোথায়! এই জন্যই তো বলি, সব ছেড়ে দিয়ে ভোলা-মনপুরায় চলে যাই।'

আমরা এবার অর্থনৈতিক প্রশ্ন তুলি। তিনি বলেন, 'আমি দেশের সেরা অর্থনীতিবিদদের নিয়ে পরিকল্পনা কমিশন করেছিলাম। তারা তো আমার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে পারল না। আসলে তত্ত্ব আর বাস্তবতার মধ্যে পার্থক্য অনেক। ওঁরা (পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যরা) ভালো লোক, পণ্ডিত, কিন্তু আমাদের গ্রামবাংলা আর গ্রামীণ অর্থনীতির সঙ্গে বোধহয় এদের ভালো পরিচয় নেই। আমি সোনার মানুষের কথা বলি। আমার কৃষকেরাই সোনার মানুষ। তারা সারা বছর হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে ফসল ফলায়, ঘরবাড়ি বানায়, নৌকা চালায়। তাদের জন্যই না আমরা বাবু সেজে পায়ের ওপর পা তুলে আরো কত বড় হব তার খোয়াব দেখি। তেমনি মুটে-মজুর, জেলে, কামার-কুমার তারা আমাদের সমাজ ও অর্থনীতিকে টিকিয়ে রেখেছে। তা না হলে সব ভেঙে পড়ত। আমরা সমাজতন্ত্রের কথা বলেছি, সমবায়ের কথা বলেছি। দেশের যা অবস্থা, মধ্যবিত্তের যা খাই-খাই ভাব তাতে সফল হব কিনা জানি না। চেষ্টা করছি। আমি ভিয়েতনামকে দ্রুত স্বীকৃতি দিয়েছি। হো চি মিন কত বড় নেতা, আর খাঁটি মানুষ, তাঁরা কী করছেন, সেখান থেকে শিক্ষা নেবার চেষ্টা করছি। বড় বড় ইন্ড্রাস্ট্রি করে বোধ হয় আমারা খুব সুবিধা করতে পারব না। আমি সমবায় ও কৃষিভিত্তিক ছোট ছোট প্রকল্পে হাত দিতে চাই। ঔপনিবেশিক কাঠামোটা ভাঙতে চাই। তবে সে বড় কঠিন কাজ। আমার কিছু এমপিই জমির সিলিং ১০০ বিঘা করার বিপক্ষে।'

হঠাৎ তিনি কিছুটা যেন উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠেন। রাহাত আর আমার দিকে তাকিয়ে বলেন, 'তোরা হতাশ হবি না। প্রফেসর সাহেব, আমার এই কথাটা খুব মন দিয়ে শোনেন। বাঙালি খুব গরিব, দরিদ্র, আমার ভাষায় 'দুঃখী'। আমি যতটাই ইতিহাস পড়েছি তাতে জেনেছি, হাজার বছর ধরেই বাঙালি দুঃখী, অভাবী। তার বিত্ত নাই, বেসাত নাই। হাতে পয়সা নাই। কিছুদিন আগে একটা উপন্যাস পড়েছিলাম, 'কলকাতার কাছেই।' তাতেও আছে বাঙালি কাঁচা পয়সার কী কাঙাল! একটা পয়সার জন্য কী 'কেগিভেগি' (অনুনয়-বিনয়) করত! মনে হয় শায়েস্তা খাঁর আমলেও বাঙালি কাঙালিই ছিল। সস্তা হলেও কোনো জিনিস সে কিনতে পারেনি। ডাক্তার সাহেব, এরা তো (অর্থাৎ আমরা) সে দিনের ছাওয়াল। এরা বুঝবে না। কিন্তু আপনি আমি জানি। বাঙালির, বিশেষ করে কৃষিজীবী মুসলমান বাঙালির হাতে কোনো কাঁচা পয়সা থাকত না। ধান কাটার মরশুমে পেট পুরে গরম ভাত খেতাম। আর পাটের সময় হলে পাট বিক্রি করে কিছু নগদ পয়সা জুটত। এই টাকা দিয়ে আমাদের বাবা-চাচারা ইলশা মাছ কিনে আনতেন। মা-চাচির জন্য শাড়ি আর নিজেদের জন্য লুঙ্গি কিনতেন। আমাদেরও নতুন কাপড় জুটত বছরে পাটের মরশুমে ওই একবারই। এই তো বাঙালি মুসলমানের অর্থনৈতিক অবস্থা।'

'এই অবস্থাটা মনে রেখে ভাবো স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের কথা। প্রকৃত অর্থে এই প্রথম বাঙালিরা সত্যিকার অর্থে স্বাধীন হয়েছে। এবং এই প্রথম বাঙালির হাতে নগদ পয়সা আসছে। ব্যাপারটা খুব বড় তাৎপর্যপূর্ণ। এর একটা উত্তেজনা আছে। বাঙালি, বিশেষ করে তরুণরা এখন বাঁধনহারা। সমাজ পরিবর্তনের প্রবল ও আকস্মিক ধাক্কায় দিশেহারা। কেউ গাড়ি কিনছে, কেউ ফাইভ ফাইভ ফুঁকছে, কেউ ছিনতাই-হাইজ্যাকসহ নানা আকাম-কুকাম করছে। অবাধ স্বাধীনতার এই আকস্মিক স্বাদ ও হাতে আসা নগদ অর্থ দিশেহারা করেছে অনেককে। ধীরে ধীরে রাষ্ট্রীয় আইন-কানুন ও প্রতিষ্ঠান তৈরি করে এদের দায়িত্বসচেতন করা হবে। নিয়ন্ত্রণে আনা যাবে। আনতে হবে। দেশটা তো শুধু মধ্যবিত্তের না, আমার গরিব ও দুঃখী মানুষেরও। আসল ত্যাগ তো তারাই স্বীকার করেছে। তাদের অবস্থার পরিবর্তন যদি করতে পারি তবেই অর্থনৈতিক মুক্তি আসবে। আমার দেশের মানুষ আমাকে 'জাতির পিতা' বলে, কতজন আমার জন্য জান দিয়েছে– আমার দায়িত্ব বড় বেশি। আপনারা সাহায্য করেন, সোনার মানুষ দেন, আমি সোনার বাংলা গড়ে তুলি।'

সেদিনের মতো আমাদের সঙ্গে তাঁর আলাপ এভাবেই শেষ হল। তিনি তাঁর ক্যামেরাম্যান আলমকে ডাকলেন। নতুন যে ক্যামেরা কিনে দিয়েছেন তা ঠিকমতো কাজ করছে কিনা জানতে চাইলেন। পরে আমাদের সঙ্গে ছবি তুললেন। আলমকে বললেন, 'এই ছবির কপি বাংলা একাডেমীতে এদের পৌঁছে দিবি। এই ছবির আলাদা গুরুত্ব আছে।'

না, আলম সাহেব আমাদের কোনো ছবি দেননি। জিল্লুর রহমান বহুদিন তাঁর কাছে ঘুরেও সে ছবি আদায় করতে পারেননি। আমরা সবাই বঙ্গবন্ধুর আদেশ-নির্দেশ ও কথা এইভাবে অমান্য করেছি। সেজন্যই আন্তরিক ও সরল মানুষটি কাউকে অবিশ্বাস করতে পারেননি। তিনি বোধহয় রবীন্দ্রনাথের ওই বিখ্যাত উক্তি 'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ'-এ প্রবল আস্থা রাখতেন। এটাই তাঁর জন্য কাল হয়েছিল। তিনি ডালিমদেরও বিশ্বাস করেছিলেন। বাড়িতে এসে ঘুরে-ফিরে সবকিছু দেখতে দিয়েছিলেন।

দুই

বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আমাদের দ্বিতীয়বার আলাপের সুযোগ ঘটে কিছুকাল পরেই এবং সেটাও বাংলা একাডেমীর কাজেই। তখন একাডেমীর মহাপরিচালক ড. নীলিমা ইব্রাহিম– আমাদের শ্রদ্ধেয়া নীলিমা আপা। তিনি নিয়োগ পেয়ে সৌজন্য-সাক্ষাৎ করতে যান বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে। একাডেমীর কয়েকজন সিনিয়র অফিসারকেও তিনি সঙ্গে নেন। আমিও সেই দলে ছিলাম। আমাদের সহকর্মী ও গল্পলেখক আবুল হাসানাতও ছিলেন তাতে। হাসানাত তখন বঙ্গবন্ধুর ওপর খুব ক্ষুব্ধ। তিনি তাঁর 'বাবাই দায়ী' গল্পগ্রন্থেও এই ক্ষোভের কিছু ছাপ দিয়েছেন। আমরা তাঁকে বলি, 'Politics is a difficult game', ভেতর থেকে না দেখলে সবকিছু বোঝা যায় না।

তিনি আমাদের কথায় আশ্বস্ত হন না। তো আমি তাঁকে বলি, আমাদের দলের সঙ্গে তুমিও চলো। তোমার ক্ষোভ অভিযোগ সামনা-সামনিই বলবে। আবুল হাসানাত বলেন, 'হ্যাঁ, গিয়ে ওই সব ক্ষোভ জানিয়ে চাকরিটা হারাই।'

আমি বলি, 'তোমার চাকরি রাখার দায়িত্ব আমি নেব।'

তিনি শেষ পর্যন্ত রাজি হন এবং আমরা বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে নীলিমা আপার নেতৃত্বে তাঁর ধানমণ্ডির বাড়ির নিচতলায় ড্রয়িং রুমে কথা বলি। প্রথমে আপা সৌজন্য বিনিময় করেন। পরে একাডেমী কেমন চলছে বঙ্গবন্ধু তা জানতে চান। নিয়ম-কানুন যে আগে তেমন মানা হয়নি সে-প্রসঙ্গ ওঠে। বঙ্গবন্ধু ইঙ্গিতটি বোঝেন এবং কোনো নাম উচ্চারণ না করে বলেন, 'হ বইন, সব দোষ আমার। যত দোষ নন্দ ঘোষ।' তিনি একটু বিড়-বিড় করে বলেন, 'কী আর করব, যেখানে যাকে বসাই সেখানেই সে সমস্যার সৃষ্টি করে।'

আপা একাডেমীর জন্য সাহায্য-সহযোগিতা চাইলেন। বঙ্গবন্ধু বললেন, বাংলা একাডেমীর কোনো সমস্যা হবে না।

সেদিন বঙ্গবন্ধু খুব ব্যস্ত ছিলেন, শেষদিকটায় কথা হল দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে। আমি হাসানাতকে নিয়ে সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। তিনি আমার কাঁধে একটা হাত রাখলেন। মনে হল পিতৃপরশ পাচ্ছি। অন্য একটা হাত বাড়িয়ে হাসানাতের বুকের মধ্যে মৃদু আঙ্গুল ঠেকিয়ে কথা বলতে থাকলেন। আমি হাসানাতের চোখের দিকে তাকালাম। সে চোখে তখন কোমল, কমনীয় স্নিগ্ধতা। আবেগে সে বিনম্র হয়ে উঠেছে। কোনো কথাই সে বলল না। বঙ্গবন্ধুর কথা শুধু শুনে গেল।

সাক্ষাৎকার শেষে বেরিয়ে এসে বললাম, 'কই হাসানাত, তুমি যে কিছুই বললে না?' হাসানাত বলল, 'এ যে রাজনৈতিক জাদুকর। আমাকে মুগ্ধই, অভিভূত করে ফেললেন। কোনো কথাই মুখ থেকে বের করতে পারলাম না। অত বড় ব্যক্তিত্ব আর আন্তরিকতার নিজস্ব ধরন দিয়ে আমাকে একেবারে গলিয়ে ফেললেন।'

তিন

বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আমার তৃতীয় সাক্ষাৎকারটি ঘটে ১৯৭৫-এর



জুনে, শেরে বাংলা নগরে তাঁর অফিস তৎকালীন গণভবনে। আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যান শ্রদ্ধেয় কবীর চৌধুরী। কবীর স্যারের নেতৃত্বে আমরা ক'দিনের মধ্যেই মস্কো যাব– সে ব্যাপারেই সাক্ষাৎ করতে যাওয়া। আমরা আফ্রো-এশীয় লেখক সম্মেলনে যোগ দেবার জন্য যাচ্ছিলাম। দলটি গঠিত হয়েছিল চার জনকে নিয়ে, বাকি দুই জন খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস ও মোস্তফা সারওয়ার। তা ছোট দেশ থেকে এত বড় দল সাধারণত যায় না। দু'জনই যথেষ্ট। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর ইচ্ছাতেই দলটি বড় হয়। সোভিয়েত দূতাবাস নিশ্চিত হতে চাইছিল, বঙ্গবন্ধু চার জনকে পাঠাতে চান কিনা। ওই দূতাবাসের দ্বিতীয় সচিব আলেকজান্ডার পার্সিন বঙ্গবন্ধুর সচিবালয়ে এসে এ বিষয়ে একদিন আলাপ করে যান।

কবীর স্যার ও আমি যখন তাঁর ঘরে ঢুকি তখন তাঁকে একটু উত্তেজিতভাবে পায়চারি করতে দেখি। অবশ্য কবীর স্যারকে দেখেই খুবই আগ্রহ ও আন্তরিকতার সঙ্গে এগিয়ে এসে তাঁকে ধরে নিয়ে সোফায় বসান তিনি। আমিও বসি। তখন ভেতরে ছাত্রলীগের কিছু ছেলে ছিল। তাদের মধ্যে একজন বঙ্গবন্ধুকে বলে, 'আপনি ছাত্র ইউনিয়নের সম্মেলনেও তো গেলেন।'

তিনি আবার উত্তেজিত হলেন। বললেন, 'যাব না কেন? আমি শুধু তোমাদের নেতা? আমি সকলের। তা না হলে আমি জাতির পিতা হতে পারতাম না।' আরো বললেন, 'তোমাদের কাজে আমি সন্তুষ্ট হতে পারি না সব সময়। ছাত্র ইউনিয়নের ওরা পরিশ্রমী, নিষ্ঠাবান, ত্যাগী। ওরা সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানে সীডবেড করে উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করেছে।

'আমি একটি মাত্র জাতীয়ভিত্তিক পার্টি করছি। ত্যাগী, সৎ লোকেরা কাজের মাধ্যমে সেই পার্টির সামনের কাতারে

আমি পাকিস্তানিদের হাতে বন্দি থাকায় আমার দুঃখী বাঙালিদের মধ্যে দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ যেমন বেড়েছে, তেমনি মানুষ আমার অনুপস্থিতিতে আমার একটা বিশাল প্রতীক মনে মনে তৈরি করে নিয়েছে। এটা ছিল মুক্তিযুদ্ধের বড় একটা শক্তি। .... ওরা যদি আমাকে মেরে ফেলত, তা হলে আমি আরো বড় প্রতীকে পরিণত হতাম। বাংলার মানুষ লড়াকু হয়ে যুদ্ধ করত।

আসবে। অকর্মণ্য গলাবাজরা পিছনে পড়বে। দেখো না, আমি আলতাফ সাহেবকে মন্ত্রী করেছি। এমন একটা লোক পাওয়া ভাগ্যের কথা।'

ছেলেরা চুপ হয়ে গেল। তিনি বললেন, 'এবার তোমরা যাও, প্রফেসর সাহেবের সঙ্গে আমার জরুরি কথা আছে।'

তিনি আমার দিকে ফিরে বললেন, 'তিন জনকে আমি আগেই ব্রিফ করেছি। তখন তুমি ছিলে না। প্রফেসর সাহেব তোমাকে নিয়ে এসে ভালোই করেছেন। তুমি দলের বয়োকনিষ্ঠ সদস্য। দলনেতার নির্দেশমতো চলবে। দেশের সুনাম যেন নষ্ট না হয়। আর আমাদের কিছু কাগজপত্র নিয়ে যাও। ফরাসরা (ফরাসউদ্দিন, তাঁর তৎকালীন প্রাইভেট সেক্রেটারি) ব্যবস্থা করে দেবে।'

পরে কবীর স্যারের দিকে ফিরে বললেন, 'চৌধুরী সাহেব, ভাগ্যের কি নিষ্ঠুর পরিহাস, সারাজীবন গণতন্ত্রের জন্য আন্দোলন করলাম, কত জেল খাটলাম আর এখন একপার্টি করতে যাচ্ছি। আগস্ট মাস থেকে বাকশালের কাজ পুরোপুরি শুরু হবে। আমি এটা চাইনি। বাধ্য হয়ে করতে হচ্ছে। পাকিস্তানপন্থী বিভিন্ন ইসলামি দল এবং অস্ত্রধারী জাসদের গণবাহিনী, সর্বহারা পার্টি প্রভৃতি প্রশাসন ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতাকে ভেঙে ফেলার উপক্রম করে ফেলেছে। আমার বহু লোককে অন্যায়ভাবে হত্যা করছে। অতএব অন্য কোনো পথ খোলা না দেখে আমি স্বাধীনতার পক্ষের লোকদের নিয়ে সমমনাদের একটি রাজনৈতিক মঞ্চ হিসেবে বাকশাল গঠন করছি। আমি সমাজতন্ত্রবিরোধী, ধর্মনিরপেক্ষতা-বিরোধী এবং সর্বোপরি মুক্তিযুদ্ধবিরোধী কোনো দল বা ব্যক্তিকে বাকশালে নেব না। আরো একটি কথা, আমার ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার জন্য নয়, দেশকে বাঁচানোর জন্য এই পদক্ষেপ। আমি ক্ষমতা অনেক পেয়েছি, এমন আর কেউ পায়নি। সে ক্ষমতা হল জনগণের ভালোবাসা ও নজিরবিহীন সমর্থন। প্রফেসর সাহেব, শোনেন, তুমিও লিখে রেখো, আমার এই একদলীয় ব্যবস্থা হবে সাময়িক। দেশটাকে প্রতিবিপ্লবের হাত থেকে রক্ষা করে আমি আবার গণতন্ত্রে ফিরে যাব। বহুদলীয় গণতন্ত্রে ফিরে যাব। তবে চেষ্টা করব আমার গণতন্ত্র যেন শোষকের গণতন্ত্র না হয়। আমার দুঃখী মানুষ যেন গণতন্ত্রের স্বাদ পায়।'

তিনি বলেন, 'আমাকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল দালাল ও রাজাকারদের ক্ষমা না করতে। খুব কঠোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল– শামসুজ্জামান জানে বোধহয়, প্রতিবিপ্লবীদের ধ্বংস করে দিতে। আমি তা করিনি। তাদের কুকীর্তির কথা জেনেও করিনি। আমার চোখে-মুখে ভেসেছে অসংখ্য মা-বাবা, স্ত্রী ও শিশুর মুখ। আমার মনে হয়েছে, আল্লার আরশ কাঁপবে না? আমি মানবিক হতে চেয়েছি। অনেকগুলি পরিবারকে ধ্বংস করি নি। আমি জাতির স্রষ্টা হয়ে সেটা করতে পারি না। আমি ভুল করেছি কি ঠিক করেছি ইতিহাস একদিন সে বিচার করবে।'

বাকশালে যোগদানের ব্যাপারে কোনো বাধ্যবাধকতা ছিল না। অনেকেই এতে যোগ দেয়নি। বঙ্গবন্ধু এতে কিছুই মনে করেননি। সাংবাদিকরা প্রতিযোগিতা করে যোগ দিয়েছেন। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যোগ দেওয়ার জন্য লাইন ধরে ফুলের মালা নিয়ে গিয়েছে। কিন্তু কবি শামসুর রাহমান, নির্মলেন্দু গুণ, শওকত ওসমান, আবু জাফর শামসুদ্দীন– এঁরা যোগ দেননি। বাংলা একাডেমী যোগ দেয়নি। মরহুম জিয়াউর রহমান ও বেগম জিয়াকে বাকশাল অফিসের একটা সভায় দেখেছিলাম, মতিয়া চৌধুরীর পাশে বসেছিলেন। মোস্তফা সারওয়ার সে-সভা পরিচালনা করেন। সভা শেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও তাঁরা উপভোগ করেন। পরদিন কাগজে তাঁর ছবি ছাপা হয়।

'শেখ মুজিব একটি লাল গোলাপ' বই থেকে সংকলিত

টুঙ্গিপাড়া থেকে টুঙ্গিপাড়া

সুব্রত বড়ুয়া

বঙ্গবন্ধুকে আমি সরাসরি কিছুটা কাছে থেকে প্রথম দেখি ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। বঙ্গবন্ধু সেবার বাংলা একাডেমী আয়োজিত অমর একুশে অনুষ্ঠানমালার উদ্বোধন করতে এসেছিলেন। আমার ঠিক মনে নেই; তবে সেবার অনুষ্ঠান ছিল বোধ হয় তিন দিনের। খোলা মঞ্চ। প্যান্ডেলও ছিল না। মাত্র আড়াই মাস আগে অনুষ্ঠিত জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে আওয়ামী লীগ। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করেছেন, পাকিস্তানের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হতে যাচ্ছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

দেশে সামরিক শাসনের অবসান ঘটতে যাচ্ছে। আবার কায়েম হবে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা। সবার মনে সুদিনের প্রত্যাশা। মানুষ প্রাণ খুলে কথা বলতে পারবে। জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবেন। উন্নতির পথে, প্রগতির পথে এগিয়ে যাবে দেশ।

কিন্তু সত্যিই তা হবে তো? সুসময়ের প্রত্যাশার পাশাপাশি স্বপ্নভঙ্গের আশঙ্কাও যে ছিল। বঙ্গবন্ধু উঠে দাঁড়ালেন তাঁর ভাষণ দিতে। সে ভাষণের সব কথা আজ আর পুরোপুরি মনে নেই। মনে থাকার কথাও নয়। কিন্তু দুটি বিষয় বেশ ভালোভাবেই মনে আছে। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, তিনি পণ্ডিত নন, বুদ্ধিজীবীও নন। তিনি একজন সাধারণ মানুষ। সাধারণ মানুষদের সঙ্গে নিয়েই রাজনীতি করেন। পণ্ডিতজনের হিসাব করা মাপজোক করা তত্ত্বের বন্ধনে আবদ্ধ রাজনীতি করতে তিনি জানেন না। সাধারণ মানুষই তাঁর রাজনীতির জগৎ। তাদের ভালোমন্দই তাঁর রাজনীতির সাধনা।

আরেকটি কথা বলেছিলেন বঙ্গবন্ধু। সেটি তাঁর ভয়ের কথা, আশঙ্কার কথা, উদ্বেগের কথা। তিনি বলেছিলেন, ফেব্রুয়ারি মাস, মার্চ মাস বাঙালির রক্ত ঝরার মাস। নির্বাচনে জেতাই শেষ কথা নয়। নির্বাচনের রায় বানচাল করে দেওয়ার জন্যে ষড়যন্ত্র চলছে। বাঙালিরা যাতে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শাসনক্ষমতায় যেতে না পারে তার জন্যে ষড়যন্ত্র চলছে। অতএব সতর্ক থাকতে হবে, সজাগ থাকতে হবে। পূর্ব বাংলার মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রাম যাতে ব্যর্থ না হয় তার জন্যে সারাক্ষণ প্রস্তুত থাকতে হবে আমাদের সবাইকে।

বঙ্গবন্ধুর সেদিনের সেই আশঙ্কা মিথ্যে ছিল না– ইতিহাসই তার প্রমাণ। মাত্র দশ-এগারো দিন পরই প্রকাশ পেল ষড়যন্ত্রের ঘটনা। কিন্তু বাংলার মানুষকে দমিয়ে রাখার ষড়যন্ত্র, ভয় দেখিয়ে, ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে, গণহত্যা সংঘটিত করে বাংলার মানুষকে সেদিন স্তব্ধ করা যায়নি। সাতই মার্চ (১৯৭১) রেসকোর্স ময়দানে লাখো মানুষের উত্তাল সমাবেশে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' তাঁর সে উচ্চারণ সত্য হয়েছিল তিরিশ লক্ষ মানুষের আত্মদানের মাধ্যমে, লাখো মা-বোনের সম্ভ্রম হারানোর মাধ্যমে আর বাংলার চাষি-মজুর-ছাত্র-জনতার মরণপণ সংগ্রামের মাধ্যমে।

স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ অর্জনের জন্যে বাংলার মানুষের যে সংগ্রাম সে সংগ্রামের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তিনি ছিলেন পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি– একা, নিঃসঙ্গ। তাঁর মনোবল চূর্ণ করার জন্য পাকিস্তানি সামরিক জান্তা বাইরের দুনিয়া থেকে তাঁকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল। বাইরের পৃথিবীর কোনো খবর জানতে পারতেন না তিনি। বাংলাদেশে কী ঘটছে সে খবরও জানতে পারেননি তিনি সে সময়।

কিন্তু অনুপস্থিত বঙ্গবন্ধুই ছিলেন সেদিন নয় মাসব্যাপী মুক্তিযুদ্ধের আসল নেতা। তাঁর সাতই মার্চের ভাষণই হয়ে দাঁড়িয়েছিল বাংলার মানুষের প্রেরণার মন্ত্র। তিনিই ছিলেন মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশ সরকারের প্রধান– রাষ্ট্রপতি। বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে সৈয়দ নজরুল ইসলাম পালন করেন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব।

বঙ্গবন্ধুর সাহসী নেতৃত্বই স্বাধীনতা অর্জনের মূলশক্তি। তারই স্বীকৃতি রয়েছে আমাদের গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সংবিধানে। তিনিই এ দেশের প্রধান স্থপতি– জাতির জনক।

ফরিদপুরের গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া গ্রামের এই মানুষটি ছিলেন সাধারণ এক মধ্যবিত্ত কৃষক পরিবারের সন্তান। তিনি খুব ঘনিষ্ঠভাবেই পরিচিত ছিলেন বাংলার খেটে-খাওয়া গরিব মানুষদের প্রতিদিনের জীবন-সংগ্রামের সঙ্গে। তাঁর রাজনীতির কেন্দ্রে ছিল এই মানুষদেরই জীবন। তাদের প্রতি ভালোবাসাই ছিল তাঁর রাজনীতির শক্তি। আর সে রাজনীতি ছিল বাস্তব জীবনের সঙ্গে অটুট বন্ধনে আবদ্ধ। তাই সে রাজনীতি কখনও স্বার্থপরতার মধ্যে বন্দি হয়ে থাকেনি; নিশ্চিল নিথর হয়ে থাকেনি কোনো ছক-বাঁধা পথের মধ্যে।

ছাত্রজীবন থেকেই রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়েছিলেন তিনি। সে বন্ধন জীবনে আর কখনও ছিন্ন করতে পারেননি। কারণ, রাজনীতি নয়, আসলে মানুষের ভালোবাসার কাছেই বাঁধা পড়েছিলেন তিনি। আর তিনি তো সত্যিই জানতেন, ভালোবাসার



টুঙ্গিপাড়ায় নিজের জন্মস্থানে জাতির পিতার কবরের পাশে বসে দোয়াদরূদ পড়ছেন শেখ হাসিনা

বন্ধন এক নিষ্ঠুর বন্ধন, জীবন দিয়ে শোধ করতে হয় তার মূল্য।

আর রাজনীতি? সেখানেও আছে তাঁর অনন্য বৈশিষ্ট্য। নিজেকে পরিণত করেছেন প্রতিনিয়ত, বেরিয়ে এসেছেন প্রশস্ততর পরিসরে, নতুন সময়ের নতুন দাবির সঙ্গে অনায়াসে যুক্ত করেছেন নিজেকে। আর এই যুক্ত করার মধ্যে তাঁর কোনো চালাকি ছিল না, মতলব ছিল না, আখের গোছানোর বুদ্ধিও ছিল না।

বাংলার শান্ত নিরিবিলি ছায়া-ঢাকা পাখি-ডাকা এক গ্রাম টুঙ্গিপাড়া থেকে উঠে এসেছিলেন তিনি। সিক্ত হয়েছেন মানুষের ভালোবাসায়। মানুষের মধ্যে মানুষেরই জন্যে বেঁচে থাকতে চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু নিয়তির কাছে পরাজিত হলেন শেষ পর্যন্ত। প্রতিক্রিয়াশীল শোষকচক্রের ষড়যন্ত্রে স্বাধীন বাংলাদেশেরই কিছু বিপথগামী সেনাসদস্যের হাতে সপরিবারে নিহত হলেন ১৫ আগস্ট, ১৯৭৫ ভোরে। ঘাতকচক্রের বুলেট সেদিন রেহাই দেয়নি শিশু ও নারীদেরও।

কিসের এত অন্ধ আক্রোশ? কী অপরাধ করেছিলেন বাঙালির এই মহানায়ক? বাংলার মাটি ও মানুষকে ভালোবাসাই কি ছিল তাঁর একমাত্র অপরাধ? ষড়যন্ত্রকারী ঘাতকচক্র সেদিন তাঁর মরদেহ দাফনের জন্য ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল জন্মভূমি টুঙ্গিপাড়াতেই। নিভৃত গ্রামের মাটির নিচেই তাঁকে স্তব্ধ করে রাখতে চেয়েছিল তারা। আর নিয়তির কী নিষ্ঠুর পরিহাস– সেই টুঙ্গিপাড়াই আজ বাঙালির নতুন তীর্থভূমি।

জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ শিশু একাডেমী প্রকাশিত স্মরণিকা থেকে সংকলিত

আমার শেখ মুজিব

বেলাল বেগ

মুক্তিযোদ্ধা, বিজ্ঞানী ও লেখক ড. নূরন নবী তাঁর অসাধারণ আত্মকথামূলক বই 'জন্মেছি এ বাংলায়' উল্লিখিত এক মন্তব্যে বলেছেন, শেখ মুজিব কর্মী হিসেবে তাঁকে খুঁজে পাবার আগে তিনি তাঁকে (শেখ মুজিব) নেতা হিসেবে আবিষ্কার করেছিলেন। ড. নূরন নবী যে পরিবেশে সূর্যের মতো শেখ মুজিবকে দেখতে পেরেছিলেন, উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িকতাভিত্তিক রাজনীতির উদ্ভব না হলে তা হয়ত সম্ভব হত না। অনুরূপভাবে, বাংলাদেশ নামক স্বাধীন দেশে শোষণ-ভিত্তিক সামন্তবাদী এবং ঔপনিবেশিক সমাজের অস্তিত্ব না থাকলে আমার সঙ্গেও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দেখা হত না।

পাকিস্তানের উভয় অংশের মধ্যে সম্প্রীতির বন্ধন গড়ে তোলাকে বিকলাঙ্গ পাকিস্তানের অস্তিত্ব বজায় রাখার একটা উপায় হিসেবে মনে করা হত। ঐ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে সরকারি বৃত্তি নিয়ে লাহোরে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার আমার সুযোগ হয়েছিল। প্রথমে পড়াশোনা এবং পরে টেলিভিশনে প্রশিক্ষণ গ্রহণর জন্য আমি তিন বছরেরও বেশি সময় পাকিস্তানে ছিলাম। ঐ সময়ে পাকিস্তানের সর্বশ্রেণির মানুষের সঙ্গে মেশার আমার একটা সুযোগ হয়েছিল। আমি লক্ষ করেছি, পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ নিরক্ষর, পশ্চাৎপদ ও দরিদ্র হওয়া ছাড়াও ছিল একবারেই ধর্মান্ধ। তখন আমাদের সাধারণ মানুষ তাদের মতোই নিরক্ষর, পশ্চাৎপদ ও দরিদ্র ছিল বটে, কিন্তু কখনই ধর্মান্ধ ছিল না। তাদের তুলনায় আমাদের মানুষের মানসলোক অনেক বেশি আলোকিত ছিল। অন্যদিকে পাকিস্তানি সমাজের উপরতলার মানুষগুলি ছিল উপনিবেশবাদপালিত সামন্তবাদী শোষক। সীমান্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব, সিন্ধু বা বেলুচিস্তানের গ্রাম-গঞ্জের মতো ইস্ট পাকিস্তানও তাদের কাছে নেহায়েত একটি শোষণক্ষেত্র ছিল। আমাদের উন্নত সংস্কৃতি এবং আলোকিত ইতিহাস সম্বন্ধে তাদের কোনো ধারণাই ছিল না। পাকিস্তানে প্রথমে ছাত্র ও পরে সরকারি কর্মচারী হিসেবে অর্জিত অভিজ্ঞতার ফলে আমি জানতাম, এ রাষ্ট্রে আমাদের কোনো ভবিষ্যত নেই। তখন অনেকে গোপনে এমন ধ্যানধারণা পোষণ করতেন। একবার ঢাকা-লাহোর আকাশপথে বিমানে বসে আমি কয়েকজন বাঙালি সিএসপি অফিসারকেও এ ব্যাপারে ফিসফাস আলোচনা করতে দেখেছি। বঙ্গবন্ধু ৬-দফা দাবি উত্থাপন করে আমাদেরই ঐ না-বলা চিন্তা-চেতনাকে প্রবলভাবে প্রকাশ্য করেছিলেন। আমি ৬-দফা সমর্থন করলেও পাকিস্তান-উচ্ছেদের ধারণাকে উগ্র মনে করতাম। কারণ, ৬-দফায় বাঙালিদের জাতীয় মুক্তির কথা থাকলেও বাঙালি দরিদ্র মানুষের মুক্তির কথা ছিল না, অথচ তখন পাকিস্তান কি ভারতের মৌলিক সমস্যাই ছিল পশ্চাৎপদতার অবসান ও দারিদ্র্যমুক্তি। কিন্তু পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার সে পথে না গিয়ে শোষণ ও দমনের পথ ধরে। পূর্ব বাংলা পশ্চিম পাকিস্তানি ধনিক-বণিক সমাজের লুণ্ঠনের চারণভূমি হয়ে পড়ে। উচ্চ-মূল্যবোধসম্পন্ন অধিকার-সচেতন নিম্ন ও মধ্যবিত্ত বাঙালি এর বিরুদ্ধে ক্রমশ ফুঁসতে থাকে। বঙ্গবন্ধু ছিলেন এই জেগে ওঠা বাঙালির ইচ্ছা-সম্রাট। তাঁর কাছে আমি গোপনে বশ্যতা স্বীকার করলাম, কিন্তু তখন পর্যন্ত তিনি আমার মন জয় করতে পারেননি।

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর দারিদ্র্যমুক্তির সংগ্রামের নতুন প্রেক্ষিত দেখা দিল। সকল ধর্মের ধনী-নির্ধন লক্ষ লক্ষ বাঙালি স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিয়েছে, কোটি কোটি মানুষ সর্বস্ব ত্যাগ করেছে এই স্বাধীনতার জন্য। হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান, ধনী-গরিব সকল বাঙালির রক্তের



সাগরে কোনো দল বা গোষ্ঠীর রক্ত আলাদাভাবে সনাক্ত করার আর উপায় থাকল না।

স্বাধীনতার পর অকল্পনীয় শক্তিতে জেগে ওঠা সকল শ্রেণির মানুষ নিজ নিজ ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে তাদের স্বপ্নগুলি হাতের মুঠোয় পেতে চাইল রাতারাতি। এমন অচিন্ত্যপূর্ব পরিস্থিতির জন্য কেউ প্রস্তুত ছিলেন না; না বঙ্গবন্ধু, না দেশের মানুষ। দেশের মানুষ অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য স্বাধিকার চেয়েছিল এবং বঙ্গবন্ধু তার জন্য 'বজ্রকণ্ঠে' হাঁক দিয়েছিলেন। পাকিস্তানি লুটেরা শাসকগোষ্ঠী আমাদের ন্যায়সংগত অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংগ্রামের গুরুত্ব না বুঝে, আমাদের শান্তিকামী নিরীহ মানুষদের যুদ্ধ ও ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়। এই যুদ্ধ গরিব মানুষদের জীবন ও সমাজকে প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় বা সুনামির মতো লণ্ডভণ্ড করে দেয়। স্বাধীনতার পর সমস্ত মানুষের অন্ন-বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা প্রভৃতি সকল মৌলিক চাহিদা পূরণের সমস্যা একসঙ্গে দেখা দেয়। ধ্বংসপ্রাপ্ত অর্থনীতি ও যোগাযোগ ব্যবস্থার পুনরুদ্ধার ছাড়াও স্বাধীন দেশের জন্য রাতারাতি একটি প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও শাসনতন্ত্রও দরকার। ওদিকে শত্রুরা পরাজিত হলেও শত্রুতা অব্যাহত রেখে সর্বত্র ষড়যন্ত্রের বিষ ঢেলে যাচ্ছিল। অবস্থা সামাল দিতেই বঙ্গবন্ধু প্রকৃত বন্ধুর মতোই সকল দায়িত্ব ও বিপদ নিজের কাঁধে তুলে নিলেন। এমন সাহস কেবলমাত্র তিনিই দেখাতে পারেন– যিনি অবলীলাক্রমে বলতে পারেন, "রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেব, এদেশকে মুক্ত করেই ছাড়ব ইনশাআল্লাহ।" তখনকার পরিবেশ, পরিস্থিতিতে নিজেকে প্রেসিডেন্ট বানানো ও বাকশাল গঠন কেবলমাত্র একজন যুগান্তকারী দেশপ্রেমিকের পক্ষেই সম্ভব ছিল। বঙ্গবন্ধুর ঐ চিন্তাগুলি কত মৌলিক ও গভীরভাবে আন্তরিক ছিল তার প্রমাণ বাকশাল গঠন উপলক্ষে দেওয়া জাতীয় সংসদে তাঁর ভাষণ।

৭ই মার্চে দেওয়া তাঁর অলৌকিক ভাষণের মতো সংসদে দেওয়া ভাষণটিও ছিল স্বতঃউৎসারিত, অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে জলপ্রপাতের মতো নির্গমিত। বস্তুত বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণেই তাঁর অধিকাংশ মৌলিক চিন্তা প্রকাশিত হয়েছে। ঐ নিরাভরণ বলিষ্ঠ ঋজু ভাষণের ভাব, ভাষা, বক্তব্য ও ব্যক্ত প্রেমের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু একটা অশরীরী আত্মার মতো আমার ভিতরে ঢুকে গিয়েছিলেন। আমি নিশ্চিত জানতাম মণি সিংহের মতো তিনিও আমার একজন নেতা এবং সম্ভবত তাঁর চেয়েও বড়।

বাকশাল গঠনের পূর্বে আমার কাছে বঙ্গবন্ধু ছিলেন নিম্ন ও মধ্যবিত্ত বাঙালির নেতা। বাকশাল গঠনকালে জাতীয় সংসদে দেওয়া ভাষণের পর থেকে আমি আবিষ্কার করলাম, তিনি শোষিত মানুষেরও নেতা। তিনি বলেছিলেন, পৃথিবীতে দু'রকম মানুষ আছে–একদল শোষক ও অন্যদল শোষিত। 'আমি শোষিত মানুষের পক্ষে।' একজন বক্তৃতাপ্রিয় মানুষের পক্ষে এটা একটা কথার কথা হতে পারত, কিন্তু বৃটিশ ঔরসজাত ব্যুরোক্রেসিকে যখন তিনি ধ্বংসের আহ্বান জানান তখনই আমি জানলাম– সত্যে, বিশ্বাসে এবং আবেগে তিনিই আমাদের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ সন্তান।

বাংলাদেশে অর্থনৈতিক শোষণ ও শ্রেণিসংগ্রামের গতি-প্রকৃতি নিয়ে তখন সমাজতান্ত্রিক শিবিরে নানা তত্ত্বের কুস্তাকুস্তি চলছিল। ঠিক সে সময় বঙ্গবন্ধু বলে দিলেন, "ও মিঁয়ারা, আমি একটা কথা সাফ সাফ কয়া দিবার চাই, সাফ-কাপুড়্যা মানুষ থাইকা বাঁইচা থাইকবা।" দরিদ্র মানুষদের জীবনের বাস্তবতা এবং বুর্জোয়া শোষণকে এমন সহজ মেঠো-ভাষায় পৃথিবীর আর কোথাও প্রকাশ করা হয়েছে কিনা, আমরা জানি না। আপাদমস্তক বাঙালি ছিলেন বলে বঙ্গবন্ধু বাঙালির সহজাত সমাজতান্ত্রিক জীবনবোধকে এত সহজে ধারণ করতে পেরেছিলেন।

'বঙ্গবন্ধু স্মারকগ্রন্থ' থেকে সংকলিত

● এই উপমহাদেশের সমগ্র অঞ্চল বা কোনো বিশেষ অংশের সঙ্গে ধর্ম বা সমাজের শ্রেণিগত কাঠামোর দিক দিয়ে আমাদের অনেক সাদৃশ্য রয়েছে। কিন্তু স্বতন্ত্র পরিচয় রাখার ক্ষেত্রে আমাদের অদম্য ইচ্ছাই এসব কিছুকে অতিক্রম করেছে। এই আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হচ্ছেন বঙ্গবন্ধু এবং এটাই এই বিশেষ মানুষটা আর জনতার মধ্যে গড়ে তুলেছিল এক অবিচ্ছেদ্য সেতুবন্ধন।

জাতীয় অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক

● বঙ্গবন্ধু খুবই সচেতন মানুষ ছিলেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকে যেভাবে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তা খুবই প্রশংসনীয়।

জ্যোতি বসু
পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী

● হত্যাকারীদের কাছে বঙ্গবন্ধুর এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ সহচরদের একমাত্র অপরাধ ছিল বাংলাদেশের সৃষ্টি। একথা যাঁরা বোঝেন না, তাঁদের বোঝাতে চাওয়া বৃথা। যাঁরা বঙ্গবন্ধুকে ছোট করার চেষ্টা করেন কিংবা আরো বড় করতে গিয়ে ছোট করে ফেলেন, তাঁদের জানতে হবে– ইতিহাসে বঙ্গবন্ধু অমরত্ব লাভ করেছেন। তিনি যা তিনি তা-ই, তাঁর আসন ধূলি-মলিন হওয়ার নয়।

ড. আনিসুজ্জামান
শিক্ষাবিদ, প্রাবন্ধিক

মুজিব ফিরে আসে

মহাদেব সাহা

যখন ভোরে আকাশ জাগে শিশির পড়ে ঘাসে
পাখিডাকা সেই সকালে মুজিব ফিরে আসে,
নদীর বুকে বৃষ্টি নামে যখন ওঠে ঢেউ
মুজিব বলে, আসছি আমি, ডাকছে আমায় কেউ ।

মিষ্টি ফুলের গন্ধে যখন আকুল করে বন
ফিরে আসে মুজিব বড় সবার প্রিয়জন,
সাঁঝ-আকাশে যখন ফোটে লক্ষ কোটি তারা
ফিরে আসে মুজিব যেন হাজার প্রাণের ধারা;
মার্চে যখন বাংলা জুড়ে স্বাধীনতার ডাক
মুজিব আসে, দেশটি নতুন জীবন ফিরে পাক,
যখন ভোরে মায়ের কোলে শিশুরা সব হাসে
শিশুর মুখের সেই হাসিতে মুজিব ফিরে আসে ।

দিয়েছিলে অসীম আকাশ

আসাদ চৌধুরী

আমাকে দিয়েছিলে তুমি অসীম আকাশ।
আকাশটা পেয়েছিলাম আমি, আমরাই।
পেয়েছিলাম অনেকের ত্যাগে, সাধনায়।
পেয়েছিলাম
কেন না তুমিই চেয়েছিলে
আমাদের ঘাড় থেকে নেমে যাবে
দুঃখ-অপমানের ভারী ভারী বোঝা।
দু'চোখ থেকে দুঃস্বপ্নের দিনগুলো,
রাতগুলো
চিরকালের জন্য অদৃশ্য হয়ে যাবে।
ক্ষুধা আর ভয়,
দেশে নয়, কেবল অভিধানেই পাওয়া যাবে
সেই দুঃসময়ে
খরখরে খরায়
গাছ-ওপড়ানো ঝড়ের মধ্যে
তুমি একটি নির্মল আকাশের স্বপ্ন বুনেছিলে
আমাদের তন্দ্রাচ্ছন্ন চোখে।
সেই আকাশের নিচে বসেই
শহিদ ভাইয়ের কবরের পাশে দাঁড়িয়ে
শুকনো রুটি চিবুতে চিবুতে
আমরা যখন তোমার নাম ধরে গালাগাল দিচ্ছিলাম
তখন সেই আকাশে মেঘ জমেছিল,
তখন, হায় ক্লান্ত মানুষ!
তুমিও নিজের কাছেই নিজে অপরিচিত হয়ে উঠেছ।
এ দেশের প্রতিটি ঘাস, ধূলিকণা তোমাকে চেনে,
প্রতিটি বৃক্ষের পাতা তোমার কণ্ঠস্বরে
দুলে দুলে উঠত এক সময়।
ঘরে-পোষা আদরের হালাল পশু
তোমার নামে উৎসর্গ করা হত।
অথচ আততায়ীদের বুলেট স্পর্শ করেছিল
এই অপরিচিত বিচ্ছিন্ন মানুষটিকেই।
তখন থেকেই আকাশ
ছোট হতে হতে
হয়ে উঠল সোনালি খাঁচা;
আর তোমার সোনার বাংলার
ঝোপঝাড়-জঙ্গল-আঁস্তাকুড় থেকে
হালুম করে লাফিয়ে উঠল
ভীতি আর লালসা,
বর্বর অমানুষতা
আর আমাদের ক্ষমাহীন নিষ্ক্রিয় উদাসীনতা।
সেই আকাশের স্বপ্নটা দুলতে থাকল,
তরুণ-তরুণীদের উজ্জ্বল চোখের রুপোলি চামিচে
তখন সমকালীন ইতিহাস নিয়ে
সাপ-লুডো খেলছে
স্মৃতি-বিস্মৃতির রাজনীতি।

মুজিব শিশু বাংলাময়

মুহম্মদ নূরুল হুদা

জনক জনক ডাক পাড়ি
জনক আছে নিজ বাড়ি ।

উজানভাটির হাল খুলে
নৌকারা যায় পাল তুলে ।
শিশু-কিশোর দাঁড় বায়
জনক হাসে আপন নায় ।

মায়ের কোলে বাবার বুকে
টুঙ্গিপাড়া ঘুমায় সুখে ।
টুঙ্গিপাড়ার নাম অশেষ
টুঙ্গিপাড়ার বাংলাদেশ ।

আয়রে সবাই ঘরে আয়
জাতিরাষ্ট্র এ বাংলায় ।
বাংলা জোড়া একটি জাতি
এই মোহনা একই জ্ঞাতি ।

দোয়েল চড়ুই ধানশালিক
সকাল দুপুর বৈকালিক ।
উড়তে উড়তে কেবল কয়,
'মুজিব শিশু বাংলাময় ।'

সব বাঙালির একটি স্বর
জাতির জনক মুজিবর ।
জনক জনক ডাক পাড়ি
জনক এখন নিজ বাড়ি ।

আমার বাড়ি তোমার বাড়ি
মুজিব বাড়ি মুজিব বাড়ি ।
সব বাঙালির তীর্থবাড়ি
মুজিব বাড়ি মুজিব বাড়ি ।

পাঠ্য বইয়ে যে কথা নেই

রফিক আজাদ

পাঠ্য বইয়ে যে কথা নেই সেই কথাই শুনবে?
সত্য বচন শোনার পরও আর কি প্রমাদ গুনবে?
যাঁর চেষ্টায়, ত্যাগ-তিতিক্ষায় এই দেশটির জর্ম,
তাঁরই নামটি ভুলিয়ে দেয়া! এতই সহজ কর্ম?

দু'যুগ ধরে যাঁর আদর্শে সারাটি দেশ লড়লো,
তিরিশ লক্ষ বীর বাঙালি হাসিমুখে মরলো
অনাদিকাল সেই মানুষটির কথা লোকে কোটি মুখে বলবে,
বুকের ভেতরে অরূপরতন মুখচ্ছবি সারাক্ষণই জ্বলবে ।
এদেশেরই ধূলিকণায় অঝোর ধারায় থাকবে যে নাম বহমান,
প্রিয় সে মুখ আর কেউ নয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ।

সাতই মার্চ ১৯৭১
নাসির আহমেদ

বাংলাদেশের ইতিহাসে এমন দিন তো আর আসেনি
লক্ষ মানুষ স্রোতের মতো রেসকোর্সে আর ভাসেনি!
গণজোয়ার স্লোগানমুখর : 'জিন্দাবাদ আর কমু না
এক ঠিকানাই বাঙালিদের : 'পদ্মা-মেঘনা-যমুনা।'
জয়বাংলা স্লোগান ওঠে, বাংলা এবার জেগেছে
রক্তে স্বাধীনতার দোলা ঢেউয়ের মতন লেগেছে।

মঞ্চে এলেন জাতির নেতা, লক্ষ করতালিতে
বীর-জনতা গর্জে ওঠে, সূর্য যেন বালিতে
ঢাললো আগুন তপ্ত কথার অনন্য এক ভাষণে;
ইয়াহিয়া উঠলো টলে স্বৈরাচারের আসনে।

জাতির নেতা সেই ভাষণে পষ্ট দিলেন জানিয়ে
এই সংগ্রাম স্বাধীনতার, যার যা আছে তা নিয়ে
ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ো; দিলাম হুকুম আমি এ–
কোর্টকাচারি বন্ধ করো, সব কিছু দাও থামিয়ে।
মহান নেতার সেই আদেশেই বিক্ষোভে দেশ কাঁপিয়ে
বীর বাঙালি অসহযোগ-যুদ্ধে পড়ে ঝাঁপিয়ে।

এক ভাষণেই পাল্টে গেল বাংলাদেশের ছবি যে
ভাষণ তো নয় কাব্য যেন, লিখে গেলেন কবি যে–
তোমরা জানো কবি কে? শেখ মুজিবুর রহমান
বাংলাদেশের নদীর মতোই জাতির প্রাণে বহমান।

সাহসী সঞ্চয়

হাবীবুল্লাহ সিরাজী

জ্যোৎস্নাময় মধ্যরাতে চুরি গেলো সোনার মুকুট
সঙ্গে গেলো হীরের আঙটি, লাল নাক-ফুল টিপ
রক্তভেজা একখণ্ড সবুজ কাপড় উড়তে-উড়তে
পদ্মা-যমুনার পানি ছুঁয়ে বাংলাদেশ হয়ে গেলো

চুরি গেলো পালানের গাই-গরু মাঠের ফসল
লেকের ফুটন্ত-পদ্ম, অরণ্যের বাঘ, পোষা পাখি
বত্রিশ হাজার বর্গমাইলের আকাশ-বাতাস ।

চুরি গেলো হাত-বাক্সে জমা রাখা একটি হৃদয়
চুরি গেলো আট কোটি মানুষের সাহসী সঞ্চয় ।

মুজিব

মুহাম্মদ সামাদ

মুজিব আমার স্বপ্ন-সাহস
মুজিব আমার পিতা
মুজিব আমার শৌর্যে-বীর্যে
নন্দিত সংহিতা ।

মুজিব আমার শিরায় শিরায়
রক্তে রক্তে প্রেম
মুজিব আমার ভালোবাসার
সূর্য-সবুজ হেম ।

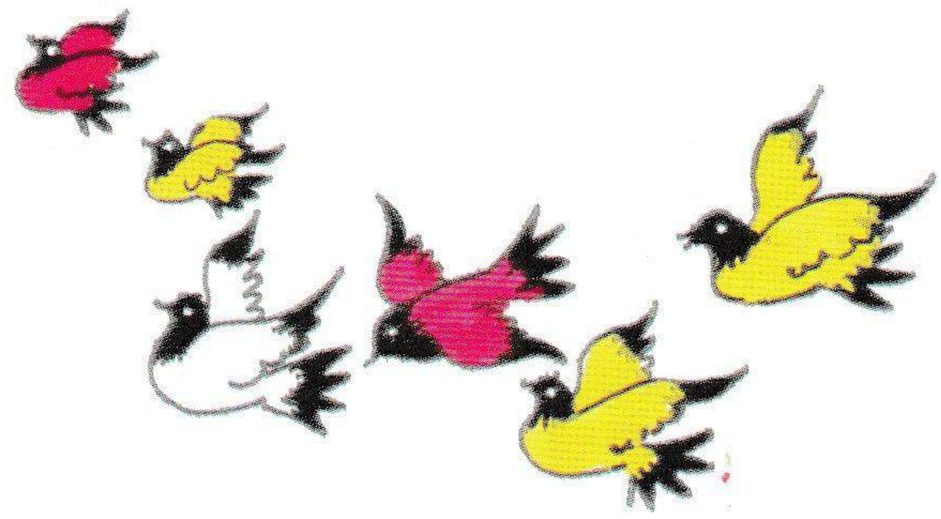
মুজিব আমার স্বাধীনতার
অমর কাব্যের কবি
মুজিব আমার হৃদয়পটে
চিরসবুজ ছবি ।

মুজিব আমার পরশপাথর
পবিত্র নিষ্পাপ
মুজিব আমার বাংলা জুড়ে
একটি লাল গোলাপ!!

একটি স্বপ্ন

শিহাব সরকার

এমন হতে পারতো নাকি–
তিনি আছেন জীবিত তাঁর অস্তিত্বের মায়া ছড়িয়ে দেশব্যাপী
তিনি আছেন কোলাহল থেকে দূরে, নিভৃত কুটিরে
তাঁর আঙিনা-ভর্তি শালিক পায়রা মুনিয়া হরিণ শাবক
পাখিরা তাঁর হাত থেকে খুটে নিচ্ছে শস্যদানা
দীঘির কিনারে এসে দাঁড়ানো মাত্র লাল নীল
মাছেরা ছুটে আসছে ঝাঁকে ঝাঁকে ।
এখন তাঁর বিশ্রাম প্রয়োজন, তিনি সৌম্য বৃদ্ধ
স্মৃতির ফেলে আসা জনপদ রণক্ষেত্র ঝড়ের অলিগলি
ঘুরে এসে এবার কিছুদিন নিজের মধ্যে একলা ভ্রমণ ।
আমরা জানি তিনি শহরে নেই
অথচ তিনি আছেন ওতপ্রোত জড়ানো আমাদের স্বপ্ন ও বাস্তবে
তাঁকে ছাড়া আমরা অসহায়, সামান্য দুর্বিপাকে
ছুটে যাই তাঁর কাছে, তিনি পথ দেখান অসীম ধৈর্যে
তাঁর সোনার বাংলা আজ অফুরন্ত আনন্দমেলা
তিনি আমাদের শক্ত পায়ে দাঁড়াতে শিখিয়ে
প্রকৃতির ভিতরে গেছেন, বড় ক্লান্ত তিনি;
কতদিন হাঁটেননি খালি পায়ে কুয়াশা-ভেজা দূর্বায়
কচুরিপানার জলগন্ধ নাকে এসে লাগেনি কয় যুগ!
তিনি আমাদের উঠে দাঁড়াতে শিখিয়ে
ছুটি নিয়ে গেছেন স্মৃতিদের গ্রামে
তিনি পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী, পরিতৃপ্ত পিতা ।
এমনও হতে পারতো নাকি–
পনেরো আগস্ট পঁচাত্তরের ভোররাতে
ভীষণ দুঃস্বপ্ন নিশ্চুপ বসে থেকে তারপর
এসে দাঁড়ালেন ব্যালকনিতে:
'এ কী দেখলাম বাংলা মাগো, মানুষ আমাকে মেরেছে?
আমার এ পোড়া বুকে যে মানুষেরই ঠাঁই'
অনেক দিন পর সময় নিয়ে তিনি সূর্য ওঠা দেখলেন ।



মুজিবকে সালাম জানাই

অসীম সাহা

তাই তাই তাই তাই, মামাবাড়ি যাই
মামী বলে, 'মুজিবের নাম শোনো নাই?'

"শোনো সব ছেলে-মেয়ে তোমরা তো বোকা
তোমাদের মতো ছিল সে-ও এক খোকা ।

বড় হয়ে মুজিবুর হলো প্রিয় পিতা
মহৎ মানুষ ছিল, গরিবের মিতা ।

এই মিতা এনেছিল স্বাধীন স্বদেশ
ঘাতকেরা তাই তাঁকে করেছিল শেষ ।

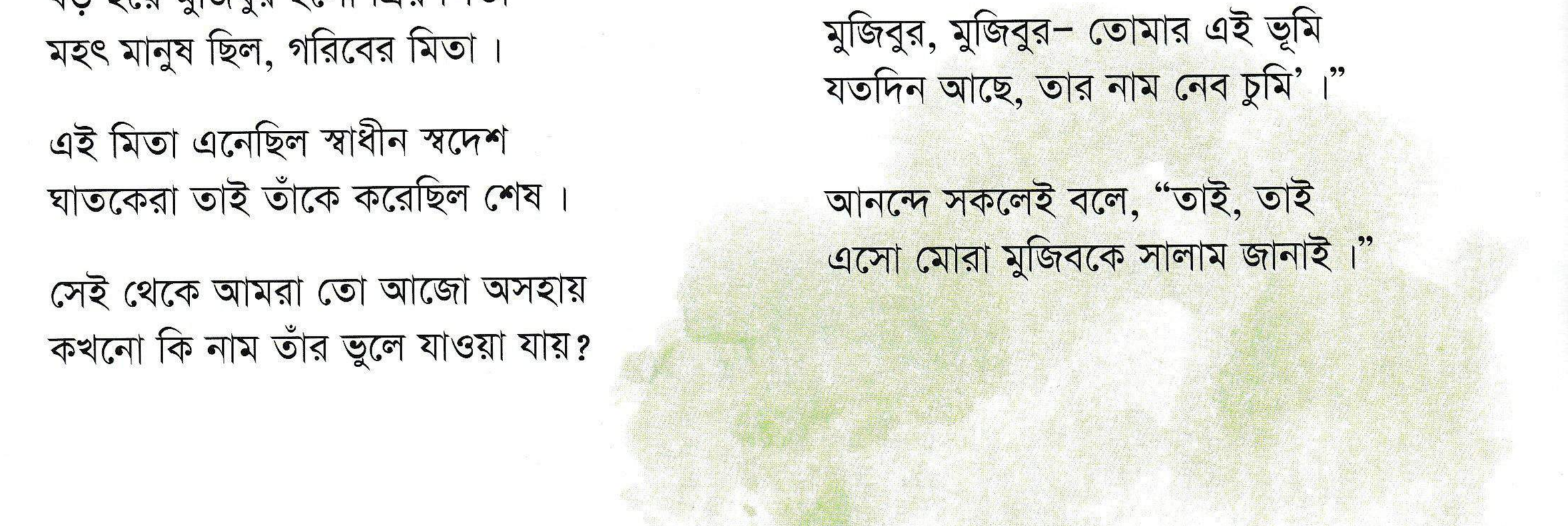
সেই থেকে আমরা তো আজো অসহায়
কখনো কি নাম তাঁর ভুলে যাওয়া যায়?

অথচ তোমরা আজো, জানো না তো কিছু ।"
কথা শুনে সকলেই মাথা করে নিচু

মামীর কণ্ঠ থেকে সব শুনে যাই
আমাদের ডেকে বলে : "বলো না সবাই–

মুজিবুর, মুজিবুর– তোমার এই ভূমি
যতদিন আছে, তার নাম নেব চুমি' ।"

আনন্দে সকলেই বলে, "তাই, তাই
এসো মোরা মুজিবকে সালাম জানাই ।"



সেই মুখখানি কবিতার বড় ছিল

কামাল চৌধুরী

সেই মুখখানি স্বাধীনতা প্রিয় ছিল
সেই মুখখানি মিছিলে মানব হতো
উত্থিত হাতে শ্লোগানে চলায় মিলে
সেই মুখখানি অগ্নির সাথি ছিল ।

আমার কান্না বিষাদের কালো দিনে
সেই মুখখানি একা মহীরুহ ছিল
মারী ও মড়কে মানুষের তাণ্ডবে
সেই মুখখানি পৃথিবীর প্রেম ছিল ।

তাঁর চলা ছিল পদ্মার জলস্রোত
হু-হু বেগে এসে ধুয়ে নিত সব গ্লানি
তাঁর বলা ছিল মেঘে বিদ্যুতে ডাক
স্লোগানে মিছিলে শব্দিত হয়ে থাকা
সেই মুখখানি আমাদের পিতা ছিল ।

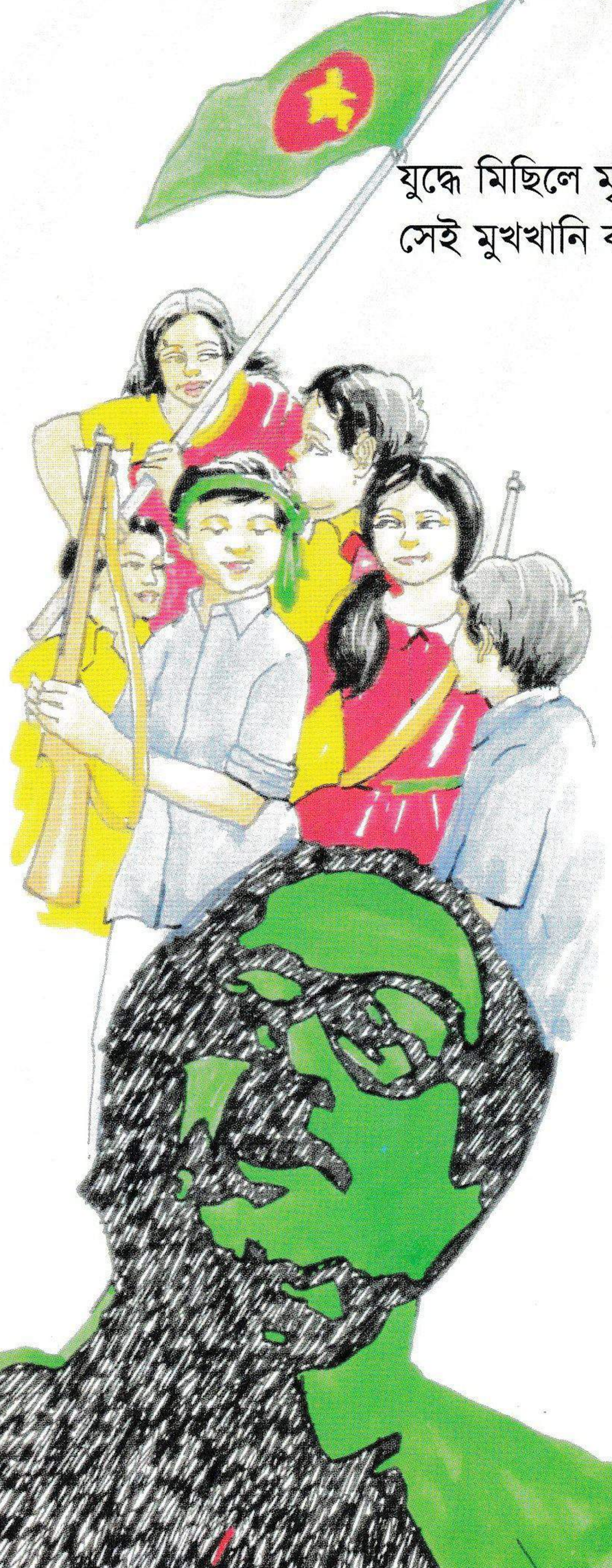
আমার স্বদেশে রক্তের ঘোলা জলে
তাঁর হাত দুটো উদ্যত রাইফেল
যুদ্ধে বারুদে শহীদের লাশ ছুঁয়ে
শিবিরে শিবিরে সকল রণাঙ্গনে
সেই মুখখানি স্বদেশের ছায়া ছিল ।

মৃত্যুর রাতে তরতাজা সেই মুখ
রক্তে বুলেটে একাকার শুয়ে ছিল
ধুপধুনাহীন বারুদের প্রিয় ঘ্রাণে
সেই মৃতদেহ যুদ্ধ প্রেরণা ছিল ।

শিশিরের কাছে পদচিহ্নের মতো
সেই মুখখানি বারবার ফিরে আসে
রক্ত বারুদ যুদ্ধের স্মৃতি শুঁকে
সেই মুখখানি আঁকতে চেয়েছি কতো ।

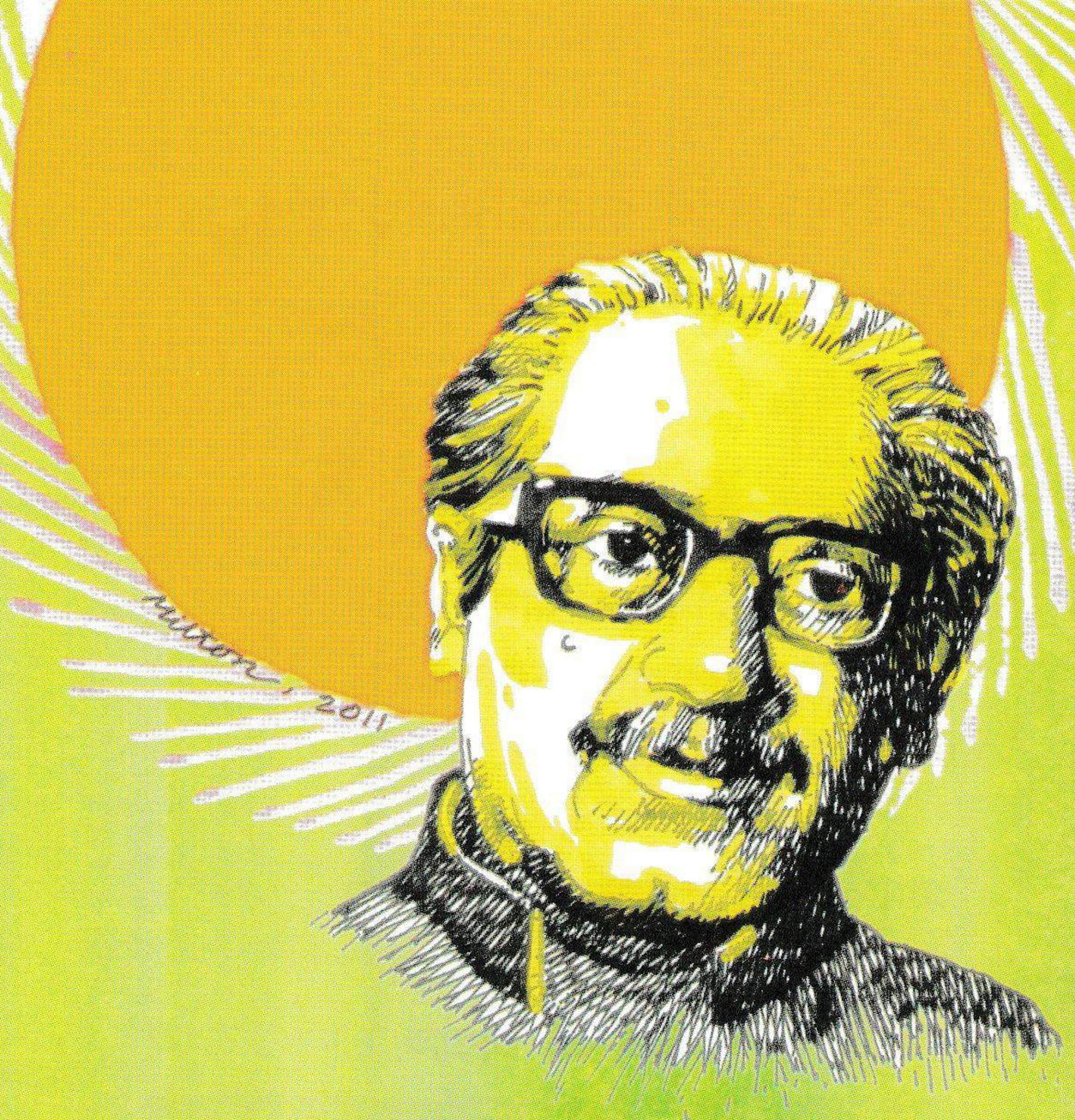
আঁকতে পারি না, আঁকতে পারি না হায়
এখানে আমার শব্দেরা সব কাঁদে
ব্যর্থতা নিয়ে জেগে থাকে সারারাত ।

যুদ্ধে মিছিলে মৃত্যু বারুদে মাখা
সেই মুখখানি কবিতার বড় ছিল ।



শতাব্দীর বরপুত্র

বিমল গুহ



চোখের তারার মতো মহাকাশে সন্ধ্যাতারা জ্বলে
উল্‌কা-পিণ্ড ছিটকে পড়ে চারপাশে
সৌরমণ্ডল জুড়ে গ্রহতারা নক্ষত্রের যৌথ সমাহার,
সৃষ্টির মহিমা গুণে করাঙ্গুলে
ভাগ করে নেয় এই মানুষের কৃতকর্মের
দায়ভাগ পরস্পর।

শতাব্দীকাল পর জ্বলন্ত নক্ষত্রের মতো
বস্তুবিশ্বের গাঢ় অন্ধকারে জ্বলে ওঠে আলো,
শতাব্দীর বরপুত্র শেখ মুজিবুর–
যাঁর অঙ্গুলি হেলনে কেঁপে ওঠে আকাশ বাতাস
নক্ষত্রমণ্ডল,
দীপ্ত পদভারে যিনি হেঁটে যান ভবিষ্যতের দিকে
তর্জনী উঁচিয়ে, এই শতাব্দী-পুরুষ
বাংলার তৃণমূল মাটি ও মানুষকে জাগিয়ে তোলেন
আর বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন সেই অমর পঙ্‌ক্তি:
'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'
সেইদিন পৃথিবী এক বীরের জাতিকে চিনে নেয়
সেইদিন শতাব্দীর বরপুত্র শেখ মুজিবুর
বীরদর্পে বাংলার আকাশ চূড়ায় দাঁড়িয়েছিলেন!

শোনো এক খোকার গল্প

রবীন্দ্র গোপ

মধুমতির ঢেউয়ের খেলায়
শিখলো সাঁতার কিশোর বেলায়
জেলজুলুম আর অত্যাচারে
কাটলো জীবন অন্ধকারে

ছোট্ট বেলার খোকা
সেই খোকা যে
দেশের তরে একদিন সে
হয়ে গেল সংগ্রামী একরোখা ।

স্বাধীনতার দিলেন ডাক
('এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম')
ছুটলো মানুষ দিকে দিকে
যা আছে যার তাই নিয়েই
গেরিলাদল এঁকেবেঁকে
নদীর স্রোতে রক্ত ঢেলে
ছুঁবে সূর্য স্বপ্ন মেলে ।

একদিন সেই স্বপ্নটাই
পুব আকাশের সূর্য হয়,
যুদ্ধশেষে করলো যে জয়
বাঙালিরা অকুতোভয় ।

বিশ্বজুড়ে বীরের জাতি
রটে গেল সেই পরিচয়
কাটলো শেষে আঁধার রাতি
বাঙালিরা বীরের জাতি ।

সেই খোকাই দেশটি স্বাধীন
করলো সেদিন
জাতির কারিগর
সেই খোকাই জাতির জনক– শেখ মুজিবর ।

মহান মুজিবুর

আলম তালুকদার

চাঁদের আলো জোনাক পোকা
এবং গোলাপ ফুল
সূর্যালোকে শিশিরবিন্দু
এবং কালোচুল
বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখায়
নেই হিসাবে ভুল ।
কোনটা দোয়েল কোনটা কোকিল
কণ্ঠে বুঝি সুর–
তেমনিভাবে চিনতে পারি
মহান মুজিবুর ।



যা আমার প্রিয়

কাজী রোজী

আমার প্রিয় পথ একটাই
বত্রিশ নম্বর বাড়ির রাস্তাটা ধরে ধরে নিজের বাড়ি।
আমার প্রিয় মানুষ একজনই
বাঙালির প্রিয় সন্তান শেখ মুজিবুর রহমান
আমার প্রিয় লক্ষ্য সেই এক
বাংলার স্থপতির স্বপ্ন ও আদর্শ বাস্তবায়ন
আমার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা
মুজিব হত্যার বিচার জীবদ্দশায় দেখা।

সে নাম মুজিব

খালেক বিন জয়েনউদদীন

যে নামে ওঠে সুয্যি-তারা, যে নামে ওঠে চাঁদ
যে নামে ফোটে শাপলা-বেলি যে নামে ভাঙে বাঁধ।
যে নামে ডাকে হাজার পাখি যে নামে জাগরণ
যে নামে শুধু আশার আলো স্বপ্ন সারাক্ষণ।
সে নাম মুজিব, তাঁর নামে এই পুণ্যি লেখা
চতুর্দিকে তাঁরই ছায়া, পাই যে কেবল দেখা।

মুজিব নামের ফুল ফুটেছে মধুমতীর চরে
আঁধার ঘরে আলোর শিখা জগৎ কেবল ভরে।
মুজিব নামে ফুল ফুটেছে সুবাস মধুময়
নামের ধ্বনি আকাশ-ভূমে চতুর্দিকে বয়।
ঘর উজালা বাড়ি উজালা, উজালা এই দেশ;
তাঁর কথাটি যতোই লিখি হয় না তবু শেষ।

মহান মুজিবর
আসলাম সানী

আবহমান বাংলা জানে
ষড়ঋতুর মুগ্ধ মানে
দোয়েল শ্যামার গানে গানে
পদ্মা মেঘনা নদীর টানে
প্রকৃতির এই রূপ,

এমন করেই জেনেছিলেন
তাই চেতনায় মেনেছিলেন
ভালোবাসায়-ধ্যানে ছিলেন
স্বপ্ন বয়ে এনেছিলেন
হৃদয়ে নিশ্চুপ ।
এই বাঙালির মন্ত্র তিনি
জেনেছিলেন খুব ।

সেই মন্ত্র একটি জাতির
মুক্তিমন্ত্র হয়
সেই মন্ত্র স্বাধীনতার
জয় বাংলার জয় ।
সেই মন্ত্রই করেছিলো
তাঁকে যে নির্ভয়
সেই মন্ত্রই বাংলাদেশ আর
বিশ্বের বিস্ময় ।

সেই মন্ত্রের ঋদ্ধ কবি
দৃপ্ত কণ্ঠস্বর
হাজার বছরের বাঙালির
চেতনা-অন্তর
বাংলাদেশের জাতির পিতা
মহান মুজিবর ।

বাঙালি
রহীম শাহ

যাচ্ছি হেঁটে দৃপ্ত পায়ে
সামনে খোলা মাঠ
আজকে হবে হাওয়ায়
হাওয়ায়
নতুন দিনের পাঠ ।

যতই আসুক বিঘ্ন-বাধা
সামনে পড়ুক গোলকধাঁধা
যার মাথাতে বীরের মুকুট
সে কি কভু থামে?
মুষ্ঠি-তোলা শপথ আছে
শেখ মুজিবের নামে ।

বাদ্যি বাজুক তাকধিনাধিন
দেশ করেছি মুক্ত-স্বাধীন
হাজার বছর টিকে আছি
সঙ্কটে সংগ্রামে,
সামনে বিশাল মহাসড়ক
শেখ মুজিবের নামে ।

তিনিই জাতির পিতা

সুজন বড়ুয়া

বাংলাদেশের ছোট এক গ্রাম ছোট এক গৃহকোণ
দাদা-দাদি আর মার সাথে থাকে ছোট দুই ভাইবোন,
বোন বড় তার নামটি হাসিনা, কামাল যে ছোট তাই–
আপুটাকে শুধু কাছে পেতে করে ইতিউতি আইঢাই ।
আপু সারাদিন কত খেলা করে ছুটে চলে দুদ্দাড়
এই যদি থাকে উঠোনে আবার সেইতো পুকুর পাড়,
কামাল কি আর অত যেতে পারে ছোট টলোমলো পায়
তবু আপুটাকে ধরবে বলেই কেবলই সে তড়পায়,
আপু ততক্ষণে দূরে চলে গেছে, ছেড়ে গেছে পাটক্ষেত
কোঁচড়-ভর্তি জাম-জামরুল, তোলে করমচা বেত
বেতবন ছেড়ে বাঁশবন ছুঁয়ে দূরে ওই কাশবনে
ঘুরছে ফিরছে উড়ছে দুলছে আপুটা আপনমনে,
আপুটা এখন আপু নয় যেন রোদ ঝিলমিল পাখি
কামাল ভাবছে– আমি যে ডাকছি শুনতে পায় না নাকি!
ডাকতে ডাকতে ক্লান্ত কামাল পড়ে যায় বেশ পিছে
দাঁড়ায় সে চুপ ছায়া পাতা ঘন তমাল গাছের নিচে,
করুণ দু'চোখে কান্নার ঢেউ থরোথরো অভিমানে
আপু যে কখন কাছে এসে গেছে কামাল কি আর জানে ।
দু'চোখ ভাসছে– হঠাৎ তখন কার যেন ছোঁয়া পায়,
আপু যে টানছে বাহুবন্ধনে কী গভীর মমতায়!
কামালের মুখে অনাবিল হাসি, ভাইবোন একাকার
সেও যে তখন আপুর কুড়ানো ফলের অংশীদার,
আপুর ধরা সে প্রজাপতিটাও ছোট কামালের হাতে
ফল খেতে খেতে বাড়ি যেতে যেতে ফের আনন্দে মাতে,
এমনি কত কি খেলছে করছে সারাদিন অবিরত
হাসিনা কামাল দুই ভাইবোন দুর্গা অপুর মতো ।

এভাবে অপার হাসি আনন্দে উচ্ছল বাধাহীন
দুই ভাইবোন উঠছিল বেড়ে, যাচ্ছিল কেটে দিন,
এর মাঝে ছোট কামাল দেখলো একদিন সন্ধ্যায়–
বাড়িতে ঢুকছে দীর্ঘ সুঠাম এক লোক পায় পায়,
বাড়িটা মাতিয়ে তুললো হঠাৎ লোকটা বাড়িতে ঢুকে
দাদা-দাদি এসে সেই লোকটাকে জড়িয়ে ধরেছে বুকে,
কে যেন বললো লোকটা এসেছে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে
কামালের প্রিয় হাসু আপা নাকি এই লোকটারই মেয়ে,



ওমা আপুটাও না জানি কেমন লোকটাকে পেয়ে কাছে
ভাইটাকে ভুলে লোকটার সাথে গায়ে গায়ে মিশে আছে,
বাকুম বাকুম করছে অচেনা সেই লোকটাকে ঘিরে
যেন ঢেউ হয়ে আছড়ে পড়ছে কেবলই নদীর তীরে,
কখনো আবার হাওয়ার কাঁপনে দুলে ওঠা লাউ-লতা
'বাবা বাবা' ডেকে বলছে দু'জনে কত কি জমানো কথা,
কামাল অবাক আড়ালে দাঁড়িয়ে এসব কাণ্ড দেখে
অচেনা লোকটা তাকেও ডাকছে হাত তুলে থেকে থেকে
বলছে 'তুমিও আসো কাছে আসো, তোমাকে আদর করি',
কামাল ভাবলো– 'আমি কেন যাব ধুত্তরি ধুত্তরি–
লোকটা আমার কেবা হয় আর আমিবা কে হই তার
এই ভাবনায় দূরে সরে যায় কামাল যে বার বার ।

রাত কেটে গেল, সকালে কামাল দেখে যেন ওমা আরো
লোকটার সাথে আপুমণিটার বন্ধুতা কত গাঢ়,
বই নিয়ে আপু পড়তে বসেছে সেই লোকটার কোলে
পড়ছে খাচ্ছে বলছে যে কথা 'আব্বা আব্বা' বলে,
সব দেখে শুনে কামালের মনে জাগে যেন মৃদু ক্ষোভ
সেই সাথে জাগে আপুর মতন 'আব্বা' ডাকার লোভ ।
আব্বা যে কী কামাল জানে না, চেনে না সে আব্বাকে
তাই সে আপুকে একা পেয়ে বলে সেদিন কাজের ফাঁকে–
'আপু, আমার এক ইচ্ছে জেগেছে, জানো সে ইচ্ছেটা কি?
তোমার বাবাকে আমিও একটু আব্বা বলেই ডাকি ।'
ছোট ভাইটির এই কথা শুনে আপু কুটিকুটি হেসে–
বলে– 'আরে ডাক ডাকরে আব্বা যত খুশি ভালোবেসে
আমার আব্বা তোরও তো আব্বা, আব্বা তো একজন
দশের কাজেই ব্যস্ত আব্বা রাতদিন সারাক্ষণ
দেশের কাজেই ঘোরে দূর দেশে, চিনিস না তুই তাই
আজ জেনে রাখ আমাদের প্রিয় বাবা এই লোকটাই ।'

কামালের মতো ছোট বন্ধুরা, জেনেছো কি তার কথা
কামালের সেই বাবাই এনেছে এ দেশের স্বাধীনতা
তার অবিরাম ত্যাগ সংগ্রাম যায়নি মোটেও বৃথা
কামালের বাবা আমাদেরও বাবা– তিনি যে জাতির পিতা ।



সেই মহাশিশু

ফারুক নওয়াজ

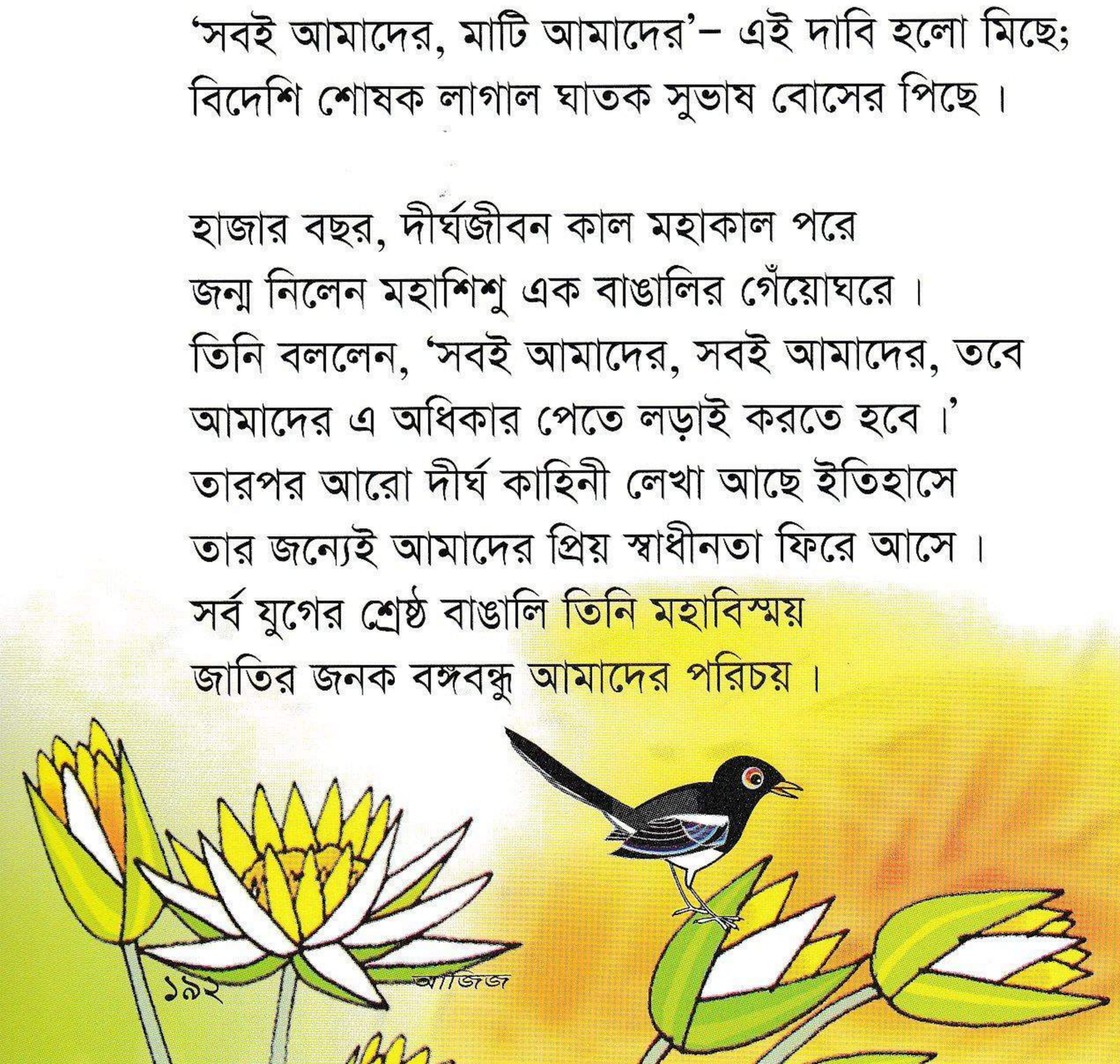
দোয়েল পাখিটা আমাদের পাখি; মিষ্টি শিসটি তার
শাপলা ফুলটা আমাদের– তাতে আমাদেরই অধিকার
আমাদের নদী পদ্মা-মেঘনা, কুশিয়ারা, মধুমতি,
সবই আমাদের– এই দাবিটাতে ছিল না অসঙ্গতি ।

আমাদের পাট বিশ্বজুড়ে যা শ্রেষ্ঠ সোনালি আঁশ ।
আমাদের আছে ছয়রঙে আঁকা ছয়ঋতু, বারোমাস ।
সবুজ সবুজ ফসলের মাঠে উদাসী হাওয়ার ঢেউ –
সবই আমাদের; অতীতে এ দাবি সেভাবে করে নি কেউ ।

রুপোলি ইলিশ, দখিনসাগর, অবাক সোঁদরবন
টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া জুড়ে হৃদয়ের বন্ধন ।
সবই আমাদের, অথচ সেসব ছিল না-তো আমাদের
মুঘল পাঠান ইংরেজ-প্রভু মালিক হয়েছে এর ।

'আমাদের সব' এই দাবি করে ঈশা খাঁ পান নি পার
মুঘলের কাছে পাঠাতে হয়েছে আপোসের উপহার ।
তিতুমীর ফুঁসে উঠেছেন রাগে; ব্যর্থ সে ইতিকথা
ঈঙ্গসেনারা জীবন কেড়েছে আসে নাই স্বাধীনতা ।
বীর ক্ষুদিরাম, বিনয়, বাদল, দীনেশ, সূর্যসেন
তাদের কাতারে প্রীতিলতা, চাকী জীবন বিলিয়ে দেন ।
'সবই আমাদের, মাটি আমাদের'– এই দাবি হলো মিছে;
বিদেশি শোষক লাগাল ঘাতক সুভাষ বোসের পিছে ।

হাজার বছর, দীর্ঘজীবন কাল মহাকাল পরে
জন্ম নিলেন মহাশিশু এক বাঙালির গেঁয়োঘরে ।
তিনি বললেন, 'সবই আমাদের, সবই আমাদের, তবে
আমাদের এ অধিকার পেতে লড়াই করতে হবে ।'
তারপর আরো দীর্ঘ কাহিনী লেখা আছে ইতিহাসে
তার জন্যেই আমাদের প্রিয় স্বাধীনতা ফিরে আসে ।
সর্ব যুগের শ্রেষ্ঠ বাঙালি তিনি মহাবিস্ময়
জাতির জনক বঙ্গবন্ধু আমাদের পরিচয় ।



বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কাকার গল্প

আমীরুল ইসলাম



এমন অনেক গল্প আছে, যা গল্পের মতো। আসলে গল্প নয়। জীবনের কঠিন সত্য উঠে আসা অবিশ্বাস্য কাহিনি। নিরেট বাস্তবতায় আচ্ছন্ন। পড়তে পড়তে মনে হবে একি গল্প? নাকি এক জীবনের কথা?

গল্পটি লিখেছেন আমার ছোট কাকা। রুলটানা খাতায় পেন্সিলে ভাঙা ভাঙা অক্ষরে লেখা। কোনো কোনো জায়গায় অস্পষ্ট। লেখাটি একটানা হলেও কোথাও খুব খাপছাড়া। কাকা লেখক ছিলেন না। কাকা ছিলেন একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা। মুক্তিযুদ্ধের অনেক গল্প শুনেছিলাম কাকার কাছে। কাকা যুদ্ধ করেছিলেন রাজশাহী এলাকায়। বীরশ্রেষ্ঠ মোস্তফা কামালের সঙ্গে একই বাংকারে কাকা দিনের পর দিন কাটিয়েছেন। পশ্চিম পাকিস্তানের শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে কাকার তীব্র ক্ষোভ ছিল। সত্তরের নির্বাচনে কাকা ঘুরে বেড়িয়েছেন এক জেলা থেকে আরেক জেলায়। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে কাকার পরিচয় ১৯৬৬ সাল থেকে। বঙ্গবন্ধু কাকাকে বলতেন– তুই তো আমার পাগলা-রাখাল।

কাকা যখন বঙ্গবন্ধুর গল্প বলতেন আমরা তখন তন্ময় হয়ে সেসব শুনতাম। কাকা বলে যেতেন অনর্গল। বঙ্গবন্ধুর কথা বলতে বলতে কাকা থরথর করে কাঁপতেন।

–অনেক বড় মাপের মানুষরে বঙ্গবন্ধু। সারা বাংলাদেশটা তাঁর হৃদয়। বাংলার প্রতিটি ধূলিকণার জন্য তাঁর মমতা। এরকম মানুষ হয় নারে। এরকম নেতা পৃথিবীর খুব কম জাতির মধ্যেই জন্ম নিয়েছে। এত বড় নেতাকে আমরা...

বলেই হাউমাউ করে কেঁদে উঠতেন কাকা। কাঁদতে কাঁদতে তাঁর শরীর কাঁপতে থাকত। চোখের মণি উল্টে আসত। অনেকটা ফিটের মতো হয়ে যেতেন কাকা। বাবা বলতেন, কাকার সঙ্গে এসব বিষয় নিয়ে আলাপ না করাই ভালো।

বঙ্গবন্ধুর প্রতি কাকার ভালোবাসা এমনই তীব্র যে, বঙ্গবন্ধুর বিষয় ভাবতে গেলেই তিনি পাগলের মতো হয়ে যেতেন। যুদ্ধ থেকে ফিরে কাকা দেশ গঠনের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। রিক্ত, নিঃস্ব, শূন্য বাংলাদেশকে খাদ্যশস্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে গড়ে তুলতে হবে। প্রয়োজন নেই বিদেশি সাহায্য। নিজের যা কিছু আছে তাই নিয়েই দূর করতে হবে অভাব। জমিগু লোতে আবাদ করতে হবে। সোনার ফসল ফলবে। বাংলাদেশ হবে সোনার বাংলা। বঙ্গবন্ধুর এই ছিল স্বপ্ন। বাংলার গরিব-দুখীরা খাদ্য পাবে। কৃষকেরা অনাহারে মারা যাবে না। এই স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করতে হবে। কাকা ছুটতে থাকলেন গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। কাকা বিয়ে করেননি।

থাকতেন আমাদের সঙ্গে। আমরা তখন থাকতাম পুরনো ঢাকায়, ভাড়াবাড়িতে। একতলা ছোট্ট একটা বাড়ি। ছাদে একটা চিলেকোঠা ছিল। কাকা সেই চিলেকোঠায় থাকতেন। আমার জন্ম ৭৬ সালে। ছোটবেলা থেকেই আমি জানতাম, আমার এক পাগলা কাকা আছেন। তিনি উপরতলায় সারাদিন ঘরের দরজা বন্ধ করে বসে থাকেন। বিড়বিড় করে কী সব আবোল তাবোল বলেন, মাঝেমধ্যেই বই পড়েন। গান শোনেন। 'শোনো একটি মুজিবরের থেকে, লক্ষ মুজিবরের কণ্ঠস্বরের ধ্বনি প্রতিধ্বনি আকাশে বাতাসে ওঠে রণি...' এই গানটি ছিল কাকার সবচেয়ে প্রিয়। আর কাকার সংগ্রহে ছিল প্রচুর দেশি-বিদেশি পত্র-পত্রিকা, মক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বইপত্র।

কিছুদিন আগে কাকার পুরনো বইপত্র ঘাঁটতে গিয়ে একটি ছোট্ট খাতা পাই আমি। সেই খাতায় পেন্সিলের আঁকিবুকি। এলোমেলো। অসংলগ্ন অনেক লেখা। পড়তে পড়তে আমার চোখের পাতা ভিজে আসে। সেখানেই খুঁজে পাই গল্পের মতো একটা লেখা। নাম 'যে গল্পের শেষ নেই'।

॥ দুই ॥

যে গল্পের শেষ নেই

বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয়েছিল ৭৫ সালের জুন মাসে। ভারি ব্যস্ত ছিলেন বঙ্গবন্ধু। ৩২ নম্বর বাড়িতে ঢুকতে কোনো প্রবেশ-অধিকার লাগতো না আমার। যে কোনো সাধারণ বাঙালির মতোই অনায়াসে ভেতরে ঢুকে যেতে পারিতাম। প্রহরী থাকিত। প্রহরীদের অনাবশ্যক ব্যস্ততা বঙ্গবন্ধু পছন্দ করিতেন না।

তখন অনেক রাত্রি হইয়াছে।



বঙ্গবন্ধু দোতলার বারান্দায় বসিয়া ছিলেন।

ক্লান্তির ছাপ সর্বশরীরে। আমাকে দেখিয়া বলিলেন,

কিরে পাগলা-রাখাল। কেমন আছিস তুই?

আমি বঙ্গবন্ধুর পায়ের সামনে বসিয়া পড়িলাম।

নিশ্চয়ই ভালো নাই তুই। আমি সব বুঝি।

বাংলার মানুষের একটু সুখের জন্য কষ্ট করছি। তোরাও খেটে মরছিস। সবাই যদি ভালো না থাকে তবে আমরাও বা ভালো থাকি কীভাবে?

আমি নিরুত্তর।

কিরে পাগল। মন কি খুব খারাপ তোর? দ্যাখ, দ্যাখ আকাশে কী সুন্দর চাঁদ উঠেছে। তাকিয়ে দ্যাখ।

আমি বারান্দার ফাঁক দিয়া গভীর নীল আসমানের দিকে অপলকে তাকাইলাম। সত্যিই বড় অর্পূব মনে হইলো। আকাশে পূর্ণ-শশী। সোনালি আলোর আভা ছড়াইয়া দিয়াছে সমস্ত চরাচরব্যাপী। বঙ্গবন্ধুর চোখে-মুখেও চন্দ্রালোকিত জ্যোৎস্নার আলোর কোনো ঘাটতি হয় না। ভোরবেলা পাখি ডাকে। নদীতে মাঝি নৌকা বেয়ে যায়। গাছে গাছে ফল-ফুল হয়। প্রকৃতি চলিতে থাকে তার আপন গতিতে।

আর জানিস তো পাগল, দুঃখের দিনের কথাই মানুষ মনে রাখে। সুখের দিনের কথা কতটুকুই বা মনে রাখি আমরা? একদিন বাংলাদেশ সোনার বাংলা হবে। এদেশের দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফুটিবে। আমরা সেই দিনের জন্য কাজ কইরা যাইতেছি।

আমি বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নময়, কাজল-কালো দুই চোখের দিকে তন্ময় হইয়া তাকিয়ে ছিলাম। মাত্র তিন মিনিট সময়। আজও আমার হৃদয়ের মণিকোঠায় সেই স্মৃতি জ্বলজ্বল করে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বঙ্গবন্ধু ব্যস্ত হইয়া গেলেন। বিদেশি দূতাবাসের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা হইবে। তারপর ব্যক্তিগতভাবে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে পার্টির নেতা, সাংবাদিক ও কয়েকজন অর্থনীতিবিদের সঙ্গে।

সহজেই বুঝিতে পারলাম, বঙ্গবন্ধুর ঘুমাতে অনেক রাত হবে। মাথার ওপর সমস্ত দেশের দায়িত্ব। কোনো বিদেশি সাহায্য-সহযোগিতা নেই। যুদ্ধ-বিধ্বস্ত বাংলাদেশকে গড়ে তোলার জন্য মৃত্যুপণ করেছেন বঙ্গবন্ধু। বঙ্গবন্ধু বিষয়ে কিছু লিখিব বলিয়া বহুবার ভাবিয়াছি। তরুণ-প্রজন্ম এই মহান নেতা সম্পর্কে সত্য-মিথ্যা কিছু জানিতে পারে না। বঙ্গবন্ধু মানুষ হিসাবে কত বড় ছিলেন আমরা তাঁহার সান্নিধ্যে আসিয়াই বুঝিতে পারিয়াছি। বাঙালি, বাংলাভাষা ও বাংলাদেশের জন্য যে কোনো মুহূর্তে জীবন-দান করিবার জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন।

বঙ্গবন্ধুকে নিয়া আমি কিছুই লিখিতে পারিব না। আমার কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইয়া যায়। আমি অশ্রু সংবরণ করিতে পারি না। বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি মনে পড়িলে সবকিছু অসহ্য, বিষময় হইয়া ওঠে। আমার দম বন্ধ হইয়া আসে। আমি পাগলের মতো হইয়া যাই। দিশাহীন, উপায়হীন ভীরু মানুষের মতো আমি মূর্ছিত হইয়া পড়ি।

বঙ্গবন্ধু, তুমি আমাদের রাখিয়া এইভাবে...। কোন নরাধম, বর্বর, পাপিষ্ঠ জাতির এত বড় সর্বনাশ করিল। বাঙালি পরাধীন জাতি। কর্মবিমুখ, অলস, নিন্দুক জাতি। সেই ঘুমন্ত, হাজার-বছর প্রাচীন জাতিকে তুমি প্রেরণা দিলে, স্বাধীনতা দিলে, ঘুম ভাঙাইলে। বাংলাকে যখন তুমি সোনার বাংলায় পরিণত করিতে গেলে, তখনই পশুরা তোমার উপর ঝাঁপাইয়া

পড়িল। সুবিধাবাদী, স্বার্থপর, ভণ্ডরা তোমাকে সহ্য করিবে কেন? তুমি ভালোবাসিতে সকল বাঙালিকে। তুমি আমার মতো মূঢ়কে বলিতে পাগলা-রাখাল।

আমি পাগল না হইয়া কী করিব?

আমি তোমাকে ভালবাসি। বাংলাকে ভালোবাসি। বাংলার মানুষকে ভালোবাসি। তোমার মৃত্যুর পরে আমি উন্মাদ হইয়া গেলাম। একেবারে বদ্ধ-উন্মাদ। আমার সমস্ত কর্মপ্রেরণা হ্রাস হইল। আমি অসুস্থ হইয়া পড়িলাম। আমি বিবেক-শূন্য, অস্থির, চঞ্চল হইলাম।

হে বঙ্গবন্ধু, তোমার মৃত্যুদিন আমি আজও স্মরণ করিতে পারি। প্রভাত বেলায় আমি বিশ্ববিদ্যালয় যাইব বলিয়া মনস্থির করিয়াছিলাম। সেদিন ১৫ই আগস্ট। ১৯৭৫ সাল। তুমি সকালে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আসিবে। রাষ্ট্রপতি হইয়াও তুমি ৩২ নম্বর বাড়ি ত্যাগ করো নাই। ভোগ-বিলাস ও প্রাচুর্য তোমাকে কখনো আকৃষ্ট করে নাই। সাধারণ মানুষের মতোই তুমি একজন অসাধারণ মানুষ। সরল বেশভূষা, সহজ চলাফেরা, অনায়াস গতিবিধি, প্রহরীবিহীন জীবন-যাপন তোমাকে বাঙালির প্রাণপ্রিয় নেতায় পরিণত করিয়াছিল। তুমি আমাদের সকলের নয়ন-মণি। তুমি বাংলার বন্ধু, বঙ্গবন্ধু।

১৫ই আগস্ট সকালে বেতারে তোমার মৃত্যু-সংবাদ শ্রবণ করি। অবিশ্বাস্য এক দুঃসংবাদ। মনে হইল, সমস্ত পৃথিবী উলোট-পালট হইয়া গেছে। তোমাকে কে মারিতে সাহস পাইবে? কে মারিবে? কোন নরাধম? কোন পাপিষ্ঠ?

আমি বিশ্বাস করি না।

বঙ্গবন্ধু তোমাকে কেহ হত্যা করিতে পারে না। তুমি মরিতে পারো না। আমাদের রাখিয়া তুমি কোথায় যাইবে? তোমার পরিবারবর্গকেও হত্যা করা হইয়াছে। কে বিশ্বাস করিবে এরকম অবিশ্বাস্য সত্যকে!

আমি উন্মত্তের মতো ছুরি হাতে চিৎকার করিতে করিতে ৩২ নম্বরের দিকে ধাবিত হইলাম। আমি বঙ্গবন্ধু হত্যাকারীদের দেখিয়া লইতে চাই। ইহাই ভুল করিলাম। ধানমণ্ডি সড়ক ধরে আমি ছুটে চললাম পাগলের মতো। বঙ্গবন্ধুর কাছে আমাকে যেতে হবে। ঐ ঐতিহাসিক বাড়িতে আমি একটি মুহূর্তের জন্য যেতে চাই। নিহত পিতার লাশ আমি দেখিতে চাই।

পিতা, তুমি কোথায়?

পিতা! পিতা! পিতা! উচ্চঃস্বরে আমি ডাক দিতে দিতে বেভুল, উন্মাদের ন্যায় সেদিন কোথায় গিয়াছিলাম, কী করিয়াছিলাম বলিতে পারি না।

দীর্ঘ তিন মাসের অজ্ঞাতবাসের পর আমি ফিরিয়া আসি। এই তিন মাস আমার জীবনের বিস্মৃতি-পর্ব। কোথায় ছিলাম, কী হইয়াছিল, সম্পূর্ণ ভুলিয়া গিয়াছি। ভাইয়ের কাছে ফিরিয়া আসিলাম যখন, তখন আমি চেতনালুপ্ত, জড়বুদ্ধিসম্পন্ন এক হতভাগ্য ব্যক্তি। বহু চিকিৎসকের কাছে গিয়াছি। অবিরাম আমার মানসিক চিকিৎসা হইয়াছে।

চিকিৎসকরা বহু প্রশ্ন করিয়াছেন।

আমি আর সুস্থ হই নাই। বিস্মৃত তিন মাসের স্মৃতি আমি উদ্ধার করিতে পারি নাই। শুধুমাত্র বঙ্গবন্ধুর কথা মনে হইলেই আমি উন্মাদের মতো হইয়া উঠি। বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পর অর্থহীন একটি জীবন হইয়া গেল আমার।

এখন আমিও মৃত্যুর প্রহর গুনি। এই অস্থির, মিথ্যা দিনগুলি আমাকে ক্রমেই মৃত্যুর দিকে ঠেলিয়া দিতেছে। আমি বাঁচিয়া উঠিতে চাই। বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত কাজগুলি করিতে চাই। কিন্তু সে প্রেরণা কোথায় পাইব? আমি তো মানসিক ভারসাম্য হারাইয়া ফেলিয়াছি। এখন অন্ধকার। আমার চারপাশে গভীর অন্ধকার। চিলেকোঠার স্যাঁতস্যাঁতে, নোনাধরা ইটের দেয়ালের চারপাশে আমার বন্দিজীবন কেঁদে কেঁদে মরে।

বঙ্গবন্ধু, তুমি আমাকে শক্তি দাও। আমাকে উদ্ধার করো। আমাকে বাঁচাও।.....

॥ তিন ॥

ব্যস্ এটুকুই লেখা। সেই রুল-টানা কাগজে পেন্সিলের টানে সাধু-চলিত ভাষায় স্মৃতিকাহিনিমূলক একটি লেখা। লেখার নিচে কাকার সই আছে। সানাউল হক। পরের পৃষ্ঠাগুলোতেও কাকা কী কী লিখেছেন। তা খুবই অস্পষ্ট। বোঝা যায় না। কাকা লেখাটির নাম দিয়েছেন 'যে গল্পের শেষ নেই'। কথাটি খুব সত্যি। কাকার লেখাটি যে গল্প হয়নি তা তো বোঝাই যায়। আবার এটিকে যে স্মৃতিকাহিনি বলব এমনটিও বলা যাবে না।

মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে কাকা দীর্ঘদিন শয্যাশায়ী ছিলেন, মারা যান ১৯৮৮ সালের ৮ ডিসেম্বর। মাথায় প্রচণ্ড ব্যথা হত কাকার। শেষে ব্রেন-হ্যামারেজ হয়। দিন সাতেক অচৈতন্য থাকার পর কাকা শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

মৃত্যুর কিছুদিন আগে কাকা আমাকে বলেছিলেন, বাঙালিরা বড় ভাগ্যহীন জাতি। বঙ্গবন্ধুর মতো নেতা হাজার বছরে একজন জন্মগ্রহণ করে। তাঁকেই আমরা হত্যা করি। তাঁকে ঠিকমতো চিনতেও আমাদের সময় লাগে। আমরা বঙ্গবন্ধুর মূল্যায়ন করার যোগ্যতা রাখি না।

তোমরা নতুন প্রজন্ম। হয়তো তোমরাই পারবে বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত স্বপ্ন সফল করতে।

আমার পড়ার টেবিলের সামনে বঙ্গবন্ধুর একটি বিশাল ছবি আছে। আমি সেই ছবির দিকে তাকিয়ে থাকি। আমার কানে প্রতিধ্বনিত হয় কাকার সেই সব কথা। আমি আগামী দিনের স্বপ্ন দেখি।

সুন্দর, সুখী বাংলাদেশের স্বপ্ন।
বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলার স্বপ্ন।

খোকন খোকন করে মায়

(শিশুদের জন্য একাঙ্কিকা)

বেগম মমতাজ হোসেন

চরিত্র

১ । সায়েরাতুন্নেছা: মা– বয়স ২৮/২৯
২ । লুৎফুর রহমান: বাবা– বয়স ৩৪/৩৫
৩ । বেগম: বড় বোন– বয়স ১১/১২
৪ । ঠাণ্ডু: মেজবোন– বয়স ১০/১১
৫ । খোকা (কিশোর): (শেখ মুজিবুর রহমান)– ৭/৮ বছর
৬ । লতুর মা: কাজের লোক– ২০/২৫

স্থান : (টুঙ্গিপাড়ার শেখ বাড়ির উঠান, সাথে রয়েছে লাল সিমেন্টের সিঁড়িসম্বলিত বারান্দা) ।
চরিত্র : সায়েরাতুন্নেছা, বেগম, ঠাণ্ডু, লতুর মা, খোকা ।
সময় : দিন ।

১ম অংক

(সায়েরা) মা লতুর মাকে ডুমুরের আচার তৈরি করতে সাহায্য করছে । মা লাল সিঁড়িতে বসে আছে । সামনে পানের বাটা ।
মা : লতুর মা, সারা বছর তো ডুমুর পাওয়া যায় না, এদিকে খোকা ডুমুর খেতে পছন্দ করে ।
লুতুর মা : হ বিবিজি! লতুর বাপেরে কইয়া অনেক ডুমুর পাড়াইয়া আনছি । লতুর বাপে খোকারে যা মহব্বত করে ।
মা : বেশিদিন তো ডুমুর রাখা যাবে না । এক কাজ করো, কতগুলো ডুমুর কেটে হলুদ মেখে রোদে শুকাতে দাও, তারপর আচারের মশলা দিয়ে রেখে দিলে নষ্ট হবে না ।
লতুর মা : ঠিক আছে । (লতুর মা ডুমুরের থলে নিয়ে চলে যায় । বেগম ও ঠাণ্ডু পেয়ারা হাতে খেতে খেতে প্রবেশ করে) ।
মা : এই যে পাড়াবেড়ানিরা, এতক্ষণে ঘরে ফেরার সময় হল!
বেগম : পাড়া বেড়ালাম কোথায়! তোমার আদরের ছেলেকে খুঁজতে গিয়েছিলাম ।
ঠাণ্ডু : তোমার খোকন সোনা ওর বন্ধু হাবলুকে নিয়ে বাইগার নদীতে সাঁতার কাটতে গেছে ।
মা : (ভয় পেয়ে) বলিস কী! বাইগার নদী কত গভীর । তোরা কেমন বোন! তোরা ওকে ডেকে আনতে পারলি না!
বেগম : খোকা আমাদের কথা শুনলে তো! সে তো সকালে ধানক্ষেতে চাষাদের সাথে কাজ করছিল । আমি নিষেধ করলাম বলে কেমন রাগ রাগ চোখ করে আমার দিকে তাকাল ।
ঠাণ্ডু : ওর বন্ধু হল চাষাভুষা, জেলে, মজুর! আম্মা, আপনি ওর ওস্তাদজীকে বলে দিন । ওস্তাদজীকে খোকা মানে ।
মা : আশি বছরের বুড়িদের মতো উপদেশ না দিয়ে লাল মিয়াকে বল । লাল মিয়া ধানের গোলা সাফ করছে । ওকে বল এখনি সোজা বাইগার নদীর পাড়ে যেতে ।
বেগম : আমিও যাই?
মা : না! তোমাকে যেতে হবে না । ঘরের কাপড়গুলো ভাঁজ করে গুছিয়ে রাখো । ঠাণ্ডু, যা, লাল মিয়াকে বলে আয় ।
(ঠাণ্ডু চলে যায় । বেগম মুখটা মলিন করে অন্দরে চলে যায়) ।
(এমন সময় খোকা ফুটবল হাতে করে লাফাতে লাফাতে প্রবেশ করে ।)
মা : খোকা! তুই!
খোকা : হ্যাঁ! আমি তোমার খোকা ।
মা : খোকা! তুই নাকি বাইগার নদীতে সাঁতার কাটতে গিয়েছিস ।
খোকা : কে বলল এ কথা?
মা : কেন? বেগম আর ঠাণ্ডু বলল! খোকা, এমন সাহস করতে নেই ।
খোকা : (হাসে) মা, সাহস করলে ভয় কেন পাবে? তবে তোমাকে না বলে আমি নদীতে সাঁতার কাটতে যাব, এ কথা বিশ্বাস করো?
মা : না, তা করি না । ওরা নিজেরাও তো ভয় পেয়েছে । নদী বলে কথা! নদীতে কত ভয় থাকে ।
খোকা : কিসের ভয় মা? বাইগার নদী তো একটা ছোট নদী । মা, আমার ইচ্ছে আছে, আমি একদিন সাঁতরে নদীর ওপারে যাব । তবে যেদিন যাব সেদিন তুমি নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকবে ।



(মা খোকাকে কাছে টেনে নেয় ।)
মা : দেখ খোকা, আকাশে মেঘ জমেছে । এখনি বৃষ্টি নামবে ।
খোকা : মেঘ দেখেই তো ফুটবলটা হাতে নিয়ে বাড়ি চলে এলাম । মা, ওস্তাদজী বলেছেন, কখনো কোনো কিছুতে ভয় পেতে নেই । আমিও ভয় পাই না । তবে একটা ভয় পেতে আমি খুব ভালোবাসি ।
মা : কেমন ধরনের সেই ভয়?
(খোকা মায়ের গলা জড়িয়ে বলে)
ওই দেখো মা, বর্ষা এল
ঘনঘটায় ঘিরে,
বিজুলি ধায় এঁকে বেঁকে
আকাশ চিরে চিরে
দেবতা যখন ডেকে ওঠে
থর্‌থরিয়ে কেঁপে
ভয় করতেই ভালোবাসি
তোমায় বুকে চেপে ।
(মা হাসে ! খোকাকে বুকে চেপে ধরে) ।
মা : এমন সুন্দর ভয়ের কবিতা কখন শিখলি খোকা?
খোকা : আজ সকালেই ওস্তাদজী শেখালেন । আকাশে মেঘ দেখেই তোমার কথা মনে হল ।
(খোকাকে মা আদর করে বলবে)
মা : যখন বড় হবি খোকা, তখনও এমন সুন্দর ভয়ের কথা মনে করবি তো?
খোকা : করব, করব ।

২য় অংক

স্থান : শেখবাড়ির বারান্দা
চরিত্র : লুৎফুর রহমান, খোকা, সায়েরাতুন্নেছা, বেগম, ঠাণ্ডু ।
সময় : পরের দিন ।

[বারান্দায় পাটির উপর দস্তরখান পেতে খেতে বসেছে লুৎফুর রহমান, খোকা, ঠাণ্ডু, পরিবেশন করছে সায়েরা ও বেগম]

লুৎফুর : খোকা, তোকে কিন্তু আমি ইংরেজ সরকারের চাকরি করতে দেব না ।
মা : কেন? আপনি নিজে তো করছেন । মাস গেলে বেতন আসে ।
লুৎফুর : তা আসে কিন্তু মনটা বড় ছোট হয়ে থাকে, গোলামি করা সবার ভালো লাগে না ।
মা : তা হলে খোকা লেখাপড়া করে যখন বড় হবে, তখন কি করবে? রুজি রোজগার করতে হবে না?
লুৎফুর : তা করবে, তবে স্বাধীন ব্যবসা । খোকা ল পড়বে ।
বেগম : উকিল-ব্যারিস্টার হবে । তাই না?
লুৎফুর : হ্যাঁ! শেরে বাংলা ফজলুল হকের মতো বিখ্যাত আইনের লোক হবে । তারপর ওকালতি করবে । অন্যায়কে সহ্য করবে না । দোষীকে শাস্তি দেবার ব্যবস্থা করবে ।
খোকা : আর যে দোষ করেনি, তাকে বাঁচাতে হবে ।
ঠাণ্ডু : তা হলে খোকা জজম্যাজিস্ট্রেট হলেই পারে ।
লুৎফুর : সেটাও তো চাকরি । খোকা, তোকে আমি লেখাপড়া করাব, দরকার হলে বিলেতে পাঠাব ।
বেগম : বিলেতে গিয়ে সে তো সাহেব হয়ে যাবে ।



খোকা : না, আমি কখনোই সাহেব হব না। আমি বাঙালির ছেলে। আমি বাঙালিই থাকব। মা, আমাকে একটু ছোটমাছ দিন না।

(মা তুলে দিলেন, তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করল খোকা এবং লুৎফুর রহমান)

লুৎফুর : খোকা! চলো! আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে, তোমারও স্কুলের দেরি হয়ে যাচ্ছে।

(খোকা ও লুৎফুর উঠে পড়ে)।

শেষ অংক

স্থান : শেখ বাড়ির দাওয়া, উঠান

চরিত্র : খোকা এবং সায়েরা ও লতুর মা

সময় : বিকেল।

(মা বসে আছে। খোকার জন্য অপেক্ষা করছে।)

মা : লতুর মা, ও লতুর মা।

(লতুর মা অন্দর থেকে আসে)

মা : খোকা এখুনি স্কুল থেকে চলে আসবে। খোকা আমার খিদে সহ্য করতে পারে না। ঘরে পাটি পেতে খাবার সাজিয়ে রাখ!

লতুর মা : যাইতাছি বিবিজি! আমগো সবার আদরের ধন খোকা! (প্রস্থান)

মা : আমার খোকা কত তাড়াতাড়ি বড় হয়ে যাচ্ছে। খোকাকে ওর বাবা গোপালগঞ্জে নিয়ে যাবে। সেখানে স্কুলে ভর্তি করে দেবে। আমি খোকাকে কেমন করে ছেড়ে থাকব?

(কথাগুলো আপনমনে বলবে)।

(খোকা স্কুল থেকে ফিরে আসে)

খোকা : মা, আমি জানতাম, আপনি আমার জন্য বসে থাকবেন, তাই এমন জোরে হাঁটলাম, এক ঘণ্টার মধ্যেই চলে এলাম।

(মা খোকার মাথায় হাত বুলায়, কাছে টেনে বসায়)

মা : আজ স্কুলে কি পড়ালো?

খোকা : আজ নবাব সিরাজউদ্দৌলার কথা জানলাম। বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব। লর্ড ক্লাইভ পলাশীর আমবাগানে যুদ্ধ করে নবাবের সাথে। আর নবাবের সেনাপতি মীরজাফর করল বেঈমানি, হেরে গেলেন নবাব। এই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিল বেনিয়া ইংরেজ।

মা : খোকন। সেই থেকে ২০০ বছর ধরে ওরা আমাদের শাসন করছে। ওরা আমাদের গোলাম বানিয়ে রেখেছে। সেজন্যেই তো স্বদেশীরা আন্দোলন করছে।

খোকা : মা! বাংলার শেষ নবাব সিরাজউদ্দৌলা। এ দেশে আরেকজন সিরাজ আসতে পারে না? সেই সিরাজ সবাইকে নিয়ে লড়াই করে ইংরেজদের তাড়িয়ে দিতে পারে না?

মা : কেন পারবে না? নিশ্চয় পারে। খোকা, তোদের মতো ছেলেরা সিরাজ হতে পারে।

খোকা : সত্যি বলছ! তা হলে স্বাধীন হবে এই– দেশটা স্বাধীন হবে। (খুশিতে দৌড় মারে খোকা)

মা: খোকা! খোকা! খোকা! কোথায় যাচ্ছিস? (ফ্রিজ হয়ে যায়)।

বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড
নিজের চোখে দেখা

এ. এফ. এম. মুহিতুল ইসলাম

রাত সাড়ে আটটা থেকে নয়টার ভিতর বঙ্গবন্ধু গণভবন থেকে চলে এলেন। উপরে উঠে গেলেন। তারপর তোফায়েল সাহেব এসেছিলেন। তোফায়েল সাহেব কিছু কথা বললেন। ওনারা সবাই চলে গেলে যথারীতি বঙ্গবন্ধু শুতে গেলেন। বঙ্গবন্ধু প্রায় সাড়ে বারটা থেকে একটার মধ্যে বিছানায় শুয়ে পড়তেন এবং সেদিনও ঠিক একইভাবে শুয়ে পড়েছিলেন। আমি গেটে এক আর্মি-সিপাহীর সাথে রাত একটা-দেড়টা পর্যন্ত গল্প করে এসে আমাদের নির্ধারিত জায়গায় শুয়ে পড়লাম। কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম আমি ঠিক জানি না। হঠাৎ আমাদের যে মিস্ত্রি ছিল, মিস্ত্রি এসে আমাকে বলছে, 'স্যার, প্রেসিডেন্ট সাহেব আপনাকে ডাকছেন।' আমি যে লুংগিপরা অবস্থায় ছিলাম সে-অবস্থায় এসে টেলিফোন ধরলাম। আমি টেলিফোন ধরার সাথে সাথে বঙ্গবন্ধু বললেন, 'সেরনিয়াবাতের বাসায় আক্রমণ করেছে, পুলিশ কন্ট্রোল রুমকে টেলিফোন কর।' আমি টেলিফোন ঘুরাচ্ছিলাম, পুলিশ কন্ট্রোল রুমকে পাচ্ছিলাম না, না পেয়ে আমি গণভবন এক্সচেঞ্জকে টেলিফোন করলাম, ওখানকার টেলিফোন অপারেটর রিসিভ করল। কিন্তু রিসিভ করে কোনো কথা বলছিল না, আমি যত বলি "হ্যালো, আমি পি. এ-টু-প্রেসিডেন্ট বলছি" ও ততো শুধু 'এ্যা-এ্যা' শব্দ করছিল। ঠিক সেই মুহূর্তে বঙ্গবন্ধু উপর থেকে গেঞ্জি গায়ে লুংগি পরে নিচে নেমে এলেন। নেমে এসে আমাকে বললেন, "কিরে, তোকে পুলিশ কন্ট্রোল রুমে লাগাতে বললাম, লাগালি না?" আমি তখন বলেছিলাম, "স্যার, আমি কন্ট্রোল রুমকে লাগানোর চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু পাচ্ছি না। আমি গণভবন এক্সচেঞ্জকে পেয়েছি, কিন্তু কোনো কথা বলছে না।" তখন উনি রিসিভারটা আমার হাত থেকে নিলেন। নিয়ে উনি নিজেই বলছিলেন, "আমি প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিব বলছি..." ঠিক সেই মুহূর্তে এই পিছনের জানালাতে বৃষ্টির মতো গুলি আসতে থাকল। ইতোমধ্যে একটা গ্লাস– এই জানালার বেশ বড় একটা গ্লাস

উনি নিজেই বলছিলেন, আমি প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিব বলছি.... ঠিক সেই মুহূর্তে এই পিছনের জানালাতে বৃষ্টির মতো গুলি আসতে থাকল। .... বেশ বড় একটা গ্লাস আমার হাতের মধ্যে ফুটল.... প্রচুর রক্ত ঝরছিল। এটা দেখে বঙ্গবন্ধু তাড়াতাড়ি আমার হাত ধরে .....

আমার হাতের মধ্যে ফুটল এবং কেটে প্রচুর রক্ত ঝরছিল। এটা দেখে বঙ্গবন্ধু তাড়াতাড়ি আমার হাত ধরে টানছিলেন শুয়ে পড়ার জন্য। কিছুক্ষণ পর গুলি বন্ধ হয়ে গেল। সেই সময় কাজের ছেলে আব্দুল ওপর থেকে ওনার পাঞ্জাবি আর চশমা নিয়ে আসে। আমার সামনে দাঁড়িয়ে উনি পাঞ্জাবিটা পরলেন এবং চশমাটা হাতে নিয়ে গাড়ি বারান্দায় গিয়ে বললেন, "পুলিশ সেন্ট্রি, এত গুলি চলছে, তোমরা কী করছ?" বলে উনি উপরে উঠে গেলেন। তার কিছুক্ষণ পর কামাল ভাই এলেন, নেমে এসে শুধু বললেন, "পুলিশ সেন্ট্রি, আর্মি সেন্ট্রি, আসেন আমার সঙ্গে।" ঠিক সেই মুহূর্তে আমি এবং ডিএসপি সাহেব উনার পিছনে যেয়ে দাঁড়িয়ে আছি, হঠাৎ দেখি ৩-৪ জন কালো পোশাকধারী লোক উনার সামনে এসে হাজির হল। এসেই বলল, "এই শুয়োরের বাচ্চা, সোজা হয়ে দাঁড়া !" বলার সাথে সাথে ডিএসপি সাহেব আমাকে পিছন থেকে টান দিলেন, ঘরের ভিতর আসার জন্য ইঙ্গিত করলেন। প্রায় জোর করে উনি আমাকে ধরে নিয়ে এলেন রুমের ভিতরে, আর ওরা সেই মুহূর্তে কামাল ভাইয়ের পায়ের উপর গুলি করল, কামাল ভাই জাম্প দিয়ে এখানে এসে পড়লেন ঠিক আমার পাশেই, এমনভাবে পড়লেন যে, ওনার ধাক্কায় আমিও পড়ে গেলাম। আমার বডির হাফ পোর্শন ছিল টেবিলের নিচে আর হাফ পোর্শন টেবিলের বাইরে। ঠিক সেই মুহূর্তে কালো পোশাকধারীরা কামাল ভাইকে লক্ষ্য করে ব্রাশফায়ার করল। কামাল ভাইয়ের বুক ঝাঁঝরা হয়ে একটা গুলি লাগল ডিএসপি সাহেবের পায়ে, আর একটা লাগল আমার। কামাল ভাই এখানেই স্তব্ধ হয়ে গেলেন। তারপর ডিএসপি সাহেব আমাকে প্রায় টেনে ওনার রুমে নিয়ে গেলেন। ওখানে যেয়ে দেখি এসবি-র এক সাব-ইন্সপেক্টর দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে, পিস্তলটা তার পায়ের কাছে ফেলানো। আমাদের দু'জনকে ডিএসপি সাহেব প্রায় ধাক্কায়-ধাক্কায় এই দরজা দিয়ে বাইরে নিয়ে গেলেন। বাইরে যাওয়ার পর আমাদের তিনজনকে একজন আর্মি এসে চুল ধরে টেনে তুলল। টেনে তোলার পর আমাদেরকে লাইনে দাঁড় করাল। চেয়ে দেখি ওখানে পুলিশের আরো কিছু লোক লাইনে দাঁড়িয়ে আছে। আমরাও দাঁড়িয়ে রইলাম। ৩-৪ জন সেন্ট্রিকে পাহারা দেওয়ার জন্য রেখে গেল, তারপর তারা ভিতরে চলে গেল। আমরা যখন লাইনে দাঁড়িয়ে আছি তখন উপরে বেশ গুলিগোলার শব্দ শুনলাম। একসময় বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠ শুনলাম :

"আমাকে কোথায় যেতে হবে?" তার কিছুক্ষণ পরেই প্রচণ্ড একটা ব্রাশফায়ার শুনলাম, তারপর উপরে বেশ নিস্তব্ধতা নেমে এল। কিছুক্ষণ পরে মহিলাদের কান্নার রোল পড়ে গেল। কান্নার পরে ফায়ার হচ্ছিল, তারপর কান্নার আওয়াজগুলো থেমে গেল। কিছুক্ষণ পরে নাসের কাকাকে উপর থেকে নামিয়ে নিয়ে এল। উনি যখন নেমে এলেন দেখলাম যে, একটা শাড়ির পাড় দিয়ে উনার আঙ্গুলগুলো বাঁধা, তাতে মনে হয়েছিল যে, আঙ্গুলগুলো হয়তো নেই। উনি আমাদের লাইনে এসে দাঁড়ালেন, তখন একজন আর্মি বলল, "চলেন, আপনি ঐ রুমে বসেন," বলে আমাদের লাইন থেকে উনাকে আমাদের অফিস রুমের এটাচড বাথরুমে নিয়ে এল। নিয়ে এসে ওখানে গুলি করল।

যে গুলি করল, গুলি করে সে আমাদের লাইনের কাছাকাছি এসে আবার দাঁড়াল। কিছুক্ষণ পরে নাসের কাকা 'পানি পানি' বলে চিৎকার করে উঠলেন। তখন আরেকজন বলল, "পানি দিয়ে আয়।" তখন যে গুলি করেছিল, সে এসে আবার ফায়ার করল।

তারপর... কিছুক্ষণ পরে দেখি যে, রাসেলকে নিয়ে নিচে নেমে আসছে। রাসেল আমাকে দেখে, ও যে গান পয়েন্টে ছিল ঠিক ভুলে গিয়ে, আমাকে এসে জড়িয়ে ধরেছে, ধরে বলে, "ভাইয়া, আমাকে মারবে না তো?" আমি বললাম, "না, ভাইয়া তোমাকে মারবে না।" ও যখন আমাকে জড়িয়ে ধরেছে, একজন আর্মি ওকে ধরে নিয়ে গেটের ডান পার্শ্বে যে পুলিশ বাঙ্কার, ওখানে নিয়ে গেল। নিয়ে গিয়ে ওখানে আটকে রাখল। একজন সেন্ট্রি ছিল ওখানে। কিন্তু ওখান থেকে ও কান্নাকাটি করছিল যে, "আমি মায়ের কাছে যাব।" তখন ওকে ঐ পুলিশ বাঙ্কার থেকে বের করে উপরে নিয়ে গেল। তার কিছুক্ষণ পর গুলির শব্দ শুনলাম, তারপরে সমস্ত আবার নিস্তব্ধ হয়ে গেল। কর্নেল জামিল সাহেবের ডেডবডি দেখলাম ওনারই লাল টয়োটা গাড়িতে নিয়ে এখানে এনে রাখল। ওনার ডেডবডির পা দুটো গাড়ির বাইরে আর বডির ম্যাক্সিম্যাম পোর্শনটা গাড়ির ভিতরে। কিছুক্ষণ পরে আব্দুল আর রমাকে নামিয়ে নিয়ে এল আমাদের লাইনে। তখন আমার পায়ে প্রচুর ব্লিডিং হচ্ছিল, এবং আব্দুলেরও গুলি লেগেছে, তারও খুব ব্লিডিং হচ্ছে। তখন এ-বাসায় যে বুড়ি ছিল, রান্নার জন্য, সে বুড়ি আর্মিদের কাছে অনুরোধ করছে বারবার যে, "দু'টো ছেলে মারা যাচ্ছে, তোমরা তাদের হসপিটালে নিয়ে যাও।" কি মনে করে আব্দুলকে আর আমাকে– আমাদের দু'জনকে দু'গাড়িতে করে হসপিটালে নিয়ে গেল। তারপর আর বলতে পারব না, এ বাড়িতে আর কি হয়েছিল।

জিয়াউল হক
ঊর্ধ্বতন চিত্রগ্রাহক,
বাংলাদেশ টেলিভিশন, ১৯৭৫

সেদিন সকাল বেলায়, প্রায় সকাল নয়টা কি দশটার সময়,

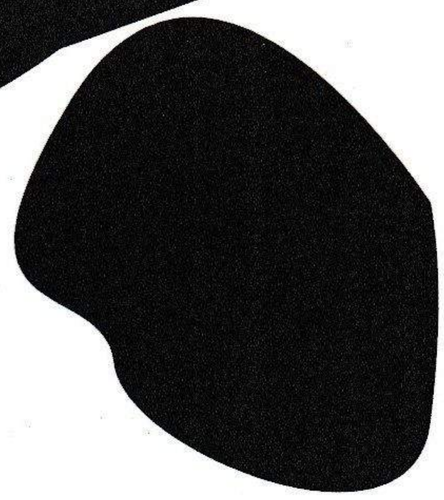
সামরিক বাহিনীর কিছু লোক আমার বাসায় এসে আমাকে তুলে নিয়ে যায়। এদের প্রত্যেকের হাতে রিভলভার কিংবা স্টেনগান। উদ্দেশ্য– বঙ্গবন্ধুর ৩২ নম্বরের বাসায় এসে তাঁদের এ নিহত অবস্থার ছবিগুলো তোলা। তখন, বঙ্গবন্ধু যখন এইখানে বা এ ভবনে বাস করতেন, তখন এটা উনার বসার কক্ষ হিসেবে ব্যবহার করা হত এবং এই দরজা দিয়ে– এটাই ছিল মেইন প্রবেশদ্বার– বাইরের লোক এখানে এসে জিজ্ঞাসা করে, সামনে ড্রয়িং রুম, সেই ড্রয়িং রুমে বসত। এই ঘরে শেখ কামাল, বঙ্গবন্ধুর বড় ছেলে, ওনাকে দেখেছি, ওনার মৃতদেহ এখানে পড়ে ছিল। আর সামনে একটা টুল ছিল, এখানে পুলিশের একজন সাব-ইন্সপেক্টর, তাঁকে দেখেছি নিহত অবস্থায় পড়ে থাকতে।

আমি যখন এই ঘরে ঢুকি তখন দেখি এই দরজা বন্ধ অবস্থায়, এখানটায় বেগম মুজিব উপুড় হয়ে পড়ে আছেন, নিহত অবস্থায়। অবশ্য আমাকে বলা হল যে, মহিলা যেহেতু আর সামরিক বাহিনীর লোক গার্ডে ছিলেন... তাঁরা আমাকে বললেন যে, মেয়েদের ছবি তুলবেন না। আমি ছবি তুললাম না।

এই কক্ষটা মূলত বঙ্গবন্ধু এবং বেগম মুজিবের শয়নকক্ষ, এখানে কিছু পাইপ-টাইপ রাখা আছে, আমি যখন ভিতরে আসি তখন দেখলাম যে, এই খাট এবং এই সাইড-টেবিলের মাঝখানটায় আধাশোয়া অবস্থায় জামালের মৃতদেহ। গুলির চিহ্ন বুকে লাগা, আর রক্ত বিভিন্ন জায়গায় ছড়ানো, পুরো মেঝের মধ্যেও রক্ত ছিল।

যদিও আমাকে ছবি তুলতে দেয়নি তখন, যেহেতু মেয়েদের ছবি, এবং শেখ সাহেবের পরিবারের বড় বৌ, শেখ কামালের বৌ সুলতানা এবং রোজী, মাঝখানটায় রাসেল– তাঁদের মৃতদেহ এখানটায় ছিল আমি শুধু দেখছি, আমাকে ছবি তুলতে দেওয়া হয়নি। ঠিক এইখানে আমি বঙ্গবন্ধুর মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেছি। যখন আমি সিঁড়ি দিয়ে আসি ওনার গায়ে রক্ত, সিঁড়ির একবারে একদিক দিয়ে নেমে-নেমে লাস্ট সোপানে গিয়ে রক্তের ধারা– আমি বুঝতেই পারিনি প্রায় ৮ কোটি লোকের এরকম নেতা বঙ্গবন্ধু এখানে পড়ে থাকবেন। আমি ক্যামেরায় ছবি তুলছি, আমার বিশ্বাস হয় না, তার আগের রাতে সোয়া আটটা পর্যন্ত আমি গণভবনে তাঁর সাথে কথা বলেছি এবং এ রকম এক মহান ব্যক্তিত্বকে এই সিঁড়ির তিন ধাপের যেখানে... আমি ভাবতেই পারিনি... আমি একবার চশমা খুলি, তাঁকে দেখি, আবার ক্যামেরা দেখি, অ্যাপারচার লাগাই আর সেট করছি, ভাবছি, সত্যি দেখছি না মিথ্যা দেখছি, আমি ঘড়িতে হাত দিয়ে দেখছি আমি সত্যিই দাঁড়িয়ে আছি কিনা একজন জীবন্ত মহামানবের সামনে, তাঁর মৃতদেহের সামনে। আমি ছবি তুলছি, আবার তাকাচ্ছি, আমি সত্যি দেখছি কিনা, চশমা খুলছি, আবার অ্যাপারচার দিচ্ছি, ফোকাস করছি।

ঠিক এইখানে আমি বঙ্গবন্ধুর মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেছি। যখন আমি সিঁড়ি দিয়ে আসি ওনার গায়ে রক্ত... আমি বুঝতেই পারিনি প্রায় ৮ কোটি লোকের এরকম নেতা বঙ্গবন্ধু এখানে পড়ে থাকবেন। এরকম এক মহান ব্যক্তিত্বকে এই সিঁড়ির তিন ধাপের যেখানে একবার চশমা খুলি, তাঁকে দেখি, আবার.....



তারপর দেখছি বঙ্গবন্ধু, গালের এখানে তাঁর সেই মোল, সেটা আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। এবং তিনি, আমার মনে হয়, হাত দিয়ে কিছু বলতে চাচ্ছিলেন। কারণ মনে হল, একটা বুলেট লেগে হাতের এ জায়গাটায় আঙ্গুলটা নাই। বুকের ওপর হাতটা রাখা, আরেকটা হাত ওপাশে, উনি শুয়ে আছেন। আট কোটি লোকের নেতা বঙ্গবন্ধু। আমার বিশ্বাসই হয় না, তিনি এভাবে পড়ে থাকবেন। সমস্ত ছবি– মৃতদেহের ছবি সব তোলার পর আমি এ বারান্দায় আসি। তখন আমাকে বলা হল যে, "ক্যামেরার ছবিগুলো আমাকে দিয়ে দেন।" তো, আমি ঠিক এ বারান্দায় এসে ক্যামেরাটা খুলে সমস্ত ছবিগুলো দিলাম। একটা রোল দিলাম। তো, বলে, "বাকিটায় কী আছে?" আমি বললাম, "ওগুলো আন-এক্সপোসড ম্যাটারিয়াল।" বলল, "ওটাও আমাকে দেন।" ও-দুটেসহ আমি তখন সেনাবাহিনীর লোকের হাতে হস্তান্তর করলাম।

ম. হামিদ সম্পাদিত 'সেই অন্ধকার রাত' বই থেকে সংকলিত

তাঁর স্মরণে

রবিউল হুসাইন

৭ই মার্চের ভাষণটি বিভিন্ন কারণে কালজয়ী। বঙ্গবন্ধু ভাষণটি এমনভাবে দিয়েছিলেন যে, সেই ভাষণের মাধ্যমে তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন পরোক্ষভাবে। .... বাংলার মানুষ যেমন তাঁর মর্মবাণী পেয়ে গেল, অন্যদিকে পাকিস্তানিরাও তাঁকে সরাসরি স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য দায়ী করতে পারেনি।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অচিন্তনীয় ও অভাবিত পরিবারবর্গ নিয়ে মৃত্যু পৃথিবীর ইতিহাসে, বিশেষ করে অধুনাকালে অন্যতম বিয়োগান্ত রাজনৈতিক ঘটনা। যিনি একটি দেশের প্রতিষ্ঠাতা তাঁর পরিবারসুদ্ধ ঘাতকদের হাতে নিশ্চিহ্ন হওয়ার বিষয় আমাদের জানামতে এইকালে আর কোথাও দেখা যায় না। রাজা-বাদশাহদের আমলে সেই সুদূর অশোকের সময়ে সম্রাট অশোক নিজের সিংহাসন আরোহণের পথ সুগম করার জন্য তাঁর শতাধিক ভাই-বোন-জ্ঞাতিগোষ্ঠী নিশ্চিহ্ন করেছিলেন। পরে অবশ্য আত্ম-অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে বৌদ্ধ ধর্মের অন্যতম অনুসারী এবং পৃষ্ঠপোষক হিসেবে শান্তি খুঁজে বেড়ান। মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবও বড় ভাই দারাশিকোসহ অন্যান্যদের হত্যা করে ক্ষমতা দখল করেন, এমনকি নিজের পিতা সম্রাট শাহজাহানকেও গৃহবন্দি করে রেখেছিলেন। ক্ষমতার মরীচিকা মানুষকে এমন মোহাচ্ছন্ন করে রাখতে পারে যে, হত্যা করা তখন স্বাভাবিক একটি প্রক্রিয়া হিসেবে দেখা দেয়, বিশেষ করে রাজ্য ও রাজত্বলাভে। প্রাচীন কালে পররাষ্ট্র পদানত করাকে বীরোচিত কর্ম হিসেবে গণ্য করা হত। কারণহীন এই অমানবিক পরদেশ জয় কর্ম এক ধরনের মানসিক পীড়া ও বিকৃতমনস্কতার পরিচয় দেয়– ইতিহাস যদিও ঐ সব নায়কদের বীর বলে আখ্যায়িত করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এরা খলনায়ক ও মানসিক ভারসাম্যহীন যুদ্ধবাজ গোত্রীয়। এদের মধ্যে মহাবীর (?) আলেকজান্ডার, চিঙ্গিস খাঁ, হালাকু খাঁ, নাদির শাহ, অধুনা হিটলার উল্লেখ্য। অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় ভাগ্যান্বেষী, নিজের দেশের অপর্যাপ্ততা নিষ্ঠুর লোভ-লালসাযুক্ত এই সব তথাকথিত ইতিহাসের বীরপুঙ্গবরা দেশে দেশে কতশত



ড্রয়িং : হাশেম খান

নির্দোষ, নিরপরাধী সাধারণ মানুষের রক্তে হোলি খেলেছে, কত কত গ্রাম, জনপদ, কীর্তি, সৌধ ধ্বংসসাধন করেছে এর কোনো শেষ নেই। এদের সবাইকে প্রায় আততায়ীর হাতে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়েছে। ধর্মীয় গোত্রের নেতাদের বেলায়ও আততায়ীদের দ্বারা গুপ্তহত্যা অমানবিকভাবে ঘটেছে। আমাদের ইসলাম ধর্মের চার খলিফার মধ্যে হযরত ওমর (রা.) হযরত ওসমান (রা.) এবং হযরত আলী (রা.) গুপ্তহত্যার শিকার হয়েছেন। স্পেনের কলোনি ল্যাটিন আমেরিকার আজটেক সাম্রাজ্য যেমন ধ্বংস হয়েছিল নিষ্ঠুর হার্নান্দো কর্টেসের নেতৃত্বে তেমনি তারা

আটাশ বছরব্যাপী মুসলিম রাজত্ব সেই স্পেনেই ধ্বংস-সাধন করে নিজেদের খ্রিস্টীয় প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল বিপুল প্রাণহত্যার মাধ্যমে। তুরস্কের অটোমন সাম্রাজ্যের শেষ সুলতানের কপালেও আততায়ী কর্তৃক হত্যাকাণ্ড জুটেছিল। ফরাসি বিপ্লবের শেষে ষোড়শ লুই-এর বেলায়ও পরিবারসহ গিলোটিনে ফাঁসি, রাশিয়ার বিপ্লবশেষে দ্বিতীয় নিকোলাসের পরিবারসহ হত্যা, পলাশী যুদ্ধের পর নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরিবারসহ নিধনযজ্ঞ– সবই রাজনৈতিক হত্যার নির্মম ঘটনা। এর পরে দেশে দেশে গান্ধী, রাজীব গান্ধী, শ্রীলংকার বন্দরনায়েক, প্রেমাদাসা, মিশরের আনোয়ার সা'দাত, পাকিস্তানের ভুট্টো, জিয়াউল হক, চিলির আলেন্দে, বলিভিয়ার বিপ্লবী চে গুয়েভারা, সুইডেনের ওলফ পাম, আফগানিস্তানের নজিবুল্লাহ, কঙ্গোর প্যাট্রিস লুমুম্বা, বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানসহ অসংখ্য রাজনৈতিক নেতার হত্যাকাণ্ড ঘটে গেছে। কিন্তু উল্লেখ্য যে, এদের মধ্যে কেউই, শেখ মুজিব আর মহাত্মা গান্ধী ছাড়া, কোনো দেশের জনক বা প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন না। বঙ্গবন্ধু সেইদিক থেকে খুব হতভাগা তো বটেই; আরো নির্মম যে, নিজের নির্দোষ পরিবারবর্গসহ তিনি নিহত হয়েছিলেন আজ থেকে সাঁইত্রিশ বছর আগে। আজ এতোদিন পর প্রশ্ন জাগে, কেন তিনি একটি দেশের প্রতিষ্ঠা করেও ওইরকম নির্মমভাবে প্রাণ দিলেন? তাঁর কি অপরাধ ছিল? এর উত্তর তাঁর কথাতেই পাওয়া যেতে পারে। তিনি বলতেন, আমার সবচেয়ে বড় দোষ এবং গুণ ছিল দেশকে ভালোবাসা। আর দেশের মানুষকে ভালোবাসা। ভালোবাসার এত চরম মূল্য ইদানিংকালে আর কোনো নেতা এমনভাবে দেননি। অনেকে বলে থাকেন, মানুষ তার জীবদ্দশাতেই পাপের শাস্তি পেয়ে যায়। তখন আমরা ভাগ্যের কথা বলি, কপালের কথা বলি। কিন্তু এই যুক্তি বা ফর্মুলা বঙ্গবন্ধুর বেলায় দুর্বল হয়ে পড়ে। পরিবারসহ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবেন! একটি দেশের স্বাধীনতা দেওয়া কি পাপ? একটি জাতিকে পুনরুজ্জীবিত করা কি অন্যায়? যে দেশ বা জাতি হাজার বছর ধরে পরাধীনতার নাগপাশে বন্দি ছিল সেই দেশ এবং জাতিকে শৃঙ্খলমুক্ত করা কি অপরাধ? জানি এসবের কোনো উত্তর হয় না। বিরুদ্ধপক্ষরা হয়তো বলবে, সেই সময় তাঁর তৈরি করা রক্ষীবাহিনীর অত্যাচারের কুফল প্রতিক্রিয়াই পাপ হিসেবে দেখা দিয়েছিল। পক্ষের লোকেরা বলবে: তিনি যে স্বাধীনতার বিরুদ্ধপক্ষদের প্রতি নমনীয়ভাব প্রদর্শন করছিলেন, সেটিই পাপ হয়ে রূপ নিয়েছিল। ধরে নিলাম দুটোই সত্য, কিন্তু তাই বলে এমন নিষ্ঠুরতা কি কখনো ঘটতে পারে? আজ সাঁইত্রিশ বছর হল এই নিষ্ঠুরতার বয়স। এই দীর্ঘ সময়ের পর তাঁর মূল্যায়ন, অবদান এবং গ্রহণযোগ্যতা দিন দিন বেড়েই চলেছে। বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পর তাকে ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলেছে, স্বাধীনতার প্রকৃত ইতিহাসকে তার নিজস্ব ও সঠিক পথে যেতে দেওয়া হয়নি পরিকল্পিতভাবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইতিহাসের মরণকামড় ঠিকই সঠিক সময়ে পড়েছে। প্রকৃতির মধ্যে অদৃশ্য ও রহস্যময় একটি বিচারপদ্ধতি চালু আছে। সেইমতো আপাতত স্ববিরোধী রূপ পরবর্তীকালে পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন হয়ে ওঠে। বঙ্গবন্ধুর অবদানও স্বাধীনতার ইতিহাসে তেমনিভাবে প্রকৃতির অপ্রতিরোধ্য ও স্বাভাবিক বিচারের আলোকে উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিয়েছে।

বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর ব্যাপারে বিরুদ্ধপক্ষরা বলে থাকে, সেই সময়ে কোনো দিক থেকে কোনো প্রতিবাদ বা বাধার সৃষ্টি হয়নি। রক্ষীবাহিনী, যেটি তাঁর নিজের সৃষ্টি, সেখান থেকেও কেউ কোনো রকম শব্দ করেনি, এমনকি তাঁর নিজের হাতে গড়া বিশাল রাজনৈতিক দল, সেখান থেকেও কোনো নেতা বা কর্মী সেইমতো প্রতিরোধ গড়ে তোলেনি। এই সব মূল প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, কথাগুলো সঠিক। কিন্তু বিরুদ্ধপক্ষরা সেখানে মনস্তাত্ত্বিক খেলা খেলেছিল, সেটাই আসল কারণ। এই কথা তারা বুঝতে চায় না। বঙ্গবন্ধুর মতো এক জনপ্রিয় বিশাল ব্যক্তিত্বকে পরিবার-পরিজনসহ হত্যা করার ঘটনা মনস্তাত্ত্বিকভাবে সবার মধ্যে একটি বিরাট ভয়াবহতার সৃষ্টি করেছিল। সেই মনস্তাত্ত্বিক ভয়াবহতার স্পর্শে ও বাস্তবতায় নেতা-কর্মীসহ সবাই শিহরিত হয়ে মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছিল। আর যখন কেউ মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে যায় তখন তার মধ্যে সেই প্রতিরোধের চেতনা থাকে না। এই কারণে সেই সময়ে কেউ প্রতিবাদ করতে এগিয়ে আসেনি। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, যেরকমভাবে বিরুদ্ধপক্ষরা বলে থাকে– বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা, ভালোবাসা বা সম্মান সেই ঘটনার পর কর্পূরের মতো উবে গেছে– তা সঠিক নয়; বরং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রতি আকর্ষণ দিন দিন বেড়েই চলেছে।

একটি মানুষের মৃত্যুর পর কী কী কারণে তিনি

স্মরণীয় হয়ে থাকেন? বঙ্গবন্ধুর মধ্যে সেইসব অবিস্মরণীয় গুণাবলি ছিল বলেই তাঁকে সবাই মনে রেখেছে। তাঁর চেহারা, দীর্ঘদেহ আর ব্যবহার মিলিয়ে হৃদয়খানি ছিল বিশাল মাপের, যে হৃদয় ওই রকম দীর্ঘ দেহেই মানায়। তাঁর ছিল তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তি। একবার কাউকে দেখলে জীবনে তাকে কখনো ভুলতেন না। তাঁর ব্যবহার ছিল অবিশ্বাস্যরকমভাবে স্বচ্ছ আর উদার। তাঁর চরিত্রের কারিশমাটিক আকর্ষণে সবাইকে কাছে টেনে নিতে পারতেন। 'বারিটোন' কণ্ঠস্বর দিয়ে মানুষকে বিমোহিত করে রাখতেন। একটি মানুষের মধ্যে যে জিনিসটি সবচেয়ে দরকারি সেটি হল নির্ভীকতা, নিঃস্বার্থতা আর দেশের প্রতি– দেশের মানুষের প্রতি অকুণ্ঠ ভালবাসা। এরকম মানুষকে মানুষ কীভাবে ভুলতে পারে! সাময়িকভাবে তাঁকে ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলেও তাঁর অবদান ও কৃতিত্ব ঠিকই ভেসে উঠবে। বঙ্গবন্ধুর বেলায় তাই হয়েছে প্রকৃতির নিয়মে। মানুষ হিসেবে যেমন বড় মাপের ছিলেন তেমনি ছিল তাঁর তীক্ষ্ণ রাজনৈতিক মেধা। তা না হলে ৭ই মার্চে সেই অবিস্মরণীয় ভাষণ দিলেন কেমন করে। তিনি বাংলাদেশের প্রায় সব মানুষকে স্বাধীনতার মন্ত্রে এক করে এক কাতারে দাঁড় করাতে পেরেছিলেন কেমন করে, কিসের শক্তিতে– এই প্রশ্ন আজ জাগে।

৭ই মার্চের ভাষণটি বিভিন্ন কারণে কালজয়ী। বঙ্গবন্ধু ভাষণটি এমনভাবে দিয়েছিলেন যে, সেই ভাষণের মাধ্যমে তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন পরোক্ষভাবে। সেই সময়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক চাপের মধ্যে তিনি মাথা ঠাণ্ডা করে স্বীয় অপূর্ব ধীশক্তির মাধ্যমে সরাসরি স্বাধীনতার ঘোষণা দেননি। অথচ সেইরকম হতে পারত। আর যদি সেইরকমই হত তাহলে আমাদের স্বাধীনতা পাওয়া সুদূরপ্রসারী হয়ে পড়ত। পরোক্ষভাবে স্বাধীনতা ঘোষণার কারণে বাংলার মানুষ যেমন তাঁর মর্মবাণী পেয়ে গেল; তেমনি করে পাকিস্তানিরাও তাঁকে সরাসরি স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য দায়ী করতে পারেনি। সরাসরি স্বাধীনতার ঘোষণা দিলে পাকিস্তানিরা তাঁকে জীবিত রাখত তো নয়ই, বরং আরো তারা বেলুচিস্তানের মতো ঈদের জমায়েতে বোমা বর্ষণ করার মতো রেসকোর্সের ময়দানে বোমা ফেলতে দ্বিধা করত না। এবং এসব করার যুক্তিপূর্ণ একটি কারণ খুঁজে পেত। আর একটি ব্যাপারেও বঙ্গবন্ধু ভবিষ্যৎদ্রষ্টার ভূমিকা রাখলেন, সেটা হচ্ছে– তাঁকে বিচ্ছিন্নতাবাদী হিসেবে প্রমাণিত করতে পারল না পাকিস্তানিরা; ফলে ২৫শে মার্চের গণহত্যার পর সারা দুনিয়াই যে প্রচার হয়েছিল তাতে বিদ্রোহীদের মাঝে বিপুল পরিমাণে সাড়া ফেলতে সক্ষম হয়েছিল। যেহেতু তা কোনো বিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রশ্ন ছিল না, ছিল তা নির্বাচনের পর বিপুলভাবে জয়লাভ করার কারণে শাসনভার গ্রহণের পালা এবং যখন সেই ক্ষমতা হস্তান্তরে তারা কোনো সাড়া দিল না অন্যায়ভাবে, তখনই স্বাধীনতার প্রকৃত আন্দোলন শুরু হল। এইসব কারণে তিনি দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাননি। স্বেচ্ছায় ধরা দিয়েছিলেন। কারণ তিনি বিদ্রোহী চরিত্রের ছিলেন না। যে সাবলীল গণতান্ত্রিক ধারায় রাজনীতি চলছিল তার একটি বিশেষ প্রক্রিয়াকে তিনি অনুসরণ করেছিলেন। সেইদিক থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভ বিংশ শতাব্দীতে একটি অনবদ্য রাজনৈতিক ঘটনা। ৭ই মার্চের ভাষণ এইসব কারণে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং সূক্ষ্ম-তীক্ষ্ণ রাজনৈতিক মেধার ফসল। এই কারণে বঙ্গবন্ধুকে একজন কালজয়ী রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে অভিহিত করা যায়।

অনেকে বলে থাকেন, তিনি যদি সেইরকম বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ হতেন, তাহলে গণহত্যাকে রোধ করতে পারতেন। যখন স্বাধীনতার ঘোষণা সরাসরি দিলেন না কিন্তু গণহত্যা শুরু হল কেন অর্থাৎ তাহলে সরাসরি স্বাধীনতার ঘোষণা দিলেই পারতেন, যখন গণহত্যা অবধারিত ছিল। এইসব প্রশ্নে বলা যায় যে, যেকোনো রাষ্ট্রের জন্ম-সময়ে স্বাধীনতা আন্দোলনের কালে গণহত্যা অবশ্যম্ভাবী। রক্তপাত ছাড়া দুনিয়ার কোথাও স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব হয়নি, হবেও না কোনোকালে কোনোদিন।

এরকম উদাহরণ কোনো দেশে পাওয়া যায় না। বিশেষ করে এক সামরিক শাসনের কালে এ কথা কল্পনাও করা যায় না। বঙ্গবন্ধুর কৃতিত্ব, তিনি ধীরে ধীরে, ধাপে ধাপে গণতান্ত্রিক রাজনীতি নিয়মতান্ত্রিকভাবে অনুসরণ করতে করতে দেশের স্বাধীনতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আজ তাঁর মৃত্যুদিবসে বঙ্গবন্ধুকে সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করি।

অনন্য মহামানব

মাহবুব তালুকদার

আমার জীবনের সবচেয়ে বড় গৌরব আমি চাকরি সূত্রে বঙ্গবন্ধুর সান্নিধ্য লাভে ধন্য হয়েছিলাম। আজ যখন পেছনে ফিরে তাকাই তখন মনে হয় বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষের মধ্যে এ রকম বিরল সৌভাগ্য অর্জনকারীদের আমি একজন। তাঁর সংস্পর্শে ইতিহাসের কত ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে আছি আমি। বঙ্গবন্ধুর স্নেহের স্পর্শ জীবনভর আমার জন্য পরম পাথেয়। বেঁচে থাকার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অন্তরে লালন করব তার পুণ্যস্মৃতি।

১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি যেদিন তিনি প্রধানমন্ত্রীর পদ ছেড়ে রাষ্ট্রপতির পদে অভিষিক্ত হন, সেদিন থেকে ১৫ আগস্ট তাঁর মৃত্যুদিন পর্যন্ত আমি ছিলাম সরকারের উপসচিবের পদমর্যাদায় তাঁর সহকারী প্রেসসচিব। সে সময়ে প্রেসসচিব ছিলেন প্রখ্যাত সাংবাদিক তোয়াব খান আর তথ্য অফিসার ছিলেন ইনফরমেশন সার্ভিসের মোহাম্মদ সফিউল্লাহ, যিনি পরবর্তীকালে রাষ্ট্রদূত হন। বঙ্গবন্ধুর অধীনে দায়িত্ব পালন নিতান্ত আকস্মিক মনে হয়। ১৯৭৫ সালের প্রথম থেকেই শুনছিলাম সরকার পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটবে। সংসদীয় সরকারের বদলে রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির সরকার চালু হবে। আমি তখন বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতি মুহম্মদুল্লাহর জনসংযোগ অফিসার বা পিআরও। সরকার-পদ্ধতির পরিবর্তনের পর আমার চাকরির ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। কোথায় বদলি করা হবে কে জানে! কিন্তু ভবিতব্য বলে একটা কথা আছে। প্রায় আকস্মিকভাবে আমার জীবনে উপস্থিত হল সেই অলৌকিক মুহূর্ত। দুপুরে বঙ্গবন্ধু অফিস থেকে বেরিয়ে গাড়িতে উঠতে যাচ্ছেন। হঠাৎ পেছন দিকে মুখ ফিরিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে আমাকে ডাকলেন, 'মাহবুব! শোনো।' আমি ত্রস্ত পায়ে সামনে এগিয়ে যেতে বঙ্গবন্ধু বললেন, 'তুমি আমার সঙ্গে থাকবা।' জাতির জনকের অধীনে চাকরি করার এটুকুই ভূমিকা।

বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিকথা লিখেছি আমার লেখা 'বঙ্গভবনে পাঁচ বছর' বইয়ে। অনেক ঘটনার বিবরণ আছে তাতে। দু'-একটি ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলেও অনেক নতুন পাঠকের কাছে তা সমাদৃত হতে পারে বলে আশা করি। দীর্ঘ ৩১ বছর পর তা লিখতে গিয়ে মনে হচ্ছে স্মৃতি কখনও মরে না। স্মৃতি সততই জীবন্ত। মনে পড়ে ১৯৭৫ সালের ১০ ফেব্রুয়ারির কথা। সেনাবাহিনীর বিমান 'বলাকা'য় আমরা কক্সবাজার যাই। অন্যদের মধ্যে মন্ত্রী খোন্দকার মোশতাক আহমদ ও প্রতিমন্ত্রী তাহের উদ্দীন ঠাকুর সঙ্গে ছিলেন। এই সফরে আবিষ্কার করলাম উভয় মন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর খুবই ঘনিষ্ঠজন। আর তাহের উদ্দীন ঠাকুর তো ছিলেন তাঁর 'ব্লু আইড বয়'। জীবনের শেষ দিনগুলোতে তাহের উদ্দীন ঠাকুর ছাড়া কোনো গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে যেতেন না। কোথাও গেলে একদিকের দরজা দিয়ে বঙ্গবন্ধু অবতরণ করেছেন, অন্যদিকের দরজা দিয়ে গাড়ি থেকে নেমেছেন তাহের উদ্দীন ঠাকুর। আরেকটি দিনের স্মৃতি মনে আছে। ১৯৭৫ সালের ৮ মার্চ বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে টাঙ্গাইল যাই। সেখান থেকে হেলিকপ্টারে খুলনা যাই আমরা। খুলনায় বঙ্গবন্ধুর ভাই শেখ নাসেরের বাড়িতে বঙ্গবন্ধুর অসুস্থ পিতা শেখ লুৎফর রহমান ছিলেন। তাঁকে দেখতে যাওয়ার জন্যই খুলনায় যাওয়া। হেলিকপ্টারে সেবার সামনের সারিতে বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর পাশে বাণিজ্যমন্ত্রী খোন্দকার মোশতাক আহমদ বসেছেন। রাষ্ট্রপতির বিশেষ সহকারী তোফায়েল আহমেদ ও আমি তাঁদের পেছনের সারিতে। প্রতিটি সফরের সময় আলাপচারিতায় বুঝেছি খোন্দকার মোশতাক আহমদ বঙ্গবন্ধুর কত আপনজন! পঁচাত্তরের কলঙ্কিত হত্যাকাণ্ডের পর খোন্দকার মোশতাক আহমদ প্রেসিডেন্ট হলেন আর তাহের উদ্দীন ঠাকুর হলেন তাঁর প্রধান পরামর্শক। প্রেসিডেন্টের অফিস থেকে মাত্র দু'শ গজ দূরে আমার বাসস্থান। তখন লক্ষ করেছি, পরিবর্তিত অবস্থায় মানুষ কী রকম কদর্য রূপ পরিগ্রহ করতে পারে! বঙ্গবন্ধুর মহাপ্রয়াণ দিনে এসব ঘটনা কেন বেশি করে মনে পড়ছে জানি না।

অনেক স্মৃতিই তো আছে বঙ্গবন্ধুকে ঘিরে। আমার জীবনের সবচেয়ে গৌরবের ঘটনাটি আবার বলার লোভ সংবরণ করতে পারছি না। পঁচাত্তর সালের ৭ মে'র ঘটনা। বঙ্গবন্ধুর



**মাহবুব এভাবে শুয়ে আছে?
একটা বালিশ ওরে যোগাড় কইরা
দিতে পারলা না?
এরপর বঙ্গবন্ধু নিজেই একটা
বালিশ এনে আমার
মাথার নিচে দিয়ে দেন।**

পিতার চেহলামে যোগ দিতে আমরা টুঙ্গিপাড়া যাই। এ যাত্রা তিনি নিজেই আমাকে সঙ্গে যেতে বলেছিলেন। 'গাজী' জাহাজে আমরা রওনা হই। বাণিজ্যমন্ত্রী খোন্দকার মোশতাক আহমদ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রী আবদুর রব সেরনিয়াবাত, তথ্যমন্ত্রী এম কোরবান আলী, রাষ্ট্রপতির বিশেষ সহকারী তোফায়েল আহমেদ, শেখ ফজলুল হক মণি ছাড়াও তিন বাহিনীপ্রধান এবং অনেক আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী আমাদের সঙ্গে ছিলেন। আমি সড়ক পথে বা আকাশ পথে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে বিভিন্ন স্থানে গেলেও এই ভ্রমণের আগে তাঁর সঙ্গে জাহাজে বা লঞ্চে কোথাও যাইনি। সুতরাং তাঁর সঙ্গে জলপথে ভ্রমণের পূর্ব-অভিজ্ঞতা ছিল না। কথাবার্তা ও গল্পগুজবে রাত হয়ে গেল। নৈশভোজের পর আবিষ্কার করলাম, প্রত্যেকেই যার যার শয্যার আয়োজন করে নিয়েছেন। মন্ত্রী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ছোট ছোট কেবিনে চলে গেছেন। অনেকেই ডেকে শয্যা পেতেছেন। কেবল আমারই শোয়ার ব্যবস্থা নেই। ডাইনিং স্পেসে একটি সোফা পাতা ছিল। ভাবলাম ওটার ওপর শুয়ে পড়ব। ইতোমধ্যে রাষ্ট্রপতির এডিসি গোলাম রব্বানীর ব্যাটম্যান এসে একটা হোল্ডল বিছিয়ে দিয়ে গেল। রব্বানী সৌজন্যবশত জিজ্ঞাসা করল, স্যার! আপনি কি এতে শেয়ার করবেন? আমি জানালাম, আমি সোফাতেই রাত কাটিয়ে দেব। এর মধ্যে আমার মতো ভাগ্যাহত আরেকজন জুটল। তিনি গোলাম তাহাবুর, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার বিশেষ সংবাদদাতা। আমি তাঁকে বললাম, আমার সোফার একটা সাইড তিনি শেয়ার করতে পারেন। জবাবে তাহাবুর জানালেন, তিনি প্রয়োজন হলে তা করবেন, তবে আপাতত চেয়ারে হেলান দিয়ে একটু ঘুমিয়ে নেবেন। রাত ১১টার দিকে জাহাজের দুলুনিতে ঘুমিয়ে পড়লাম। যখন ঘুম ভাঙল, তখন মধ্যরাত। হঠাৎ টের পেলাম, আমার মাথার নিচে বালিশ। শোয়ার সময় হাতের কনুই মাথার তলে রেখে শুয়েছিলাম। এখন বালিশ এল কোত্থেকে? আমি শোয়া থেকে উঠে বসলাম। দেখলাম এডিসি রব্বানী তখনও জেগে। এমনকি গোলাম তাহাবুরও সজাগ বসে আছেন। আমি এডিসিকে বললাম, রব্বানী! বালিশ এল কোত্থেকে?

গোলাম রব্বানী জানাল, বালিশ বঙ্গবন্ধু দিয়ে গেছেন। রাত সাড়ে ১২টার দিকে বঙ্গবন্ধু রাউন্ডে বেরিয়েছিলেন। কে কোথায় কিভাবে শুয়েছেন, ঘুরে ঘুরে তা দেখেন। আমার সামনে এসে বললেন, মাহবুব এভাবে শুয়ে আছে। একটা বালিশ ওরে যোগাড় কইরা দিতে পারলা না?

এরপর বঙ্গবন্ধু নিজের কেবিনে গিয়ে নিজেই একটা বালিশ এনে আমার মাথার নিচে দিয়ে দেন। গোলাম তাহাবুরও একই কথা আমাকে জানাল। পুরো ব্যাপারটা আমার জন্যে বিপন্ন বিস্ময়। আমি যদ্দূর জানি, বঙ্গবন্ধু মাথার তলে দুটি বালিশ ছাড়া ঘুমাতে পারেন না। আমাকে একটা বালিশ দিয়ে যাওয়ায় রাতে তাঁর ঘুমের ব্যাঘাত ঘটবে। সুতরাং বালিশটা ফেরত দিয়ে আসা সমীচীন। আমি বালিশটি ফেরত দিতে চাইলে গোলাম তাহাবুর বললেন, তা বোধহয় ঠিক হবে না। এটা অনেকক্ষণ আগের ব্যাপার। এতক্ষণে তিনি নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছেন।

ভোরবেলা দিনের আলো ফোটার আগেই উঠে পড়লাম। লক্ষ করলাম, বঙ্গবন্ধু জাহাজের ডেকে একটা চেয়ারে হেলান দিয়ে একা বসে আছেন। এত সকালে আর কেউ তখনও ঘুম থেকে ওঠেননি। দেখলাম তিনি পা দোলাতে দোলাতে আবৃত্তি করছেন, 'নম নম নম সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি ...।'

আমাকে দেখে আবৃত্তি থামিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কী? রাতে ভালো ঘুম হইছে তো? বললাম, জ্বী না। ভালো ঘুমাতে পারিনি। তিনি বললেন, 'কেন? আমি তো তোমার মাথার তলে বালিশ দিয়া দিছিলাম। ঘুম হয় নাই কেন?' আমি বললাম, ওই জন্যই তো ঘুম হয়নি। আপনি নিজের বালিশ আমার মাথার তলে দিয়ে গেলে ঘুম হওয়া কি সম্ভব?

এসব কথা মনে হলে আজও বুকের ভেতর রক্তক্ষরণ হয়। বঙ্গবন্ধু মানেই মানবিক গুণাবলিসমৃদ্ধ এক অনন্য মহামানব। তাঁর মানবিক সংস্পর্শে আমার ক্ষুদ্র জীবন ধন্য হয়ে গেছে। সরকারি কর্মকর্তা হলেও সন্তানতুল্য স্নেহ দিয়ে পিতার মতো তিনি আমাকে কাছে টেনে নিয়েছিলেন।

সারা জীবন চোখের পানি ফেলেও কি পিতার ঋণ কখনও শোধ করা যায়?

শিশুদের বন্ধু বঙ্গবন্ধু

ফজল-এ-খোদা

১৯৬৬ সাল। আমরা যারা তখন গ্রীন রোডের পাকিস্তান কালচারাল একাডেমির ছাত্রছাত্রী, তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন মিলে 'ছবি সংঘ' নামে একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে তুলি। 'ছবি সংঘে'র সভানেত্রী হন হাসনা বেগম, আমি সহ-সভাপতি, টিপু সাধারণ সম্পাদক আর সাংস্কৃতিক সম্পাদকের দায়িত্ব দেওয়া হয় শেখ কামালকে। এই সময় আমরা ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করি। অনুষ্ঠানটির প্রশংসা করে পত্রপত্রিকায় ছবি ও প্রতিবেদন ছাপা হলে শেখ কামালের নাম দেখে মুজিব ভাই 'ছবি সংঘে'র সদস্যদের দেখতে চান। এই প্রথম আমি একেবারে মুখোমুখি হয়ে শেখ মুজিবুর রহমানকে দেখি। দেখামাত্রই আমার মনে হয় তিনি যেন আমার জন্ম থেকেই চেনা। পরিচয় হতে না হতেই কোনো মানুষ যে এত আপন হতে পারে, তা যারা শেখ মুজিবের কাছাকাছি যাওয়ার সুযোগ পেয়েছে তারা ছাড়া আর কারোর পক্ষেই জানা বা বোঝা সম্ভব নয়। চমৎকার মানুষ তিনি। মুহূর্তেই কী শিশু কী কিশোর কিংবা তাদের বাবা-মা সবাইকে আত্মীয় করে ফেলেন; তিনি হয়ে যান সবার 'মুজিব ভাই'। আমি নিজের চোখে দেখেছি, নিজের কানে শুনেছি শিশুও মুজিব ভাই বলছে, সেই শিশুর বাবা-মাও মুজিব ভাই বলছে, শিশুর দাদা-দাদিও মুজিব ভাই বলছে। মুজিব ভাই যেন কোনো নাম নয়, একটা অতি আদরের ভক্তি, শ্রদ্ধা ও সম্মানের প্রিয় ডাক। এই সম্বোধনে ডাকতে পারাতেই সবার আনন্দ, একান্ত আপনজন হওয়ার পরিতৃপ্তি।

ধানমণ্ডির ৩২ নম্বরের সেই বসার ঘরে আমরা হৈ হৈ করে ঢুকতেই মুজিব ভাই উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর বিপুল হাতে সবাইকে জড়িয়ে ধরলেন। আয় আয় তোরা সব এসে গেছিস? তখন তিনি তাজউদ্দীন সাহেবের সঙ্গে বসে কথা বলছিলেন। তিনি তাঁকে উদ্দেশ করে বললেন, তুমি যাও, আমি এখন 'ছবি সংঘে'র বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলব। কামাল, তোর মাকে বল নাস্তা দিতে। আগে খাওয়া-দাওয়া, তারপর কথা।

আমি বলি, আমরা আপনাকে দেখতে এসেছি।

আরে দেখবি দেখবি, যখন তোদের জন্য কিছু করতে পারব। এখনো কিছুই করতে পারিনি। কেবল ছয়দফা দিছি, দেখি কী হয়।

একথা সেকথার পর মুজিব ভাই বললেন, তোরা নাচ করলি গান করলি, কিন্তু নাটক করলি না কেন? একটা অন্তত নাটিকা করা উচিত ছিল তোদের। নাটক করলে কথা বলার সাহস হয়। মুজিব ভাই আরো বললেন: আমি তখন ক্লাস সিক্সে পড়ি। আমাদের স্কুলে ইন্সপেক্টর ভিজিট করতে আসবেন। মাস্টারমশায়রা ঠিক করলেন, ইন্সপেক্টরের আগমন উপলক্ষে একটা অনুষ্ঠান করবেন।

তার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল। ঠিক হল এ অনুষ্ঠানে একটি নাটিকাও হবে এবং সিরাজউদ্দৌলা নাটকের একটি দৃশ্য। কিন্তু সিরাজউদ্দৌলা কে হবে? আমাদের ইংরেজির মাস্টারমশায় বেশ ক'জনকে পরীক্ষা করে বললেন, মুজিব সিরাজউদ্দৌলা হবে। আর আলীবর্দী খাঁর ক্যারেকটার দিলেন নাইনের একটি ছেলেকে। মহড়া শুরু হল। মাস্টারমশাই নাটিকাটি লিখেছিলেন। বাংলা থেকে বর্গি তাড়ানো ছিল নাটকের কাহিনী। কিন্তু দুঃখের কথা হল, কী যেন কী কারণে স্কুল ইন্সপেক্টর এলেন না। আর আমারও সিরাজউদ্দৌলা হওয়া হল না।

এই গল্প শুনে আমাদের দলের একটি মেয়ে হঠাৎ বলে ফেলল: মুজিব ভাই, তবু আপনিই আমাদের সিরাজউদ্দৌলা।

শুনে তিনি যেন থতমত খেলেন। পরক্ষণেই হো হো করে হাসতে হাসতে বললেন: তোরা দোয়া কর, সিরাজউদ্দৌলা নয়, আমি যেন তোদের মুজিব ভাই হয়েই থাকতে পারি। আমি সবার মুজিব ভাই-ই থাকতে চাই, বাংলার দুখী মানুষের সুখ-দুঃখের সঙ্গী হতে চাই।

আজকে তাঁর কথা মনে হলেই মনে হয়, আসলে শেখ মুজিবই ছিলেন বাংলার প্রাণ, বাঙালির মান।

স্বাধীনতার পর। ১৯৭২ সালের শেষের দিকে হবে। শেখ কামালের কাছে শোনা। মুজিব ভাই তখন বাঙালি জাতির জনক হয়েছেন।

বঙ্গবন্ধু প্রায় প্রতিদিনই ভোরে হাঁটতে বেরোতেন। তখন কেউ না কেউ তাঁর সঙ্গে থাকত। সেদিন শেখ কামাল সঙ্গে ছিল। হঠাৎ বঙ্গবন্ধু লক্ষ করলেন, ছোট্ট একটি ছেলে বইয়ের ব্যাগ কাঁধে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে পথ চলছে। তিনি ছেলেটিকে কাছে ডাকলেন। জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এভাবে হাঁটছ কেন? তোমার কী হয়েছে?

ছেলেটি একটি পা দেখিয়ে বলল, পা ব্যথা করছে।

বঙ্গবন্ধু নিজ হাতে তার সেই পায়ের জুতো খুলে দেখেন, পায়ের তলার মোজা রক্তে ভিজে গেছে। জুতোর ভেতর একটি লোহার চোখা মাথা বেরিয়ে আছে। এমন সময় একজন পুলিশ এসে পাশে দাঁড়াতেই তিনি তাকে বলে দিলেন: একে প্রথমে ডাক্তারখানায় নিয়ে যাবে। এটিএস ইনজেকশন দেবে। তারপর ওর বাড়ি পৌঁছে দেবে। আর ওর মা-বাবাকে বলবে, যতদিন ওর পায়ের ঘা না সারবে ততদিন যেন ওকে স্কুলে না পাঠায়। পুলিশের হাতে কিছু টাকা দিয়ে বঙ্গবন্ধু ছেলেটিকে তার কোলে তুলে দিলেন।

বঙ্গবন্ধু ছোটদের যে কী ভালোবাসতেন এবং পছন্দ করতেন তা বলে শেষ করা যাবে না। ছোটদের কথা উঠলেই তিনি বলতেন, আজকের শিশু-কিশোররাই আমার বাংলার আগামী দিনের সোনার মানুষ।



গোপালগঞ্জের সেই কিশোর

আনোয়ারা সৈয়দ হক

আমাদের এই দেশটির নাম বাংলাদেশ। বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। লাল আর সবুজ রঙ দিয়ে তৈরি এই দেশের পতাকা। স্বাধীনতা দিবস আর বিজয় দিবসে এই পতাকা যখন বাংলাদেশের প্রতিটি দালান-কোঠা, গাড়ি এবং ময়দানে পত পত করে ওড়ে তখন সেটা এক দেখার মতো দৃশ্য হয়।

পৃথিবীর ম্যাপে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের জন্ম উনিশশো একাত্তর সালের ছাব্বিশে মার্চ। সেই হিসেবে দেশটির বয়স এখনও খুব বেশি হয়তো হয়নি। কিন্তু তাতে কি, জন্মের আগে থেকেই এই দেশটির আছে একটি গৌরবময় অতীত। আর সেটা হল সশস্ত্র যুদ্ধের ভেতর দিয়ে দেশটির জন্ম হয়েছে। অর্থাৎ যুদ্ধ করে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীকে পরাস্ত করে বাংলাদেশের জন্ম।

বলা দরকার যে, আগে আমাদের এই বাংলাদেশের নাম ছিল পূর্ব পাকিস্তান। আর আমরা তখন ছিলাম পূর্ব পাকিস্তানি। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানি হলেও আমরা ছিলাম অত্যন্ত অসুখী এক বাঙালি জাতি। কারণ আমাদের তখন আরও একটি অংশ ছিল, সেই অংশটি ছিল ভারতের পশ্চিম দিকে অবস্থিত এবং তার নাম ছিল পশ্চিম পাকিস্তান।

এই পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষেরা ছিল খুব স্বার্থপর। এরা পূর্ব পাকিস্তানকে নিজেদের কব্জার ভেতরে ধরে রাখত। এদেশের যতো টাকা পয়সা, ধন-সম্পদ সব পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে চলে যেত। দু'দেশের ভেতরে ছিল এক হাজার মাইলের দূরত্ব। পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের মাঝখানে ছিল বা এখনও আছে বিশাল ভারত। তাই যোগাযোগ ব্যবস্থা খুব ভালো ছিল না।

পূর্ব পাকিস্তানের একজন নামকরা নেতা ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থপর ব্যবহারের প্রতিবাদ করে এসেছিলেন বরাবর। তাঁরই নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা পশ্চিম পাকিস্তানের কাছ থেকে নিজেদের প্রাপ্য হিস্সা বুঝে নিতে আন্দোলনে নামে। এই আন্দোলন পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী একবারেই ভালো চোখে দেখেনি। তারা শেখ মুজিবকে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে গ্রেফতার করে, যে মামলার নাম হচ্ছে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা'। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের মানুষদের জোরালো প্রতিবাদে পাকিস্তান সরকার মামলা তুলে নিতে বাধ্য হয়।

ততদিনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছেন। তাঁর সাহস, বিক্রম, ধৈর্য এবং সততার কথা তখন বাংলার ঘরে ঘরে উচ্চারিত হচ্ছে। তিনি বাঙালির মুখে হাসি ফোটাবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর সদা হাস্যময় চেহারা, বলিষ্ঠ চলাফেরা, স্পষ্ট কথাবার্তা এবং অকুতোভয় সাহসের কথা তখন বাঙালির ঘরে ঘরে উচ্চারিত এবং আদৃত।

কিন্তু কীভাবে বঙ্গবন্ধু এতদূর পথ পাড়ি দিলেন? কে তাঁকে যোগালো এত সাহস? জীবনের শুরু থেকেই তিনি জেল খাটতে শুরু করেছিলেন। যতোদিন এ পৃথিবীতে বেঁচে ছিলেন, অধিকাংশ সময়, বিশেষ করে যৌবনের সোনালি সময়গুলো তাঁর কেটে গিয়েছিল জেলখানায়। জেল থেকে ছাড়া পাবার জন্যে তিনি কোনোদিন পাকিস্তান সরকারের কাছে মুচলেকা বা বন্ড দেননি। দেশের স্বার্থহানি করে নিজের সুবিধা আদায় করা তিনি স্বপ্নেও ভাবতে

পারতেন না। কিন্তু কে তাঁকে এই সাহস যোগালো? সত্যি কথা বলতে গেলে, তাঁর এই সাহস তিনি অর্জন করেছিলেন জন্মগতভাবে। ছেলেবেলা থেকে ছিলেন ডানপিটে, একরোখা এবং ন্যায়ের পক্ষে অনমনীয় মনোভাবে অবিচলিত। খেলাধুলার প্রতি ছিলেন খুব আগ্রহী। চোখে খুব খারাপ একটা অসুখ হওয়ার জন্যে অনেকদিন তিনি লেখাপড়া করতে পারেননি, কিন্তু তাতে কি, চারপাশের প্রকৃতি তাঁকে সর্বদাই শিক্ষা দিত কীভাবে বড় একজন মানুষ হয়ে ওঠা যায়। আর এ সময়ে একটু বড় হতেই বাংলাদেশের বিখ্যাত এক নেতা হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর নজরে পড়ে যান তিনি।

সেটা ছিল এক মজার ঘটনা। উনিশশো আটত্রিশ সালের কথা। তখনকার অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী এ কে ফজলুল হক এবং তখনকার বাণিজ্য ও পল্লী উন্নয়নমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী একবার গোপালগঞ্জের মিশন স্কুল পরিদর্শন করেন। শেখ মুজিব তখন মিশন স্কুলের ছাত্র। মিশন স্কুলের ছাত্রাবাসের ভাঙা ছাদ দিয়ে বৃষ্টির পানি ঘরে ঢুকে পড়ত। অনেকবার দরখাস্ত করার পরেও ছাদ সারানো হয়নি। এই দুই মন্ত্রী যখন স্কুল পরিদর্শনে এলেন এবং সভা শেষে যখন গোপালগঞ্জের ডাকবাংলোয় ফিরবেন, তখন তাঁরা দেখেন, তাঁদের পথ আটকে ধরেছে একটি কিশোর। সেই কিশোরটির সঙ্গে আরও কয়েকজন ছাত্র।



–কে তোমরা, কী চাই, পথ আটকে রেখেছো কেন? –জিজ্ঞেস করলেন মুখ্যমন্ত্রী এ কে ফজলুল হক। তাঁরা দু'জনেই মনে মনে অবাক হয়েছেন বালকটির সাহস দেখে। সকলে যেখানে তাঁদের দেখে ভয়ে থরহরিকম্প সেখানে এই সাহসী ছেলেটি কে?

–আমার নাম শেখ মুজিবুর রহমান, স্যার। আর এরা আমার সতীর্থ। স্যার, আপনাদের কাছে একটা অভিযোগ জানাতে এসেছি।

শেখ মুজিবের এই জনপ্রিয়তায় ভয় পেয়ে গেলেন আইয়ুব খান। তিনি তখন পাকিস্তানের সামরিক প্রেসিডেন্ট। তড়িঘড়ি শেখ মুজিবকে বন্দি করা হল। তখন উনিশ শো আটষট্টি সাল। তাঁর সঙ্গে বন্দি হলেন আরো ৩৪ জন নেতা।

– অভিযোগ, কীসের অভিযোগ, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

– স্যার, আমাদের হোস্টেলের ছাদ দিয়ে পানি পড়ে। সেই পানি ঘরে ঢুকে আমাদের বই, বিছানাপত্র সব ভাসিয়ে নিয়ে যায়। বললেন শেখ মুজিব।

– তা এ অভিযোগ আমাদের কাছে কেন? এর জন্যে তো তোমাদের স্কুলের কমিটি আছে। বললেন মুখ্যমন্ত্রী।

– স্যার, আমরা অনেকবার তাঁদের কাছে দরখাস্ত দিয়েছি, কিন্তু কিছুই হয়নি। আমাদের অভিযোগ কর্তৃপক্ষ কানে তোলেন না!

শেখ মুজিবের সাহসী বক্তব্য শুনে দুই মন্ত্রী হতবাক। এ তো সাংঘাতিক লড়াকু ছেলে দেখছি।

তাঁরা দু'জনে ডাক বাংলোয় ফিরে গেলেন। তারপর মুখ্যমন্ত্রী এ কে ফজলুল হক ঘোষণা দিলেন, তিনি তাঁর ঐচ্ছিক তহবিল থেকে বারোশো টাকা মিশন স্কুলের ছাদ সারাবার জন্যে দান করেছেন। বাণিজ্যমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী করলেন আরও চমকপ্রদ কাজ। যেন তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের ভাগ্যনিয়ন্ত্রক হিসেবে তিনি নিজের অজান্তেই একটি কাজ করে বসলেন। আর সেটি হল– সেদিন রাতে একটি স্লিপ পাঠিয়ে তিনি শেখ মুজিবকে ডাকবাংলোয় ডেকে পাঠালেন। তারপর তাঁর সাথে আলোচনা করলেন নানা কথা। সোহরাওয়ার্দীর কেন জানি মনে হল এই কিশোরটির ভেতরে আছে সেই স্ফুলিঙ্গ, যা তিনি আজীবন খুঁজে বেড়াচ্ছেন তাঁর উত্তরসূরি হিসেবে। তিনি শেখ মুজিবকে তাঁর কোলকাতার ঠিকানা দিলেন এবং তাঁর সাথে দেখা করতে বললেন।

শেখ মুজিবও এভাবেই খুঁজে পেলেন তাঁর শিক্ষাগুরু হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে এবং পরবর্তী ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী তাঁর যোগ্য শিষ্য খুঁজে নিতে ভুল করেননি। বাংলার পূর্ণ স্বাধীনতার গুরুদায়িত্ব যেন সেদিন শিক্ষাগুরু হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী নিজের অজান্তেই তুলে দিলেন বাংলার তরুণ শেখ মুজিবের কাঁধে।

উনিশ শো বিয়াল্লিশ সালে শেখ মুজিব এন্ট্রান্স বা এখনকার হিসাবে স্কুল ফাইনাল পাশ করলেন। তারপর কলকাতার ইসলামিয়া কলেজ থেকে উনিশ শো সাতচল্লিশ সালে বি.এ পাশ করলেন। ততদিনে তিনি মুসলিম লীগের একজন নিবেদিতপ্রাণ কর্মী। এসময় মুসলিম লীগ এবং ছাত্রলীগে যত আন্দোলন হয়েছে, তার পুরোভাগে থেকেছেন তিনি। তাঁর উৎসাহ এবং উদ্দীপনা দেখে অবাক হয়েছে চারপাশের মানুষ। যেকোনো জনসভায় শেখ মুজিব উপস্থিত থাকলেই সে সভার গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। অথচ তিনি তখন একজন তরুণই বলা যায়।

উনিশ শো সাতচল্লিশ সালে ভারত ভাগ হল তিন খণ্ড হয়ে। ভারতের দু'পাশের খণ্ড দুটি হল পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তান। আর মাঝখানের বৃহৎ খণ্ডটি হল ভারত। এই রকম দুষ্টুমি করে ভাগ করে দিয়ে গেল ইংরেজ, যাতে করে ভারত উপমহাদেশে সবসময় অশান্তি এবং অনাচার লেগে থাকে। কারণ উনিশ শো সাতচল্লিশের আগে ভারত উপমহাদেশ পুরোটাই শাসন করত ইংরেজ। দেশ স্বাধীনের পরপরই পাকিস্তান সরকার শেখ মুজিবকে জেলে ভরলেন। সেই একই সালে জেল থেকে বেরিয়ে তিনি ছাত্রলীগ গঠনকারীদের একজন হলেন। ক্রমে রাজনীতি হয়ে উঠল তাঁর জীবনের মূল লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য। উনিশ শো সাতচল্লিশ-এ কলকাতা থেকে ঢাকায় এসে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে ভর্তি হন, কিন্তু উনিশ শো ঊনপঞ্চাশ সালে যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের দাবিদাওয়ার আন্দোলন শুরু হয়, তখন সেখানে তিনি নেতৃত্ব দিতে গিয়ে আবারও জেল খাটেন। মুচলেকা দিয়ে তিনি বেরিয়ে আসতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা করেননি।

দেশ স্বাধীনের পর মুসলিম লীগের কর্মকাণ্ড সব স্বার্থপর হয়ে ওঠে। দেশের মানুষের জন্যে কাজ না করে তারা

পাকিস্তানের শাসকদের তাঁবেদার হয়ে ওঠে। তাই তাদের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে উনিশ শো চুয়ান্ন সালে পূর্ব পাকিস্তানে এ. কে. ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী তিনজনে মিলে যুক্ত-ফ্রন্ট গঠন করেন এবং পূর্ব পাকিস্তানের তথা বাংলার স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যে একুশ দফা দাবি প্রণয়ন করেন। সেই দাবিগুলি তৈরির সময় তরুণ নেতা শেখ মুজিবের সক্রিয় অংশ ছিল। এরপর নেতাদের সঙ্গী হয়ে শেখ মুজিব সারা বাংলাদেশ সফর করেন। দেশের দুঃখ, কষ্ট, লাঞ্ছনা সম্পর্কে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হয়। অধিকার-বঞ্চিত মানুষের কষ্ট এসে তাঁর তরুণ বুকে বাজে।

চুয়ান্ন সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগ চরমভাবে হেরে যায় এবং যুক্তফ্রন্ট বিজয়ী হয়। শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তানে মন্ত্রিসভা গঠন করা হয়, কিন্তু পাকিস্তান সরকার হিংসুকের মতো আচরণ করে। পাকিস্তানের তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দেন এবং দেশে গভর্নরের শাসন চালু করেন। এই সময় বাংলাদেশের শত শত নেতাকে বন্দি করে জেলখানায় পাঠানো হয়। শেখ মুজিবও গ্রেফতার হন। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ এতে উত্তেজিত হয়ে ওঠে। আবার এই একই সালে পূর্ব পাকিস্তান তথা পূর্ব বাংলা থেকে গভর্নরের শাসন উঠিয়ে দেওয়া হয় এবং সেই সময় বন্দি সব নেতাকে মুক্তি দেওয়া হয়।শেখ মুজিবও জেল থেকে মুক্তি পান।

উনিশ শো পঞ্চান্ন সালের জুন মাসে পাকিস্তান গণপরিষদের নির্বাচন হয়। শেখ মুজিব গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। তারপর উনিশ শো ছাপান্ন সালে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রধানমন্ত্রী হয়ে সরকার গঠন করেন। পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা গঠন করে। শেখ মুজিব এই মন্ত্রিসভায় যোগ দেন, কিন্তু অল্প কিছুদিন পরে, তিনি মন্ত্রিত্ব ছেড়ে আওয়ামী মুসলিম লীগ পার্টির সাংগঠনিক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। দলকে ঠিকমতো গড়ে তোলার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তিনি দেশের মানুষকে নিজের অধিকার সম্পর্কে ধীরে ধীরে সচেতন করে তোলেন। রাতদিন শহরে-শহরে, গ্রামে-গঞ্জে মিটিং মিছিল করে তিনি দেশবাসীর সামনে পূর্ব পাকিস্তানের করুণ চিত্র তুলে ধরেন। এবং পূর্ব পাকিস্তানের অর্থে পশ্চিম পাকিস্তানের সমৃদ্ধির চিত্র মানুষের সামনে তুলে ধরেন। মানুষ তখন সচেতন হয়ে ওঠে। অবস্থা দেখে পাকিস্তানের তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জা উনিশ শো আটান্ন সালে দেশে সামরিক শাসন চালু করেন। শেখ মুজিব আবার গ্রেপ্তার হন। এরপর আসেন জেনারেল আইয়ুব খান। তিনি ইস্কান্দার মির্জাকে হটিয়ে পাকিস্তানের ক্ষমতা দখল করে ফেলেন। এবং দীর্ঘ ছয় বছরের জন্যে পাকিস্তানে রাজনীতি নিষিদ্ধ করেন।এর ভেতরে এসে গেল উনিশ শো পঁয়ষট্টি সাল। পাকিস্তান ইচ্ছাকৃতভাবে ভারতের সাথে যুদ্ধ বাধাল। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে যুদ্ধ শুরু করা হল, অথচ পূর্ব পাকিস্তানকে সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থায় ফেলে রাখা হল। সেই সময় ভারত ইচ্ছা করলে চোখের নিমিষে পূর্ব পাকিস্তান দখল করে নিতে পারত।

অবস্থা দেখে উনিশ শো ছেষট্টি সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী লীগের হয়ে ৬-দফা কর্মসূচি শুরু করলেন। এটি ছিল একটি গণমুখী আন্দোলন। এই আন্দোলনের ভেতরে দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে স্বায়ত্তশাসন কায়েম করার জন্যে জোরালো দাবি জানানো হল। বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সারা দেশের মানুষ এক কাতারে তাঁর পেছনে দাঁড়াল। সকলের দাবি শ্বায়ত্তশাসন। এই কর্মসূচির সাথে যোগ ছিল পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র সমাজের এগারো দফা দাবি। ফলে আন্দোলন খুব জোরালো হয়ে উঠল।

শেখ মুজিব হয়ে উঠলেন পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের অবিসংবাদী জননেতা। লোকে শেখ মুজিবকে এক পলক চোখে দেখার জন্য অস্থির হয়ে উঠল।

শেখ মুজিবের এই জনপ্রিয়তায় ভয় পেয়ে গেলেন আইয়ুব খান। তিনি তখন পাকিস্তানের সামরিক প্রেসিডেন্ট। তড়িঘড়ি শেখ মুজিবকে বন্দি করা হল। তখন উনিশ শো আটষট্টি সাল। তাঁর সঙ্গে বন্দি হলেন আরো ৩৪ জন নেতা।

কিন্তু ততদিনে পাকিস্তান সরকারের জন্য বহুৎ দেরি হয়ে গিয়েছে। জেগে উঠেছে বাংলার মানুষ। শেখ মুজিবের মুক্তির দাবিতে সমস্ত বাংলাদেশ উত্তাল হয়ে উঠল। অবস্থা দেখে পাকিস্তানের আইয়ুব খান ভয় পেয়ে গেলেন। উনিশ শো উনসত্তর সালে আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করে নেওয়া হল। শুধু তাই না, সকল বন্দিকে নিঃশর্ত মুক্তি দেওয়া হল।

সেদিন বাংলার মানুষের মুখে বিজয়ীর হাসি ফুটে উঠল। শেখ মুজিবকে দেওয়া হল গণসংবর্ধনা। রেসকোর্স

ময়দানে, বর্তমানে যেটা সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, সেখানে আয়োজন করা হল এই গণসংবর্ধনার। আয়োজন করল কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ। সেদিন দেশের মানুষ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের মাধ্যমে শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি দিল। মাথার মুকুটের মতো আজীবন এই গৌরবময় উপাধি বঙ্গবন্ধু বহন করে চললেন। এই উপাধির ভেতরে বাংলার জনগণের আবেগ, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জড়ানো হয়ে থাকল আজীবন।

এরপর এলো উনিশ শো সত্তর সাল। পূর্ব পাকিস্তানে জাতীয় গণপরিষদ নির্বাচন হল। এই নির্বাচনে একশো উনসত্তরটি আসনের ভেতরে একশো সাতষট্টি আসনে জয়লাভ করল আওয়ামী লীগ। দেশের মানুষ খুশিতে আত্মহারা। কারণ পশ্চিম পাকিস্তানের গণপরিষদের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর বিপরীতে দাঁড়ানো পাকিস্তান পিপলস্ পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো এতগুলো ভোট পাননি। তিনি খুবই কম ভোট পেয়েছেন। সুতরাং গণতান্ত্রিক নিয়মমাফিক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হবেন দেশের প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু হায়, পশ্চিম পাকিস্তানের ভুট্টো



ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল, তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে।.... এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৭ই মার্চ, ১৯৭১-এ মুক্তিকামী সাড়ে সাত কোটি বাঙালিকে সশস্ত্র যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য এই দুঃসাহসী ঘোষণা দেন

এবং তাঁর সহযোগী সামরিক নেতারা তা হতে দিলেন না। বদলে তারা পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সৈন্য আমদানি করে পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের মানুষের ওপর অত্যাচার শুরু করে দিলেন। সেই নির্মম অত্যাচারের পুরো খবর তোমরা বড় হয়ে পড়বে। শুধু কি অত্যাচার? নির্মম গণহত্যা, লুটপাট, আগুন জ্বালানো, নির্যাতন সব চলল পুরো মাত্রায়। উনিশ শো একাত্তর সালের ২৫শে মার্চ পাকিস্তানি সৈন্যদল পূর্ব পাকিস্তানের নিরীহ ও নিরস্ত্র বাঙালির উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল তীব্র বেগে। নয় মাসে তিরিশ লক্ষ বাঙালিকে হত্যা করল তারা। ইতিহাসের একটা জঘন্যতম নরহত্যা উৎসব করল পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী। সমস্ত পৃথিবী ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিল পাকিস্তানের দিক থেকে। পাকিস্তানের সামরিক শাসকেরা তবুও নির্দয়ের মতো পূর্ব পাকিস্তানে চালিয়ে গেল তাদের নৃশংস কর্মকাণ্ড। কিন্তু বাংলার মানুষ যে মহান মানুষটির পরশকাঠির ছোঁয়ায় একবার জেগে উঠেছে. তাদেরকে দমিয়ে রাখা কি চাট্টিখানি কথা? বাংলার নিরস্ত্র মানুষ সংগঠিত হল। খুব দ্রুততার সঙ্গে সংগঠিত হল, কারণ



নয় মাসের যুদ্ধকালীন সময়ে গ্রামের মা-বোনেরা যার যা কিছু অস্ত্র আছে দা, কুড়াল, বঁটি ইত্যাদি নিয়ে পাক-হানাদার দস্যুদের এবং রাজাকার-আলবদরকে রুখে দাঁড়িয়েছে

বঙ্গবন্ধু শিশুদের বলতেন, পৃথিবীতে যত প্রকারের ভালোবাসা আছে তার ভেতর দেশপ্রেম হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট।

তারা বঙ্গবন্ধুর পরামর্শে আগেই সচেতন হয়ে উঠেছিল দেশের ভবিষ্যত সম্পর্কে। পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা প্রতিবেশী দেশ ভারতের সহায়তার খুব দ্রুত সংগঠিত হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল পাকিস্তানি সামরিক জান্তার ওপর। হাটে, মাঠে, ঘাটে, হাওড়ে, রাজধানীতে, শহরে, গ্রামে পুরোদমে শুরু হল যুদ্ধ। আমাদের হল গেরিলা যুদ্ধ আর পাকিস্তানের হল সুসজ্জিত সামরিক বাহিনীর যুদ্ধ। বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানি সামরিক শাসকের হাতে বন্দি হলেন পঁচিশে মার্চ রাতে। তার আগেই এবং সেই দিনই রাতের বেলা বঙ্গবন্ধু ঘোষণা দিলেন স্বাধীনতার। বাংলা স্বাধীন একটি দেশ হিসেবে সেইদিন পৃথিবীর ম্যাপে ঠাঁই করে নিল।

উনিশ শো একাত্তর সালের ষোলই ডিসেম্বর যুদ্ধ করে আমরা বিজয় লাভ করলাম। পাকিস্তানি সৈন্যদের সম্পূর্ণ-ভাবে হারিয়ে এইদিন তাদের সকলকে এই দেশের মাটিতেই বন্দি করা হল। প্রায় এক লক্ষের মতো পাকিস্তানি সেনা বন্দি হল যৌথবাহিনীর হাতে। যৌথবাহিনী অর্থ হচ্ছে বাংলাদেশ এবং ভারতের সম্মিলিত বাহিনী।

বঙ্গবন্ধু যুদ্ধের ন'মাস পাকিস্তানি শিবিরে বন্দি থাকলেও তাঁর প্রেরণায় সমগ্র বাঙালি জাতি হাতে তুলে নিয়েছিল অস্ত্র। এবং গ্রামের মা-বোনেরা পর্যন্ত হাতে তুলে নিয়েছিলেন দা, বঁটি, শাবল, গাঁইতি। অর্থাৎ হাতের কাছে যে যা পেয়েছিলেন তাই। এই জনযুদ্ধ ন'মাসের ভেতরেই পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে একেবারে নাজেহাল করে ফেলেছিল। তারপর আর যুদ্ধ করতে না পেরে পাকিস্তানি সৈন্যরা দলবেঁধে আত্মসমর্পণ করল যৌথ বাহিনীর কাছে।

এতবড় একটা স্বাধীনতা যুদ্ধের কথা এই পরিসরে বলা সম্ভব নয়। কারণ স্বাধীনতার সঙ্গে জড়িয়ে আছেন আমাদের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। স্বাধীনতা অর্জনের ধাপে ধাপে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের অবদান রয়েছে। এমন কি এই স্বাধীন দেশটির জন্যে তিনি জীবন বিসর্জনও দিয়েছেন তাঁর পরিবারের মানুষদের সাথে। তাঁর ছোট্ট ছেলেটি, শেখ রাসেলও, তাঁর সাথেই নিহত হয়। সেটা ছিল উনিশ শো পঁচাত্তর সালের পনেরোই আগস্ট। দেশের কুলাঙ্গার সন্তানেরা বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর জন্য দায়ী। তারা হচ্ছে বাংলাদেশের রাজাকার এবং হত্যাকারীর দল। বাংলার মানুষেরা তাদের ধরে নিয়ে বিচার করে ফাঁসি দিয়েছে। এখন বাংলাদেশে যেসব বাঙালি কুলাঙ্গার পাকিস্তানি হানাদারদের হাতে হাত মিলিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় দেশের নিরীহ মানুষদের হত্যা করেছে, তাদের বিচার চলছে।

একথা আমাদের জানা দরকার যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই বাংলাদেশটির জন্যে শরীরের শেষ রক্তবিন্দুটুকু পর্যন্ত দান করেছেন।

বঙ্গবন্ধু দেশের শিশু ও কিশোরদের খুব ভালোবাসতেন। তিনি তাদের জন্য অনেক ধরনের সাহায্য প্রদান করতেন। সদ্যস্বাধীন হওয়া দেশটির তখন এমন কিছু সামর্থ্য ছিল না যে, দেশের মানুষের জন্যে কিছু করে। কিন্তু বঙ্গবন্ধু তাঁর বিশাল দু'হাত তুলে দিয়ে চেষ্টা করেছিলেন দেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে গড়ে তোলার। তিনি বলতেন, শিশুরা হচ্ছে দেশের ভবিষ্যৎ; তাদের উপরই নির্ভর করছে সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশটির পৃথিবীর বুকে গৌরবে মাথা তুলে উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা। তিনি আরও বলতেন, দেশের মানুষকে দেশপ্রেমিক হতে হবে। দেশকে ভালোবাসতে হবে। নিজের সুযোগ-সুবিধা সবসময় না ভেবে দেশের উন্নতির কথা ভাবতে হবে।

তিনি শিশুদের বলতেন, পৃথিবীতে যত প্রকারের ভালোবাসা আছে, তার ভেতরে দেশপ্রেম হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট।

তিনি নিজেও ছিলেন দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ একজন বাঙালি সন্তান। বাংলাদেশ ছিল তাঁর স্বপ্নের দেশ, ইচ্ছাপূরণের দেশ। তোমরা যখন আরও বড় হবে, তখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে আরও অনেক কিছু জানতে পারবে। যতদিন আমাদের বাংলাদেশের অস্তিত্ব থাকবে, ততদিন দেশের প্রতিটি ধূলিকণার সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর নাম মিশে থাকবে। গোপালগঞ্জের সেই কিশোরটিকে বাঙালি জাতি কখনো ভুলবে না।

সাধারণ জীবন ও অসাধারণ পিতা

ইয়াফেস ওসমান



জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর বিষয়ে লিখতে হুকুম হয়েছে নবীন প্রজন্মের উত্তরসূরিদের কাছ থেকে, তাই আজ কিছু কথা প্রকাশ না করে পারছি না। তা না হলে এগুলো চিরকাল নিজের মাঝেই নিভৃতে ধারণ করতে চেয়েছিলাম। কারণ, এ সমাজে কারো কাছে প্রকাশ করার মানসিকতা অনেক আগেই হারিয়ে ফেলেছি।

১৯৭৫ সালের ১৪ আগস্ট সারারাত জেগে বস্ত্রশিল্প সংস্থার প্যাভেলিয়নের মডেল করার কাজে আমি আর বন্ধু মাসুদ ব্যস্ত ছিলাম, যেটা করা হচ্ছিল সেটি সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে শিল্পমেলায় নির্মিত হবে। আমি তখন স্থপতি হিসেবে গৃহায়ণ অধিদপ্তরে চাকরি নিয়ে সংস্থার লালমাটিয়া কোয়ার্টারের দোতলায় থাকি।

রাত কেটে ১৫ আগস্ট ভোর হয়-হয়, ফজরের আযান হচ্ছে, হঠাৎ বিকট আওয়াজ; সাথে থেমে থেমে গুলির মতো শব্দ শোনা গেল। মাসুদ বলল, বঙ্গবন্ধু আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবেন, ছাত্ররা বোধহয় আনন্দ করছে। এ কথা বলতে না বলতেই আমাদের কোয়ার্টার পেরিয়ে মোহাম্মদপুর বরাবর কামানের গোলা পড়ার শব্দ। দু'জনে দিশা হারানোর অবস্থা, এমনিতেই সারারাত ঘুম মেরে রাত-জাগা। কোথায় খবর পাই! অবশেষে রেডিও খুলে অবস্থা বোঝার চেষ্টা করলাম। একটু পরেই ঘাতক মেজর ডালিমের কণ্ঠ শোনা গেল। তারপর দু'জনে কি শুনলাম না শুনলাম; এটা বাস্তব না স্বপ্ন, বুঝতে অনেকক্ষণ সময় লাগল। দু'জনে ছুটে বের হলাম। মাসুদের বাসা কলাবাগান মেইন রোডের খুব কাছে। মিরপুর রোড ধরে দু'জনে সোবহানবাগ হয়ে ওর বাড়ির দিকে রওয়ানা

তালা খুলে বাসার ভিতরে ঢুকে ধুলায় ধূসর লণ্ডভণ্ড শোকাবহ অনেক কিছুর মাঝে যেটা আমাকে সবচেয়ে বিস্মিত করেছিল, সেটা শোবার ঘরে একটি আলনায় সবচেয়ে নিচের কাঠের র‍্যাকের ওপর অনেকগুলো জীর্ণ স্যান্ডেল ও জুতার অবস্থান। একটা মধ্যবিত্ত সাধারণ জীবনযাপনকারী পরিবার। কোনো কিছুই ফেলে দেওয়ার স্বভাব ছিল না।



দিলাম। লেকের পাশ দিয়ে রাস্তা ধরে বঙ্গবন্ধুর বাড়ির দিকে তাকিয়ে ধীর পায়ে চলেছি। বঙ্গবন্ধুর বাড়ির সম্মুখে বেশকিছু কালো পোশাক-পরা সেনা পাহারায়। লেকের পাড়ে মিরপুর সড়কেও কালো পোশাকে একটু দূরে দূরে সেনারা দাঁড়িয়ে। কলাবাগান বাসস্ট্যান্ডের কাছাকাছি লেকের পাড়ে বঙ্গবন্ধু ভবনের দিকে তাক-করা দুটি কামানের অবস্থান। লোকজনকে দ্রুত হেঁটে যাওয়ার জন্য উর্দু উচ্চারণে ধমক দিচ্ছে রাস্তায় টহলরত সেনারা। মাসুদের বাসার গলির মুখে দু'জনে দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধুর বাড়ির দিকে তাকিয়ে থাকলাম, দু'জনেরই চোখে জল। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম আজ আর হিসেব করে বলতে পারব না। পরে ওর বাসার ড্রইংরুমে দু'জনে নীরবে অনেকটা সময় কাটালাম, স্মৃতিরা ভিড় করে এল।

জনক বঙ্গবন্ধুর কথা মনে হচ্ছিল। এই দুর্বিষহ দুঃখজনক ঘটনার কয়েক মাস আগে আমাদের ডিজাইন-করা গৃহায়ণ অধিদপ্তরের অধীনে মোহাম্মদপুরে আধুনিক মার্কেট কমপ্লেক্সের একটা ডিজাইন বঙ্গবন্ধুকে দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলাম। প্রস্তাবিত মার্কেট-প্রকল্পের সকল স্থাপত্যনক্সা কয়েকমাস পরিশ্রম করে একটানা ২১ ফুট কেন্ট পেপারের রোলের ওপর এঁকে, জল রংয়ের ওয়াশ দিয়ে দৃষ্টিনন্দন করা হয়েছিল। এটা বঙ্গবন্ধুকে দেখানো হবে সেই শিহরণ থেকে করা। তৎকালীন গৃহায়ণ অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী কে. টি. হোসেন সাহেবও সেদিন ওখানে উপস্থিত ছিলেন। গণভবন কনফারেন্স রুমের বিশাল টেবিলটা একটানা নক্সায় ভরে গিয়েছিল। কনফারেন্স রুমে ঢুকে আকর্ণ হাসির সাথে বঙ্গবন্ধু আমাদের উদ্দেশে বললেন, "কি রে, আমার দেশ গড়ার কারিগররা কেমন আছিস; দেখি, মস্ত কিছু করা হয়েছে মনে হয়।" তারপর টেবিলের এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত মনোযোগ দিয়ে পুরোটা নক্সা দেখলেন। আমরা মাঝেমধ্যে ডিজাইনের মূল বিষয়গুলো বর্ণনা করছিলাম। দেখা শেষ করে কে. টি. হোসেন সাহেবকে উদ্দেশ করে, পাহাড়ের মতো উচ্চশির, বাংলার রাষ্ট্রনায়ক বঙ্গবন্ধু বলে উঠলেন, "হোসেন সাহেব, আমার এদেশ গড়ার জন্য বিদেশিদের প্রয়োজন নাই, এরাই আমার দেশ গড়ার কারিগর, এদের দেখে রাখবেন।" বঙ্গবন্ধু প্রস্থান করলেন অন্য জরুরি কাজে। পিতার সেই হাসি, পর্বতপ্রমাণ বাঙালিত্বের গর্ব, সবকিছুর স্মৃতি ভাস্বর হয়ে উঠেছিল।

শিল্পী রশীদ চৌধুরীকে বঙ্গবন্ধু খুব স্নেহ করতেন। আর তাই গণভবনের অফিসসজ্জা ওঁকেই করতে হয়েছিল। মরহুম শিল্পী রশীদ চৌধুরী স্থাপত্য অনুষদে আমাদের পেইন্টিংয়ের শিক্ষক ছিলেন, তা ছাড়া আমার সঙ্গে ওঁর একটা বিশেষ স্নেহের সম্পর্ক ছিল। স্যারকে একদিন গণভবনে অফিস সজ্জার বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ওঁর কাজ বঙ্গবন্ধু পছন্দ করেছেন তো? উত্তরে রশীদ স্যার একটা ঘটনার কথা বলেছিলেন– বঙ্গবন্ধুর অফিসকক্ষের এক কোণে তিনি একটা বড়ো মাটির জালার ঠিক মাঝখানে কৃষি জমি চাষ-করা লাঙ্গলের পুরনো ক্ষয়ে-যাওয়া চকচকে ফলা বসিয়ে দিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু রশীদ চৌধুরীকে নিয়ে সাজানো কক্ষটি দেখতে-দেখতে ঠিক ওখানটায় এসে থমকে দাঁড়ালেন। তারপর উদাস হয়ে বলেছিলেন, "রশীদ তুই কী করেছিস?" রশীদ স্যার জানালেন, তখন বঙ্গবন্ধুর দু'চোখে জল। সেদিন অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে বঙ্গবন্ধু স্বগত উক্তি করেছিলেন, "এরাই দেশের খাঁটি মানুষ। দুঃখী মানুষ। দেখি এদের জন্য কিছু করতে পারি কিনা।" কথাগুলো কানে বাজছিল।

আমাদের কোয়াটার্সয়ের নিচতলায় অফিসের বড়োবাবু তসিকুল ইসলাম থাকতেন। তিনি একদিন গল্প করেছিলেন, ওঁর আপন ছোটভাই চাঁপাইনবাবগঞ্জের গম্ভীরা গানের নানা চরিত্রে গান করেন। গম্ভীরা গানের দলটিও ওঁর ছোট-ভাইয়ের। নাটোর উত্তরা গণভবনে প্রথম যেদিন বঙ্গবন্ধু গিয়েছিলেন, সেদিন বঙ্গবন্ধুর সম্মানে, ওঁর ছোটভাইয়ের দলই গম্ভীরা গান গেয়েছিল। ছোটভাই ওঁকে জানিয়েছিলেন, সেদিন গম্ভীরা গানের শেষে বঙ্গবন্ধু তার লাঠিটা নিজের হাতে নিয়ে বলেছিলেন, "সবকিছু ছেড়ে দিয়ে তোর মতো যদি সারাটা বাংলায় গান গেয়ে বেড়াতে পারতাম!" সবকিছুই দৃশ্য হয়ে ভাসছিল।

বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠ পুত্র শেখ কামালের মুখটাও ভেসে উঠছিল। লেক সার্কাস বালিকা বিদ্যালয়ে একসময় ছায়ানটের গানের ক্লাশ হত। রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখতে আসতাম। কামালও ওস্তাদ খুরশীদ খানের কাছে সেতার শিখত। ক্লাশ শুরুর আগে রিক্সায় চড়ে সেতার হাতে, সদা হাস্যোজ্জ্বল সুদর্শন যুবক কামালের সাথে দেখা হলেই সালাম জানাত, কুশল জিজ্ঞাসা করত। মুখে খুবই মানানসই গোঁফ, চশমা চোখে, প্রায়শই ফুলহাতা হাওয়াই শার্ট পরত কামাল। কোনোদিন ওর আত্মম্ভরিতা চোখে



টুঙ্গিপাড়ায় স্ত্রী বেগম ফজিলাতুননেসার সঙ্গে যুবক নেতা শেখ মুজিব

পড়েনি। সহজ সরল বিনয়ী যুবক। ১৯৭১ সালের ২৮ বা ২৯ মার্চ ইউকসুর সহসভাপতি থাকার কারণে মাথার উপর ঝুলে থাকা হুলিয়া, তার সাথে ভারতে গিয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে উন্মন। ঢাকা ছেড়ে জিঞ্জিরা পার হয়ে রোহিতপুর রওয়ানা দিলাম। ধলেশ্বরীর ঘাটে লাগানো একটা লঞ্চে কামালের সাথে দেখা। কাছে গিয়ে কুশল বিনিময় করলাম। সেদিন ওকে বলেছিলাম, "কামাল, তোমার গোঁফটা কিছুদিনের জন্য কেটে ফেলো, তোমাকে চিনতে ওটাই যথেষ্ট।" বিনয়ী স্বরে উত্তরে কামাল বলেছিল, "ঠিক আছে ভাই, তাই করব।" আজ এ কী হল, ও কেন স্মৃতি হয়ে যাবে? বিশ্বাস হচ্ছিল না।

দুপুরের দিকে বাসায় ফিরলাম। কোন পথে এসেছিলাম বলতে পারব না। সারাটা শরীর অবশের মতো, বিছানায় পড়ে রইলাম। কোয়ার্টারের সামনে বিকেলবেলা ছোট ছোট জটলা ছিল, কিন্তু কারো মুখে কোন উচ্চবাচ্য নেই, সবাই যেন বোবা হয়ে গেছে। এটাই ছিল সেদিনের ঢাকা শহর। বেশ কয়েকদিন ঠিক এমনই অবস্থা বিরাজ করেছিল। আর এই অবস্থার পুরোটুকুর সদ্ব্যবহার করেছিল ঘাতকচক্র। তাই তেমনটি করে বিদ্রোহ হল না। এরপর বহুদিন প্রায়শই বঙ্গবন্ধুর বাড়ির সামনের রাস্তা ধরে হেঁটে যেতাম। আর বাইরে থেকে বাড়ির গায়ে গুলির দাগগুলো দেখে মনে হত, বাঙালির সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল সোনালি অক্ষরে লেখা ইতিহাসের পাতা ঘাতকের গুলির আঘাতে ছিন্ন করে কলঙ্ক-কালিমা এঁকে দেওয়া হয়েছে।

বাংলার মানুষের প্রিয় নেত্রী, বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনা প্রবাসজীবন থেকে বাংলায় ফিরে এলেন দলের হাল ধরতে। সে বছরই বঙ্গবন্ধুর বন্ধবাড়ির তালা খোলা হল। সেদিন নেত্রীর সাথে পার্টির তৎকালীন সেক্রেটারি আবদুর রাজ্জাক, মোনায়েম সরকার, স্থপতি আলমগীর কবীর, স্থপতি মাজহারুল ইসলামের সাথে আমিও উপস্থিত ছিলাম। তালা খুলে বাসার ভিতরে ঢুকে ধুলায় ধূসর, লণ্ডভণ্ড শোকাবহ অনেক কিছুর মাঝে যেটা আমাকে সবচেয়ে বিস্মিত করেছিল, সেটা শোবার ঘরে একটা আলনার সবচেয়ে নিচের কাঠের র‍্যাকের ওপর অনেকগুলো জীর্ণ স্যান্ডেল ও জুতার অবস্থান। একটা মধ্যবিত্ত সাধারণ জীবনযাপনকারী পরিবার, কোনোকিছু ফেলে দেওয়ার স্বভাব ছিল না। অতিসাধারণ মধ্যবিত্ত জীবনযাপন করতেন পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। আর এটা করতেন বলেই সাধারণ কোটি কেটি বাঙালির দুঃখ-বেদনা, বঞ্চনা, বিদ্রোহ সবকিছুই আপন বিশাল হৃদয়ে ধারণ করে জাতির শ্রেষ্ঠ প্রতীক বঙ্গবন্ধু হতে পেরেছিলেন। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতা দিয়ে গেছেন, একটা পতাকা দিয়ে গেছেন, জাতীয় সঙ্গীত দিয়ে গেছেন, দেশকে সংবিধান দিয়ে গেছেন, সর্বোপরি জাতি হিসেবে বাঙালিকে বিশ্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার অধিকারী করে গেছেন। ১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্ট জাতির চরমতম দুর্ভাগ্য, এ জাতির উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, শ্রেষ্ঠ সম্ভাবনা হত্যাকারী-ঘাতকের হাতে জীবন দিয়ে, সাধারণ জীবনের অধিকারী অসাধারণ পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব আবহমানকাল ধরে কোটি বাঙালির হৃদয়ে চিরস্থায়ী স্থান করে নিয়ে সবচেয়ে প্রিয় দেশের মাটি, টুঙ্গিপাড়ায় চিরনিদ্রায় শায়িত হয়ে অমরত্ব লাভ করে গেছেন। টুঙ্গিপাড়া আজ বাঙালির কাছে পবিত্র তীর্থভূমি।

পরিবারের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু

বেবী মওদুদ



জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পারিবারিক জীবন ছিল বড় সুখের, পরিতৃপ্তির ও আনন্দের। এর প্রধান উৎস ছিলেন বঙ্গবন্ধুর মা-বাবা এবং স্ত্রী। এদের সুষ্ঠু কর্তৃত্ব, স্নেহ, মমতা, উদার হৃদয়ের উষ্ণতা, বুদ্ধিমত্তার কারণে বঙ্গবন্ধুকে কখনোই তাঁর পারিবারিক জীবন নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত বা ঝামেলায় থাকতে হয়নি। প্রথম দিকে মা-বাবা, পরে স্ত্রী-আত্মীয়-স্বজন, ছেলে-মেয়ে, ঘর-সংসার ছাড়াও অনেক সময় তাঁর দলের লোকজনের বিষয়ে যথাযথভাবে তাঁদের দায়িত্ব পালন করতে দেখা গেছে। পরিবারের প্রতিটি সদস্য ছিল রাজনীতিমনস্ক, বাঙালির সংস্কৃতি ও সামাজিক জীবনের মূল্যবোধের অধিকারী; আবার ধর্মচর্চা ও আধুনিক চিন্তাভাবনায় স্বতঃস্ফূর্ত, অসাম্প্রদায়িক ও শান্তিকামী।

বড় দু'বোনের জন্মের পর শেখ মুজিবের জন্ম। তাঁর বাবা তখন গোপালগঞ্জ কোর্টের পেশকার হিসেবে কাজ করতেন। তাঁর জন্ম শুধু নিজ পরিবারে নয়, আত্মীয়-স্বজনসহ পুরো বংশে একটা আনন্দের বার্তা বয়ে এনেছিল। তাঁর নানা শেখ আব্দুল হামিদ সঙ্গে সঙ্গে আকীকা দিয়ে নাম রাখলেন, 'শেখ মুজিবুর রহমান।'

টুঙ্গিপাড়া নামে সবুজ প্রকৃতি-ঘেরা একটি প্রত্যন্ত পাড়াগাঁয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জন্ম। নদীপথই ছিল একমাত্র যাতায়াত ব্যবস্থা। যদিও তখন ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ বেশ পরিচিত শহর ছিল। ইংরেজরা এসব স্থানে শাসনকার্য পরিচালনা করত, বাড়ি-ঘর তৈরি করেছিল, মিশনারিরা হাসপাতাল ও স্কুল পরিচালনা করত।

টুঙ্গিপাড়া গ্রামে বঙ্গবন্ধুর পূর্বপুরুষেরা ১৮৫৪ সালে কলকাতা থেকে কারিগর এনে বিশাল দালানবাড়ি তৈরি করেছিলেন। টুঙ্গিপাড়া ও গোপালগঞ্জে বঙ্গবন্ধুর শৈশব-কৈশোর জীবন কেটেছে। গ্রামীণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, মধুমতী নদী আর মানুষের সারল্য, অভাব, দারিদ্র্য ও জীবনসংগ্রাম তাঁকে শৈশব-কৈশোরে অনুভূতিসম্পন্ন করে গড়ে তোলে।



শৈশবে মা-বাবার অতুলনীয় স্নেহ-মমতা, আদরে মুজিব পরিপুষ্ট হয়ে ওঠেন। বড় দু'বোন, ছোট তিন ভাই-বোন, চাচাত-মামাত-খালাত-ফুফাত ভাই-বোন ছাড়াও বাড়িতে আত্মীয়-স্বজনের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে একত্রে খেলাধুলা, লেখাপড়া ও খাওয়াদাওয়ার মধ্য দিয়ে তিনি বড় হয়ে ওঠেন। মা-বাবা ডাকতেন 'খোকা' বলে, বড়-দু'বোনও ডাকতেন 'ভাইটি' বলে, আর সব ছেলেমেয়ে ডাকত 'মিয়া ভাই' বলে। গ্রামের মোটামুটি সচ্ছল পরিবার ছিল; ক্ষেতের ধান, গোয়ালে গরুর দুধ, মধুমতী নদী-খাল-বিল-পুকুরের মাছ, কোনো অভাব তাঁকে স্পর্শ করেনি। তারপরও গ্রামের সরল সাধারণ আদর্শ জীবনযাত্রা তাঁকে আদর্শবান, দৃঢ় চরিত্রের অধিকারী হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

শেখ মুজিবের ছেলেবেলা কেটেছে মায়ের মমতায়, মায়ের স্নেহছায়ার আঁচলের তলে। মা নিজে রান্না করতেন এবং ছেলেকে নিজ হাতে তুলে খাওয়াতেন। বাটিভরা দুধ, সরভাসা ঘন দুধ, ঘরে তোলা মাখন ও ঘি, পিঠা, কইমাছের ঝোল, ভর্তা এসবই মা একটু বিশেষভাবে নিজের হাতে তৈরি করতেন তাঁর আদরের খোকার জন্য, যাতে রোগা-পাতলা শরীরে পুষ্টি হয়, জ্ঞান-বুদ্ধি ধারালো হয়। লেখাপড়ায় প্রথম পাঠ হয়েছিল গৃহশিক্ষকের কাছে। ধর্মশিক্ষা, অঙ্ক, ইতিহাস, বাংলা, ইংরেজি



জয় ও পুতুলকে আদর করছেন নানাভাই বঙ্গবন্ধু। পাশে তাদের মা শেখ হাসিনা ও নানী বেগম ফজিলাতুননেসা মুজিব

সব ধরনের শিক্ষার্জনের জন্য গৃহশিক্ষক ছিলেন কয়েকজন। তাঁদের কাছে সকাল-সন্ধ্যা পড়তে হত। প্রাথমিক শিক্ষা টুঙ্গিপাড়া গিমাডাঙ্গা স্কুলে শুরু হলেও, পরে গোপালগঞ্জ স্কুলে চতুর্থ শ্রেণিতে লেখাপড়া করেন। মাদারীপুর পাবলিক স্কুলে পড়ার সময় তাঁর চোখের অপারেশন হয়। এ সময় মা কাছে ছিলেন। তিন বছর পর গোপালগঞ্জ ফিরে মিশন স্কুলে সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি হন। তখন তাঁর গৃহশিক্ষক ছিলেন আব্দুল হামিদ মাস্টার, যার কাছে তিনি ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনের কথা শুনে শুনে রাজনীতিতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁর সাহস, বুদ্ধিমত্তা শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক ও হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

মাত্র ১০ বছর বয়সে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের আকদ হয় চাচাত বোন ফজিলাতুননেসা রেণুর সঙ্গে। পরে ১৮ বছর বয়সে আনুষ্ঠানিক বিয়ে সম্পন্ন হয়। বেগম মুজিবের বয়স যখন মাত্র ৩ বছর তখন তাঁর মা মারা যান, বঙ্গবন্ধুর মা তাঁকে ছেলের বউ করে কোলে তুলে ঘরে আনেন। ফলে বাড়ির আর সব ছেলেমেয়ের সঙ্গে একত্রে গৃহশিক্ষকের কাছে লেখাপড়া করেন রেণু। বঙ্গবন্ধুর শৈশব-কৈশোরে খেলাধুলা, লেখাপড়ার সঙ্গী রেণু তাঁর আদর্শ জীবনসঙ্গী হিসেবে গড়ে ওঠেন। অল্প বয়সেই 'স্বামী'-কে বুঝতে শেখেন, তাঁর কাজকর্ম, জীবনযাত্রা, চিন্তাভাবনার একান্ত সঙ্গী ছিলেন।

বঙ্গবন্ধু মা-বাবার কাছ থেকে যে পারিবারিক মূল্যবোধের শিক্ষা পেয়েছিলেন তা বিরল। লেখাপড়ার পাশাপাশি ছেলের সমাজকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড, বাঙালি সংস্কৃতির জীবনধারায় জড়িয়ে যাওয়া, কলকাতায় ছাত্র-রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হওয়া, পরবর্তীকালে বৃহত্তর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ ও নেতৃত্বদানে কখনোই বঙ্গবন্ধুর বাবা-মা কোনো প্রশ্ন তোলেননি, বরং সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে। পারিবারিক আর্থিক কাজে পিতাকে সাহায্য করতে বঙ্গবন্ধুর ছোটভাই শেখ আবু নাসের অল্প বয়সেই এগিয়ে আসেন। বিশেষ করে নিজেদের কৃষিকাজের দেখাশোনা ছাড়াও পারিবারিক আর্থিক সহায়তার জন্য তিনি ব্যবসা শুরু করেন। পরবর্তীকালে খুলনা শহরে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন। বঙ্গবন্ধুর বাবা-মা টুঙ্গিপাড়া গ্রামের বাড়িতে বসবাস করলেও প্রতিটি ছেলেমেয়ের



লন্ডনে অসুস্থ শেখ মুজিবের পাশে বেগম মুজিব

সঙ্গে পারিবারিক সম্পর্ক ছিল মধুর। ছয় ছেলেমেয়ের জামাই-বধূ, নাতি-নাতনিসহ এক বিশাল পরিবারের গৃহকর্ত্রী বঙ্গবন্ধুর মা ছিলেন একজন আদর্শ মহিলা। পরিশ্রমী, সাংসারিক, গৃহকর্মে নিপুণা। তাঁর যোগ্য উত্তরাধিকারিণী ছিলেন পুত্রবধূ ফজিলাতুননেসা মুজিব। স্বামীর রাজনৈতিক কর্মব্যস্ততা, রাজবন্দি অবস্থায় তিনি ছিলেন ধীরস্থির, শান্ত, অসীম ধৈর্যের অধিকারী। ১৯৬৮ সালে বঙ্গবন্ধু যখন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় রাজবন্দি, ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন যখন পাকিস্তানি কারাগারে ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত এবং তিনি নিজেও ছেলেমেয়ে নিয়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হাতে বন্দি, তাঁকে তখনও দেখা গেছে ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে। রাজবন্দি স্বামীকে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ শুধু নয়, আইয়ুব খানের গোলটেবিলে প্যারোলে মুক্তিলাভ করে যোগদান না করার সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করেছিলেন এই বলে যে, "তাহলে তোমার বিরুদ্ধে আমি পল্টনে জনসভা করব।" সেদিন রাজনৈতিক নেতারা বঙ্গবন্ধুকে প্যারোলে মুক্তিলাভের শর্ত মেনে নিতে যে পরামর্শ দিয়েছিলেন, তার বিরুদ্ধে বেগম মুজিবের এ পরামর্শ ছিল অনেক দূরদর্শিতাসম্পন্ন।

বেগম মুজিবের ওপর বঙ্গবন্ধুর ছিল সম্পূর্ণ আস্থা, বিশ্বাস, ভালোবাসা। রাজনৈতিক ব্যস্ততা, চিন্তাভাবনা, গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণকালে বেগম মুজিবের সান্নিধ্য ও সহযোগিতা তাঁকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করত। ৭ মার্চ ঐতিহাসিক ভাষণ দিতে যাওয়ার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত বেগম মুজিব তাঁর চিন্তাভাবনা, আলোচনা, পরামর্শের একান্ত সঙ্গী ছিলেন। বেগম মুজিব ঐ ভাষণ শাহবাগের মোড়ে গাড়িতে বসে শুনেও এসেছিলেন। তেমনি সাহসের সঙ্গে ১৯৭১ সালে বন্দিজীবনে স্বামীর জন্য অধীর অপেক্ষা করেছেন। সর্বংসহা এক মমতাময়ী নারী হিসেবে তিনি সকলের কাছে ছিলেন শ্রদ্ধা ও সম্মানের আদর্শ।

বঙ্গবন্ধুর পারিবারিক জীবনের সাফল্য যেমন আনন্দময়, তেমনি তাঁর পরিবারের সবাইকে স্বার্থত্যাগ করতে হয়েছে, আর করুণ পরিণতিও ঘটেছে। বঙ্গবন্ধুর মা-বাবার দীর্ঘ জীবন ছিল। ১৯৭১ সালে পুত্রের জন্য পিতা-মাতাকে রাস্তায় বসিয়ে গ্রামের বাড়ি আগুনে পুড়িয়ে ছাই করে দেয় পাকিস্তান সেনাবাহিনী। বঙ্গবন্ধুর ছোটভাইয়ের খুলনার বাড়ি লুটপাট করে। ছোটভাই স্ত্রী-ছেলেমেয়েসহ ভারতে শরণার্থী হন। পরে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেন। বঙ্গবন্ধুর পরিবার যখন ঢাকায় বন্দি, তখনো তাঁর দু'সন্তান শেখ কামাল ও শেখ জামাল মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করে। বেগম মুজিব পরবর্তীকালে শ্বশুর-শাশুড়িকে এনে হাসপাতালে রাখেন।

১৯৭৪-এর ৩০ জুন বঙ্গবন্ধুর মা এবং ১৯৭৫-এর ৩০ মার্চ বঙ্গবন্ধুর বাবা মৃত্যুবরণ করেন। ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু বেগম মুজিব, তিন সন্তান ও দু'জন পুত্রবধূসহ ঘাতকের হাতে নিষ্ঠুরভাবে নিহত হলেন। বঙ্গবন্ধুর একমাত্র ছোটভাই শেখ আবু নাসেরও তাদের সঙ্গী হলেন কেন? ঘাতকেরা তাঁকেও রেহাই দেয়নি।

বঙ্গবন্ধুর পারিবারিক জীবন যে কতখানি আদর্শস্থানীয়, মাধুর্যপূর্ণ, আনন্দময়, পরিতৃপ্ত, আকর্ষণীয় ছিল, যাঁরা খুব ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন তাঁরাই তা অনুভব করতে পারবেন। তাঁর বাড়িতে মূল্যবান আসবাবপত্র, দামি কার্পেট, এয়ারকন্ডিশন, বিদেশি ফিটিংস, ঝাড়বাতি, পোশাক-পরিচ্ছদ, তৈজসপত্র ছিল না। বাঙালি জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় সামগ্রী ছিল। আর ছিল রুচিবোধ এবং হৃদয়ভরা ভালোবাসা, মায়া, মমতা ও সহমর্মিতার মতো মূল্যবান দুর্লভ সম্পদ। তাঁর জীবিত দুই কন্যা বাড়িটি বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর করে জনগণকে উৎসর্গ করে দিয়েছেন। টুঙ্গিপাড়ায়ও গড়ে তুলেছেন 'স্মৃতিসৌধ'।

শেষরাতে পুলিশ এসেছে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করতে, আর বড়মেয়ে শেখ হাসিনা মৃদুকণ্ঠে তাদের বলেছেন, "একটু অপেক্ষা করুন, উনি অনেক রাতে সভা করে এসে সবেমাত্র ঘুমিয়েছেন।" ১৯৭১-এর মার্চ মাসে খাবার টেবিলে বসে শেখ মুজিব ছেলেমেয়েদের ছয়টি আঙুল তুলে বলতেন, "এতদিন ছিল আমাদের ছয়দফা, এখন একদফা।" সম্পূর্ণ রাজনৈতিক আদর্শের অধিকারী ছিল বঙ্গবন্ধুর পরিবার। বঙ্গবন্ধুর জন্য তাঁরা যে কোনো ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত ছিলেন, এমনই তাঁদের আত্মিক সম্পর্ক ও একাত্মতাবোধ ছিল।

বঙ্গবন্ধু ও বাংলা একাডেমী

সেলিনা হোসেন

১৯৭১ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ছিল বাঙালির জীবনে এক অসাধারণ উজ্জ্বল ব্যতিক্রমী সময়। কারণ পাকিস্তানের ২৪ বছরের ইতিহাসে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৭০ সালে। এই বছরের নভেম্বর মাসে প্রবল জলোচ্ছ্বাসে ভেসে গিয়েছিল দেশের উপকূলীয় অঞ্চলের জনপদ। প্রাণ হারিয়েছিল লাখ লাখ মানুষ। নির্বাচন শেষ হয়েছিল ডিসেম্বর মাসে। এই নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দল আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পেয়ে বিজয় লাভ করে। পাকিস্তানের ২৪ বছরের ইতিহাসে এই প্রথম বাঙালি কেন্দ্রের শাসন ক্ষমতায় যাবে। বাঙালির উৎসাহ-উদ্দীপনার শেষ ছিল না। আত্মমর্যাদার বোধেও প্রদীপ্ত ছিল পূর্ববঙ্গের গণমানুষ।

সে সময়ে বাংলা একাডেমীর পরিচালকের দায়িত্বে ছিলেন অধ্যাপক কবীর চৌধুরী। তিনি বিশেষভাবে অমর একুশের অনুষ্ঠানমালা সাজিয়েছিলেন। ১৫ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এই প্রথম তিনি প্রতিষ্ঠানের আমন্ত্রিত অতিথি হয়ে বাংলা একাডেমীতে আসেন।

বঙ্গবন্ধুকে বাংলা একাডেমীতে আমন্ত্রণ জানানোর বিষয়টি সম্পর্কে অধ্যাপক কবীর চৌধুরী লেখেন: "আমরা যখন এ অনুষ্ঠানমালার উদ্বোধন করার অনুরোধ নিয়ে তাঁর কাছে যাই, তখন তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সুন্দর মৃদু হাসি হেসে আমাকে বলেছিলেন, আমি কেন? আমি তো মাঠের মানুষ, পড়ালেখা জানি না, আপনারা কোনো পণ্ডিত বা সাহিত্যিককে দিয়ে উদ্বোধন করান, তাই যথার্থ হবে। কিন্তু আমরা যখন কেন তিনি সে সম্পর্কে আমাদের যুক্তির কথা বললাম তখন তিনি আবারও একই রকম মৃদু হাসি হাসলেন, তবে এবারে আমাদের প্রস্তাব মেনে নেন। উদ্বোধনী ভাষণে তিনি উদাত্ত কণ্ঠে তাঁর স্বভাবজ প্রেরণাদায়ক ভঙ্গিতে দেশের শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের সাধারণ মানুষের পাশে এসে তাদের সাথে একত্রিত হয়ে দাঁড়িয়ে তাদের জীবনকে সুখী ও সমৃদ্ধ করে তোলার সর্বাত্মক প্রয়াসে সক্রিয় অংশগ্রহণের আহ্বান জানান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের একটি পর্ব ছিল একাডেমী পরিচালিত বাংলা ভাষা শিক্ষা কোর্সে সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ অবাঙালি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রধান অতিথি ও ২১ অনুষ্ঠানমালার উদ্বোধক বঙ্গবন্ধু কর্তৃক সনদপত্র বিতরণ।"

মহান মুক্তিযুদ্ধের অমর শহীদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী লিখেছেন, "আজ বিকেল ৪টায় বাংলা একাডেমীর শহীদ স্মরণ সপ্তাহের অনুষ্ঠান আরম্ভ হলো। শেখ মুজিবুর রহমান প্রধান অতিথি। উনি বাঙালি সংস্কৃতির কথা বললেন।"

বাংলা একাডেমীর অনুষ্ঠানে তিনি তাঁর রাজনৈতিক দর্শনের প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। বাঙালি সংস্কৃতির সাধক লেখকদের তিনি সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াতে বলেছেন। সাহিত্যে জীবনের প্রতিফলন ঘটানোর পাশাপাশি সংস্কৃতির যে নিজস্ব শেকড় সেটা অনুধাবনের তাৎপর্যও তিনি বলতে ভোলেননি। এখানেই তাঁর বাংলা একাডেমীর গৌরবের জায়গা দেখিয়ে দেওয়ার প্রজ্ঞা। তিনি জানতেন, শিক্ষা-সংস্কৃতি ও জনজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মাতৃভাষার স্বীকৃতি অর্জন জাতিসত্তার বৈশিষ্ট্যের একটি প্রধান দিক।

বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক প্রজ্ঞার সঙ্গে সাংস্কৃতিক সচেতন স্বচ্ছতা ছিল নিবিড়ভাবে সংযুক্ত। ষাটের দশকে পাকিস্তান বেতার ও টেলিভিশনে রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রচার নিষিদ্ধ করেছিল সরকার। সে সময় দেশের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীবৃন্দ প্রবল প্রতিবাদ করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে পাকিস্তান সরকার বাধ্য হয়েছিল রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রচার নিষিদ্ধ আদেশ প্রত্যাহার করতে। তখন দেশে ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের প্রবল জোয়ার। ধসে পড়েছে আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের ভিত। বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে পরিচালিত 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয় পাকিস্তান সরকার। জেলখানা থেকে মুক্তি পান বঙ্গবন্ধু।



১৯৭৪, বাংলা একাডেমীর আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলন উপলক্ষে একাডেমীতে পৌঁছালে বঙ্গবন্ধুকে অভ্যর্থনা জানান তৎকালীন সচিব অধ্যাপক লুৎফুল হায়দার চৌধুরী (বামে), ডানে তৃতীয়: মহাপরিচালক অধ্যাপক মযহারুল ইসলাম এবং মাঝে: লেখক সেলিনা হোসেন

১৯৬৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি রেসকোর্স ময়দানে দেওয়া বক্তৃতায় বঙ্গবন্ধু বলেন, "আমরা মীর্জা গালিব, সক্রেটিস, শেক্সপীয়র, এরিস্টটল, দান্তে, লেনিন, মাও সে তুং পড়ি জ্ঞান আহরণের জন্য। আর দেউলিয়া সরকার আমাদের পাঠ নিষিদ্ধ করে দিয়েছে রবীন্দ্রনাথের লেখা, যিনি একজন বাঙালি কবি এবং বাংলায় কবিতা লিখে যিনি বিশ্বকবি হয়েছেন। আমরা এই ব্যবস্থা মানি না। আমরা রবীন্দ্রনাথের বই পড়বই, আমরা রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইবই এবং রবীন্দ্রসঙ্গীত এই দেশে গীত হবেই।" এভাবে বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতিসত্তার মননে রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতির অনিবার্য দিকটিকে রাজনীতি ও সংস্কৃতির যোগসূত্রে গেঁথে দিয়েছিলেন।

এই সত্যের মধ্যেই বাংলা একাডেমীর যথার্থতা নিহিত। ভাষা আন্দোলনের অমর শহীদদের রক্তের বিনিময়ে প্রতিষ্ঠিত বাংলা একাডেমী। জাতির সাংস্কৃতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা সবচেয়ে বেশি ধ্বনিত হয় এই প্রতিষ্ঠানে। পাকিস্তান আমল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত দেশে এমন আর একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনি, যেখানে জাতির মগ্ন-চৈতন্যে তার সাংস্কৃতিক বোধ প্রবলভাবে স্পন্দিত হয়। বঙ্গবন্ধু এই প্রতিষ্ঠানে এসে এই সত্যকে আরো দৃঢ় করেছিলেন। তাই পাকিস্তান সরকারের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হয়েছিল বাংলা একাডেমীর বর্ধমান ভবন। এর দ্বারা বোঝা যায় একটি ভবন কীভাবে জাতিসত্তার প্রতীকে উত্তীর্ণ হয়। বাংলা একাডেমী শুধু ইটকাঠের দালান হয়ে থাকে না। তাই পঁচিশের কালো রাতে পাকিস্তান হানাদার বাহিনী কামান দেগে ভেঙে দেয় বর্ধমান ভবনের দেয়াল। ওই রাতেই শুরু হয় বাঙালির মহান সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ।

স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭৪ সালে বাংলা একাডেমী একটি আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজন করেছিল। সে সময় বাংলা একাডেমীর সংস্কৃতি বিভাগের প্রধান ছিলেন গবেষক,

ফোকলোরবিদ শামসুজ্জামান খান। বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালকসহ তাঁরা কয়েকজন '৭৪ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি সকাল ৯টায় বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে গিয়েছিলেন আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলনে তাঁকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য। শামসুজ্জামান খান লিখেছেন: বঙ্গবন্ধু বসলেন, প্রফেসর ইসলাম এবং আমরাও বসলাম। তিনি বললেন, "বলুন প্রফেসর, কি মনে করে এসেছেন।" ড. ইসলাম বললেন: "বঙ্গবন্ধু, আমরা বাংলা একাডেমী থেকে একটি আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজন করছি, বিভিন্ন দেশ থেকে বিখ্যাত সাহিত্যিকরা আসবেন। আপনাকে সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে পেতে চাই।" তিনি যেন আকাশ থেকে পড়লেন। তাঁর প্রত্যুত্তর: "আমি সাহিত্যের কি বুঝি? আমি কি বলব! একজন প্রবীণ ও সর্বজনশ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক বা পণ্ডিতকে দিয়ে এ কাজ করান, সম্মেলনের মর্যাদা বাড়বে। আগে তো তাই হতো। ছাত্রজীবনে দু'একবার সাহিত্য সম্মেলনে যোগ দিয়েছি। কই, রাজনৈতিক নেতারা তার উদ্বোধন করেছেন বলে তো মনে পড়ে না।" এই বলে তিনি হাসলেন। পরিস্থিতিকে একটু সহজ করার জন্য বললেন, "আমি রবীন্দ্রনাথ পড়ি, ভালোবাসি তাঁকে– সাহিত্যে আমার পুঁজি তো ওইটুকুই। এই পুঁজি নিয়ে দেশ-বিদেশের বড় বড় পণ্ডিত ও সাহিত্যিক-শিল্পীদের মধ্যে যেতে আমি সংকোচবোধ করছি।" তাঁকে বলা হল, এটা স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সাহিত্য সম্মেলন। এর একটা ভিন্ন তাৎপর্য রয়েছে। আপনি সম্মেলন উদ্বোধন করলে তা আন্তর্জাতিক মর্যাদা লাভ করবে। তাছাড়া গণতন্ত্র, মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও মানবাধিকারের প্রশ্নে আপনার ও আপনার সরকারের দৃষ্টিভঙ্গিরও প্রতিফলন ঘটবে। তিনি একটু ভাবলেন, বললেন, "ঠিক আছে, যাবো। আমার বন্ধু জসীমউদ্‌দীন ও শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনকেও বিশেষ মর্যাদায় আমন্ত্রণ জানাবেন।"

আবারও দেখা যাচ্ছে বঙ্গবন্ধু দেশের সাংস্কৃতিক ব্যক্তিবর্গকে কতখানি সম্মানের সঙ্গে দেখতেন। বাংলা একাডেমীর অনুষ্ঠানে কারা অংশগ্রহণ করলে মানসম্পন্ন হবে সে ব্যাপারেও তিনি ছিলেন গভীর বিবেচনার মানুষ।

আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলন সম্পর্কে অধ্যাপক আনিসুজ্জামান লিখেছেন: "মযহারুল ইসলামের সময়ে বাংলা একাডেমীর উদ্‌যোগে বড় রকমের এক সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বঙ্গবন্ধু এটি উদ্বোধন করেন। বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের অনেক বিখ্যাত লেখক এতে যোগ দেন। আমি একটা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করি।"

কথাসাহিত্যিক রাবেয়া খাতুন লিখেছেন: "চুয়াত্তরের সম্মেলনের প্রথম দিন দর্শকের সংখ্যা উপচে পড়েছিল মাঠে। মঞ্চ তৈরি হয়েছে নতুন বিল্ডিংয়ের সামনের দিকে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এসেছেন। আমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন পশ্চিম বাংলার লেখক ও পণ্ডিতরা।"

সাহিত্য সম্মেলনে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে এসেছিলেন কথাসাহিত্যিক আনোয়ার আলিমঝান্‌ভ ও মরিয়ম সালগানিক এবং আরো কয়েকজন। তৎকালীন পূর্ব জার্মানি থেকে এসেছিলেন সাহিত্যিক হ্যাসো গ্রাবনার। মঙ্গোলিয়া থেকে এসেছিলেন কথাসাহিত্যিক মি. পি. হাসবাতার। ভারত থেকে এসেছিলেন হিন্দি লেখক মুলকরাজ আনন্দ, সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায়, ইতিহাসবিদ ড. নীহাররঞ্জন রায়, লোকসাহিত্যবিশারদ ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য, কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়সহ অনেক লেখক।

বাংলা একাডেমী আয়োজিত আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলনে দেশের লেখকদের বিদেশি লেখকদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা থেকেই বঙ্গবন্ধু শিল্পী, সাহিত্যিক, কবি, প্রাবন্ধিক, গবেষকদের সামনে এনেছিলেন। রাজনৈতিক প্রজ্ঞার দৃষ্টিতে সাংস্কৃতিক দিকনির্দেশনাকেও তিনি গভীরভাবে মূল্যায়ন করেছিলেন। সেই সম্মেলনে বাংলাদেশের নবীন-প্রবীণ লেখকরা মুখর করে তুলেছিলেন বাংলা একাডেমীর প্রাঙ্গণ।

বঙ্গবন্ধু একটি স্বাধীন দেশের স্বপ্নদ্রষ্টা। বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতার স্বপ্নে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। ভাষা-শহীদের রক্তের বিনিময়ে প্রতিষ্ঠিত বাংলা একাডেমী যে কোনো সাধারণ প্রতিষ্ঠান নয়, এটা তিনি গভীরভাবে অনুধাবন করেছিলেন। সে কারণে অনুষ্ঠানের বক্তব্য প্রদান করেছিলেন সেই দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে।

তিনি মাত্র দু'টো অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন। একটি স্বাধীনতার বছরের সময় একুশের অনুষ্ঠান। সেই অনুষ্ঠানে তিনি বাঙালির সাংস্কৃতিক শক্তির পরিচয়টিকে বিশ্লেষণ করেছিলেন জনজীবনের রাজনৈতিক চেতনার সঙ্গে এক করে। লেখকদের সেই জীবনের রূপকার হওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন।

দ্বিতীয়বার তিনি এলেন একটি আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলনে। সাহিত্য জাতির জীবন-পরিচর্যার সামগ্রিক চিত্র প্রতিফলিত করে। সাহিত্য আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পরিচিতি লাভ করলে দেশের মর্যাদা ও গৌরব বৃদ্ধি পায়। বিশেষ করে অর্থনৈতিকভাবে দারিদ্র্য-পীড়িত ছোট দেশকে দারিদ্র্যের ঊর্ধ্বে নিয়ে যায় সে দেশের শিল্প-সাহিত্য-সঙ্গীত-চলচ্চিত্র-খেলাধুলা ইত্যাদি। এসব মাধ্যমই দেশের সৃজনশীলতার পরিচয়কে উজ্জ্বল করে তুলতে পারে। বাংলা একাডেমী দেশের সাহিত্য ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশ করে।

এভাবে সুদূরপ্রসারী জ্ঞানচিন্তায় বঙ্গবন্ধু বাংলা একাডেমীর ভূমিকা কি হবে তা স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন। সামগ্রিক অর্থে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন বাংলা একাডেমী কীভাবে জাতিসত্তার পরিচয়ের প্রতীক হবে।

বঙ্গবন্ধুর স্বদেশফেরা, ১৯৭২

মুনতাসীর মামুন

১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ সালে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করল হানাদার পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের সহযোগীরা। দেশ জুড়ে আনন্দ, কিন্তু তারপরও সবার প্রশ্ন, বঙ্গবন্ধু তো নেই। তিনি তখনও পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি। তিনি ফিরে না আসা পর্যন্ত স্বাধীনতা পুরোপুরি পাওয়া গেছে– এ কথা মানতে কেউ রাজি নয়।

হঠাৎ রটে গেল বঙ্গবন্ধু ফিরছেন। মুহূর্তে যুদ্ধে বিধ্বস্ত, ক্লান্ত বাঙালি যেন জেগে উঠল। ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু ফিরবেন। ৭ মার্চ যেমন সবাই ছুটেছিল রমনা রেসকোর্সে তাঁর ভাষণ শুনতে, প্রায় এক বছর পর আবার অনেকে ছুটল রমনার দিকে, কেউ তেজগাঁ বিমানবন্দরের দিকে। তেজগাঁ থেকে রমনা পর্যন্ত রাস্তার দু'পাশেও লোকজন থই থই করছে। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে প্লেনটি যখন নামল তখন কেউ আর কিছু মানতে চায়নি। প্লেনের দোরগোড়ায় তাঁকে জড়িয়ে ধরেন তাজউদ্দীন আহমদ ও তাঁর সহকর্মীরা। তারপর ট্রাকে রমনার দিকে রওয়ানা হন বঙ্গবন্ধু।

৭ মার্চে রমনায় ছিল যেমন উত্তেজনা, ১০ জানুয়ারিও ছিল ঠিক তেমন উত্তেজনা, তার সঙ্গে যোগ হয়েছিল আনন্দ। কারণ তিনি ফিরে এসেছেন। ৭ মার্চ তাঁর বক্তৃতায় ছিল স্বাধীনতার আহ্বান। ১০ জানুয়ারির বক্তৃতায় ছিল উদ্বেগ। কী হবে দেশের? তাঁর এই সোনার বাংলার? কারণ, সব কিছুতো বিধ্বস্ত। বঙ্গবন্ধু রমনা মাঠের (সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানের সেই জায়গায় যে জায়গা থেকে ৭ মার্চ বক্তৃতা দিয়েছিলেন) মঞ্চে উঠলেন। আবেগে তখন তাঁর গলা কাঁপছিল। অনেক কথা তিনি বলেছিলেন [দ্র. ১০ জানুয়ারির বক্তৃতা]। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলি তুলে ধরছি।

বঙ্গবন্ধু ঢাকার পথে রওয়ানা হওয়ার আগে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ভুট্টো তাঁকে জানান যে, পূর্ব পাকিস্তান এখন বাংলাদেশ। এবং সে দেশের নেতা হিসেবে তিনি এখন ফিরবেন। বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে কি একটা কনফেডারেশন হতে পারে? এ কথা জানিয়েছেন ভারতীয় কূটনীতিক শশাঙ্ক ব্যানার্জি, যিনি একই বিমানে লন্ডন থেকে দিল্লি যাচ্ছিলেন। উত্তরে কী বলেছিলেন বঙ্গবন্ধু, জানতে চান শশাঙ্ক ব্যানার্জি। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'আমার জীবনকালে নয়।'

১০ জানুয়ারিতে সেই বক্তৃতায় তিনি এ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'পাকিস্তানি কারাগার থেকে আমি যখন মুক্ত হই তখন জনাব ভুট্টো আমাকে অনুরোধ করেছিলেন, সম্ভব হলে আমি যেন দু'দেশের মধ্যে একটা শিথিল সম্পর্ক রাখার চেষ্টা করি। আমি তাঁকে বলেছিলাম, আমার জনসাধারণের নিকট ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত আমি আপনাকে এ ব্যাপারে কিছু বলতে পারি না। আমি এখন বলতে চাই, জনাব ভুট্টো সাহেব, আপনারা শান্তিতে থাকুন।'

বাংলাদেশের স্বাধীনতা আনার কৃতিত্ব তিনি সাধারণ মানুষকে দিয়েছিলেন, বলেছিলেন– "আপনারা বাংলাদেশের মানুষ সেই স্বাধীনতা এনেছেন।" বক্তৃতার শেষের দিকে বলেছিলেন– বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে। এখন যদি কেউ বাংলাদেশের স্বাধীনতা হরণ করতে চায়, তাহলে সে স্বাধীনতা রক্ষার জন্য মুজিব সর্বপ্রথম তার প্রাণ দেবে। জোর গলায় বলেছিলেন, "একজন বাঙালিও প্রাণ থাকতে এই স্বাধীনতা নষ্ট হতে দেবে না।"

ইসলামি দেশগুলি পাকিস্তানকে সমর্থন দিয়েছিল– এ তথ্য তখনও হয়তো তাঁর অজানা। কিন্তু ধর্ম যে বাঙালির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত সেটা তিনি ভোলেননি। মনে করিয়ে দিয়েছিলেন জনতাকে, "আপনারা আরো জানেন যে, আমার ফাঁসির হুকুম হয়েছিল। আমার সেলের পাশে আমার জন্য কবরও খোঁড়া হয়েছিল। আমি মুসলমান, মুসলমান মাত্র একবারেই মরে। তাই আমি ঠিক করেছিলাম, আমি তাদের নিকট নতি স্বীকার করব না।" জনগণকে মনে করিয়ে দিয়ে বলেছিলেন– "বাংলাদেশ পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম-অধ্যুষিত দেশ। ইন্দোনেশিয়ার পরেই এর স্থান। মুসলিম জনসংখ্যার দিক দিয়ে ভারতের স্থান তৃতীয় ও পাকিস্তানের স্থান চতুর্থ।"

আমার ফাঁসির হুকুম হয়েছিল।
আমার জন্য কবর খোঁড়া হয়েছিল।
মুসলমান মাত্র একবারই মরে।
তাই আমি ঠিক করেছিলাম, আমি
তাদের নিকট নতি স্বীকার করব না।

ইসলামের কথা তিনি মনে করিয়ে দিয়েছিলেন অন্য কারণে। পাকিস্তান সব সময় ধর্মের দোহাই দিয়ে বাঙালিদের শোষণ করেছে, ভয় দেখিয়েছে। আন্দোলন শুরু হলেই পাকিস্তানি নেতারা বলতেন ইসলাম বিপন্ন। বাঙালিরা আঁতাত করছে ভারত বা ভারতীয় হিন্দুদের সঙ্গে। ধর্মের দোহাই দিয়ে শাসন করা– এ বৃত্ত তিনি ভাঙ্গতে চেয়েছিলেন। নিজে মুসলমান দাবি করলেও তিনি যে বাঙালি তা ভোলেননি এক মুহূর্তের জন্য। সে কারণে বক্তৃতার বিভিন্ন জায়গায় এই কথাগুলি মনে করিয়ে দিয়েছিলেন– "ফাঁসির মঞ্চে যাওয়ার সময় আমি বলব, আমি বাঙালি, বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা। জয় বাংলা।" তারপর বলেছিলেন, "পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনী ইসলামের নামে এ দেশের মুসলমানদের হত্যা করেছে, আমাদের নারীদের বেইজ্জত করেছে। ইসলামের অবমাননা আমি চাই না। আমি স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে দিতে চাই যে, আমাদের দেশ হবে গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজতান্ত্রিক দেশ। এ দেশের কৃষক-শ্রমিক, হিন্দু-মুসলমান সবাই সুখে থাকবে, শান্তিতে থাকবে।"

তাঁর এই প্রতিশ্রুতি তিনি রেখেছিলেন। অনেকে বলেন, তিনি বামপন্থীদের চাপে সমাজতন্ত্রের কথা বলেছিলেন। এই বক্তব্য দেওয়ার সময় বামপন্থী কারো সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়নি। বিমান থেকে নেমেই তিনি বক্তৃতার মঞ্চে এসেছেন। সুতরাং সমাজতন্ত্রের কথা তিনি ভেবেচিন্তেই বলেছিলেন, ধর্মনিরপেক্ষতার কথাও। এখানে ধর্মনিরপেক্ষতার ওপর গুরুত্ব দিতে চাই। কারণ, ঐ রকম ঘোষণা ঐ সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে ছিল একেবারে নতুন। আরও পরে ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে তিনি কী বোঝেন সেটি বিশদভাবে বলেছিলেন, "বাংলাদেশ হবে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। মুসলমান মুসলমানদের ধর্ম পালন করবে। এ মাটিতে ধর্মহীনতা নাই, ধর্মনিরপেক্ষতা আছে। এর একটা মানে আছে, এখানে ধর্মের নামে ব্যবসা চলবে না। ধর্মের নামে লুট করা চলবে না। ধর্মের নামে রাজনীতি করে রাজাকার-আলবদর পয়দা করা বাংলার বুকে আর চলবে না। সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করতে দেওয়া হবে না।" সে কারণে তিনি সংবিধানে মূলনীতি হিসেবে গণতন্ত্র, বাঙালি জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা ঘোষণা করেছিলেন। শুধু তাই নয়, এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখার জন্য ধর্মভিত্তিক রাজনীতিও নিষিদ্ধ করেছিলেন।

১৯৭৫ সালে জেনারেল জিয়া এসব মূলনীতি বাতিল করেন। কারণ, মানসিকভাবে তিনি পাকিস্তানের কাছাকাছি থাকতে চেয়েছিলেন, আমাদেরও তাঁর সহযাত্রী করতে চেয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু ঠিকই বুঝেছিলেন– ধর্মের নামে আবারও রাজাকার আলবদর পয়দা হবে। ১৯৭৫ সালের পর আমরা তাই দেখি। এ কারণে বোধ হয় বক্তৃতার শুরুতে তিনি বলেছিলেন– "ষড়যন্ত্র এখনও শেষ হয়নি।" তাঁর কথা সত্য হয়েছিল। লে. জেনারেল জিয়া পাকিস্তান যাত্রা শুরু করেছিলেন। তাঁর অনুসারীদের পাকিস্তানে পৌঁছাবার আকুল বাসনা ছিল। আগেই উল্লেখ করেছি, ১০ জানুয়ারির বক্তৃতায় এক ধরনের উদ্বেগ উৎকণ্ঠা ছিল। কী হবে? যে আশা তিনি দেখিয়েছিলেন তা পূরণ করতে না পারলে? তাই উদ্বেগ চাপা না রেখে বলেছিলেন- "আজ সোনার বাংলার কোটি কোটি মানুষ গৃহহারা, আশ্রয়হারা, তারা নিঃসম্বল। আমি মানবতার খাতিরে বিশ্ববাসীর প্রতি আমার এই দুঃখী মানুষদের সাহায্যদানের জন্যে এগিয়ে আসতে অনুরোধ করছি। নেতা হিসেবে নয়, ভাই হিসেবে আমি আমার দেশবাসীকে বলছি, আমাদের সাধারণ মানুষ যদি আশ্রয় না পায়, খাবার না পায়, যুবকরা যদি চাকরি বা কাজ না পায়, তাহলে আমাদের এই স্বাধীনতা ব্যর্থ হয়ে যাবে– পূর্ণ হবে না। আমাদের এখন তাই অনেক কাজ করতে হবে।"

গণহত্যার কথা তিনি ভোলেননি, যদিও পশ্চিম পাকিস্তানে থাকার কারণে এর ব্যাপকতা তখনও অনুধাবন করতে পারেননি। বলেছিলেন তিনি– "যারা অন্যায়ভাবে আমাদের মানুষদের মেরেছে তাদের অবশ্যই বিচার হবে। বাংলাদেশে এমন পরিবার খুব কমই আছে, যে পরিবারের লোক মারা যায়নি। .... পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বাংলাদেশে যে নির্বিচার গণহত্যা করেছে তার অনুসন্ধান ও ব্যাপকতা নির্ধারণের জন্য আমি জাতিসংঘের নিকট একটা আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল গঠনের আবেদন জানাছি।"

বঙ্গবন্ধু বক্তৃতার প্রথমে যা বলেছিলেন তা দিয়েই শেষ করব– "বাংলাদেশ ইতিহাসে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবেই টিকে থাকবে। বাংলাকে দাবিয়ে রাখতে পারে এমন কোনো শক্তি নেই।"

এখন ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস হিসেবে পালন করা হয়।

জনগণের রাজনীতির নায়ক বঙ্গবন্ধু

আবুল মোমেন

দাঙ্গা আর দেশভাগ, বিতাড়ন আর জবরদখল, হিংসা আর চক্রান্তের ওপর যে রাষ্ট্রের ভিত তৈরি হয়েছিল তার নৈতিক সংকট অনিবার্য। পাকিস্তানের প্রাসাদ-ষড়যন্ত্র আর বাঙালি-বৈরী রাজনীতিকে মুখোমুখি মোকাবিলা করেছেন বঙ্গবন্ধু। ষড়যন্ত্রের রাজনীতি চলে নেপথ্যে এবং আশেপাশের চাতুরির ওপর ভিত্তি করে। বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের ক্ষমতার দুর্গে আঘাত হেনেছেন সরাসরি। তিনিই পাকিস্তানের রাজনীতিতে আমজনতাকে সম্পৃক্ত করলেন, মূলধারার রাজনীতিকে রাহুমুক্ত করে নিয়ে এলেন জনতার কাতারে। ছয়দফা তাঁর রাজনৈতিক সনদ, ঐক্যবদ্ধ জনতা তাঁর সৈনিক, আর মানুষের সংগ্রামী চেতনা তাঁর এগিয়ে চলার প্রেরণা।

শেখ মুজিবুর রহমান হয়ে উঠলেন বঙ্গবন্ধু, জাতির জনক, স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি। ছয়দফা ঘোষণার পর থেকে একদিকে পাকিস্তানি শাসকচক্রের নির্যাতনে, লাঞ্ছনায় তিনি রাজনৈতিক অঙ্গনের ত্যাগী সাহসী সংগ্রামী নেতার অদ্বিতীয় ভাবমূর্তি অর্জন করেছেন; আর অন্যদিকে এরকম এক নেতাকে সামনে পেয়ে বিভক্ত অলস কলহপ্রবণ এক জাতির বিস্ময়কর বিপ্লবী রূপান্তর ঘটেছিল দ্রুত। তারা এক নেতার পেছনে স্বাধীনতার এক লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল, সকল ভীরুতা ও দোলাচল ঝেড়ে হয়ে উঠেছিল সাহসী এবং দেশ ও জাতির জন্যে আত্মত্যাগের মহৎ প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়েছিল। তাঁর সাতই মার্চের ভাষণ সমগ্র জাতিকে সেদিন দিক-নির্দেশনা দিয়েছিল, এক লক্ষ্যে উজ্জীবিত করেছিল। আর প্রয়োজনে জীবন বাজি রেখে স্বাধীনতার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্বুদ্ধ করেছিল। এ ভাষণ যেন জিয়নকাঠি, একটি সুপ্ত সনাতন জাতিকে ত্যাগী বিপ্লবী জাতিতে রূপান্তরিত করেছিল। এমন ঘটনা বাংলার ইতিহাসে তো বটেই, বিশ্বের ইতিহাসে কি কখনো ঘটেছে? ঘটেনি। তাই বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসে সেরা জাতীয় নেতা তিনি।

তাঁকে ঘিরে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজ থেকে কেন্দ্রীয় ভূমিকায় উঠে এসেছিলেন অনেক নেতা। আওয়ামী লীগ হয়ে ওঠে উঠতি শিক্ষিত বাঙালি আর গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষের নিজের দল। ধর্ম, বর্ণ, অঞ্চল, নারী-পুরুষ সব রকম ভেদাভেদ ভুলে বঙ্গবন্ধুর আওয়ামী লীগ হয়ে ওঠে মুক্তিকামী বাঙালির প্ল্যাটফর্ম। '৬৬ থেকে সৃষ্ট গণজোয়ারের মূল স্রোতস্বিনীর নাম বাঙালি জাতীয়তাবাদ, সবাইকে নিয়ে যে নৌকা তাতে ভেসেছিল তার নাম আওয়ামী লীগ, আর এর কাণ্ডারি ছিলেন মুজিব।

এমন মহৎ মানুষের মন হয় শিশুর মতো সরল, ব্যক্তিত্ব হয় সহজ, চালচলন অনাড়ম্বর। তাঁর ঔদার্যের সুযোগ নিয়েছে চক্রান্তকারী; আর তাঁর নেতৃত্বে বাঙালি ও বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা নিশ্চিত দেখে পরাজিত শত্রুর দল মরিয়া হয়ে উঠেছিল প্রত্যাঘাত হানতে। ১৯৭৫ সালের মধ্য-আগস্টে শত্রু ও চক্রান্তকারীর দল তাঁকে হত্যা করে, শিশু-নারীসহ পুরো পরিবারকে নিশ্চিহ্ন করে থামিয়ে দিতে চেয়েছিল আধুনিক মানবিক বাংলাদেশের জয়যাত্রা। তারপর আধিগ্রস্ত বন্ধুর পথে চলতে হয়েছে দীর্ঘদিন বাংলাদেশকে। পশ্চাৎপদতার বিকার আর অন্ধবিশ্বাসের জঙ্গি আন্দোলনে দিশাহীন হয়ে পড়েছিল মানুষ।

এর মধ্যে বঙ্গবন্ধুর কন্যা তুলে নিলেন পিতার আরব্ধ কাজ। আবারো পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে রাজনীতিকে ষড়যন্ত্র ও ক্ষমতাচক্র থেকে বের করে জনতার জন্যে উন্মুক্ত করার ব্রত নিলেন তিনি। ইতোমধ্যে অবশ্য ষড়যন্ত্রের সাথে যুক্ত হয়েছে জঙ্গিবাদীরা। ২০০১-২০০৬ আমলে বিএনপি-জামাত জোট সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে তারা শক্তিশালী হয়েছে, আঘাত হেনেছে প্রগতিশীল শক্তির ওপর, এমনকি বঙ্গবন্ধু-কন্যা

আধুনিক বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখাচ্ছেন যিনি, সেই শেখ হাসিনার প্রাণনাশের চেষ্টাও হয়েছে। এই বাস্তবতায় বঙ্গবন্ধু-প্রবর্তিত গণমানুষের রাজনীতিকে মূলধারায় রূপান্তরের কাজটি এখন অনেক কঠিন। সেই কঠিন পথেই বঙ্গবন্ধু-কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ দিনবদলের মাধ্যমে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে।

সেই অভিযাত্রায় বঙ্গবন্ধুকে চেনা, তাঁর রাজনীতিকে বোঝার কোনো বিকল্প নেই। আর একাজ শুরু করার ভালো সময় শৈশব, অন্তত মানুষ মুজিবের সাথে পরিচয় শুরু হতে পারে এই সময়ে। সেদিক থেকে ভালো হয়েছে তাঁর জন্মদিনটিকে জাতীয় শিশু দিবস ঘোষণা করা। শিশুরা এই মহান নেতার জন্মদিন পালন করবে আনন্দ-উৎসবে। উৎসবের আনন্দে মেতে উঠে ওরা আঁকবে, গাইবে, আবৃত্তি করবে, মেতে উঠবে আরো নানান সৃজনশীল আনন্দময় কাজে। তারই মধ্যদিয়ে ওরা বঙ্গবন্ধুকে চিনবে, তাঁর জীবনকথা জানবে। সেইসাথে বয়স অনুযায়ী পরিচিত হবে মুক্তিযুদ্ধ এবং বাংলাদেশের ইতিহাসের সাথে; সেই ইতিহাসের অন্যান্য বীর সেনানী ও অগ্রনায়কদের জানবে।

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সুখী, সুন্দর, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ কায়েম করতে হলে নতুন প্রজন্মকে এবং অনাগত দিনের প্রজন্মকে ধর্মীয় সহনশীলতা, উচ্চ মানবতাবোধ, গভীর দেশপ্রেম, আপন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য-চেতনা, বিশ্ববোধ, যুক্তিবাদী মননশীলতা, সমকালীন বিভিন্ন ইস্যু সম্পর্কে সচেতনতা এবং ভবিষ্যৎ ভাবনায় সমৃদ্ধ হতে হবে।

ছোটবেলা থেকে এইসব সমৃদ্ধ ভাব ও চেতনা অনুশীলনের সুযোগ পেলে আজকের শিশুরা আগামী দিনে দেশ গড়ার যথার্থ সৈনিকে পরিণত হবে। তাদের হাতে রূপ পাবে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা, আর বঙ্গবন্ধু-কন্যার ডিজিটাল বাংলাদেশ।

- বঙ্গবন্ধু ইতিহাসে অক্ষয় ধ্রুবতারার মতো অম্লান গরিমায় ভাস্বর হয়ে থাকবেন। বাঙালি জাতিকে পথ দেখাবেন। তাঁর স্বপ্ন বাঙালির অস্তিত্ব। তাঁর স্বপ্ন বাঙালির সমাজ ও সংস্কৃতি। তাঁর সম্ভাবনা বাঙালি জাতি ও তার সভ্যতার নব অভ্যুদয়।

  আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী
  সাংবাদিক, সাহিত্যিক

- শেখ মুজিব হলেন রাজনীতির কবি

  Sheikh Mujib is a Poet of Politics.

  News Week, U.S.A

দু'ফোঁটা চোখের জল

তপন চক্রবর্তী

আমার প্রিয় এক দুষ্ট ছাত্র ছিল। তার নাম হারুন। সে চট্টগ্রাম সিটি কলেজে বি. এসসি. ক্লাশে পড়ত। সময়টা ১৯৬৯ সালের শেষের দিকে। সবে বাংলা মায়ের দামাল ছেলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে অব্যাহতি পেয়ে অভাগিনী মায়ের কাছেই ফিরে এসেছেন। দুঃখিত। ভুল বললাম। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্বৈরাচারী আইয়ুব সরকার আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে অত সহজে বা আপোসে মুক্তি দেয়নি। জনগণের উত্তাল আন্দোলন ও রুদ্ররোষের তাপে তাঁকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল। সে যা-ই হোক।

বলছিলাম হারুন নামের আমার আদরের ছাত্রের কথা। ছেলেটি দেখতে সুন্দর। গায়ের রঙ ফর্সা। লম্বায় মাঝারি গোছের। দুষ্ট বটে সে, কিন্তু খুব মেধাবী ও বুদ্ধিমান। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা, সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তার ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। সে সকলের প্রিয় হারুন ভাই। সে সময় চট্টগ্রাম সিটি কলেজ ছিল ছাত্রলীগের ঘাঁটি। গোটা চট্টগ্রামের ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীরা সিটি কলেজের নেতৃত্বে চলত। চট্টগ্রামের প্রাক্তন শ্রমিক নেতা প্রয়াত জহুর আহমদ চৌধুরী, প্রয়াত সর্বজনশ্রদ্ধেয় আজিজ ভাইসহ অন্য নেতারাও সিটি কলেজের ছাত্রনেতাদের যথেষ্ট গুরুত্ব দিতেন। ১৯৬৯/৭০ (খুব সম্ভবত) সিটি কলেজের সংসদ নির্বাচনে ছাত্রলীগ জয়ী হয়। হারুন সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়। নির্বাচিত হওয়ার পর সংগঠনের কাজে সে বেশি জড়িয়ে পড়ে। ক্লাশ কম করে বা করার সময় পায় না। তবে সে আমার ক্লাশ মিস করত খুব কম।

এই সময় চট্টগ্রাম সিটি কলেজ বেসরকারি ছিল। তিন শিফ্‌টে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হত। সকালে, দিনে ও রাতে। সকালে শুধু মেয়েদের জন্য। দিনে ও রাতে কো-এডুকেশন অর্থাৎ ছেলে-মেয়ে উভয়ের জন্য। ক্লাশে ছাত্র-ছাত্রীরা আলাদা বসত। ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় বিশ হাজার। যে সকল অধ্যাপক দিনের বেলায় পড়াতেন, তাঁদের অনেকেই স্বল্পবেতনে সকালে ও রাতে পড়াতেন। বি. এসসি. ক্লাশে (জীববিজ্ঞানে) ছাত্রসংখ্যা ছিল শ'খানেক। আর মেয়ে দশ-বারো। আজ থেকে প্রায় ৪৩ বছর আগের কথা। স্মৃতি সবসময় আমার প্রতি বিশ্বস্ত থাকে না।

হারুনের গ্রামের বাড়ি কোথায় ছিল মনে পড়ে না। তবে সে যে নিম্নবিত্ত ঘরের সন্তান তা জানতাম। বাবা কৃষিজীবী। তাদের গ্রামটি সমৃদ্ধ ছিল না। তখনো মুসলমান সমাজে পড়াশোনার রেওয়াজ কম ছিল। হারুনের এক শিক্ষিত আত্মীয়ের প্রেরণায় ও পরামর্শে হারুন এতদূর পর্যন্ত পড়তে পারছিল। সম্ভবত তিনি অর্থসাহায্যও করতেন।

হারুন ক্লাশে দ্বিতীয় বা তৃতীয় বেঞ্চে বসত। ধীরস্থির ছিল না। খুব চঞ্চল। কিন্তু তাকে পড়া ধরলে সে সঠিক জবাব দিত। তার মানে, দুষ্টুমি করলেও কানটাকে আমার দিকে মেলে রাখত। কিছুদিন পর সে প্রায়ই ক্লাশ কামাই করতে শুরু করে। ক্লাশে এলেও অমনোযোগী। ইদানীং ছাত্রীদের পাশ ঘেঁষে বসে এবং মেয়েদের উত্ত্যক্ত করে। একদিন বাড়াবাড়ি দেখে তাকে কাছে ডাকি এবং খুব বকাঝকা করি। মেজাজ এমন চড়ে গিয়েছিল, চড়ও মেরে বসি। ছাত্র-ছাত্রী সবাই অবাক। স্যার ডাকসাইটে নেতা হারুনের গায়ে হাত তুললেন! স্যারের না কী দুর্গতি হয়! তখন তো ছাত্রদের দাপটের যুগ। হারুন মাথা নিচু করে সিটে গিয়ে বসে।

ক্লাশের শেষে হারুনের কাছে গিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে

দেখা করতে বলি। সে-ও কিছুক্ষণ পর আমার কক্ষে আসে। হারুনের শার্টের বুক পকেটের বাইরে পিন দিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি সবসময় আঁটা থাকত। আমি তাকে বললাম, "তুমি তোমার নেতাকে ভালোবাসো ও শ্রদ্ধা করো বলে, তুমি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শের সন্তান বলে, তাঁকে বুকে ঠাঁই দিয়েছ। তাহলে তোমার এমন কোনো কাজ করা সঙ্গত হবে না যাতে তাঁর অমর্যাদা হয়। তিনি কী চান? তিনি চান এদেশের মুটে, মজুর, কৃষক, শ্রমিক অর্থাৎ চিরবঞ্চিত, শোষিত, অবহেলিত মানুষের ছেলে-মেয়েরা সোনার ছেলে-মেয়ে হয়ে গড়ে উঠুক। এই দেশটি সোনার দেশে পরিণত হোক। পৃথিবীর বুকে আমাদের দেশ শিক্ষা-দীক্ষা, বিজ্ঞান ও সম্পদে মাথা উঁচু করে দাঁড়াক। দেখো, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আগে নিজেকে গড়েছেন। তারপর তোমাদেরকে, দেশকে গড়ার কাজে আত্মনিবেদন করেছেন।" আমি আরও বললাম, "তোমাকে নিয়ে তোমার মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজনের কত গর্ব, কত আশা। তুমি ছাত্র। তোমার প্রথম কাজ ভালো করে পড়াশোনা ও চরিত্র গঠন করা। আমি দুঃখিত, তোমার মনে কষ্ট দিতে বাধ্য হয়েছি। তোমাকে ভালোবাসার অধিকারে আমি তোমাকে শাসন করা কর্তব্য বিবেচনা করেছি। তোমাকে আহত করেছি। তুমি বুদ্ধিমান ছেলে। আশা করি দেশকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য নিজেকে গড়ে তোলার শপথ নেবে।" কথাগুলো হারুনকে বলতে বলতে আমার গলা ধরে এল, তারও চোখ ভেজা। সে আমায় প্রণাম করে ধীরে ধীরে চলে গেল।

এরপর হারুনের অসাধারণ পরিবর্তন। তার মধ্যে চটুল চপলতা নেই। লেখাপড়ায় সে যথেষ্ট মনোযোগী। গুছিয়ে খুব সুন্দর করে ছাত্র সংসদে বক্তৃতা করে। ছাত্ররাও তাকে খুব ভালোবাসে। তার কারণে কলেজে ছাত্রলীগের সদস্য বেড়ে যায়। পুরো চট্টগ্রামে দলনির্বিশেষে সবাই তাকে চেনে।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে সসম্মানে বেরিয়ে আসার কিছুদিন পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান চট্টগ্রাম সফরে আসেন। সঙ্গত কারণে পার্টি-নেতা ও ছাত্রনেতাদের তৎপরতা বেড়ে যায়। জায়গাটার নাম আমার স্মরণে আসছে না। বঙ্গবন্ধু হাটহাজারি না ফটিকছড়ির দিকে ভাষণদানের জন্য যাচ্ছিলেন। তাঁর পেছনে সারি সারি গাড়িতে যাচ্ছিলেন নেতা-কর্মীরা। দুর্ভাগ্যক্রমে একটি গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। কিছু মানুষ মারা যায়, কিছু মানুষ বেশ আহত হয়।

কলেজে রাতের শিফ্‌টে ক্লাস নেওয়ার সময় মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনার সংবাদ পাই। জানতে পারি আহত ও নিহতের মধ্যে সিটি কলেজের কয়টি ছাত্রও আছে। ওদের চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজে আনা হয়েছে। আমি ক্লাশ ছেড়ে দিয়ে তৎক্ষণাৎ মেডিক্যালে যাই। প্রথমে আহতদের দেখলাম। তাদের মধ্যে পরিচিত কাউকে দেখতে পেলাম না। নিহতের মধ্যে দেখি

এরপর হারুনের
অসাধারণ পরিবর্তন।
তার মধ্যে চটুল চপলতা নেই।
লেখাপড়ায় সে যথেষ্ট মনোযোগী।
গুছিয়ে খুব সুন্দর করে.....
বক্তৃতা করে।

আমার হারুনের নিস্পন্দ দেহ। আমার দু'চোখ বেয়ে জলের ধারা নেমে আসে। আমি লাশের পাশে বসে পড়ি। কিছুক্ষণ পর মেডিক্যাল কলেজে কর্মীদের মধ্যে অসম্ভব তৎপরতা ও গুঞ্জন লক্ষ করি। শুনতে পাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আহত ও নিহতদের দেখতে আসছেন। তিনি সিঁড়ি দিয়ে উঠে প্রথমে আহতদের দেখে পরে নিহতদের দিকে আসেন। হারুনের নাম হয়তো তিনি জানতেন। আওয়ামী লীগ নেতারা হারুনের লাশ দেখিয়ে দেন। বঙ্গবন্ধু হারুনের লাশের পাশে এসে মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দেন। আমি উঠে তাঁকে নমস্কার জানাই। তিনি আমায় জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি হারুনের কে হন?' আমি বললাম, টিচার। এরপর তিনি এক-এক করে সব লাশ দেখে অঝোরে কাঁদতে কাঁদতে সিঁড়ি বেয়ে ধীরে ধীরে নেমে যান।

আমার হারুন মারা গেছে। আমার বুকে স্বজন হারানোর অপার বেদনা। বঙ্গবন্ধুর কাছে ধরতে গেলে এরা পাতি নেতা, সাধারণ মানুষ। 'আল্লার মাল আল্লায়ই নিয়ে গেছেন।' এদের জন্য তাঁর বুকফাটা কান্না দেখে আমি বিস্মিত হই। এ কান্নাতো ক্ষমতালোভী, অর্থলোভী রাজনৈতিক নেতাদের মেকি কান্না নয়। এই কান্না সন্তান হারানো মায়ের কান্না। গোটা দেশ ও মানুষের প্রতি ভালোবাসা ও দরদ না থাকলে এরকম কান্না আসতে পারে না।

আজকের প্রজন্মের শিশু-কিশোরেরা, তোমরা বিশ্বাস করো, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সেই কান্নার আওয়াজ আজো আমার বুকে বাজে। কিন্তু আমরা কি উদার হৃদয়ের মহান এই ক্ষণজন্মা মানুষটির কান্নার প্রতিদান দিতে পারলাম? যেদিন তিনি মোহাম্মদী বেগদের বুলেটের আঘাতে প্রায় সবংশে নিহত হলেন সেদিন আমরা তো তাঁর প্রতি প্রকাশ্যে দু'ফোঁটা চোখের জলে অর্ঘ্য নিবেদন করতে পারিনি! আমাদের এই অপারগতা, ভীরুতা ও অকৃতজ্ঞতা কি ক্ষমার যোগ্য!!

তীর্থভূমি

রশীদ হায়দার

যাঁরা টুঙ্গিপাড়ায় যাননি, তাঁরা অনুমানও করতে পারবেন না, ওটি কতোখানি অজ পাড়াগাঁ। বলা যায়, গ্রামের মধ্যে গ্রাম। সেই গ্রাম থেকে নৌকায় আগে ঢাকা আসতে লাগত তিন থেকে চারদিন। এখন দিনে দিনে যাওয়া যায় ঠিকই। কিন্তু গোপালগঞ্জ-পটুয়াখালি হাইওয়ে থেকে আরো ভেতরে যেতে হয় মাইলখানেক। হাইওয়ের পাশ দিয়ে মধুমতী নদী; যে-নদীর শাখা টুঙ্গিপাড়ার পেট চিরেও প্রবাহিত হচ্ছে। শান্ত, স্নিগ্ধ, গাছপালার সবুজে-সবুজে মাখামাখি এই অজ পাড়াগাঁ থেকে হিমালয়তুল্য একটি মানুষ কি করে বেরিয়ে এলেন, ভাবলে শুধু অবাক নয়, শিহরিত হতে হয়। এই হিমালয়তুল্য মানুষ একটি দেশের স্থপতি হলে, জাতির জনক হন।

টুঙ্গিপাড়ার এই ছেলেটি বাবা শেখ লুৎফর রহমান ও মা সায়েরা খাতুনের 'খোকা' মুজিব; শেখ মুজিব; শেখ মুজিবুর রহমান, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধু সমগ্র জাতির প্রতিভূ। সোনা বা রুপার চামচ মুখে নিয়ে জন্মাননি বঙ্গবন্ধু, অত্যন্ত সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান, গ্রামের আর দশটি ছেলের মতোই গ্রাম ও মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে বড় হয়ে উঠেছেন। নিঃসন্দেহে বলা যায়, গ্রামেই যেহেতু ছিল তাঁর মূল শিকড়, সেজন্যে গ্রামের মানুষেরা ছিল তাঁর বড় বেশি আপন। তাদের সাথে একাত্ম হয়ে যেতে তাঁর বিন্দুমাত্র সময় লাগত না।

গ্রামের আর দশটি ছেলের মতোই তিনি থেকে যেতে পারতেন গ্রামে, বড়জোর আই.এ.-বি.এ. পাশ করে একটা চাকরি, কিংবা ব্যবসা-বাণিজ্য। কিন্তু না, টুঙ্গিপাড়ার সেই লম্বা, সবার ওপরে মাথা তোলা ছেলেটি শুধু প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রি অর্জন করতে চাননি ; তিনি চেয়েছিলেন বাংলার জনগণের অধিকার ; অধিকার থেকে স্বায়ত্তশাসন এবং তা থেকে স্বাধীনতা। বাংলার মানুষের নাড়ির স্পন্দন আরো দুই নেতা– শেরে বাংলা ও মওলানা ভাসানী, কিন্তু সেই স্পন্দনকে যে স্বাধীনতা লাভের আন্দোলনে রূপান্তরিত করা যায় তা তাঁর মতো কেউ সফলভাবে প্রয়োগ করতে পারেননি। জাতীয় নেতাদের সঙ্গে জাতির পিতার পার্থক্য এখানেই। অজ পাড়াগাঁর মুজিবের জীবনের স্তরগুলো দেখলেই বোঝা যাবে, দুঃখকেই তিনি সুখের বিষয় বলে বিবেচনা করেছিলেন। ৫৫ বছরের জীবনে ১১ বছরের বেশি জেল খেটেছেন, পুলিশের হুলিয়া মাথায় নিয়ে গ্রামের পর গ্রাম, জনপদের পর জনপদ চষে বেড়িয়েছেন, গ্রেফতার হলে অনেকটা হাসতে হাসতেই জেলে গেছেন। সবকিছুর মূল লক্ষ্য একটাই– পরাধীনতার নিগড় থেকে বাঙালিকে মুক্ত করা। সফল তিনি হলেন, বিশ্বে আমাদের পরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত করলেন সম্মানের আসনে, কিন্তু আমরা সেই সম্মান ধুলোয় মিশিয়ে দিলাম।

সেই আমরা কারা?

বাংলাভাষী, বাঙালি পরিচয়ে পরিচিত কয়েকজন সেনা কর্মকর্তা কী নির্মম ও নৃশংসভাবে শুধু জাতির জনককেই হত্যা নয়, গোটা পরিবারকে নিঃশেষ করে দিল, বেঁচে রইলেন শুধু দুটি মেয়ে। বেঁচে গেলেন, তখন বিদেশে ছিলেন বলে।

এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে শুধু চক্রান্তকারী কতিপয় সেনা কর্মকর্তা নয়, এর সঙ্গে জড়িত কোনো কোনো আন্তর্জাতিক মহল ও ব্যক্তিও। টুঙ্গিপাড়ার সেই ছেলেটি কী এমন অন্যায় করেছিলেন যে তাঁকে ওইভাবে, সপরিবারে জীবন দিতে হবে? জবাবটি পরিষ্কার। চক্রান্তকারী মহল ১৯৭১ সালের পরাজয় কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি; পরবর্তীকালে তারা কিছু এদেশীয় দোসর জুটিয়েছিল।

অথচ ভাবলে অবাক হতে হয়। সাজানো আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় আইয়ুব তাঁকে ফাঁসিতে ঝোলাতে পারেনি; ১৯৭১ সালে This time he shall not go unpunished বলে হুংকার ছেড়েও ইয়াহিয়া তাঁকে মারতে পারল না, কিন্তু ৭১-এরই বীর যোদ্ধা জাতি আজ কী কলঙ্ক মাথায় বহন করে বেড়াচ্ছে!

কীভাবে হত্যা করা হয়েছিল বঙ্গবন্ধুকে?

টুঙ্গিপাড়ার ছেলেটিকে দেখার জন্য আমি টুঙ্গিপাড়ায় গিয়েছিলাম ১৯৯৫-এর মার্চ মাসে। যাওয়ার উদ্দেশ্য– কোথা থেকে তিনি এলেন, দেখলেন, জয় করলেন এবং মৃত্যুবরণ করে কোথায় কীভাবে শুয়ে আছেন।

দুই.

চিন্তা করেও গিয়েছিলাম বঙ্গবন্ধুর লাশ গোসল, জানাজা, দাফনের কাজে যাঁরা যুক্ত ছিলেন তাঁদের কারো একজনের সঙ্গে কথা বলব। সুযোগটি ঘটিয়ে দিল আমার ছেলেবেলার বন্ধু স্কুলসহপাঠী মীর্জা। বঙ্গবন্ধু-অন্ত-প্রাণ, পুলিশ বিভাগে ছিল, বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে থাকত ছায়ার মতো। বঙ্গবন্ধু নিহত হবার পর জেলও খেটেছে, কিন্তু আদর্শ ও বিশ্বাস থেকে এক চুল নড়েনি। এখন 'বাংলার বাণী'-তে থাকলেও শেখ সেলিমের সঙ্গেই সর্বক্ষণ। জি.টি. স্কুল মাঠেই মীর্জার সঙ্গে দেখা ২২ বছর পর। মীর্জাই শেখ সেলিমের বাড়ির একজনকে পাঠাল বঙ্গবন্ধুর লাশ জানাজা, গোসল ইত্যাদি কাজ করেছে এমন যাকে পাও, সাথে নিয়ে আসবে। একটু পরেই মীর্জা জানাল: রশীদ, তুই যেরকম চাইছিলি, সেইরকম একজনই এসেছেন। তিনি রমার বাপ। আঞ্চলিক উচ্চারণে রমা আসলে রহমান। রমার বাপই আব্দুল মান্নান, তাঁর কাছে জানতে চাইলাম : যা জানেন সব বলুন।

আমার প্রধান লক্ষ্য ছিল যিনি জানাজা পড়িয়েছিলেন তাঁর সঙ্গে কথা বলা। আগেই শুনেছিলাম, ওখানে গিয়েও শুনলাম, তিনি মারা গেছেন বছর দেড়েক আগে। তাঁর নাম শেখ আব্দুল হালিম। টুঙ্গিপাড়া জামে মসজিদের ইমাম। আমার কথার জবাব দিতে গিয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন আব্দুল মান্নান। বুঝতে পারি, সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য বা অভিজ্ঞতার কথা বলতে তাঁর খুব কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু আমি শুনতে চাই, শোনাতে চাই। বঙ্গবন্ধুর জানাজা, দাফন ইত্যাদির বিবরণ এর আগে দু'একটি কাগজে ছাপা হয়েছে, আমি পড়েছি সে বিবরণ; আবার বলি, আমি সেই রকম একজন মানুষের মুখ থেকে শুনতে চাই, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা যাঁর সঞ্চয়।

এক সময় চোখ মোছেন আব্দুল মান্নান। কি বলব বাবা, সে কথা বলতে গেলে বুক ফেটে যায়। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে যান তিনি: ওইদিন আমরা দুপুরের দিকে নদীর ধারে মাটি কাটছিলাম। সকাল থেকেই শুনছি মুজিবকে নাকি মেরে ফেলেছে। যাদের রেডিও আছে, তারা শুনেছে, কিন্তু আমরা শুনি নাই। বিশ্বাস হতে চায় না, মুজিবকে কে মারবে, কেনই বা মারবে। এমন সময় শুনি আকাশে ভটভট শব্দ। হেলিকপ্টারের শব্দ। মুজিব আগে আসত হেলিকপ্টারে, ওই শব্দ আমরা চিনি। শব্দ আস্তে আস্তে কাছে আগায়। দেখি দুইটা হেলিকপ্টার; ওই থানার মাঠে নামল হেলিকপ্টার দুইটা। নামার সাথে সাথে বিশ-পঁচিশ জন মিলিটারি লাফ দিয়ে নেমে মাঠ ঘিরে ফেলল। হেলিকপ্টারের শব্দে গ্রামের অনেক লোক আসতে থাকল, কিন্তু মিলিটারিরা রাইফেল তাক করে সবাইকে দূরে থাকার হুকুম দিয়ে বলল, কাছে এলে গুলি করা হবে। আমরা যারা মাটি কাটছিলাম তাদের কয়েকজনকে ডাকল মিলিটারি। এর মধ্যে হেলিকপ্টার থেকে একটা বড় কাঠের বাক্সের মতো নামাল। আমরা কাছে গেলে হুকুম দিল, "এটা মুজিবের বাড়িতে নিয়ে চল।" মিলিটারির ধমকে সেই কাঠের বাক্স কাঁধে করে নিয়ে এল আব্দুল হাই, নজির মোল্লা, রজব শেখ ও তোতা মিয়া। আমরা তখনও বুঝি নাই এই বাক্সেই আছে আমাদের মুজিবের লাশ। মিলিটারিরা বাড়িতে বাক্স নামানোর সঙ্গে সঙ্গে বলে: "এক্ষুণি গর্ত করে পুঁতে ফেল।"

এর মধ্যে চলে এসেছেন মসজিদের ইমাম সাহেব। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : কি আছে এর মধ্যে?

এক মিলিটারি ধমক মারে: "আপনার অতো জানার দরকার নেই। যা বলা হচ্ছে তাই করেন।"

ইমাম সাহেবের এক কথা: "আগে বলেন, তারপরে।" এর মধ্যে ফোনের মতো যন্ত্র দিয়ে কোথায় যেন কথা বলে মিলিটারি, তারপর বারবার বলে, তাড়াতাড়ি করো। কিন্তু ইমাম সাহেবের এক কথা,

: বলেন, এটা কার লাশ ?

: শেখ মুজিবের।

মিলিটারি বাধ্য হয়ে স্বীকার করার পর ইমাম সাহেব আবার বলেন:

: এটা তো মুসলমানের লাশ, না কি?

: হ্যাঁ।

: জানাজা ছাড়া মুসলমানের লাশ দাফন হয় কী করে?

: না, না, জানাজা-টানাজা চলবে না। এমনিই দাফন করতে হবে।

: লাশের কি গোসল, জানাজা হয়েছে?

মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে মিলিটারিরা। ইমাম সাহেব তখন বলেন, 'তাহলে কি শেখ মুজিব শহীদ?' মিলিটারি সেটাও স্বীকার করে না। রাগে ফেটে পড়েন ইমাম সাহেব– মুসলমানের লাশ, গোসল নেই, শহীদ বলে স্বীকার করবেন না; অসম্ভব, গোসল, জানাজা ছাড়া দাফন করতে দেব না। তখন মিলিটারি আবার ফোনের মতো যন্ত্রে কথা বলে শেষে রাজি হয় কাঠের বাক্স খুলে মুজিবের লাশ গোসল করাতে, জানাজা পড়াতে। এর আগে মিলিটারি আমাদের বলেছিল দশটি কবর খুঁড়তে হবে। কিন্তু ওই ফোনে ঢাকা থেকে হুকুম এল– না, দশটি নয়, একটিই কবর খুঁড়তে হবে।

বঙ্গবন্ধুর লাশ গোসল করিয়েছিলেন আব্দুল মান্নান ছাড়াও ইমানউদ্দিন গাজী, মাতব্বর নুরুল হক ও কেরামত হাজী। আমি আব্দুল মান্নানকে জিজ্ঞেস করেছিলাম: "বঙ্গবন্ধুর শরীরে কোথায় কোথায় গুলি লেগেছিল।"

"বাবারে, সে কথা কওয়া যায় না, সেই বুক দেখা যায় না। গুলিতে বুকের খাবলা মাংস উড়ে গিয়েছিল, পায়ের গোড়ালিতে গুলি লেগে অনেকখানি মাংস ছিল না। সে যে কী দৃশ্য বাবা, না দেখলে বলা যায় না। আমরা একই বয়সের দুই জন, এই গাঁয় দুই জন কত খেলেছি, ঘুরে বেড়িয়েছি, আর মুজিব বড় হয়ে দেশের নেতা হয়েও আমাদের ভোলেনি, ঢাকায়

বঙ্গবন্ধুর ওইসব রক্তাক্ত কাপড় নিয়ে এক দুঃসাহসিক কাজ করেছিলেন আব্দুল মান্নান ।.... সবার অলক্ষ্যে তিনি বাড়ির পেছন দিয়ে, ঝোপ-জঙ্গলের ভেতর দিয়ে পালিয়ে চলে যান ....

তার বাড়িতে গেলে পাশে বসিয়ে জানতে চেয়েছে অমুকের বাপ কেমন আছে, তমুকের মা কেমন আছে, অমুকের অবস্থা এখন কেমন। আসার সময় পকেটে টাকা গুঁজে দিয়েছে, গায়ে হাত রেখে কথা বলেছে, সেই মুজিবের ওই লাশ দেখতে হল, এও কপালে ছিল।

আব্দুল মান্নানের কাছে জানতে চেয়েছিলাম: "গোসল, জানাজা ও দাফনের কথা বলুন।"

আমি যে প্রশ্নই করি, করি তাঁর মুখের দিকে চেয়ে, আমি পড়তে চেষ্টা করি তাঁর মুখের ছবি, মুখ দেখেই অনুমান করতে চেষ্টা করি তাঁর মনের কষ্ট। বলছেন আব্দুল মান্নান,

: হায় রে দেশের রাজা, যে না হলে দেশ স্বাধীন হত না, তাঁকে গোসল করানো হল একটা ৫৭০ কাপড়-কাচা সাবান দিয়ে। কোনো গরম পানি না, গোসল করানো হল পুকুরের পানি দিয়ে।

: কাফনের কাপড় পেয়েছিলেন?

আবার কষ্টের শ্বাস পড়ে আব্দুল মান্নানের: কি যে কন। তখন কোথায় কাফনের কাপড়! মুজিবের মার নামে যে হাসপাতাল, সেই হাসপাতালে মুজিবই কিছু পাড়ওয়ালা নতুন সাদা শাড়ি দিয়েছিল। তার থেকে তিনটি শাড়ি এনে পাড় ছিঁড়ে কাফনের কাপড় বানানো হয়। আড়াইটা শাড়ি লেগেছিল।

জানতে চাই, কফিন খোলার পর বঙ্গবন্ধুকে কি অবস্থায় দেখলেন?

: দেখলাম বিছানার চাদর দিয়ে লাশ জড়ানো। পরনে লুঙ্গি, গায়ে গেঞ্জি, পাঞ্জাবি, পকেটে রুমাল, পাইপ। তামাকের কৌটা। একটা তোয়ালেও ছিল বাক্সে। সবকিছু রক্তে কালো হয়ে গেছে।।

বঙ্গবন্ধুর জানাজায় উপস্থিত ছিলেন বিশ থেকে পঁচিশ জন লোক। ভাবুন, দেশবাসী ভাবুন, স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি, বাঙালির অবিসংবাদিত নেতার জানাজায় মাত্র বিশ থেকে পঁচিশ জন লোক। আমি আব্দুল মান্নানকে জিজ্ঞেস না করলেও অনুমান করি মিলিটারিরা জানাজায় অংশ নেয়নি, কারণ তারা অস্ত্র তাক করে অসংখ্য গ্রামবাসীকে তাড়াতে ব্যস্ত। তাদের মনে কি ভয় ছিল? আব্দুল মান্নানের কথাতেই তো বাঝা গেল তাদের ব্যস্ততা, তাদের ভয়-ভয় ভাব, ঢাকা থেকে অয়ারলেসে তাড়াতাড়ি সারো, তাড়াতাড়ি করো নির্দেশ। অস্ত্র নিষ্ক্রিয় রেখে তারা জানাজায় অংশ নেবে মনে হয় না।

বঙ্গবন্ধুর ওইসব রক্তাক্ত কাপড় নিয়ে এক দুঃসাহসিক কাজ করেছিলেন আব্দুল মান্নান। লাশ দাফন হয়ে যাওয়ার পর সবার অলক্ষ্যে তিনি বাড়ির পেছন দিয়ে, ঝোপ-জঙ্গলের ভেতর দিয়ে পালিয়ে চলে যান নদীর ধারে। বঙ্গবন্ধুর বাড়ির খুব কাছেই মধুমতী নদীর শাখা বইছে, এই নদী থেকেই নৌকায় উঠে বঙ্গবন্ধু গেছেন কতবার, কত জায়গায়। আমি ও কবি আসলাম সানী টুঙ্গিপাড়া থানা ও যেখানে হেলিকপ্টার নেমেছিল সেই মাঠটা দেখার জন্য যাওয়ার সময় কাঠের ব্রিজের ওপর দিয়ে নদী পার হলাম। সেই নদীই বইছে, নদীর দুই পাশে সবুজ শ্যামল প্রকৃতির সব কিছু আছে, নদী ও প্রকৃতির সঙ্গে মিশে যে মানুষটি বাংলার স্রষ্টা হয়ে উঠলেন, সেই মানুষটির ওই পরিণতি। আব্দুল মান্নান কাপড়ের রক্ত ধুয়ে নিয়ে গেলেন নিজের বাড়িতে। রাতেই ঘটল এক অভাবনীয় ঘটনা। বলছেন আব্দুল মান্নান,

: রাতে দেখি সারা ঘরে লাল পিঁপড়ে। ঘরের চালের যে কোনায় কাপড় লুকিয়ে রেখেছিলাম, সেখানে হাজার হাজার পিঁপড়ে। আমার বিছানায়, কাপড় ধোয়ার সময় যে লুঙ্গি পরনে ছিল, সেটাতেও পিঁপড়ে আর পিঁপড়ে। তখন কি করি? এর মধ্যে খবর পেয়েছি আমাকে খোঁজাখুঁজি শুরু হয়েছে। ওই কাপড়-চোপড়ের জন্যেই। ওই রাতেই একটা ৫৭০ সাবান যোগাড় করে সব কাপড় আবার কাচলাম। শুকানোর পর খুব গোপনে রেখে দিয়ে, এক সময় একজনের হাতে মুজিবের ছোট মেয়ে রেহানার কাছে লন্ডনে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম।

এত বড় একটা ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করার পরও আব্দুল মান্নানের একটা দুঃখ আছে। বঙ্গবন্ধুর রক্তাক্ত কাপড়-চোপড় নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় গেঞ্জিটা পড়ে গিয়েছিল। আর পাননি। শেখ রেহানার কাছে পাঠানো কাপড়-চোপড়ই এখন বঙ্গবন্ধু মিউজিয়ামে রয়েছে। টুঙ্গিপাড়া যে থানার কথা বলেছি সেই থানার দোতলায়, বঙ্গবন্ধু বাড়ি এলে, মাঝে মাঝে বিশ্রাম নিতেন। দোতলায় উঠেছিলাম। সামান্যতম নিরাপত্তাও আছে বলে মনে হল না। ব্যক্তিগত নিরাপত্তার কথা সামান্যই চিন্তা করতেন বঙ্গবন্ধু। করলে বঙ্গভবন, গণভবন ছেড়ে নিজ ভবনে থাকতেন? অন্য জায়গায় থাকলে ঘাতকরা সফল হত না।

টুঙ্গিপাড়ার এই ছেলেটির কবরের ওপর কোনো ছাদ নেই ; আকাশই ছাদ হয়ে ছেয়ে আছে আকাশেরই মতো বিশাল ও উদার-হৃদয়ের মানুষটিকে। ওই 'পাড়া' এখন বাঙালির তীর্থস্থান।

এক মহান নেতা

এম নজরুল ইসলাম

বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম না হলে বাংলাদেশের জন্ম হত না, অথচ বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রামে বঙ্গবন্ধুর গৌরবজনক নেতৃত্বকে কিছু মানুষ অন্যরকম ব্যাখ্যা করেন। তাঁরা সাধারণত বলে থাকেন, এ ব্যাপারে তাঁর তেমন কোনো অবদান নেই। এদের মধ্যে পাকিস্তানপন্থী মহল দাবি করে, তিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি। অনেকের দাবি, স্বাধীন বাংলাদেশের অর্থনীতি, পররাষ্ট্রনীতি, প্রতিরক্ষানীতি এবং রাষ্ট্রীয় মূলনীতি সম্পর্কে তাঁর কোনো ধারণাই ছিল না। পাকিস্তানিদের হাতে বন্দি হওয়ার আগে এ সম্পর্কে কোনো নির্দেশও তিনি দিয়ে যাননি। তাদের বক্তব্য, বাংলাদেশের স্বাধীনতা তাঁর কাম্য ছিল না। যেন ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ঘটনাচক্রে ৯৩ হাজার পাকিস্তানি সৈন্য ভারত ও বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধাদের যৌথ কমান্ডের কাছে আত্মসমর্পণ করে। পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি লন্ডনে পৌঁছান। সেদিন সন্ধ্যাবেলা তিনি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হীথের সঙ্গে এক সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন। ঐদিন তাঁদের উভয়ের মধ্যে আলাপ-আলোচনার বিষয়বস্তু সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকারের গোপন নথিপত্র ২০০২ সালে উন্মুক্ত করা হয়। সেই দলিলপত্রে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের মূলনীতি ছাড়াও অর্থ, পররাষ্ট্র এবং প্রতিরক্ষা নীতির কথা পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয়। উল্লিখিত নীতিসমূহ ব্যাখ্যা করে বঙ্গবন্ধু বলেন, তাঁর সরকার সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিকতাবাদ ও বর্ণবাদ প্রতিহত করার নীতিতে অটল থাকবে। (সুত্রঃ 'বাঙালির মুক্তিযুদ্ধঃ ব্রিটিশ দলিলপত্র'-এর পৃ. ২৪৬)।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, পাকিস্তানি সৈন্যরা তাঁকে গ্রেফতার করার আগেই তিনি ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ রাষ্ট্রের মূলনীতি ও আনুষঙ্গিক বিষয়ে তাঁর নিকটতম সহকর্মীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টোর ধারণা ছিল, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দিয়ে দ্বিখণ্ডিত হয়ে যাওয়া পাকিস্তানকে জোড়া লাগানোর শর্তে তাঁকে রাজি করাতে পারবেন। কিন্তু পাকিস্তানি কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার পর ১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি লন্ডনে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হীথের সঙ্গে আলোচনাকালে এবং ঢাকায় ফিরে ১০ জানুয়ারি সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানে অনুষ্ঠিত লক্ষ মানুষের অভ্যর্থনা-অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুর একই বক্তব্যঃ পাকিস্তানের সঙ্গে আর কোনোপ্রকার মিলন নয়, সম্পর্ক নয়; দুনিয়ার অন্যসব স্বাধীন রাষ্ট্রের সঙ্গে স্বাধীন বাংলাদেশের যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকবে, পাকিস্তানের সঙ্গেও সে ধরনের সম্পর্ক থাকবে।

বঙ্গবন্ধু ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার পর তাঁকে বন্দি করে তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়। করাচি বিমানবন্দরের নিরাপত্তা পুলিশের প্রহরাধীন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একটি ছবি ১৯৭১ সালের ২৬ এপ্রিল আমেরিকান 'নিউজউইক' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পাকিস্তান থেকে মুক্ত হয়ে তিনি ১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি সকাল সাড়ে ছ'টায় হীথরো বিমানবন্দরে পৌঁছান। ঐদিন সন্ধ্যায় ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিটে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হীথ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সঙ্গে এক ঘণ্টার বেশি সময় আলোচনা করেন। অত্যন্ত অনাড়ম্বর ও আন্তরিকতাপূর্ণ পরিবেশে এই আলোচনায় বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ছিলেন ড. কামাল হোসেন। এই বৈঠকের পর বিরোধী লেবার পার্টির নেতা হ্যারল্ড উইলসন 'ক্ল্যারিজেস' হোটেলে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। বঙ্গবন্ধু বন্দি ও নিঃসঙ্গ অবস্থায় থাকাকালে তাঁর ব্যাপারে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী যে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন সেজন্য প্রথমেই তাঁকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

বঙ্গবন্ধু তাঁর মুক্তির ব্যাপারে বলতে গিয়ে বলেন, যেদিন সন্ধ্যায় জানা গেল যে, পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তান সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণ করেছে, সেদিনই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান তাঁকে ফাঁসিতে ঝোলানোর আদেশ দেন। মিয়াঁওয়ালি জেলখানার জনৈক অফিসার বঙ্গবন্ধুর প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তাঁকে গোপনে জেলখানার ভেতরে নিজ বাসায় নিয়ে দু'দিন লুকিয়ে রাখেন। এরপর অফিসার আবার তাঁকে একটি আবাসিক কলোনিতে সরিয়ে নিয়ে সেখানে ছ'দিন রাখেন। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হিসেবে জুলফিকার আলী ভুট্টো ১৯৭১ সালের ২০ ডিসেম্বরে ক্ষমতা গ্রহণের পর জেনারেল ইয়াহিয়া শেখ মুজিবকে ফাঁসি দেওয়ার জন্য তাঁকে অনুরোধ করে বলেন, পেছনের তারিখ দিয়ে প্রেসিডেন্টের (অর্থাৎ ইয়াহিয়ার) স্বাক্ষর করা একটি ফাঁসির আদেশ দিয়ে এর দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করবেন।

বঙ্গবন্ধুকে মুক্তিদানের অব্যবহিত পূর্বে ভুট্টো তাঁকে পৃথক হয়ে যাওয়া দু'টো অংশের মধ্যে একটি শিথিল ফেডারেশনের কথা বলেন। জবাবে বঙ্গবন্ধু ভুট্টোকে বলেন, এর আর কোনো সম্ভাবনা নেই। এছাড়া একজন বন্দি হিসেবে কোনোপ্রকার রাজনৈতিক আলোচনা করতে তিনি অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দিতে রাজি হলে তিনি ভুট্টোকে বলেন, তাঁকে সরাসরি ঢাকায় পাঠাতে অথবা রেডক্রস অথবা জাতিসংঘের হাতে তুলে দিতে। ভুট্টো এটা মেনে নিতে রাজি ছিলেন না। তিনি চেয়েছিলেন বঙ্গবন্ধুকে তেহরান পাঠাতে। কিন্তু বঙ্গবন্ধু রাজি হননি; তিনি লন্ডনে যাওয়ার ব্যাপারে দৃঢ় সঙ্কল্প প্রকাশ করেন।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় সেনাবাহিনী সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা জানতে চাইলে তিনি বলেন, দিল্লিতে পৌঁছেই তিনি বিষয়টি সম্পর্কে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে আলোচনা করবেন। ঢাকা পৌঁছেই তিনি সৈন্য ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য সরকারিভাবে অনুরোধ জানাবেন এবং পর্যায়ক্রমে তাদের প্রত্যাহারের জন্য কর্মসূচি প্রণয়নের প্রস্তাব করবেন।

বাংলাদেশের নিজস্ব সেনাবাহিনী প্রশ্নে বঙ্গবন্ধু বলেন, দেশের দুর্লভ সম্পদ অনুৎপাদনশীল খাতে তিনি ব্যয় করতে চান না। বাংলাদেশকে তিনি প্রাচ্যের সুইজারল্যান্ডের মতো করে গড়তে চান, যার কেবল ছোট একটি সেনা ও পুলিশ বাহিনী থাকবে।

পশ্চিম পাকিস্তানি বন্দিদের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথ জানতে চাইলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, পাকিস্তানে অবস্থানরত বাঙালিরা দেশে ফেরার জন্য উদগ্রীব। এই সমস্যার সমাধানে তিনি বাংলাদেশ, পশ্চিম পাকিস্তান ও ভারত– এই তিনটি দেশের মধ্যে আলোচনার কথা বলেন।

পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কের প্রশ্নে শেখ মুজিব জোর দিয়ে বলেন, কোনো প্রকার রাজনৈতিক সম্পর্ক একেবারেই অসম্ভব এবং সেরকম কিছু হলে বাংলাদেশে আরেকটি গেরিলা যুদ্ধ শুরু হবে। বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র; পশ্চিম পাকিস্তানসহ সকল স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের সঙ্গে তিনি বন্ধুত্ব বজায় রাখতে আগ্রহী। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বলেন, অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য দু'টি প্রতিনিধি দল শিগগিরই বাংলাদেশে পাঠাবেন। বঙ্গবন্ধু নিশ্চয়তা দেন যে, যখনই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়া হবে তখনই তিনি বাণিজ্যসহ অন্য সকল বিষয়ে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। এই স্বীকৃতির পরেই তিনি কমনওয়েলথের সদস্যপদ লাভের আশা করেন। বাংলাদেশে যে অমানবিক ধ্বংসকাণ্ড ঘটেছে, তা থেকে উত্তরণের জন্য সাহায্য সংগ্রহের ব্যাপারে ব্রিটেনের স্বীকৃতি প্রয়োজন। তিনি দুনিয়ার সকল দেশের কাছে সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন এবং যে যা দেবেন তাই গ্রহণ করবেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন। এডওয়ার্ড হীথ বলেন, ইতোমধ্যে ব্রিটিশ সাহায্য হিসেবে দশ লক্ষ পাউন্ড জাতিসংঘের মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে এবং 'হার ম্যাজেস্টিস' সরকার কারিগরি সাহায্যের অনুরোধও বিবেচনা করে দেখছে।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী জানতে চান, পাকিস্তানের বিদেশি দেনার কিছু অংশের দায়িত্ব বাংলাদেশ নিতে প্রস্তুত কিনা। জবাবে বঙ্গবন্ধু বলেন, বাংলাদেশের জন্য যা ব্যয় করা হয়েছে তার দায়িত্ব নিতে তিনি প্রস্তুত। পূর্ব ও পশ্চিমের জন্য কতো ব্যয় হয়েছে তার হিসেব করার জন্য যদি ব্রিটেন সালিশ নিয়োগ করে, তাহলে সেই হিসেবমতো তার অংশ তিনি দেবেন। অন্য কোনো উপায়ে সমাধান করলেও তা মেনে নেবেন বলে তিনি জানান। বঙ্গবন্ধু ব্রিটেন ও ইরান থেকে একজন করে মোট দুই জন সালিশ নিয়োগ করার প্রস্তাব দেন। এতে যদি পশ্চিম পাকিস্তান দায় মেনে না নেয়, সেক্ষেত্রে তিনি সারা পাকিস্তানের দায় শোধের দায়িত্ব অস্বীকার করবেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বলেন, পাকিস্তানের বিষয়ে যেকোনো একক সিদ্ধান্ত গ্রহণের আইনগত ও নৈতিক অধিকার তাঁর আছে, কারণ তাঁর দল সাধারণ নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছিল।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সীমাহীন দূরদৃষ্টির অধিকারী ছিলেন। ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করেই ১৯৬২ সালে তিনি (বঙ্গবন্ধু) ভারতে গিয়েছিলেন। লক্ষ্য, ভারতের সাহায্য নিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন। আজকে এ সত্য প্রতিষ্ঠিত যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ঐ গোপন ভারত সফর এবং পূর্ব পাকিস্তানের ক'জন সামরিক ও বেসামরিক বাঙালি কর্মকর্তাকে

নিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের গোপন পরিকল্পনার ভিত্তিতেই সাজানো হয়েছিল আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা।

পাকিস্তানের জেল থেকে মুক্তি পেয়ে ৮ জানুয়ারি (১৯৭২) ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হীথের সাথে বঙ্গবন্ধুর দীর্ঘ আলোচনার বিষয়গুলোর দিকে দৃষ্টি দিলে পরিষ্কার হয়ে যায়, তিনি দেশ পরিচালনার সার্বিক পরিকল্পনা করেছিলেন স্বাধীনতা লাভের অনেক আগেই।

এতসব তথ্য-প্রমাণ থাকার পরও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের চিন্তা-চেতনা, দূরদর্শিতা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে যারা প্রশ্ন তোলেন, নিঃসন্দেহে তারা স্বাধীনতা-বিরোধী, হীন মানসিকতাসম্পন্ন ও বিকারগ্রস্ত মানুষ।

১৯৭২ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশ সরকার স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। পাকিস্তান ও মার্কিন বাধা উপেক্ষা করে ব্রিটেনের প্রচেষ্টায় ১৯৭২ সালের ১৮ এপ্রিল বাংলাদেশ কমনওয়েলথ সদস্যপদ লাভ করে। কেবল চীন ও সৌদি আরব ছাড়া ১৯৭২ সালেই বিশ্বের প্রায় সবগুলো দেশ স্বীকৃতি দেয় বাংলাদেশকে। বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পর চীন ও সৌদি আরব বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হীথ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে বাংলাদেশকে ব্রিটেনের স্বীকৃতিদানের বার্তাটি ঐ দিনই (১৯৭২ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি) জরুরিভাবে টেলিগ্রাম করে পাঠান। বার্তাটি ছিল নিম্নরূপ:

"আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে 'ইওর এক্সেলেন্সি', এই মর্মে জানাচ্ছি যে, 'হার ম্যাজেস্টিস' সরকার আপনার সরকার ও বাংলাদেশকে আজ স্বীকৃতি দিচ্ছে। অনুগ্রহ করে আপনি আমার ব্যক্তিগত অভিবাদন গ্রহণ করুন এবং গত ৩১ জানুয়ারি 'ইওর এক্সেলেন্সির' পাঠানো বার্তার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমাদের দু'দেশের জনগণের মধ্যে ইতোমধ্যেই স্থাপিত সুসম্পর্ককে আরো শক্তিশালী করার জন্য আপনার সঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আশাবাদ ব্যক্ত করছি। আমি নিশ্চিত যে, আপনার সরকার উপমহাদেশের অন্যান্য দেশের সঙ্গে শান্তি ও সুসম্পর্ক বজায় রাখার জন্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এ বিষয়ে আমি আপনাকে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দিতে পারি।" (সূত্র: 'বাঙ্গালির মুক্তিযুদ্ধ : ব্রিটিশ দলিলপত্র'-এর পৃ. ২৪৪)।

১৯৭২ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হীথকে একটি চিঠি লেখেন। তা ছিল নিম্নরূপ: "এক্সেলেন্সি, গতকাল প্রাপ্ত 'হার ম্যাজেস্টিস' সরকার কর্তৃক আমার সরকার ও বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি প্রদানের বার্তাটি আমি আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করছি।

"পাকিস্তানের বন্দীদশা থেকে মুক্তি পেয়ে ফিরে আসার পথে লন্ডনে আপনার সঙ্গে আলোচনার কথা আনন্দের সঙ্গে আমার মনে পড়ছে। একথা জেনে অত্যন্ত আনন্দ বোধ করছি যে, 'হার ম্যাজেস্টিস' সরকার নিজেই শুধু বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়া নয়, অন্যান্য বন্ধু-রাষ্ট্রকে বাংলাদেশকে পূর্ণ স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ হিসেবে স্বীকৃতিদানেও উদ্বুদ্ধ করছে। প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী এবং আমার অন্যান্য সহকর্মীরা আমাকে জানিয়েছেন যে, স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় যুক্তরাজ্য আমাদের বহু নাগরিককে আশ্রয় দিয়েছে। সর্বস্তরের ব্রিটিশ জনগণের কাছ থেকে যে মানবিক সমর্থন তাঁরা লাভ করেছিলেন, সে বিষয়েও তাঁরা আমাকে অবগত করেছেন। আজীবন এই দানের কথা আমি, সহকর্মীরা ও জনগণ স্মরণ রাখব।"

"এখন আমার সরকারের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশে প্রকৃত জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে একটি শক্তিশালী সমাজ গঠন করা। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আমার সরকার জোট-নিরপেক্ষ নীতি মেনে চলবে। সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিকতাবাদ ও বর্ণবাদ প্রতিহত করার নীতিতে অটল থাকবে। আমার সরকার জাতিসংঘ সনদ মেনে চলবে এবং সার্বভৌম, সাম্য, অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা, আন্তর্জাতিক সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান, একে অন্যের সার্বভৌমত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও সীমান্তগত স্বকীয়তার ভিত্তিতে বিশ্বের সকল দেশের সরকারের সঙ্গে আমার সরকার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নে প্রস্তুত থাকবে।"

"উপরোক্ত নীতি ও কর্মপদ্ধতির ভিত্তিতে আমার সরকার ও জনগণ 'হার ম্যাজেস্টিস' সরকারের সঙ্গে গভীর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী। কমনওয়েলথ-এর মতো বহুজাতিক সংস্থার সদস্য হতেও আমার দেশ আশাবাদী।"

"আমি আন্তরিকভাবে আশা করি, উপমহাদেশে শান্তি ও স্থিতি বজায় থাকবে। এটা অর্জনে এই অঞ্চলের সঙ্গে ঐতিহাসিক বন্ধনে আবদ্ধ গ্রেট ব্রিটেনের সর্বাত্মক সহযোগিতা আমাকে আনন্দ দেবে। প্রতিবেশীদের মধ্যে অজ্ঞানতাপ্রসূত সংঘর্ষের অবসান ঘটানোর সময় এসেছে। আমাদের জনগণের জীবন-মানের উন্নয়নে আমাদের জাতীয় সম্পদ ব্যবহারের সুযোগ দিন। এই অঞ্চলের সকল রাষ্ট্রের মধ্যে শান্তি ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে আমাদের সবসময় পাশে পাবেন।

"আমার সরকার ও জনগণ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, আমাদের এই বিশাল পুনর্গঠন ও পুনর্বাসন কাজে গ্রেট ব্রিটেনের সরকার ও জনগণ আমাদের পাশে এসে দাঁড়াবেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আপনি আমার ব্যক্তিগত ও উষ্ণ শুভেচ্ছা গ্রহণ

করুন।" (সূত্র : 'বাঙ্গালির মুক্তিযুদ্ধ: ব্রিটিশ দলিলপত্র'-এর পৃ. ২৪৫-৪৬)।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বাঙালির ভাষা, সংস্কৃতি ও স্বাধীনতার লক্ষ্যে দীর্ঘ ২৩ বছর ধরে পাকিস্তানি শাসকদের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। সেই গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে রূপান্তর করেন। ১৯৭১-এ মুক্তিসংগ্রামের চূড়ান্ত পর্বে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ মন্ত্রের মতোই বাঙালি জাতিকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রায় খালিহাতে লড়াইয়ে নামতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তিনি বাঙালির সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবায়িত করেছেন।

বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে কোনো আন্দোলন থেমে থাকেনি, বা তাঁর নেতৃত্ব ছোট হয়ে যায়নি। স্বাধীনতা আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে ব্যক্তি মুজিব সশরীরে উপস্থিত না থাকা সত্ত্বেও তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করে মুজিবনগর সরকার। সেভাবেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব-নির্দেশিত পথে মাত্র ন' মাসে চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়।

বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের মহানায়ক জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তান থেকে মুক্ত হয়ে তাঁর ক্যারিশমাটিক নেতৃত্বগুণে বিশ্ববাসীর কাছ থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্বীকৃতি আদায় করেন। বিধ্বস্ত দেশ গঠনের কাজে হাত দেন। যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশে পরিত্যক্ত মিল-কারখানা, যোগাযোগ ব্যবস্থাসহ সকল অবকাঠামো ধ্বংসপ্রাপ্ত, সরকারকে ব্যতিব্যস্ত রাখার উদ্দেশ্যে স্বাধীনতাবিরোধী শক্তির নাশকতামূলক কার্যকলাপ, বিশ্ব-বাজারে তেলের মূল্য বৃদ্ধি ও মুদ্রাস্ফীতি, '৭৪-এ উপর্যুপরি বন্যা এবং দুর্ভিক্ষ বঙ্গবন্ধু সরকারের সামনে সমস্যার পাহাড় হয়ে দেখা দেয়। দৃঢ় হস্তেই বঙ্গবন্ধু সকল সমস্যা ও সংকটের মোকাবিলা করেন। সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হতে থাকে। ধীরে ধীরে প্রত্যাশা-পিয়াসী মানুষ নতুন উদ্দীপনায় বাঁচার স্বপ্ন দেখে। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে দেশকে গড়ে তুলতে ছাত্র-শ্রমিক-কৃষক-জনতা সকলেই তৎপর, ঠিক সেই সময় '৭৫-এর ১৫ আগস্ট রাতের আঁধারে স্বাধীনতা যুদ্ধে পরাজিতরা তাদের বিদেশি প্রভুদের সহায়তায় ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ বঙ্গবন্ধুর জীবন-প্রদীপ নিভিয়ে দিল।

১৯৭৫-এর ১৬ আগস্ট প্যারিসের বিখ্যাত পত্রিকা 'লা মঁদ'-এর প্রথম পাতায় ফ্রান্সের প্রথিতযশা লেখক রবার্ট এসকারপির একটি মন্তব্য ছাপা হয়। তাতে লেখক বলেন, "বড় নেতা তিনি যিনি সময়ের সঙ্গে আরও বড় হতে থাকেন। তাঁকে খুন করে সমাজ থেকে নির্বাসিত করা যায় না। তিনি বারেবারে ফিরে আসেন। সদ্যপ্রয়াত শেখ মুজিবুর রহমান সেই মাপের নেতা।"

আন্তর্জাতিক জুলিও কুরি পুরস্কার দেওয়ার সময় যখন তাঁকে 'বঙ্গবন্ধু' নয় 'বিশ্ববন্ধু' বলে অভিহিত করা হয়েছিল, তখন তিনি সবিনয়ে বলেছিলেন, "আমি বিশ্বের নিপীড়িত মানুষের অবশ্যই বন্ধু, কিন্তু আমাকে বঙ্গবন্ধুই থাকতে দিন। আমি জীবনে-মরণে একজন খাঁটি বাঙালি থাকতে চাই। বাঙালির যে হাজার বছরের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ঐতিহ্য, সেই শাশ্বত ঐতিহ্যকে আমি রাষ্ট্রে রূপ দিতে চেয়েছি। এই বাংলার রূপকার হওয়ার চাইতে অন্য কোনো বড় পরিচয় আমার দরকার নেই।" আসলে এসব কারণে বাঙালি জাতির অস্তিত্বে, ভালোবাসায় বঙ্গবন্ধু থাকবেন অবিনশ্বর হয়ে। তিনি সমহিমায় বেঁচে রয়েছেন বাঙালির আত্মায়।

গণতান্ত্রিক বিশ্ব বারবার উল্লেখ করেছে যে, সত্যিই শেখ মুজিবের কোনো বিকল্প নেই, যাঁর কথায় একটি জাতি সর্বাত্মকভাবে উদ্বেলিত হয়।

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পরপরই খ্যাতনামা 'নিউজউইক' ম্যাগাজিন বঙ্গবন্ধুকে 'পোয়েট অব পলিটিক্স' অভিধায় আখ্যায়িত করে। ব্রিটিশ সাংবাদিক সিরিল ডান বলেন, "বাংলাদেশের এক হাজার বছরের ইতিহাসে শেখ মুজিবরই একমাত্র নেতা যিনি রক্তে, বর্ণে, ভাষায়, সংস্কৃতিতে ও জন্মসূত্রে পুরোদস্তুর বাঙালি। তাঁর শারীরিক গঠন ছিল তেজোদ্দীপ্ত, কণ্ঠ ছিল বজ্র-নির্ঘোষ। তাঁর মন্ত্রমুগ্ধ ক্যারিশমায় জনগণ মোহাবিষ্ট হয়েছে।"

ব্রিটিশ মানবতাবাদী নেতা প্রয়াত লর্ড (ফেনার) ব্রকওয়ে মন্তব্য করেছিলেন, "শেখ মুজিব এক অর্থে জর্জ ওয়াশিংটন, মহাত্মা গান্ধী ও দ্যা ভ্যালেরার চেয়েও মহান নেতা।"

১৯৭৩ সালে আলজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনে কিউবার প্রেসিডেন্ট ফিদেল ক্যাস্ট্রো বঙ্গবন্ধুকে গভীরভাবে আলিঙ্গন করে বলেছিলেন, "আমি হিমালয় পর্বত দেখিনি, কিন্তু শেখ মুজিবকে দেখেছি।"

উপমহাদেশের প্রখ্যাত সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায় যথার্থই বলেছেন:

"যত দিন রবে পদ্মা, যমুনা
গৌরী মেঘনা বহমান
ততদিন রবে কীর্তি তোমার
শেখ মুজিবুর রহমান।"

জিজ্ঞাসা বঙ্গবন্ধুর
কেমন আছো আমার বাংলাদেশ

আখতার হুসেন

কেমন আছো বাংলার মাঠঘাট
কেমন আছো সবুজ দূর্বা ঘাস
কেমন আছো গ্রামগঞ্জের হাট
কেমন আছো বাংলার ঋতু, মাস?

কেমন আছো শিমুল, পলাশ ফুল
কেমন আছো রজনীগন্ধা, চাঁপা
কেমন আছো জুঁই, চামেলি, বকুল
কেমন আছো পদ্ম ঢেউয়ে কাঁপা?

কেমন আছো সকাল-সন্ধ্যাবেলা
কেমন আছো মোহন বাঁশির সুর
কেমন আছো দিগন্ত বাহু-মেলা
কেমন আছো হাতছানি-দেয়া দূর?

কেমন আছো বেতস বনের ঝাড়
কেমন আছো খালবিল, ডোবা, ঝিল
কেমন আছো পিছল পুকুর পাড়
কেমন আছো ইলিশেরা ঝিলমিল?

কেমন আছো বাংলার বুলবুলি
কেমন আছো সাঁকো আর সেতুগুলো
কেমন আছো একতারা আর ঢুলি
কেমন আছো মাটির শানকি, চুলো?

কেমন আছো গাঁয়ের বধূ ও মাতা
কেমন আছো ঢেঁকি আর কুলো, ধামা
কেমন আছো রোদ-বাদলের ছাতা
কেমন আছো লুঙ্গি, গামছা, জামা?



কেমন আছো দুধ, কলা, দই, সর
কেমন আছো নলেন গুড় ও পিঠা
কেমন আছো শণের ছাওয়া ঘর
কেমন আছো মাগুর, কই ও রিঠা?

কেমন আছো শ্যামা ও দোয়েল, কাক
কেমন আছো সুরের রানি কোকিল
কেমন আছো শালিক পাখির ঝাঁক
কেমন আছো সোনালি ডানার চিল?

কেমন আছো ফিঙ্গে ও কবুতর
কেমন আছো বাবুই পাখির বাসা
কেমন আছো ডাহুকের মিঠে স্বর
কেমন আছো বেড়ালের ভালোবাসা?

কেমন আছো মণ্ডা, ছানা, পায়েস
কেমন আছো গোল্লা ও পানতোয়া
কেমন আছো রাব্‌ড়ি ও সন্দেশ
কেমন আছো চিড়ে, মুড়ি, খই, মোয়া?

কেমন আছো তেঁতুল, কাঁঠাল, জাম
কেমন আছো কামরাঙ্গা, মেওয়া ফল
কেমন আছো ল্যাংড়া, ফজলি আম
কেমন আছো দিঘির স্বচ্ছ জল?

কেমন আছো পালতোলা সব নাও
কেমন আছো মাদ্রাসা, পাঠশালা
কেমন আছো শান্ত, গঞ্জ-গাঁও
কেমন আছো কুঁড়েঘর চারচালা?

কেমন আছো মসজিদ, মন্দির
কেমন আছো গির্জা এবং মঠ
কেমন আছো পাখিদের যতো নীড়
কেমন আছো মাটির কলস, পট?



কেমন আছো কামার-কুমোর পাড়া
কেমন আছো পটুয়ার আল্পনা
কেমন আছো পাটের, ধানের চারা
কেমন আছো ভোরের শিশিরকণা?

কেমন আছো গোয়ালন্দের ঘাট
কেমন আছো দূরপাল্লার মাঝি
কেমন আছো হাটের দোকানপাট
কেমন আছো পানের বাটা ও সাজি?

কেমন আছো পদ্মা ও মধুমতী
কেমন আছো বাইগার, আড়িয়াল
কেমন আছো যমুনা স্রোতস্বতী
কেমন আছো চলন বিল ও খাল?

কেমন আছো দাড়িয়াবান্দা খেলা
কেমন আছো ডুব সাঁতারের জল
কেমন আছো গোল্লাছুটের মেলা
কেমন আছো দুর্দম ফুটবল?

কেমন আছো ফুলেল শিশুর ঝাঁক
কেমন আছো ফুলের বাগান যত
কেমন আছো মধুময় মৌচাক
কেমন আছো সাধু, সন্তের ব্রত?

কেমন আছো পাহাড় ও পর্বত
কেমন আছো সেগুন ও সুন্দরী
কেমন আছো রাঙ্গামাটির পথ
কেমন আছো গল্পকথার পরী?

কেমন আছো রঙিন নকশিকাঁথা
কেমন আছো পুথিপাঠের আসর
কেমন আছো লালনের গান, গাথা
কেমন আছো দোতারার পূত স্বর?

কেমন আছো বেহালা ও করতাল
কেমন আছো সাগর ও সৈকত
কেমন আছো ঝিনুক আর প্রবাল
কেমন আছো রুপোলি, সোনালি নথ?

কেমন আছো নজরুল, ভাটিয়ালি
কেমন আছো রবি ঠাকুরের গান
কেমন আছো কবিতার করতালি
কেমন আছো নূপুরের ঐকতান

কেমন আছো চিত্রী, চিত্রকর
কেমন আছো ক্যানভাস, রং-তুলি
কেমন আছো বাংলার প্রান্তর
কেমন আছো বক্তৃতা, বাঁধা-বুলি?

কেমন আছো সৌম্য সাম্যবাদ
কেমন আছো ধর্মের অনুসারী
কেমন আছো গরিবের যতো সাধ
কেমন আছো গাছের শেকড়, নাড়ি?

কেমন আছো মজদুর আর চাষী
কেমন আছো কেরানি, কর্মচারী
কেমন আছো লাঙল-ফলার হাসি
কেমন আছো খেজুর রসের হাঁড়ি?

কেমন আছো মত্ত দার্শনিক
কেমন আছো ধার-করা দর্শন
কেমন আছো দিগন্ত দশদিক
কেমন আছো বাংলার বর্ষণ?

কেমন আছো তুমি মহাস্থানগড়
কেমন আছো পরম পাহাড়পুর
কেমন আছো উজ্জ্বল বাতিঘর
কেমন আছো বট এবং পাকুড়?



কেমন আছো নিখাদ এঁটেল মাটি
কেমন আছো বিস্তৃত বালুচর
কেমন আছো সোনালি শীতল পাটি
কেমন আছো রঙধনু মনোহর?

কেমন আছো যাত্রা এবং পালা
কেমন আছো বিবেক, সূত্রধর
কেমন আছো শ্যামল পল্লীবালা
কেমন আছো বণিক, সওদাগর?

কেমন আছো টেকনাফ, তেঁতুলিয়া
কেমন আছো লাল, নীল, শাদা ঘুড়ি
কেমন আছো শালিক, ময়না, টিয়া
কেমন আছো পাঁপড়ভাজা ও মুড়ি?

কেমন আছো রাজনীতি উদ্দাম
কেমন আছো গোঁড়া, রক্ষণশীল
কেমন আছো উদার এবং বাম
কেমন আছো চতুর শকুন, চিল?

কেমন আছো ধর্ম সমন্বয়
কেমন আছো পরম সহিষ্ণুতা
কেমন আছো যুক্তির ধ্রুব জয়
কেমন আছো তর্কের স্বাধীনতা?

কেমন আছো প্রার্থনা, মোনাজাত
কেমন আছো আজানের আবাহনী
কেমন আছো সেজদা আর সালাত
কেমন আছো উলু ও শঙ্খধ্বনি?

কেমন আছো কোরান ও বাইবেল
কেমন আছো ত্রিপিটক, গীতা আর
কেমন আছো আবেস্তা উদ্বেল
কেমন আছো ধম্মপদের সার?

কেমন আছো গড্ডল সারি সারি
কেমন আছো ব্যবসা, বুদ্ধিজীবী
কেমন আছো টাকা-পাই কাড়ি কাড়ি
কেমন আছো উইপোকাদের টিবি?

কেমন আছো উচ্চাকাঙ্ক্ষী যত
কেমন আছো পাও-চাটাদের দল
কেমন আছো ধ্যানীর মৌনব্রত
কেমন আছো নিজের পায়ের বল?

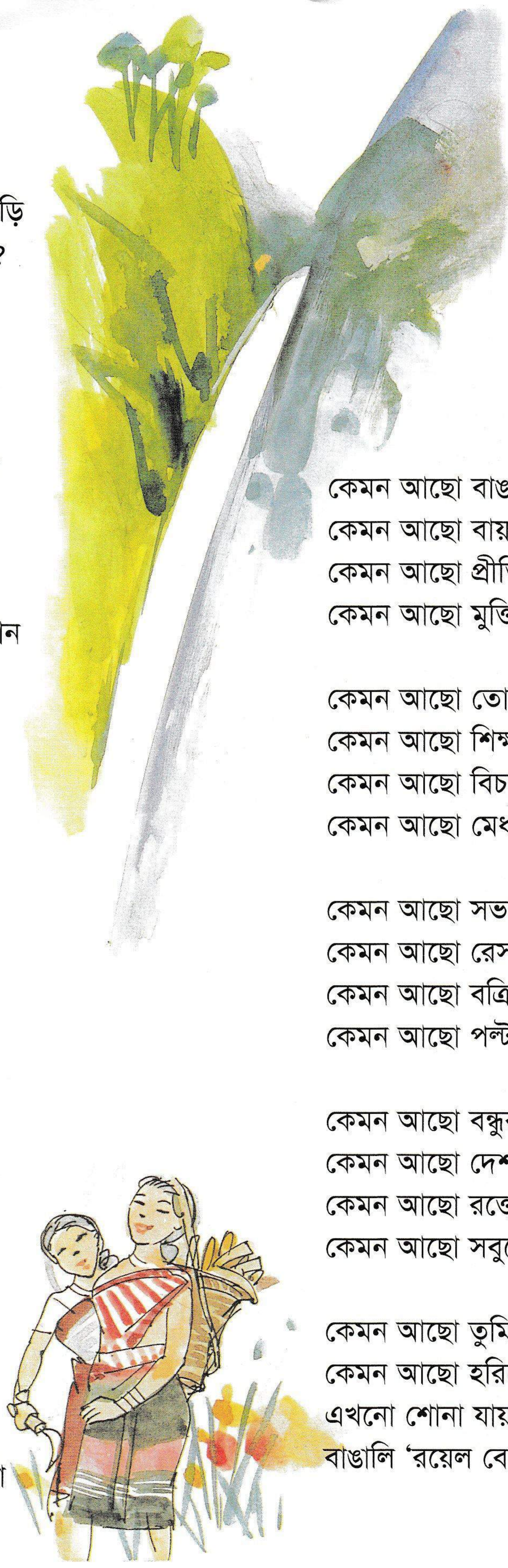
কেমন আছো 'জয় বাংলা'র গান
কেমন আছো বাঙালির পরিচয়
কেমন আছো আকাশ-কাঁপা স্লোগান
কেমন আছো শান্তির বরাভয়?

কেমন আছো আমার বন্ধু, সাথী
কেমন আছো আমার শত্রু যারা
কেমন আছো সাহসী বুকের ছাতি
কেমন আছো কন্যা পিতৃহারা?

কেমন আছো বই-ঠাসা পাঠাগার
কেমন আছো ধীমান যতো পাঠক
কেমন আছো ইতিহাস বাংলার
কেমন আছো মঞ্চ আর নাটক?

কেমন আছো ঝরনার ধারা জল
কেমন আছো তরুণ-তরুণী যতো
কেমন আছো যৌবন উচ্ছল
কেমন আছো বাধা-ভাঙবার ব্রত?

কেমন আছো পিঁড়ির আসন পাতা
কেমন আছো মুক্তিযোদ্ধা ভাই
কেমন আছো সাহসিকা বোন-মাতা
কেমন আছো শহীদের শেষ ঠাঁই?



কেমন আছো বাঙালি, বাংলা ভাষা
কেমন আছো বায়ান্নোর গৌরব
কেমন আছো প্রীতি আর ভালোবাসা
কেমন আছো মুক্তির সৌরভ?

কেমন আছো তোমরা অধ্যাপক
কেমন আছো শিক্ষক, গুরুজন
কেমন আছো বিচার ও বিচারক
কেমন আছো মেধা এবং মনন?

কেমন আছো সভা আর সেমিনার
কেমন আছো রেসকোর্স উদ্যান
কেমন আছো বত্রিশ নাম্বার
কেমন আছো পল্টন ময়দান?

কেমন আছো বন্ধুরা বেঁচে থাকা
কেমন আছো দেশ আর দেশবাসী
কেমন আছো রক্তে রাঙা পতাকা
কেমন আছো সবুজে-সূর্যে হাসি?

কেমন আছো তুমি সুন্দরবন
কেমন আছো হরিণের পাল আর–
এখনো শোনা যায় সেই গর্জন
বাঙালি 'রয়েল বেঙ্গল টাইগার'?

ধন্য তুমি যে

আহমাদ মাযহার

ধন্য তুমি যে শেখ মুজিব
বাঙালি জাতির মহান মানুষ ।
তোমার বুকের রক্তে গড়েছ
বাঙালির প্রাণ, বাঙালির হুঁশ ।
ধন্য হয়েছে সোনার বাংলা
গর্বিত আজ বাঙালির বুক ।
এই বাংলায় তোমার চেতনা
চিরকাল ধরে রবে জাগরূক ।
তুমিই দিয়েছ সোনালি চেতনা
তুমিই এনেছ বাংলাদেশ ।
পূর্ণ হয়েছে বাঙালি তোমার
প্রাণে দুঃখের নেইকো লেশ ।
সবুজের বুকে রক্তে রাঙানো
পতাকা মানে তুমি মুজিবর
হাজার বছরে বাঙালি পেয়েছে
ছায়া সুনিবিড় শান্তির ঘর ।



বত্রিশ নম্বরের বাড়ি

শিবুকান্তি দাশ

নীরব নিঝুম বাড়িটাতে আজ
নেই কোনো নিঃশ্বাস
ও-পথে যে যায়, থমকে দাঁড়ায়
ফেলে সে দীর্ঘশ্বাস ।
পচাঁত্তরের পনেরো আগস্ট
ওই বাড়িটাকে হায়
বুলেটে বুলেটে ঝাঁঝরা করেছে
কালোমুখো হায়েনায় ।
সিঁড়ির ওপর জমাট বাঁধানো
রক্তের আছে ছাপ
রক্ত ঝরিয়ে খুনিরা করেছে
শত জন্মের পাপ ।
সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে রক্ত গড়ায়
বাংলাদেশের বুকে
দেশময় আজ গভীর বেদনা
পিতা হারানোর দুখে ।
এই বাড়ি ঘিরে বাঙালি জাতির
ভালোবাসা শুধু বয়
বত্রিশ কোটি স্বপ্নালু চোখ
আজোতো স্বপ্নময় ।

বাঙালির রাজা মানুষের রাজা

আশরাফুল আলম পিনটু

পাখিরা গাইত গান
সে গানে ছিল না প্রাণ
সে গানে ছিল না মধু-ডাকাডাকি
গান কেড়েছিল ভিন বাজ-পাখি ।
পাখিরা ভাবে
কোথায় যাবে!
নিজ বনে থাকি তবু দূরে রই
ভয়ের এ কথা কারে কই,
কার কাছে কই?
রব ওঠে জোরে, ভয় নেই ওরে
পাখিদের রাজা আসে ওই, আসে ওই ।

বন মাঠ ঘাট ঘুরে ফিরে
বাতাস বইতো ভয়ে ধীরে
ধানক্ষেতে তাই উঠত না ঢেউ,
পেছনে পেছনে ধাবমান ফেউ ।
বাতাসের কান্না
আর না, আর না ।
পথ ছেড়ে দাও, নিজ মনে বই
রুদ্ধ-প্রাণের কথা কার কাছে কই?
রব ওঠে জোরে, ভয় নেই ওরে
বাতাসের রাজা আসে ওই, আসে ওই ।

নদীরা চলতো বয়ে
ক্ষ-য়ে ক্ষ-য়ে ক্ষয়ে
তাদের বিলাপ, কারা ছেঁড়ে পাল
কাড়তে চাইছে মাঝিদের হাল?
জল নয়, বুক ভরা দুখ থই থই
লাঞ্ছনার এ কথা কার কাছে কই?
রব ওঠে ওরে, ভয় নেই
নদীদের রাজা ওই আসে, আসে ওই ।

মানুষের মুখে ছিল নাকো ভাষা
ছিল নাকো হাসি, ছিল নাকো আশা
ছিল না আকাশ-মাটি
ছিল না বসতবাটি
ছিল না সূর্য, ছিল না জোছনা-তারা,
ছিল নাকো রোদ, বাতাস, বৃষ্টিধারা
শুধু ছিল লাল চোখ দানবের
শুধু ছিল অপমান মানবের ।
তারা কবে হায় নিস্তার পাবে!
মানুষেরা ভাবে–
নিজ দেশে আছি তবু বাঙালিই নই!
শেকল ছেঁড়ার কথা কার কাছে কই?
রব ওঠে জোরে, ভয় নেই ওরে
বাঙালির রাজা আসে ওই, আসে ওই ।

একদিন সেই রাজা আসে
মুক্তির জয়গানে ভাসে
দেশের মানুষ, পথ, মাঠ-ঘাট
আকাশ-বাতাস, পাখি আর ফুল
নদী বয়ে চলে কুলকুল ।
টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া আজ
যার নাম বহমান–
বাঙালির রাজা, মানুষের রাজা
শেখ মুজিবুর রহমান ।

জাতির পিতা

জ্যোতির্ময় মল্লিক

মার্চ মাসের অগ্নিঝরা ভাষণ,
টলিয়ে দিল অত্যাচারীর আসন ।

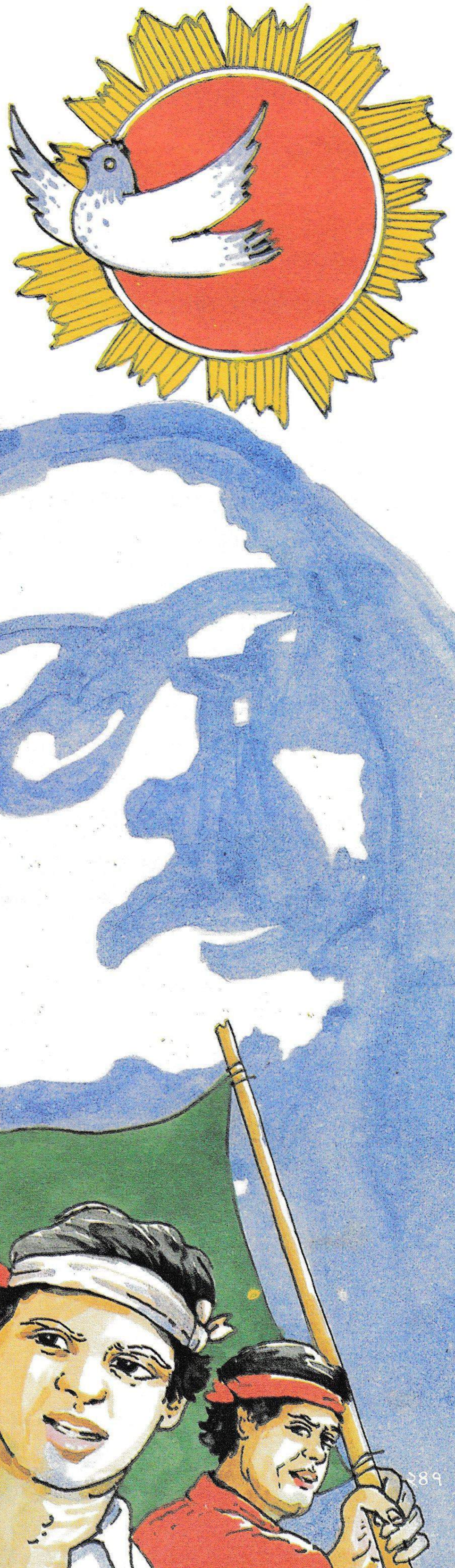
বইলো দেশে ভয়াল খুনের ধারা,
দেশের মানুষ সবাই দিশেহারা ।

নেতা বলেন অস্ত্র হাতে ধরো,
মাতৃভূমি শত্রুমুক্ত করো ।

তাঁর আদেশে অস্ত্র হাতে নিলাম,
তাঁর আদেশে যুদ্ধ করেছিলাম ।

যুদ্ধশেষে স্বাধীন হলো দেশ,
আমরা পেলাম মুক্ত পরিবেশ ।

মুজিব হলেন জাতির মুক্তিদাতা,
ভয়াল রাতে তিনিই মহান ত্রাতা ।



বাংলা মায়ের মুক্তিদাতা
শাফিকুর রাহী

[জাতির পিতার শুভ জন্মদিনে শ্রদ্ধা-ভালোবাসায়]

ঘোর আঁধারী মেঘলাকাশে কে জ্বালালো বাতি,
যাঁর আবেগী ভাষণ শুনে আমরা সবাই মাতি ।
বীরদর্পে বিশ্বজয়ের কে শোনালো বাণী?
মানুষ-মাটির বন্ধু তিনি দেশপ্রেমীও জানি ।
তাঁর গতিপথ রোধ করে কোন ভিনভাষী পাঞ্জাবি,
মায়ের ভাষা, মুক্ত আকাশ, বীর বাঙালির দাবি ।
সেই দাবিতে আঘাত হানে দস্যু খুনির দল
বাংলা মায়ের বুকটি চিরে ছোটায় রক্তজল ।

যুদ্ধ চলে স্বাধীনতার, চলল লড়াই মাঠে,
কিশোর-তরুণ ডানপিটেদের মন বসে না পাঠে ।
দুঃসাহসী বঙ্গবিচ্ছু বীরযোদ্ধা বেশে,
শত্রু নিধন জঙ্গে মাতে, কার মহানির্দেশে?
কার সে মহা অমর বাণী দুর্গ গড়ো সবে
স্বাধীনতার এই লড়াইয়ে জয়ী হতেই হবে ।
বন্ধু তিনি জাতির পিতা যুগের মহামানব,
হুংকারে তাঁর পালিয়েছিল পাকিস্তানি দানব !

যুদ্ধদিনের শপথ পাঠে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ,
টিক্কা ভুট্টো ইয়াহিয়ার ভাঙল যে দুঃশাসন ।
আকাশ-মাটি উঠলো কেঁপে, বিশ্ব অবাক হয়;
জাতির পিতা হুকুম দিলেন করতে স্বদেশ জয় ।
সাতই মার্চে ভাষণ দিলেন রমনারই উদ্যানে,
তাঁর বীরত্ব অমর গাথা সাহস যোগায় প্রাণে ।
তাঁর জন্যেই আমরা পেলাম স্বাধীন সবুজ দেশ–
হাজার যুগের মাটির পরশ, মুক্ত পরিবেশ ।

গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় মধুমতীর পাড়ে
উঠল নেচে বৃক্ষ-পাখি গিমাডাঙার ধারে ।
উনিশ শো বিশ সালের শুভ সতেরই মার্চ ভোরে,
বাংলা মায়ের মুক্তিদাতা তিমির নাশি তোড়ে ।
জন্ম নিয়েই জানান দিলেন ছড়িয়ে আলোর ডানা,
ভিনভাষীদের হটিয়ে দিতে মানব নাকো মানা ।
আমার মানুষ, মাটি নিয়ে খেলছে ওরা খেলা
চলবে না আর বলে দিলেম, করবে না কেউ হেলা ।

কোথায় তিনি নেই বলো মা, সবারই অন্তরে,
আছেন তিনি বিশ্বজুড়ে আছেন ঘরে ঘরে ।
জাতির পিতার জন্মদিনে সুখ-আনন্দে মাতি,
তাঁর স্মৃতিকে স্মরণ করে শ্রদ্ধা জানায় জাতি ।
ধন্য আমি ধন্য মাগো, এমন বীরের জন্য;
বিশ্বসভায় আজকে আমি সব থেকে অনন্য ।

ধানমণ্ডির বুকে

রাশেদ রউফ

মুয়াজ্জিনের আজান যখন সুবেহ সাদিক খোঁজে
একচক্ষু দানব তখন কাপড়ে মুখ গোঁজে।
নির্লোম বুক, দমকা বুলেট, শাণিত খঞ্জর
কাঁপতে থাকে ধানমণ্ডির বত্রিশ নম্বর।

প্রিয় বাড়ি, যার রয়েছে অনেক ইতিহাস,
সেই বাড়িতে উঠল ভেসে রক্তভেজা লাশ।
লাশের ওপর দানব হাসে বীভৎস ঘর্ঘর –
রক্তে রক্তে দেশ হয়ে যায় কারবালা প্রান্তর।
মুহররমের মাতম শুনি ধানমণ্ডির বুকে,
লেকের পানি নিথর চোখে কান্না ঝরায় দুখে;
শোকের মাতম ছড়িয়ে পড়ে, উধাও শান্তি-সুখ
বুলেটবিদ্ধ বঙ্গবন্ধু, বাংলা মায়ের মুখ!

তার সঙ্গে একটি শিশুর রক্তস্রোতে ভেসে
নিসর্গ নেয় লাল রঙা বেশ সারা বাংলাদেশে।
আকাশে নেই সূর্য, তবু রুদ্র খরতাপ,
কেমন ছিল সেই শিশুটি– 'নিষ্পাপ! নিষ্পাপ!'

রাসেল নামের সেই শিশুটির জন্যে আমার মন
বিলাপ করে হাওয়ায় হাওয়ায়, দুঃখ সারাক্ষণ।



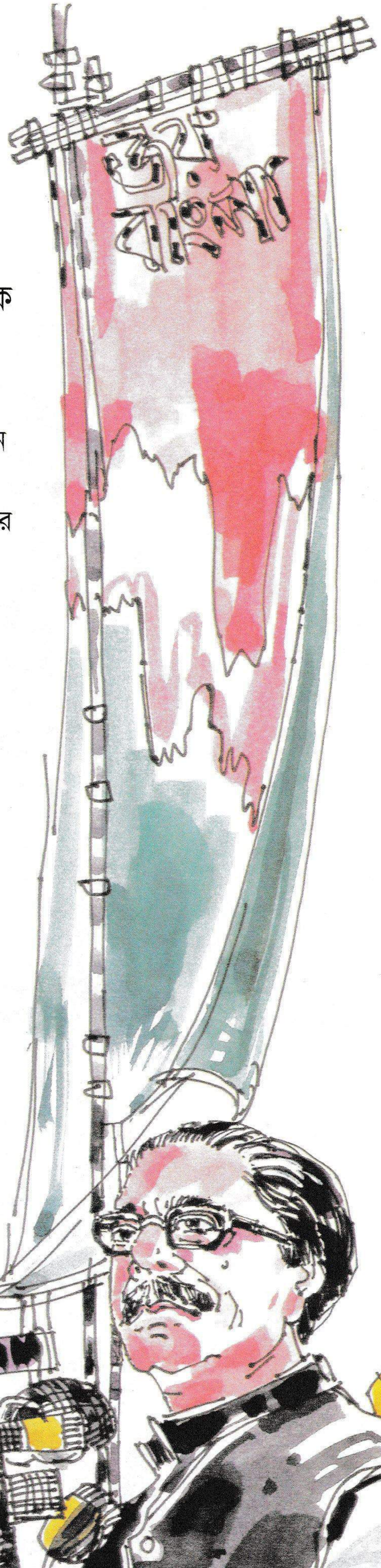
তিনি আমাদের জাতির জনক

আহসান মালেক

কান পেতে শোনো এখানে-ওখানে
কান পাতো চেনা বাটে
চোখ মেলে দেখো গাছে গাছে আর
ফসলের ক্ষেতে-মাঠে ।

পাখির কণ্ঠে, নদীর ঢেউয়ে
মাঝিদের গানে গানে
মুখরিত হয়ে একটি সুরই
বাজে সকলের প্রাণে ।

সুনীল আকাশে মোহন বাতাসে
সেই সুর ঘুরে ফিরে,
বাংলা নামের এ দেশের বুকে
মিলেমিশে থাকে ঘিরে ।



এই সুর হল আমার চেতনা
আঁধার ঘোচানো দীপ,
দৃপ্ত শপথে স্বপ্ন ছড়ানো
মুক্তির লাল টিপ ।

দিয়েছেন যিনি এই সুর-সুধা
বলি আজ অবিরাম–
তিনি আমাদের জাতির জনক
শেখ মুজিবুর নাম ।